বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার

[সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খণ্ড]

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

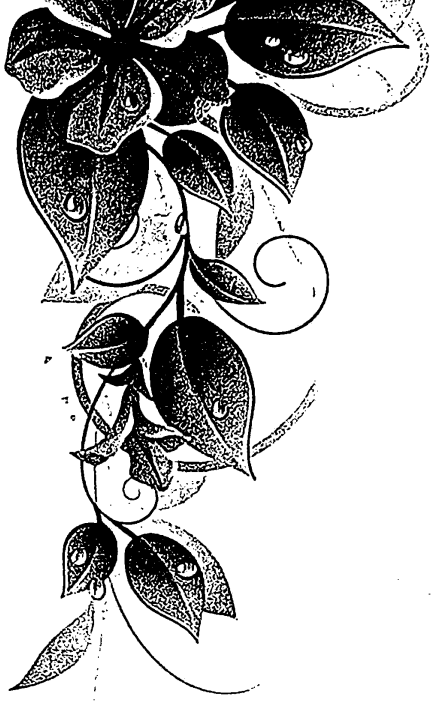
মাওলানা মুহাম্মাদ হিদায়াতুল্লাহ্
শিক্ষক, জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা
(মসজিদুল আকবার কমপ্লেক্স),
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

মাওলানা সাইফুর রহমান কাসেমী
শিক্ষাসচিব, জামিয়া মাদানিয়া নবাবকাটারা নিমতলী, ঢাকা।
ইমাম ও খতীব, গোলাম মাখদুম জামে মসজিদ
১০৮, আগাসাদেক রোড, ঢাকা

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দারুল উলূম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রথম প্রকাশ	এপ্রিল : ২০১৭
প্রকাশক	মাওলানা শহীদুল ইসলাম দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল	০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭
স্বত্ব	প্রকাশককর্তৃক সংরক্ষিত
বর্ণবিন্যাস	পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ	দি ব্রাইট, বাংলাবাজার, ঢাকা
	ISBN : 978-984-94571-3-8

মূল্য : ৫০০ টাকা মাত্র

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-১৭

রহমতে এলাহী /২৭
তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিন /২৭
রব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাতের চিন্তা /২৮
মানুষের চারটি প্রসংশনীয় স্বভাব /২৯
এক. আল্লাহকে ভয় করা /২৯
ওমরের খোদা তো দেখছেন! /৩০
তাহলে আল্লাহ্ কোথায়? /৩০
দুই. মধ্যপন্থা অবলম্বন করা /৩১
তিন. ন্যায়পরায়ণ হওয়া /৩২
চার. আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করা /৩২
নবীগণ ও আল্লাহ তা'আলার প্রসংসা /৩৩
জান্নাতবাসী ও আল্লাহর প্রশংসা /৩৪
আল্লাহর প্রশংসায় তাদের জবান সর্বদা জারি থাকবে /৩৬
মানুষের চারটি অবস্থা /৩৬
আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে লিপ্ত থাকা /৩৭
আশার আলো /৩৭
গুনাহ্সমূহকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করার ঘটনা /৩৮
গুনাহের বোঝা নিয়ে কালাতিপাত করা /৩৯
গুনাহগারদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ /৩৯
স্বচ্ছলতায় থাকা /৪০
অভাবগ্রস্ত থাকা /৪০
কেয়ামতের দিবসে অসহায় লোকদের ওজরখাহি /৪০
জনৈক কর্মব্যস্ত লোকের অক্ষমতার ওজর /৪১
জনৈক শ্রমিকের অক্ষমতার ওজর /৪১
জনৈক দরিদ্র ব্যক্তির অক্ষমতার ওজর /৪১
জনৈক অসুস্থ ব্যক্তির অক্ষমতার ওজর /৪২
সে তো জীবিত থাকতেই মারা যাবে /৪২
বকরির অফাদারী /৪৩

ছোট্ট ছেলের আমলের মধ্যে লুকায়িত শিক্ষা /৪৩
বিপদের সময়েও আল্লাহ্ থেকে বিচ্যুতি /৪৩
চারটি ওজীফা /৪৩
বিপদগ্রস্তের জন্য /৪৫
কার্যাদি সজ্জিত হওয়ার জন্য /৪৬
হিংসুকদের অনিষ্ট থেকে বেঁছে থাকার জন্য /৪৬
৪. জান্নাত লাভের জন্য /৪৭
তাবিজ-কবচের অভ্যাস /৪৭
পীর আর মুরীদের চাওয়ার মধ্যে ব্যবধান /৪৯
আল্লাহর রহমত হলো সকল ভালোবাসার স্রোতধারা /৪৯
ক্ষমা করার বাহানা /৫০
জাহান্নামিদের পরিচয় /৫১
তূর পাহাড় তো আছে; কিন্তু মূসা কোথায়? /৫২
একটি আশ্চর্য বিষয় /৫২
মুক্তির ভিত্তি একমাত্র তাঁর দয়ার ওপরই /৫২
শয়তানের আফসোস /৫৩
সম্মিলিত তাওবার ফযীলত /৫৪
গুনাহের শাস্তিতে তিনি বিলম্ব কেন করবেন? /৫৪
কাফেরদের সাথেও মাগফেরাতের প্রতিশ্রুতি /৫৪
জনৈক যুবকের মাগফেরাতের ঘোষণা /৫৫
এক মূর্তিপূজারির ওপর তাঁর দয়ার বহিঃপ্রকাশ /৫৬
তারপর আমি আপনার দরবারে কীভাবে আসব? /৫৬
একটি আশ্চর্যজনক দু'আ /৫৭
ইল্‌মে হাদীছ /৬১
ইল্‌মে হাদীছ /৬২
ইল্‌মে হাদীছের ফযীলত /৬৪
ইমাম বোখারি (রহ.) /৬৫
ইমাম বোখারি (রহ.) কে ছিলেন? /৬৫
হাদীছ মুখস্থ করার দিক থেকে একক অবস্থান /৬৭
বোখারি শরীফ সংকলনের নেপথ্যে /৬৮
কিতাব সংকলনে আদব রক্ষা /৬৯
বোখারি শরীফে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা /৬৯
বোখারি শরীফের হাদীছ বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে শর্তসমূহ /৭০
ইল্‌মে হাদীছের সংকলন /৭০

সিহাহ্ সিত্তাহর অসাধারণ বর্ণনাশৈলী /৭২
পঞ্চইন্দ্রিয় ও ইল্‌ম অর্জন /৭৪
জ্ঞান অর্জন ও বিবেক /৭৬
আল্লাহর অহী ও ইল্‌ম অর্জন /৭৮
হাদীছের কিতাবে চিত্তাকর্ষক দিকসমূহ /৭৯
বোখারি সংকলনের বছর /৭৯
নিয়তের সংশোধন /৭৯
নিয়ত শুদ্ধ করার মর্মকথা /৮১
নিয়তের শরয়ী অবস্থান /৮২
উক্ত হাদীছের পটভূমি /৮৩
একটি জ্ঞানভিত্তিক রহস্য /৮৩
তাসাওউফ-এর শুরু /৮৫
নববী হাদীছের ঝলক /৮৫
কথা অনুসরণ করে বক্তা পর্যন্ত পৌঁছা /৮৬
নববী দরবারে হাদীছ অধ্যয়নের মূল্যায়ন /৯০
নূরানী চেহারা /৯১
নূর অর্জন করার জন্য মাসনূন দু'আসমূহ /৯১
এই নূর অর্জন করা অত্যাবশ্যকীয় কেন? /৯১
কুদরতের সেই নূর অর্জনে সবচেয়ে বড় বাধা /৯২
বায়তুল্লাহর মহত্ত্ব /৯৫
পৃথিবীর সূচনা /৯৫
বায়তুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণ /৯৬
বায়তুল্লাহ্'র নামকরণ /৯৬
চক্ষুধারী তোমার যৌবনের তামাশা দেখছে /৯৭
মূল ও মধ্য ভূমণ্ডল /৯৮
বায়তুল্লাহর প্রতি স্থায়ী আকর্ষণ /৯৮
মেঘের ছায়া থেকেই হারাম শরীফের সীমানা নির্ধরণ করা হয়েছে /৯৮
হজের ঘোষণা /৯৯
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আ /৯৯
হেদায়াতের কেন্দ্র /১০০
ওগো মাবূদ! শোকর কেবল তোমারই! /১০০
মহব্বত আর ভালোবাসার পাগলামি /১০২
আরাফার দিন /১০৩
ইবলিসের অপমানিত হওয়ার দিন /১০৩

আল্লাহ্‌র রহমতের সাগর হলো কূলহীন /১০৩
হজের আমলসমূহের ওপর গুনাহ্‌মাফির অঙ্গীকার /১০৪
ফকিরের বেশ ধারণ করার বরকত /১০৫
অশ্রুর মূল্যায়ন /১০৬
চক্ষুর পলকের পশমও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হবে /১০৬
নিজের নিকৃষ্ট হওয়া স্বীকার করবেন /১০৯
আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা খুবই সহজ /১০৯
এখন ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে হাত প্রসারিত করুন /১১৩
মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ /১১৭
সীরাতুন্নাবীর একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টিকোণ /১১৭
تكريم শব্দের অর্থ /১১৮
الكريم এর বাস্তব নমুনা /১১৮
التكريم এর পারিভাষিক অর্থ /১১৯
মানুষকে মর্যাদা দেওয়ার কয়েকটি উদাহরণ /১১৯
মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের দুটি মূলনীতি /১২১
অন্যায় রোধ এবং উপকার পৌঁছানোর শিক্ষা /১২৩
শ্রেষ্ঠ কাজ /১২৪
মানুষের পেরেশানি দূর করার ফযিলত /১২৪
এটি মানবতা /১২৬
আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়ার শিক্ষা /১২৭
সাম্যের শিক্ষা /২৮
ক্রীতদাসের সাথে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা /১২৯
সামাজিকতার সোনালি নীতি /১৩০
ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা /১৩১
কাউকে নিয়ে তামাশা করার প্রতি তিরস্কার /১৩২
কাউকে তাচ্ছিল্যকারীর পরিণতি /১৩২
শ্রেষ্ঠ কালাম /১৩৩
মানুষের আত্মীয়তার চার চক্র /১৩৩
প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা /১৩৬
প্রতিবেশী তিন ধরনের /১৩৬
সীরাতুন্নাবী থেকে মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কয়েকটি নমুনা /১৩৭
একটি আশ্চর্য ঘটনা /১৩৮
দয়ালু নবীর মমতাপূর্ণ দু'আ /১৩৯
মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অনুপম উদাহরণ /১৩৯

জনৈক ইহুদির জানাযার প্রতি সম্মান /১৪০
জনৈক ইহুদি আলেমের সাথে সদ্ব্যবহার /১৪০
দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অমুসলিমদের জন্য স্বচ্ছলতার দু'আ /১৪৪
মক্কার কাফেরদের জন্যে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ /১৪৪
হাতেম তাঈ-এর কন্যার সাথে সদ্ব্যবহার /১৪৫
অমুসলিম মেয়ের মাথায় রাসূলের চাদর /১৪৭
কয়েদিদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ /১৪৮
ইল্‌ম ও তাসাওউফ /১৫৩
ইল্‌মে শরীয়ত ও ইল্‌মে তাসাওউফ /১৫৩
তাসাওউফ ও সুলুকের জন্যে ইল্‌মের প্রয়োজন /১৫৪
ইল্‌মে দীন অর্জন করতে বুযুর্গদের উৎসাহ /১৫৪
অজ্ঞতা শত্রুতার কারণ /১৫৫
সূফিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে আলেমদের সংকলন /১৫৬
তাসাওউফ কি অনারবদের তৈরী? /১৫৬
দুটি আয়াতের মাঝে বিস্ময়কর সামঞ্জস্য! /১৫৭
'ইনসান' শব্দের পরিচয় /১৫৮
رب শব্দের পরিচয় /১৫৮
পালনকর্তা কে? /১৫৯
ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য /১৬০
অজ্ঞ, স্বল্প জ্ঞানী ও রুগ্ন জ্ঞানী /১৬১
খোদপ্রদত্ত ইল্‌মের যোগ্য কারা? /১৬২
খোদা প্রদত্ত ইল্‌ম ও হাবীব আ'জমি /১৬২
মসজিদে নববীর প্রাথমিক অবস্থা /১৬৩
ওলামায়ে কেরামকে সামনে স্থান করে দেওয়ার মাঝে অন্যদের উপকার /১৬৩
ফাযায়েল ও মাসায়েলের ইল্‌ম /১৬৪
عيش الدنيا والآخرة এর সঠিক মর্ম কী? /১৬৫
হাদীছ বর্ণনায় শ্রবণের গুরুত্ব /১৬৫
কোনো নবী বধির ছিলেন না কেন? /১৬৫
হেদায়াতের নূর প্রাপ্তির জন্য শ্রবণের গুরুত্ব /১৬৬
এর নামই হলো 'বেলায়াত' /১৬৭
ইসলামের মৌলিক বিধান অথবা ... /১৬৭
এ-ও 'যাহাবী' সে-ও 'যাহাবী' /১৬৮
একটি আশ্চর্য দু'আ /১৬৮

মুরীদের পরিচিতি /১৬৮
মানুষের শরীরে ওলামা ও মজুরের বসবাস /১৬৯
আল্লাহ্‌র রূহানী দয়ায় বাধা /১৬৯
মেনে চলা শিখুন /১৭০
স্থির অন্তর নিয়ে বসুন /১৭১
অধিক যিকির নম্রতার কারণ হবে /১৭১
হাড়ের ওপর গোশত কেন? /১৭১
কুরআনুল কারীমের মৌলিক নির্দেশনা /১৭১
ফেরাউনের সাথে নরম আচরণ করার নির্দেশ /১৭২
জামাতের জন্য অপেক্ষা /১৭২
এই সময়গুলো আমাদের কাছে আমানত /১৭৩
আন্তরিক সম্পর্ক ও তার উপকারিতা /১৭৩
অন্তরের স্থিতিশীলতার সহায়ক দুটি বিষয় /১৭৪
আল্লাহ অন্যেষণকারী পথিক /১৭৪
প্রতিদান ও বিচারের দিন /১৭৯
সাহায্য কামনা করার দিন /১৮০
তিনটি মৌলিক বিশ্বাস /১৮০
কেয়ামত দিবসের বিভিন্ন নাম /১৮২
দুনিয়ার সবচেয়ে বড় খবর /১৮৪
কুরআনুল কারীমে কেয়ামতের আলোচনা /১৮৬
কেয়ামত দিবসের চারজন সাক্ষী /১৮৮
আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের অনুভূতি /১৮৯
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /১৯০
জনৈক শিশুর আশ্চর্যজনক উত্তর /১৯০
নবীজির অন্তরে কেয়ামতের ভয় /১৯১
হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর অন্তরে কেয়ামতের ভয় /১৯২
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর
অন্তরে কেয়ামতের ভয় /১৯২
হযরত ওমর (রাযি.)-এর অন্তরে কেয়ামতের ভয় /১৯২
জনৈক রাখালের অন্তরে কেয়ামতের ভয় /১৯৪
রাবেয়া বসরির অন্তরে কেয়ামতের ভয় /১৯৪
ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর
অন্তরে কেয়ামতের ভয় /১৯৪
হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ.)-এর ভয় /১৯৫

সেদিন হায় আফসোসের জগত কায়েম হবে /১৯৫
রহমাতুল্লিল আলামীনের সুপারিশ /১৯৭
খোলাফায়ে রাশেদীনের ওপর রহমতে ইলাহীর বর্ষণ /১৯৮
নবীজির সামনে লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা /২০০
আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর অন্তরে কেয়ামতের ভয় /২০১
চুপিসারে আমল করার আগ্রহ /২০২
আমলের গ্রহণযোগ্যতার ফিকির /২০২
ত্রুটিযুক্ত আমলের কোনো বিনিময় নেই /২০৩
জনৈক বাদশাহর অস্থিরতা /২০৩
কেয়ামতের নিদর্শন /২০৭
সর্বোচ্চ উন্নতির সন্ধানে /২০৭
ধোঁকার ঘর /২০৮
অন্তরের চক্ষু খোলা প্রয়োজন /২০৯
পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি কীভাবে হবে? /২০৯
আল্লাহর বন্দেগি ভিন্ন বিষয় /২১০
জীবনের কোনো ভরসা নেই /২১১
বর্তমানকালে কেয়ামতের বিভিন্ন নিদর্শন /২১২
পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ করা /২১২
বিশালাকৃতির অট্টালিকা নির্মাণ /২১৩
ইরাকবাসীর খাদ্যসরবরাহ বন্ধ হওয়া /২১৩
আরবভূমিতে কৃষি উৎপন্ন হওয়া /২১৩
টাকার বিনিময়ে স্ত্রীর আনুগত্য করা /২১৪
পিতার পরিবর্তে বন্ধুর কথায় চলা /২১৪
মা যেন নিজের নির্দেশদাতাকে জন্ম দিয়েছেন /২১৪
বুযুর্গদের কোনো যোগ্য স্থলাভিষিক্ত না থাকা /২১৪
যাকাতকে জরিমানা মনে করা /২১৫
প্রত্যেক কানে গান-বাদ্যের আওয়াজ ঢোকা /২১৫
উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ও ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করা /২১৫
ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের হত্যা করা /২১৬
রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যু, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ এবং আওয়াজ সৃষ্টি হওয়া /২১৬
ভূমিকম্পের দুটি কারণ /২১৬
প্রাকৃতিক কারণসমূহ /২১৭
শরয়ী কারণসমূহ /২১৭
অন্যকে আনন্দ দিতে সুগন্ধি ব্যবহার করা /২১৮

অন্যের সামনে উলঙ্গ ও অর্ধনগ্ন হওয়াতে সঙ্কোচবোধ না করা /২১৮
মদ-গাঁজা আর বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপকতা /২২০
গুনাহের শাস্তি বিভিন্ন ধরনের ভূকম্পনের মাধ্যমে /২২১
ভূমিকম্পের সময় কী করা উচিত? /২২১
এটি সৃষ্টিগত সিদ্ধান্ত /২২৩
একটি কঠিন ভূমিকম্প /২২৪
জমিনের পেটে ধসে যাওয়া ব্যক্তির অলৌকিক জীবন /২২৪
তিনতলা মসজিদ জমিনের ভেতর দেবে গেল /২২৪
সম্পূর্ণ গ্রাম দুটি পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে যায় /২২৪
পরিবারের সবাই নিহত! ২২৫
সম্পূর্ণ মহল্লা জমিনে ধসে গেল /২২৫
সর্বদা নিজের নিঃস্বতার খেয়াল রাখবে /২২৬
নিহত হওয়া সবাই কিন্তু পাপি ছিল না /২২৬
বছরে দু-একবার পরীক্ষা /২২৭
শিক্ষা গ্রহণ করো, অন্যের শিক্ষা গ্রহণের কারণ হয়ো না /২২৮
আজ জীবনের গতি পরিবর্তন করুন /২২৯
সৃষ্টিতত্ত্বে (Genetic Engineering)
বিজ্ঞানের উৎকর্ষ /২৩৩
আমল কীভাবে ইবাদাত হয়? /২৩৩
বস্ত্র ও হস্তলিখন বিদ্যা /২৩৪
কৃষিবিদ্যার যুগ /২৩৫
সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগ /২৩৮
মেকানিক্যাল প্রযুক্তির যুগ /২৪২
ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগ /২৪৩
ইউনানী চিকিৎসার যুগ /২৪৪
কম্পিউটারের যুগ /২৪৫
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগ /২৪৬
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিচয় কী /২৪৬
আল্লাহর প্রতিনিধির যোগ্যতা /২৪৭
ফসলের ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রভাব /২৪৮
ফলের ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রভাব /২৪৮
প্রাণীজগত নিয়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গবেষণা /২৪৮
মনুষ্যবংশ বৃদ্ধি ও জেনেটিক পদ্ধতি /২৪৯
DNA (ডি.এন.এ.) পরিচিতি /২৫১
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি প্রশংসামূলক কীর্তি /২৫৩
কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়া ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং /২৫৫

খুতুবাতে যুলফিকার-১৮

আল্লাহর মর্যাদা /২৬৫
আল্লাহর শান /২৬৫
এতেই আমি গর্বিত /২৬৬
ইবাদাত কার অধিকার? /২৬৬
ভালোবাসার মেরাজ /২৬৭
'ইলাহ' কাকে বলে? /২৬৯
আল্লাহর ইচ্ছা-ই কার্যকর হয় /২৭০
বন্দেগি এক গোলামের কাছে শিখেছি /২৭১
একটি প্রশ্নের বিস্ময়কর জবাব /২৭২
আল্লাহর ইচ্ছা সবার ঊর্ধ্বে /২৭২
আল্লাহর ইবাদাতের আহ্বান /২৭২
আল্লাহর শাহী কালেমার কিছু ঝলক /২৭৩
আম্বিয়া কেরামের অক্ষমতা /২৭৫
কুরআনের আয়াতে অক্ষমতা প্রকাশের শিক্ষা /২৭৫
মাসনূন দু'আসমূহে বিনয়ের শিক্ষা /২৭৮
আল্লাহর বিশেষ দয়া /২৮২
নবজাতকের কানে আযান-ইকামত /২৮৩
আযান-ইকামতে আল্লাহর বড়ত্বের পয়গাম /২৮৩
তাহনীক-এ কয়েকটি ইল্‌মি তত্ত্ব /২৮৫
বিসমিল্লাহ-এর ب ও তার তত্ত্ব /২৮৭
সম্মান ও অপমান কীসের ভিত্তিতে আসে? /২৮৮
গোঁফ ও পলকের মধ্যে বিস্ময়কর দৃশ্য /২৮৯
বকরির 'মেঁ-মেঁ-এর রহস্য /২৯০
'ময়না' প্রিয় হওয়ার কারণ /২৯০
বিনয় দ্বারা যোগ্যতা তৈরি হয় /২৯১
নমরূদের অহংকার কীভাবে ভাঙল? /২৯১
তাসাওউফ-এর মৌলিক মাসআলা /২৯২
সাহাবায়ে কেরামের বিনয় /২৯৩

আল্লাহওয়ালাদের বিনয় /২৯৪
ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর বিনয় /২৯৪
দাসত্ব বর্জন ও লালন পদ্ধতি /২৯৫
বিনয়ের সাথে হাত পাতুন ২৯৬
মহব্বতের কারণসমূহ /২৯৯
আল্লাহর ব্যক্তিগত মহব্বত ও ব্যক্তিগত দুশমনি /২৯৯
কাফেরদের সাদৃশ্যের কারণে শাস্তি /৩০০
ঈমানদারদের সঙ্গে আল্লাহর ব্যক্তিগত মহব্বতের প্রমাণ /৩০১
মহব্বতের কারণসমূহ /৩০২
আল্লাহর অনুগ্রহের একটি উদাহরণ /৩০৬
মহব্বতে ইলাহীর প্রচণ্ডতাই কাম্য /৩০৭
প্রিয়তমের নামে জীবনের নিলাম তোলা /৩০৮
সত্য হলো, হক আদায় হয়নি /৩০৯
আল্লাহপ্রেমের এক অপূর্ব ধরন /৩১০
আমলের গিফ্‌টপ্যাকিং কীভাবে হয়? /৩১১
ইশ্‌কওয়ালাদের নামায /৩১১
রাতজাগা লোকগুলো /৩১৩
সর্বদা সাক্ষাতের আনন্দ উপভোগ করি /৩১৫
আল্লাহকে আল্লাহ থেকে চেয়ে নিন /৩১৬
সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নফলের বাহানা /৩১৬
আল্লাহর মহব্বত আল্লাহওয়ালাদের নিকট পাওয়া যায় /৩১৭
এসব কি খানকা, না ইশ্‌কের দোকান? /৩১৮
পৃথিবীর সকল মজা অর্জনের ক্যাপসুল /৩১৮
মহব্বতে ইলাহী পাওয়ার একটি মাকবুল দু'আ /৩১৯
হাফেযে কুরআন হওয়ার আগ্রহ /৩২৩
কুরআনের মর্যাদা /৩২৩
কুরআনের সুপারিশ /৩২৪
হাফেযে কুরআনের সুপারিশ /৩২৪
এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জিত হয় না /৩২৫
মহিলাদের মধ্যে হিফযুল কুরআনের আগ্রহ /৩২৬
পাঁচ বছর বয়সে কুরআনের হাফেয /৩২৬
নব্বই বছর বয়সে কুরআন হেফয /৩২৬
সাত মাসে কুরআন হেফয /৩২৭

এক মাসেই কুরআন হেফয /৩২৭
কুরআনের ইশ্‌কে সিক্ত এক মহিলা /৩২৭
কুরআন মাজীদের কম্পিউটার /৩২৮
কয়েক মাসের শিশুর সূরা মুল্‌ক মুখস্থ /৩২৮
স্পৃহার ডানায় ভর করে হাফেযে কুরআনের উড্ডয়ন /৩২৯
শরীয়তের বিধান অনুযায়ী চলুন /৩৩০
নিয়তের স্বচ্ছতা /৩৩৩
মুমিনের নিয়তের মর্যাদা /৩৩৩
সৎকর্মের নিয়তের ভিত্তিতে ক্ষমার ফয়সালা /৩৩৪
বিস্ময়কর আমলনামা /৩৩৫
আকাঙ্ক্ষা, যা পছন্দ হয়ে গেল /৩৩৫
অন্তরে সততার আলামত /৩৩৭
খাঁটি বান্দার পরিচয় /৩৩৭
মুখলিস বান্দার আমলের মর্যাদা /৩৩৮
তিনটি বিষয় আল্লাহর জন্য খাস /৩৩৮
কথা ও কাজের বৈষম্য /৩৩৯
ভালো সালেকের তিনটি নিদর্শন /৩৪১
শায়েখের হাতে বায়'আতের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /৩৪৩
তিনটি সত্য কথা /৩৪৫
দুনিয়াপ্রেমের শাস্তির আলামত /৩৪৬
বিস্ময়কর ব্যাপার! /৩৪৭
গুনাহ সকল দুশ্চিন্তার মূল /৩৪৭
রূহানিয়্যাতের পতন /৩৪৮
তিনটি গুনাহ সকল গুনাহের মূল উৎস /৩৫০
সাদা চুল দেখে লজ্জা! /৪৫১
এক বুযুর্গের নসীহত /৩৫১
তিনটি অমূল্য বাণী /৩৫১
ঈমান ধ্বংস হওয়ার কারণ /৩৫২
সবগুলো আসমানি গ্রন্থের সারাংশ /৩৫৩
অন্তরকে অন্ধকার করে দেওয়ার মতো গুনাহ /৩৫৪
ফয়েয কীভাবে জারি হয়? /৩৫৫
বড়দের তরবিয়তের পদ্ধতি /৩৫৬

উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব /৩৬১
ফলেই গাছের পরিচয় /৩৬১
মানুষকে তার চরিত্র দিয়ে চেনা যায় /৩৬১
পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মানুষ /৩৬২
পশুর মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস /৩৬২
পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট প্রাণী /৩৬৩
দীনের মধ্যে উত্তম চরিত্রের দীক্ষা /৩৬৩
আখলাকের তিনটি স্তর রয়েছে /৩৬৪
আখলাকে হাসানাহ্ বা আখলাকে আলিয়া /৩৬৪
হযরত মুসা (আ.)-এর আখলাক /৩৬৫
২। আখলাকে কারীমানা /৩৬৬
আমাদের করুণ দশা /৩৬৬
শরীয়তের সৌন্দর্য /৩৬৭
৩. আখলাকে হাসানাহ /৩৬৭
আখলাকে আযীমাহর উদাহরণ /৩৬৮
আখলাকে আযীমার শিক্ষা /৩৬৯
একেই বলে আখলাকে আযীমা /৩৭০
মন্দ লোকের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার /৩৭০
নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করি /৩৭১
বিদ্বেষ চর্চার পরিণতি /৩৭২
বিদ্বেষমুক্ত অন্তরের পুরস্কার /৩৭২
দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম করো /৩৭৩
ভালো করো; ভালো হবে /৩৭৩
পাথেয়র চিন্তা /৩৭৪
কামেল মুমিন /৩৭৫
মানবতার মানদণ্ড /৩৭৫
আখলাকের তলোয়ার /৩৭৬
নবীজির উত্তম চরিত্রের কিছু ঝলক /৩৭৬
এক গ্রাম্যলোকের অন্তর জয় /৩৭৬
শত্রুর অন্তর জয় /৩৭৭
বন্ধুদের অন্তর জয় /৩৭৯
ছোটদের অন্তর জয় /৩৮০
নবুওতের অনুপম দলিল ৩৮১

পর্দার আড়ালে থাকতে দাও... /৩৮১
উত্তম চরিত্র ইবাদাত /৩৮২
শিকড়ের সাথে লেগে থাক /৩৮৪
মা বাবার স্নেহের ছায়া /৩৮৫
বরকতের ভান্ডার /৩৮৫
আচার-ব্যবহার খারাপ হওয়ার কারণ /৩৮৫
ক্রোধ সংবরণের পুরস্কার /৩৮৬
মন্দের প্রতিদান ভালো দিয়ে /৩৮৭
পরোপকারের পুরস্কার /৩৮৭
কল্যাণকামিতার মূল্যায়ন /৩৮৮
দুটি শব্দে গোটা দীন /৩৮৯
আখলাকের পাঠদান প্রয়োজন /৩৮৯
প্রতিবেশীর মূল্য /৩৯০
প্রকৃত কল্যাণকামিতা এমনই /৩৯১
কল্যাণকামিতার বিস্ময়কর উদাহরণ /৩৯২
আমল দিয়ে জীবন গড়ে /৩৯৩
অপূর্ব মকদ্দমা, অনুপম ফয়সালা /৩৯৩
দীনদারি না হলে স্বজনও দুশমন হয়ে যায় /৩৯৫
মুমিন হত্যায় আল্লাহর ক্রোধ /৩৯৫
কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত /৩৯৬
একজন মুমিনের মর্যাদা /৩৯৬
ভালো করো ভালো পাবে /৩৯৭
তোমাদের তো লজ্জা হয় না /৩৯৭
তিনটি মূল্যবান কথা /৩৯৮
ব্যবহারে চরিত্রের পরিচয় মিলে /৩৯৮
আজকের মুসলমানদের 'ইনশাআল্লাহ' /৩৯৯
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেক দোষ গোপন করার গুণ /৩৯৯
হত্যার সময়ও কল্যাণ কামনা /৪০০
মৃত্যুর সময়ও কল্যাণ কামনা /৪০১
মানবতার স্তর পরিমাপ করার থার্মোমিটার /৪০১
মুসলমানিত্ব গর্ব করে তাঁকে নিয়ে /৪০২
প্রাণীদের প্রতিও কল্যাণকামিতা /৪০৩
কল্যাণকামিতা জাহান্নামের জন্য প্রাচীর /৪০৩

একটি মূল্যবান নসীহত /৪০৩
অশান্তি নয়; প্রশান্তির উৎস হয়ে বসবাস করুন /৪০৫
ছাত্রদের উদ্দেশে মূল্যবান নসীহত /৪০৯
দুনিয়াটা পরীক্ষার হল /৪০৯
দু-ধরনের মানুষ /৪১১
আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করেন /৪১১
অবস্থার পরিবর্তন /৪১২
দুটি পতাকা /৪১২
চূড়ান্ত ফলাফল /৪১৩
সত্যের কাফেলা /৪১৩
আনন্দ করে নাও, দুনিয়া দ্বিতীয়বার আসবে না /৪১৪
রবের সন্তুষ্টি অনুসন্ধানকারী /৪১৪
শয়তানের প্রচণ্ড হামলা /৪১৫
শয়তানের ঘাঁটি /৪১৫
ঈমানের জন্য হুমকি /৪১৬
কর্মমুখী শিক্ষা ও আখেরাতমুখী শিক্ষা /৪১৬
আল্লাহর নির্বাচন /৪১৭
শয়তানের ব্যাটলিয়ন /৪১৭
শয়তানের ইঞ্জেকশন /৪১৮
গুনাহ ও স্মৃতিশক্তি /৪১৮
ফটোগ্রাফিক মেমোরী /৪১৮
বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি /৪১৯
মুহাদ্দিছ কাকে বলে? /৪২১
স্মৃতিশক্তির অপূর্ব এক উদাহরণ /৪২১
পরহেযগারির পুরস্কার /৪২৩
স্মৃতিশক্তি ও এক মুহাদ্দিছের মর্যাদা /৪২৩
স্মৃতিশক্তির আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা /৪২৪
একই গন্তব্যের পথিক /৪২৫
সূরতকে হাকীকত বানিয়ে নিন /৪২৬
রাসূলপ্রেমিক ও বন্ধু /৪২৭
কাঁটার বিছানা /৪২৭
নেসবতের হক /৪২৮
নিজের সাম্রাজ্য /৪২৮

দুধ ও পানির চমৎকার সংলাপ /৪২৯
আকাবিরগণ ছিলেন দুধ আর আমরা হলাম পানি /৪৩০
এই ফকিরের তামান্না /৪৩০
ইশ্‌ক ও সূলূকের তাজাল্লি /৪৩৩
ইশ্‌কের পথের পথিক /৪৩৩
দীদারে ইলাহীর ব্যাকুলতা /৪৩৬
রূপবান তার রূপ নিয়ে অভিমান করবেই /৪৩৮
ইশ্‌কের তাজাল্লি যে পায় /৪৩৮
সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) /৪৩৮
সায়্যিদুনা হযরত ওমর (রাযি.) /৪৪০
হযরত বিশ্‌র খাফী (রহ.) /৪৪০
হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম /৪৪২
হযরত মুবারক (রহ.) /৪৪৫
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) /৪৪৬
দ্বিগুণ উন্নতির সময় /৪৪৭
অন্তর ভাঙার পরই উন্নতি লাভ হয় /৪৪৮
একটি চমৎকার ঘটনা /৪৪৯
শাইখের পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা /৪৫০
তলব তথা অনুসন্ধিৎসার মান যাচাই /৪৫১
দয়ার নবীর অস্থিরতা /৪৫২
দুশ্চিন্তার অবসান /৪৫২
আশেকের প্রেম ও মাশুকের প্রেমের মাঝে তুলনা /৫৪৪
বিস্ময়ের জগত ৪৫৫
শয়তানের ফাঁদ /৪৫৬
বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতিও একটি নেয়ামত /৪৫৬
'হাল মিন মাযীদ'-এর অবস্থা /৪৫৬
জযব ও সুলূক বোঝার উপায় কী? /৪৫৭
দু'আ কবুলের সময় /৪৫৭
কষ্টের সময় আল্লাহর দান : একটি ঘটনা /৪৫৮
আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টার প্রতিদান /৪৫৯
ভালো হওয়ার ইচ্ছা ও তার মূল্যায়ন /৪৫৯
দু'আর আদব /৪৬৩
আল্লাহর অগণিত নেয়ামত /৪৬৩

আল্লাহর অনুগ্রহ ও আমরা /৪৬৪
এক পেয়ালা পানির মূল্য /৪৬৪
পঙ্গুত্ব থেকে বাঁচার কুদরতি ব্যবস্থা /৪৬৫
বিশ্বস্রষ্টার পছন্দ /৪৬৫
স্রষ্টা ও সৃষ্টি হতে চাওয়ার মধ্যে ব্যবধান /৪৬৭
স্রষ্টা ও সৃষ্টির দানের মধ্যে পার্থক্য /৪৬৮
আল্লাহর কাছে চাওয়ার আদব /৪৬৯
দু'আ ও কিছু আদাব /৪৭১
মন খুলে দু'আ করা /৪৭১
বিশ্বাসের সাথে দু'আ করুন /৪৭২
শান্তিময় রিযিক প্রার্থনা করুন /৪৭২
আল্লাহ্ কল্যাণ দেখেন /৪৭২
আমরা করুণার দিকে ধাবমান /৪৭৪
আপাদমস্তক ভিখারী হয়ে দু'আ করা /৪৭৫
শাহি আদবের দাবি /৪৭৫
আল্লাহর মহব্বতের ধরন /৪৭৬
মহব্বতমাখা দু'আ ও তার মূল্যায়ন /৪৭৭
বিগড়ে যাওয়া বান্দার অপেক্ষা /৪৭৮
আল্লাহর দরজায় পড়ে থাকো /৪৭৮

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে যুলফিকার-১৭

রহমতে এলাহী

'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার রহমতের শতভাগের মাত্র এক ভাগ তাঁর মাখলুকাতের মধ্যে বণ্টন করেছেন। আর বাকি নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেন। রহমতের এই এক ভাগের কারণেই মানুষের মধ্যে এতো ভালোবাসা দৃষ্টিগোচর হয়। মা তার সন্তানদের সাথে, স্বামী তার বিবির সাথে, বন্ধু বন্ধুর সাথে, জীবজন্তুর মাঝে, মানুষের মধ্যে, পাখপাখালির মাঝে আপনি যে ভালোবাসা দেখতে পান, সেটা ওই এক ভাগেরই সামান্য অংশমাত্র, যা এক বান্দা পেয়েছে। সেই ভাগটি কতই বড়, যেটি সকল মাখলুক পেয়েছে! আর সেই এক ভাগ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরও কিছু দান করেছেন।'

রহমতে এলাহী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

وقال تعالى في مكان آخر مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিন

মানুষের জীবনে তিনটি দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এক. যেদিন শিশু তার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, সেদিনই তার জীবনের প্রথম দিন। তার রিযিকের ফয়সালা সেদিনই হয়। আর সে কি আশেক হবে নাকি বদকার হবে তারও সিদ্ধান্ত হয়। এ-কারণেই দুধ পান করানোর পূর্বে শিশুর টাকরা ঘষে পরিষ্কার করে দেওয়া সুন্নাত। তাই যদি কোনো বুযুর্গ পাশে থাকেন, তাহলে বাচ্চার মুখে তাঁর লালা দেবেন। তিনি বাচ্চার এক কানে আযান এবং অপর কানে ইকামত দেবেন। অর্থাৎ– বাচ্চার কানে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নাম পৌঁছিয়ে দিতে হবে।

দুই. যেদিন মানুষ এই দুনিয়া থেকে ভবিষ্যত জগতের দিকে অগ্রসর হয়, সেদিন তার জীবনের একটি স্তর সে অতিক্রম করে এবং তার জীবনের দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হয়। আল্লাহর ফজলে সেদিনও যদি পাশে কোনো বুযুর্গ ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, তিনি কালেমার তালকীন করবেন। হাদীছে পাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকে, তখন তার কাছে থাকা ব্যক্তিদের জন্য অপরিহার্য

হলো, তারা একটু উচ্চ আওয়াজে কালিমা পড়বে, যাতে মৃতপ্রায় ব্যক্তির কালিমা স্মরণ হয়। একে 'তালকীন' বলা হয়।

সে সময় তাকে এভাবে বলবে না যে, আপনি কালেমা পড়ুন। কারণ, সে কোন অবস্থা অতিবাহিত করছে, সেটা কে জানে। এ-কারণে একটু আওয়াজ করে কালেমা পড়বে, যাতে সে শুনতে পায় এবং নিজেও পড়তে পারে। এটি মানুষের জীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিন।

তিন. আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হবে সেদিন, যেদিন সকলকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিত করা হবে। সেদিন সাক্ষাতের দিন। সেদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার দিন। আশেকদের জন্যে সেদিন এমন হবে যেমন কোনো বন্ধু বিদেশে গিয়ে আবার ফিরে এল আর মানুষেরা তার যত্ন করল, তার সাথে সাক্ষাৎ করে আনন্দ পেল। আর বদকার হলে আল্লাহ্র সামনে এমনভাবে হাজির করা হবে যে, যেন কোনো পলায়নকারী ক্রীতদাসকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সে তার মালিকের সামনে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান।

এই তিনটি দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ-কারণেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে,

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿

'আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।'[১]

তেলাওয়াতকৃত আয়াতে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দিনের আলোচনা করা হয়েছে।

রব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাতের চিন্তা

দুনিয়ার সকল মানুষেরই এ স্বভাব রয়েছে যে, সে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দুনিয়ার কোনো মোড়লের সাথে সাক্ষাৎ করতে হলেও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। আবার দীনের কোনো বড় বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তার জন্যও সে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমনকি বিবাহের সময় স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করার লক্ষ্যে নববধূকেও নতুন সাজে সাজিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ৩৩

মেয়ে যখন ভূমিষ্ট হয়, তখন তার মায়ের এ চিন্তা আরম্ভ হয়, আমার মেয়ের আসবাবপত্র তৈরি করতে হবে। কারণ, একদিন তাকে তার স্বামীর ঘরে যেতে হবে। এখন এই ছোট্ট মেয়ের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে, এখনও সে দোলনায় খেলছে; অথচ তার মায়ের ফিকির আরম্ভ হয়ে গেছে যে, তার কী কী লাগবে। মায়ের যদি ছোট্ট বাচ্চার জন্যে এ ফিকির হয়, তাহলে তার নিজের জন্যও তো ফিকির থাকা প্রয়োজন যে, আমি একদিন আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াব; সেদিনের জন্যে কী-কী সামান তৈরি করেছি।

যখন কোনো মেয়ের বিবাহ হয়, তখন সে তার স্বামীর প্রয়োজনে

নিজের বাড়ি ত্যাগ করে,

নিজের বংশ ত্যাগ করে,

বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করে,

নিজের সহচরদের ছেড়ে দেয়।

এমনকি সব কিছু ছেড়ে চলে আসে।

যদি একজন কন্যা শুধু তার স্বামীর স্বার্থে সব কিছু ত্যাগ করতে পারে, তাহলে আমরা কি আমাদের প্রভুর স্বার্থে দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করতে পারি না? আমাদেরও তো একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে, যার প্রস্তুতি এখন থেকেই অপরিহার্য।

মানুষের চারটি প্রসংশনীয় স্বভাব

মানুষের চারটি স্বভাব খুবই পছন্দনীয়। কিন্তু খুব কম লোকের মধ্যেই এই গুণগুলো পাওয়া যায়।

এক. আল্লাহকে ভয় করা

جلوت তথা ব্যস্ত সময় এবং خلوت তথা নির্জনতা উভয় অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। جلوت দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের উপস্থিতির মধ্যে আর خلوت দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একাকিত্ব। মানুষের সামনে বসে তো খোদাভীতির অনেক কাহিনি শোনানো হয়। বাস্তবে একাকিত্বের সময়ও কি খোদাকে সেভাবে ভয় করা হয়? কতক লোক ওয়ায-মাহফিলে বসে আল্লাহর বন্ধুর ন্যায় কথাবার্তা বলে। আর যখন একাকিত্বে থাকে, তখন তাঁর শত্রুর ন্যায় চলে, তাঁর নাফরমানি করে।

অন্তরে যখন বিশ্বাস থাকবে, তিনি আমাকে দেখছেন, তিনি আমার সাথেই আছেন, তখন মানুষের লজ্জা হয়, সে গুনাহ্ থেকে বেছে থাকার চেষ্টা করে। এই গুণটি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিক পরিমাণে ছিল।

ওমরের খোদা তো দেখছেন!

একদা হযরত ওমর (রাযি.) রাতের বেলায় ঘোরাফেরা করছিলেন। সকাল হয়ে আসছিল। এমন সময় একজন মহিলার কণ্ঠ ভেসে উঠল। সে তার মেয়েকে জিজ্ঞেস করছে, বকরি কি দুধ দিয়েছে? সে বলল, দুধ তো দিয়েছে; কিন্তু অনেক কম। বৃদ্ধা বলল, দুধ যারা নেবে, তারা এলে কী হবে? একটু পানি মিশিয়ে নাও, যাতে পরিমাণ ঠিক থাকে। মেয়েটি বলল, মা! আমি পানি মেশাতে পারব না। কারণ, হযরত ওমর (রাযি.) দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন। বৃদ্ধা বলে ফেললেন, ওমর কোত্থেকে দেখবেন? তখন মেয়েটি জবাবে বলল, যদি ওমর (রাযি.) না দেখেন, তাহলে তাঁর খোদা তো দেখছেন।

হযরত ওমর (রাযি.) তাদের এই কর্থাবার্তা শুনে ফেরত চলে এলেন। তারপর দিনের বেলায় মহিলাকে ডেকে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। মহিলার কথায় তিনি বুঝতে পেরেছেন, জবাবটি একজন যুবতি মেয়ের ছিল। এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বৃদ্ধাকে বললেন, আপনার যেহেতু যুবতি মেয়ে আছে, আমারও তো যুবক ছেলে আছে। তাহলে আমরা তাদের উভয়কে এক সাথে মিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। তারপর তাদের মধ্যে বিবাহ হয়ে গেল এবং কনে তার স্বামীর ঘরে চলে এল।

তারপর একদিন হযরত ওমর (রাযি.) ছেলের বউকে বললেন, যখনই আমি ঘর থেকে বের হব অথবা ঘরে ফিরব, তুমি দরজায় দাঁড়িয়ে বলবে, 'ওমর না দেখলে কী হবে, ওমরের খোদা তো দেখছেন।'

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ওপর একথার প্রভাব এত পরিমাণ হলো যে, তিনি মাঝে-মাঝে চমকে উঠতেন আর বলতেন, 'ওমর না দেখলে কী হবে, ওমরের খোদা তো দেখছেন।' আল্লাহু আকবার!

তাহলে আল্লাহ্ কোথায়?

এধরনের একটি ঘটনা হযরত ওমর (রাযি.)-এর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ্ (রাযি.)-এর সাথেও ঘটেছে। একদা সফরের সময় তাঁর সাথে একজন রাখালের সাক্ষাৎ ঘটে। তাকে হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন,

ভাই! একটি বকরি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আমি রোযাদার; তাই ইফতারির প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমার সাথে তুমিও কিন্তু খাবে।

রাখাল বলল, জনাব! আমি এই বকরির পালের রাখালমাত্র। মালিকানা তো আমার নয়। ইবনে ওমর (রাযি.) জানতে পারলেন, রাখাল লোকটিও রোযাদার।

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) এবার তার কাছে প্রস্তাব রাখলেন, যদি তুমি এখান থেকে একটি বকরি বিক্রি করে দাও, তাহলে তোমার ইফতারিরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে আর আমাদেরও খানার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রাখাল বলল, তাহলে আমি মালিককে কী জবাব দেব?

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.) তাকে পরীক্ষা করার জন্যে বলে দিলেন, তোমার মালিক এখানে উপস্থিত আছে নাকি?

সাথে-সাথে রাখাল বলল, যদি আমার মালিক উপস্থিত না থাকেন, তাহলে আল্লাহ্ কোথায়? আল্লাহ তো উপস্থিত আছেন।

হযরত ইবনে ওমর (রাযি.)-এর ওপর রাখালের একথার এমন প্রভাব পড়ল যে, পরবর্তী কালে যখনই তাঁর এ ঘটনা মনে পড়ত, তৎক্ষণাৎ وأين الله বলে উক্ত ঘটনাটিকে স্মরণ করতেন আর ভাবতেন, এ কেমন মালিক, যার রাখাল পর্যন্ত তার অনুপস্থিতিতে বলে, وأين الله (আল্লাহ্ কোথায়?)।

তাহলে বোঝা যায়, এই রাখালের خلوت তথা মালিকের অনুপস্থিতিতেও আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। লোকসমাগমে আর একাকিত্বে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করাই হলো পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার প্রমাণ।

দুই. মধ্যপন্থা অবলম্বন করা

একেবারে দারিদ্রতা অবস্থায় এবং একটু সম্পদশালী হওয়া অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। হাদীছ শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

خَيْرُ الأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا

'উত্তম কাজ হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।'

অর্থাৎ– আল্লাহ্ যদি কাউকে অঢেল সম্পদ দান করেন, তাহলে অলসতা করবে না। আর যদি কাউকে দারিদ্রতা দেন, তাহলেও অধৈর্য হবে না। সম্পদ থাকুক আর না থাকুক সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে।

তিন. ন্যায়পরায়ণ হওয়া

সন্তুষ্টি আর অসন্তুষ্টি যা-ই থাকুক না কেন, সর্বাবস্থায় ন্যায়পরায়ণ হওয়া অনেক কঠিন কাজ। অনেক ভালো-ভালো মানুষ এমন আছেন, যারা সাধারণত ন্যায়পরায়ণ; কিন্তু যখনই সন্তুষ্টি আর অসন্তুষ্টির বিষয় এসে পড়ে, তখন শরীয়তের বিধান মাথায় না রেখে ইনসাফের কথা ভুলে যান। সামান্য একটু অসন্তুষ্টির জন্যে

গীবত করাও বৈধ হয়ে যায়, অপবাদ দেওয়াও বৈধ হয়ে যায়,

অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করাও বৈধ হয়ে যায়।

শরীয়ত নিষেধ করেছে এমন কতক বিষয় আমরা রাগের সময় খুব আরামের সাথে সম্পাদন করি। মোটকথা, মানুষের পরিচয় তখনই জানা যায়, যখন সে আনন্দিত বা রাগান্বিত থাকে। যেলোক সভ্যতা অর্জন করতে পেরেছে, সে তো খুশি আর নারাজি উভয় অবস্থায় ইনসাফকেই গ্রহণ করবে। সে কখনও এমন কথা বলবে না বা এমন কাজ করবে না, যা তাকে ইনসাফ থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

চার. আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করা

সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করা। সচ্ছলতা অবস্থায় তাঁর প্রশংসা করা অনেক সহজ। কিন্তু অসচ্ছলতার মুহূর্তে এটা অনেক কঠিন কাজ। দারিদ্রতাবস্থায় মানুষ আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করবে এ অনেক কঠিন কাজ। কিন্তু আল্লাহর বিশেষ বান্দাগণের অবস্থা এমন হয়, তারা সর্বাবস্থায় তাঁর প্রশংসা করে। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

لطف سجن دم بہ دم قہر سجن گاہ گاہ

ایں بھی سجن واہ واہ اوں بھی سجن واہ واہ

সে আনন্দের সময়ও নিজের পালনকর্তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং দুঃখের সময়ও আপন রবের প্রতি সন্তুষ্ট। সে সর্বদা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের যিকিরের মাধ্যমে নিজের জিহ্বাকে সতেজ রাখে।

যেব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামতের ব্যাপারে এই আশা করে যে, তা আমার কাছে সর্বদা বাকি থাকুক এবং এই নেয়ামত আরো বৃদ্ধি হোক, তার উচিত সে যেন বেশি-বেশি আল্লাহর যিকির করে।

নবীগণ ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রসংসা

পুরস্কারপ্রাপ্ত চারটি গ্রুপের মধ্যে নবীদের আলোচনা গত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর বিশেষ বিশেষ নেয়ামতরাজি তাঁদের দান করেছেন। তারা সকলেই আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করতেন, যার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম যখন নৌকা তৈরি করলেন, তখন তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল–

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

'যখন আপনি এবং আপনার সাথীরা উক্ত নৌকায় আরোহণ করবেন, তখন বলবেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন।'[২]

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছে সন্তান কামনা করলেন। আল্লাহ্ তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দান করলেন। এমন মহান নেয়ামত পাওয়ার পর তিনি আল্লাহর প্রশংসা কীভাবে আদায় করলেন, কুরআনে তার উল্লেখ আছে–

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

'সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রভু আহ্বান শ্রবণ করেন।'[৩]

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিমাস সালামকে তাঁর অগণিত নেয়ামত দান করেছেন। তাঁরা সেই নেয়ামত পেয়ে কত সুন্দরভাবে তাঁর প্রশংসা করেছেন–

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

'সমস্ত প্রশংসা ওই মহান আল্লাহ্র, যিনি তাঁর অনেক বান্দার ওপর আমাদের মর্যাদা দান করেছেন।'[৪]

---

২. সূরা মুমিনুন : আয়াত ২৮
৩. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৯
৪. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ১৫

তাঁরা এভাবে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন।

জান্নাতের অধিবাসীগণও আল্লাহপাকের প্রশংসা বর্ণনা করবেন।

জান্নাতবাসী ও আল্লাহর প্রশংসা

পাঁচটি স্থান এমন হবে, যেখানে জান্নাতবাসী অন্তর থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকবেন।

১. যখন ঘোষণা করা হবে–

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

'আর হে অপরাধীর দল! আজ থেকে (আমার নেক বান্দাদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও।'[৫]

যখন মুমিনদেরকে ঈমানদারদের সাথে একত্রিত করে নেওয়া হবে, তখন তারা বলবেন–

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

'সকল প্রশংসা ওই মহান সত্তার, যিনি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতি থেকে মুক্তি দিয়েছেন।'[৬]

২. তারপর যখন পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় আসবে, সে একটি কঠিন মুহূর্ত হবে, যার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা অতিক্রম করবে না। আল্লাহ্ চূড়ান্তরূপে এ বিষয়ের জিম্মা গ্রহণ করেছেন। তারপর যারা তাকওয়া অর্জন করেছে, তাদেরকে আমি নিষ্কৃতি দেব। আর যারা জালেম, তাদেরকে তাতে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।'[৭]

তখন ঈমানদারদের অন্তরে এক ধরনের ভীতি সঞ্চার হবে। যে ঈমানদার নিরাপদে ওই পুল অতিক্রম করতে সক্ষম হবে, সে অতিক্রম করার পর বলবে,

---

৫. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৫৯
৬. সূরা মুমিনুন : আয়াত ২৮
৭. সূরা মারয়াম : আয়াত ৭১, ৭২

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

'সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্যে। তিনি আমাদের থেকে একটি বড় পেরেশানি দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক একজন ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত গুণগ্রাহী।'[৮]

৩. তারপর জান্নাতবাসীদের বলা হবে, তোমরা 'নহরে হায়াত' (নবজীবনের খাল) এর মধ্যে গোসল করে নাও, যাতে তাদের শরীরের মধ্যে কেয়ামতের দিনের কোনো ফ্যাকাশেপনা না থাকে। তারা 'নহরে হায়াতে' গোসল করবে। এটা হবে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বপ্রস্তুতি। আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের প্রস্তুতি। তারপর গোসল করার পর তাদেরকে আগের চেয়ে আরো উজ্জ্বল ও আরো সুন্দর দেখাবে। তারপর তাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। জান্নাতে যাওয়ার মুহূর্তে তারা বলবে,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ

'সমস্ত শোকর আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এ স্থানে পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদের না পৌঁছালে আমরা কখনো এখানে আসতে পারতাম না।'[৯]

৪. তারপর তারা জান্নাতে প্রবেশের পরেও আরেকবার আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে–

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۚ ۝

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব।'[১০]

৫. তারপর যখন তারা নিজেদের জন্যে তৈরী ঘরে প্রবেশ করে জান্নাতি রমণীদের সাথে মিলিত হবে, তখনও তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করবে,

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

' সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য।'[১১]

---

৮. সূরা ফাতির : আয়াত ৩৩
৯. সূরা আরাফ : আয়াত ৪৩
১০. সূরা যুমার : আয়াত ৭৪
১১. সূরা ফতেহা : আয়াত ১

আল্লাহর প্রশংসায় তাদের জবান সর্বদা জারি থাকবে

যেভাবে এসকল নেয়ামতপ্রাপ্ত লোকেরা আল্লাহপাকের প্রশংসা করতে থাকে, তেমনি আমাদেরও উচিত আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা। ওলামায়ে কেরাম বলেন, বান্দা যখনই কোনো নেয়ামত প্রাপ্ত হবে, যদি সে এই নেয়ামতের বিনিময়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে, তাহলে সে যেন এই নেয়ামতের শোকর আদায় করল। এটাতো কোনো কষ্টের কাজ নয়।

ভাইয়েরা আমার! বর্তমানে কেউ পেপসি পান করালেও আমরা তার শোকর আদায় করি, যে আমাদের চা পান করায় আমরা তারও শোকর আদায় করি। অথচ যে-পালনকর্তা সারা জীবনের খাওয়াদাওয়া এবং যাবতীয় নেয়ামত দ্বারা আমাদের ভরে দিয়েছেন, আমরা তাঁর শোকর আদায় করতে পারি না। তাই এমন অভ্যাস গড়ে তুলি যে, যখনই আল্লাহর কোনো নেয়ামত সামনে আসবে প্রথমেই তার শোকর আদায় করব।

ঘর দেখলেও আল-হামদুলিল্লাহ্।

ঘরের রমণীকে দেখলেও আল-হামদুলিল্লাহ।

সন্তানদেরকে দেখলেও আল-হামদুলিল্লাহ।

আল্লাহর ঘরকে দেখলেও আল-হামদুলিল্লাহ।

আল্লাহর নেয়ামতসমূহ ভোগ করতে-করতে আজ আমাদের দাঁতও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। হায় আফসোস! যদি তার শোকর আদায় করতে-করতে আমাদের জবান ক্ষয় হয়ে যেত!

বর্তমান সমাজের অবস্থা হলো, যেখানেই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করার ক্ষেত্র তৈরি হয়, সেখানে তার প্রশংসা করা হয় না। যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, ব্যবসা কেমন চলছে? উত্তর আসে, কোনো রকম চলছে। অথচ তার ব্যবসা এমনভাবে চলছে যে, সে ইচ্ছা করলে আরো চল্লিশটি পরিবারের খাবার জোগান দিতে পারে। এবার আপনিই চিন্তা করুন, এটা নাশোকরি কিনা? উচিত তো ছিল তখন মন থেকে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং বলা যে, আমি আল্লাহর প্রশংসা কীভাবে আদায় করব! তিনি তো আমাকে আমার চাহিদার চেয়েও অনেক বেশি দিয়েছেন।

মানুষের চারটি অবস্থা

দুনিয়ার কোনো মানুষ এই চার অবস্থার বাইরে নেই। কোনো-না-কোনোভাবে এই চার অবস্থার কোনো একটিতেই তাকে থাকতে হবে।

১. আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে লিপ্ত থাকা

প্রথম কথা হলো, বান্দা হয়তো আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগি ও অনুকরণ করবে। যদি এমন অবস্থায় থাকে, তাহলে তার উচিত পরওয়ারদেগারের নিকটে তার সেই আমলগুলোর কবুলিয়াত কামনা করা। সে হবে এমন, যেকোনো গুনাহ্ করে না, সব কাজ ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক সম্পাদন করে। যদিও ইবাদাত করুক, নেক কাজ করুক বা পরহেজগার হোক সে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কবুলিয়্যাতের মুহ্তাজ। কারণ, নেক কাজ করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা সেই নেক কাজটি কবুল না করেন। সুতরাং কবুলিয়্যাতের চিন্তাও থাকতে হবে। কারণ, যোগ্যতা আর কবুল হওয়া এক জিনিস নয়। আল্লাহর খাছ বান্দাদের অন্তরে এই পেরেশানি থাকে যে,

میری قسمت سے الٰہی! پائیں یہ رنگ قبول
پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لئے

'হে মাওলা! আমি যেন কবুলিয়্যাতের রং দ্বারা রঙিন হতে পারি, যার জন্যে আমি অনেক ফুল আহরণ করেছি।

তাই তারা অত্যন্ত আগ্রহভরে নেক কাজ করতে থাকেন, যাতে রব্বুল আলামীনের সামনে তা হাজির করা যায় আর তিনি তা কবুল করে নেন।

আশার আলো

এটা কতই-না আশার কথা যে, আল্লাহর দরবারে যোগ্যতা নয়; বরং গ্রহণযোগ্যতা দেখা হয়। যদি যোগ্যতার ভিত্তিতেই সব কিছু হতো, তাহলে আমার মতো লোকদের খবর কে রাখত? এতে অনেক আশার আলো বিদ্যমান যে, আশেকগণ যেভাবে নিজেদের যোগ্যতার ওপর খুশি, গুনাহগাররাও এই আশা রাখতে পারে, আল্লাহ্র দরবারে তো যোগ্যতা নয়, গ্রহণয়োগ্যতা দেখা হয়। তিনি যাকে চান তাকেই গ্রহণ করতে পারেন।

তিনি যখন চান, তখন হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়াজের মতো ডাকাতকেও ডাকাতের সরদারি থেকে বের করে তাঁর বিশেষ বান্দাদের সরদার বানাতে পারেন। তাহলে বোঝা গেল, সেখানে কবুলিয়্যাতের হিসাব করা হয়। তাহলে এখন আমরাও আশার আলো দেখতে পারি। এখন আর কোনো মানুষই নিরুপায় হতে পারে না। ঈমানদার তো কখনই নিরাশ হতে পারে

না। যতই গুনাহগার, নাফরমান হোক-না কেন, বান্দার কোনো মুহূর্ত যদি নাফরমানি ছাড়া না-ও যায়, তথাপিও আশার এই আলো তার জন্যও বিদ্যমান যে, কবুল তো আল্লাহপাকই করতে পারেন। তাঁর রহমতের দৃষ্টির সামনে যেকোনো অপরাধই আর অপরাদ থাকে না। তিনি তো বান্দার অপরাধকেও অনেক সময় নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।

গুনাহ্সমূহকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করার ঘটনা

কোনো একব্যক্তি বড়ই গুনাহগার ছিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের অন্তরে একদা খেয়াল এল এবং তিনি দু'আ করলেন, হে খোদা! এই মুহূর্তে তোমার যে-বান্দা সবচেয়ে বেশি গুনাহগার, তাকে আমি দেখতে চাই সে কেমন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, সে একজন নাফরমান বান্দা, যে নিজের জীবনের মূল্যবান সময় যৌবনকালকে মাতলামিতে নিঃশেষ করে দিয়েছে। অন্যায় করা-ই তার একমাত্র নেশা ছিল।

কিছুদিন পর পুনরায় হযরত মূসা আলাইহিস সালামের স্মরণ হলো এবং দু'আ করলেন, হে খোদা! তোমার যে-বান্দা সবচেয়ে বেশি ইবাদাতগুজার, আমার তাকে দেখতে ইচ্ছা করছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, সে অমুক স্থানে আছে। গিয়ে দেখেন, সে ওই আগের গুনাহগার ব্যক্তিটিই।

এমন অবস্থা দেখে হযরম মূসা আলাইহিস সালাম বড় পেরেশানিতে পড়ে গেলেন এবং বললেন, হে প্রভু আমার! সে তো সবচেয়ে গুনাহগার ছিল!

আল্লাহ্ বললেন, একদা আমার এই বান্দা ঘরে তার স্ত্রীর সামনে দাঁড়ানো ছিল। কথার ফাঁকে তার স্ত্রী তাকে বলে দিল, তুমি তো জাহান্নমী। সে বলল, হে আমার স্ত্রী! আমি গুনাহগার হলেও আল্লাহর রহমত থেকে আমি নিরাশ হইনি।

তার আশার কথায় আমার রহমতের ঢেউ উঠল আর আমি তার সবগুলো গুনাহকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। আর এতেই সে এখন সবচেয়ে আশেক বান্দায় পরিণত হলো।

কবুল হওয়ার ব্যাপারে একদিকে যেমন– আমাদের ভয় রয়েছে যে, আমাদের তো কোনো যোগ্যতা নেই, তেমনি অন্যদিকে আশায়ও বুক বেঁধে আছি যে, আল্লাহ তো যাকে চান কবুল করে নিতেই পারেন।

২. গুনাহের বোঝা নিয়ে কালাতিপাত করা

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, মানুষ গুনাহতেই জীবন কাটিয়ে দিল। যদি অবস্থা এমনই হয়, তাহলে তাওবার তাওফীক কামনা করবে। স্মরণ রাখবে, মানুষ যতই গুনাহ্ বা অপরাধ করুক-না কেন, তথাপিও তার গুনাহ তো সীমিত। আর আল্লাহ্র রহমত অসীম। তিনি ইরশাদ করেন,

إِنَّ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

'নিশ্চয়ই আমার রহমত সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছে।'

এ-কারণেই প্রতিটি গুনাহগার বান্দার জন্য ক্ষমার সম্ভাবনাও রয়েছে।

গুনাহগারদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ

বনী ইসরাইলের একব্যক্তি বড় ইবাদাতগুজার ছিল। আরেক ব্যক্তি মারাত্মক গুনাহগার ছিল। ইবাদাতকারী ব্যক্তি যখন গুনাহগার সম্পর্কে জানতে পারে, তখন তার মনে এক ধরনের ঘৃণা সৃষ্টি হয়।

নাফরমান ব্যক্তির সাথে যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ হলো, তিনি বললেন, তুমি কী চাও? সে জবাব দিল, আমার হাশর যেন ওই ব্যক্তির মতো আশেকদের সাথে হয়। আশেক ব্যক্তি তার একথা জানতে পারলেন। তিনি তো জানতেন, এই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় গুনাহগার।

হযরত মূসা আলাইহিস সালম আশেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী চাও? তিনি জবাব দিলেন, শুধু এতটুকু দু'আ করে দিন, যাতে আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিন আমার হাশর এই লোকের সাথে না করেন। কারণ, তার বিশ্বাস ছিল, এই ব্যক্তি গুনাহগার; কাজেই সে তো জাহান্নামেই যাবে। তাই আমি তার সাথে মিলতে চাই না।

সে আত্মতুষ্টির কারণে বলে দিল, আমার জন্যে দু'আ করুন, যাতে তার সাথে মিলতে না হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দু'আ কবুল করলেন আর তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, ওই গুনাহগারকে জান্নাতের শুসংবাদ দিয়ে দিন। কারণ, সে তো আশেকদের সাথে হাশর হওয়ার আশা পোষণ করেছে। আর ওই আশেককে জাহান্নামের দুঃসংবাদ পৌঁছিয়ে দিন। কারণ, সে ওই ব্যক্তির সাথে হাশর না হতে চেয়েছে। আর সে যেহেতু এখন জান্নাতে আছে আর এই লোক তার সাথে একত্র হতে চায় না; তাই তাকে জাহান্নামেই পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

এর দ্বারা বোঝা যায়, আশেকগণ যাতে নিজের কাজের ওপর সন্তুষ্ট না হয়ে যায়। আর বদকাররাও যেন তাদের অপরাধের কারণে নিরাশ না হয়ে পড়ে। কারণ, তাওবার দরজা সবসময়ই খোলা থাকে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, গুনাহ করতেই থাকবে। বরং এর অর্থ হলো, গুনাহের পরিমাণ বেশি হলেও এখন তাওবা করলে তার ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

৩. স্বচ্ছলতায় থাকা

তৃতীয় বিষয় হলো, বান্দা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হবে। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করবে। তাঁর প্রতিটি নেয়ামতের কথা কল্পনা করে-করে শোকর আদায় করবে। এতে তিনি নেয়ামত আরো বৃদ্ধি করে দেবেন। তিনি বলেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

'যদি তোমরা নেয়ামতের শোকর আদায় কর, তাহলে আমি তা আরো বাড়িয়ে দেব।'[১২]

৪. অভাবগ্রস্ত থাকা

মানুষের চতুর্থ অবস্থা হবে, সে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হবে। আর্থিক সংকট এলে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবে। দুনিয়াতে তো মসিবত আর যন্ত্রণাই বেশি আসে। এমতাবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি ধৈর্যের চাদর মুড়ি দিয়ে থাকতে পারে, তাহলে তার সাথে আল্লাহ্ আছেন বলে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

তিনি ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন।'[১৩]

কেয়ামতের দিবসে অসহায় লোকদের ওজরখাহি

আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিবসে আমাদের সবাইকে নিজেদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমরা কীভাবে জীবন কাটিয়েছ? এই জীবন কাটানোর বহু পদ্ধতি হবে।

---

১২. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৭

১৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৩

জনৈক কর্মব্যস্ত লোকের অক্ষমতার ওজর

কোনো বান্দা বলবে, হে মাবুদ! আমি বড়ই কর্মব্যস্ত ছিলাম। সময়ের মূল্যায়ন করতাম। অনেক দায়িত্ব ছিল। সময়ই পাওয়া যেত না। দীর্ঘ সময়ের কাজ হওয়াতে তোমার ইবাদাতের সময় পাওয়া যেত না। আল্লাহ্ তা'আলা তার সামনে হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালামকে উপস্থিত করে বলবেন, দেখো, এ-ও আমার বান্দা। দুনিয়াতে এ-ও রাজকীয় জীবন যাপন করেছে, যে কিনা মানুষ, জিন এমনকি পশু-পাখি, নদী-নালারও বাদশাহ্ ছিল। তথাপিও এ এমনভাবে জীবন যাপন করেছে যে, একটি মুহূর্তের জন্যেও আমাকে ভোলেনি। এ যদি এমনভাবে চলতে পারে, তাহলে তোমার বাহানা তো তুচ্ছমাত্র, যে, আমি অনেক মর্যাদাবান ও ব্যস্ত মানুষ ছিলাম?

জনৈক শ্রমিকের অক্ষমতার ওজর

এক বান্দা দাঁড়িয়ে বলবে, হে আল্লাহ্! আমি দুনিয়াতে শ্রমিক ছিলাম। আর শ্রমিক তো অন্যের নির্দেশের অনুসারী হয়। তাই আমাকে আমার মালিক ভালো কাজ বা নামাযের সুযোগই দিতেন না। আমি অপারগ ছিলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা তার সামনে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের উদাহরণ পেশ করে বলবেন, এ তো গোলাম ছিল। তথাপিও এ ওই কাজই করেছে, যা আমার নির্দেশ অনুযায়ী ছিল। এ যদি এভাবে চলতে পারে, তাহলে তোমার ওজর কীসের?

জনৈক দরিদ্র ব্যক্তির অক্ষমতার ওজর

একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তো দুনিয়াতে দরিদ্র ছিলাম। আমার কাছে কিছুই ছিল না। আমি সর্বদা খানা তালাশ করতাম। আমার এটা তো কোনো জীবনই ছিল না।

আল্লাহ্ তা'আলা তার সামনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উদাহরণ পেশ করবেন।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সফরে রওনা দেওয়ার সময় সব ত্যাগ করলেন। শুধু একটি বালিশ ও একটি পাত্র সঙ্গে নিলেন। বালিশ নিলেন বিশ্রামের সময় শোওয়ার জন্য আর পাত্র নিলেন প্রয়োজনের সময় পানি পান করতে। রাস্তায় দেখলেন, এক জায়গায় একব্যক্তি নিজের হাতের ওপর ভর দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। এটা দেখে হযরত

ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমি শুধু-শুধু বালিশের বোঝা বহন করছি কেন? চাইলে তো আমিও এর মতো আমার হাতকেই বালিশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। তাই তিনি বালিশটিও আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন।

আরেকটু সামনে গিয়ে দেখলেন, একব্যক্তি তার দু-হাতের তালু মিলিয়ে পানি পান করছে। এটা দেখে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো আমার হাতকেই পানির পেয়ালা বানিছেয়েন; আমি আবার পানপাত্র নিয়ে ঘুরি কেন? তাই সেই পেয়ালাটিও আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন। এভাবে কালাতিপাত করার পরও তো সে কখনো আমার নির্দেশ লঙ্ঘন করেননি।

তাকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এই ঘটনা বলে আল্লাহপাক বলবেন, এ যদি এমন অবস্থায়ও আমার ইবাদাত করতে পারে, তাহলে তোমার সমস্যা কী?

জনৈক অসুস্থ ব্যক্তির অক্ষমতার ওজর

আরেক ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ্! আমি তো সব সময়ই অসুস্থ থাকতাম। যেমন– সে বলত, তাহাজ্জুদ কীভাবে পড়ব; আমার তো কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা। পেটে ব্যথা, মাথায় ব্যথা। কারো আরাম হয় না অন্তরের ব্যথায় আর কারো আরাম হয় না মাথার ব্যথায়। বান্দা বলবে, আমি সব সময় মারাত্মক অসুস্থ থাকি।

আল্লাহ্ তা'আলা তার সামনে হযরত আইয়ূব আলাইহিস সালামের উদাহরণ পেশ করে বলবেন , দেখ! সে যদি এমন কঠিন মুহূর্তে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারে, তাহলে তুমি ধৈর্য ধরতে পারবে না কেন?

সে তো জীবিত থাকতেই মারা যাবে

তাই আমাদের উচিত কেয়ামত দিবসের প্রস্তুতি এখন থেকেই আরম্ভ করি। শেষ পর্যন্ত সেই দিনটি তো আসবেই। কেউই তার থেকে রেহাই পাবে না। জনৈক ব্যক্তি এক বুযুর্গের কাছে গিয়ে বলল, হযরত! অমুক ব্যক্তি মরতে-মরতে বেঁচে গেল। তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, সে তো বাঁচতে-বাঁচতেই মরবে। সে আবারও বলল, হযরত! সে তো মরতে-মরতে বেঁচে গেল। হযরত দ্বিতীয়বার বললেন, হ্যাঁ, সে তো বাঁচতে-বাঁচতে মরে গেল। কদিন বাঁচবে? একদিন সবাইকেই এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেই হবে।

আফসোস! আমাদের আকাবির সেদিনের প্রস্তুতির জন্য কতই-না মেহনত করতেন। আফসোস! আজ যদি আমরা আমাদের কর্তব্যগুলোরও এতটুকু গুরুত্ব দিতাম, যে-পরিমাণ আমাদের আকাবিরগণ নফলকে দিয়েছেন। আফসোস! আজ যদি আমরা হারামের ব্যাপারে এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতাম, যতটুকু আমাদের আকাবিরগণ হালালের ক্ষেত্রে করতেন। আফসোস! আজ যদি আমরা গুনাহমাফির জন্য এতটুকু চিন্তিত হতাম, যতটুকু আমাদের পূর্বসূরীগণ তাঁদের নেকি কবুল হওয়ার জন্য করতেন! তারা সারা রাত ইবাদাত করতেন আর তদ্রূপ শেষ রাতে ক্রন্দন করতেন, যেন এই বান্দা সারা রাত গুনাহে লিপ্ত ছিলেন। কেন এমন করতেন? কারণ, তারা জানতেন, যা কিছু করি-না কেন, সব তার সামনেই হচ্ছে।

'হে খোদা! আমরা তো আপনার যথেষ্ট ইবাদাত করতে পারিনি এবং আপনাকে সেভাবে চিনতেও পারিনি যেভাবে চিনার প্রয়োজন ছিল।'

আফসোস! আমরা যদি আমাদের বন্ধুদের সাথেও এমন আচরণ করতাম, যেরূপ আমাদের আকাবিরগণ তাঁদের শত্রুদের সাথে করেছেন।

আমাদের ও আমাদের আকাবিরের জীবনীর মধ্যে কতই-না ব্যবধান। আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমাদের জীবনে কখনো কোনো ক্ষুদ্র মসিবত এলেও আমরা তাতে প্রভাবিত হয়ে পালনকর্তার ইবাদাতে অলসতা করতাম।

বকরির অফাদারী

ছাগলের দিকে তাকান। মালিক তাকে একটা আওয়াজ দেওয়ামাত্র ঘাস খেলেও সে ঘাস খাওয়া ছেড়ে দেয়। কিন্তু আফসোস! আজ মুসলমান আল্লাহু আকবার আওয়াজ শুনেও দুনিয়ার কাজ ছেড়ে মসজিদে আসে না! আমরা তো আমাদের মালিকের এতটুকুও নির্দেশ পালন করি না যতটুকু একটা পশু, ছাগল তার মালিকের জন্য করে।

ছোট্ট ছেলের আমলের মধ্যে লুকায়িত শিক্ষা

একব্যক্তি ছোট্ট শিশুকে নিয়ে কোনো এক বুযুর্গের দরবারে গেল। বুযুর্গের পকেটে কোনো মিষ্টি বস্তু ছিল। তিনি তা শিশুটিকে দিতে চাইলে ছেলেটি তার দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল। একটু পরে বুযুর্গ আবার ওই জিনিসটা তাকে দিতে চাইলেন। তখনও সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। অথচ বাচ্চাদের তো মিষ্টি জিনিস খুবই প্রিয় হয়। তথাপিও বাচ্চাটি মিষ্টি জিনিসের দিকে তাকাল না। বরং সে নিজের পিতার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে, আমার আব্বু কী

বলেন। এটা দেখে তার পিতা বললেন, বেটা! গ্রহণ করো। তারপর বাচ্চাটি ওই মিষ্টি জিনিস নিয়ে খেয়ে নিল।

এটা দেখে বুযুর্গের চোখে অশ্রু চলে এল। লোকটি বলল, হযরত! আমার কোনো বেয়াদবি হলো কিনা? এতে আপনার চোখে পানি এল কেন? তিনি বললেন, দেখো, আমি এই শিশুটির কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি, তাকে মিষ্টি জিনিস দেওয়ার পরও সে তা গ্রহণ না করে, সেদিকে না তাকিয়ে সে তার পিতার চেহারার দিকে দেখেছে; দেখি, আমার পিতা নিতে বলেন কিনা। আমাদের সামনেও তো অনেক আকর্ষণীয় জিনিস পড়ে। কিন্তু দেখার আগে কখনো কি চিন্তা করি, দেখি, আমার রব কী বলেন? বাচ্চা তো মিষ্টি আর আকর্ষণীয় বস্তু পেয়েও সেদিকে না তাকিয়ে পিতার চেহারার দিকে তাকিয়েছে পিতার নির্দেশের জন্য। আফসোস! আমরা যদি আজ আকর্ষণীয় বস্তু আর সুন্দর বস্তুর দিকে নজর দেওয়ার আগে একটু চিন্তা করতাম, দেখি তো এ-ব্যাপারে আমার রব কী বলেন।

বিপদের সময়েও আল্লাহ্ থেকে বিচ্যুতি

আজ কাউকে প্রশ্ন করে দেখুন, ভাই! মসজিদে আসেন না কেন? জবাব দিবে, ভাই! একটু পেরেশানিতে আছি। এটা চলে গেলেই মসজিদে আসা আরম্ভ করব। উদ্দেশ্য কী? একটু বিপদ এল আর সর্বপ্রথম যাকে ভুলে গেলাম, সেটিই আল্লাহর ঘর। এ কতই-না বিস্ময়কর কথা যে, একটু বিপদ এলেই আর পালনকর্তার দরজার কথা মনে থাকে না। মসজিদে আসা বন্ধ হয়ে যায়, একটু পেরেশানি আছে; ঠিক হলেই আবার মসজিদে আসবো।

চারটি ওজীফা

অনেক বন্ধু চিঠির মাধ্যমে বা ফোনে ওজীফা জিজ্ঞেস করেন। আজ আপনাদের কুরআনে বর্ণিত কিছু ওজীফা বর্ণনা করব, যাতে আপনাদের পেরেশানি দূর হয়ে যায় এবং আপনারা আনন্দিত হতে পারেন। কুরআনের এই ওজীফাগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নিরীক্ষার আলোকে নির্ধারিত। তবে এর জন্যে প্রয়োজন দৃঢ় বিশ্বাসের।

আজ যদি আমরা কোনো মৃত ব্যক্তিকে বলি, قُمْ بِإِذْنِ اللهِ (আল্লাহর আদেশে দাঁড়িয়ে যাও) তাহলে সে কি দাঁড়িয়ে যাবে? আমাদের قُمْ بِإِذْنِ اللهِ দ্বারা তো জীবিত মানুষও জাগে না– মৃত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়া তো অনেক

দূরের কথা। অথচ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এই বাক্য উচ্চারণ করলে মৃত ব্যক্তিও জীবিত হয়ে যেত। এখানে শব্দের মধ্যে তো কোনো ব্যবধান নেই। শুধু উচ্চারণকারীর জবানের পার্থক্য। এই শব্দ যখন আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দার মুখ দিয়ে বের হয়, তখন তিনি এর মধ্যে এক ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করেন। আর যখন কোনো গাফেল বান্দার জবান থেকে বের হয়, তখন তাতে কোনো প্রভাবই থাকে না। আমল তো শতভাগ খাঁটি; শুধু অন্তরের বিশ্বাসের প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে এর প্রমাণ বিদ্যমান।

১. বিপদগ্রস্তের জন্য

যেব্যক্তি অনেক বেশি পেরেশানিতে ভুগছে, মারাত্মক মসিবতগ্রস্ত, অন্তরে অনেক পেরেশানি ও ভয় দ্বারা আচ্ছাদিত, বিভিন্ন রকমের বিপদাপদে জর্জরিত, কোনো দিক থেকেই আশার কোনো লক্ষণ দেখছে না, তাহলে তার উচিত, সে যেন নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

'আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয় আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।'[১৪]

কেননা, পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতের পর উল্লেখ করেছেন,

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُـْۨجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

'ফলে আমি তার দু'আ কবুল করে নিয়েছি এবং তাকে চিন্তা থেকে মুক্তি দান করেছি। মুমিনদের আমি এভাবেই মুক্তি দেই।'[১৫]

দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, উক্ত আয়াত তেলাওয়াতের পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে কঠিন মসিবত থেকে উদ্ধার করেছেন।

ভাইয়েরা আমার! হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তো মাছের পেটে চলে গিয়েছিলেন। কারো-কারো জন্যে তাঁর ঘর হয় মাছের পেট। তখন ঘর তার জীবনের জন্যই কাল হয়ে দাঁড়ায়।

---

১৪. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৭

১৫. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৮

আবার কারো-কারো জন্য ঘরই মাছের পেট হয়ে যায়। সে ঘরের মধ্যে এমন মসিবতে লিপ্ত থাকে যে, তার ঘরের অবস্থা একেবারেই ঠিক থাকে না।

আবার কারো-কারো জন্য তো তার শরীরই মাছের পেটের মতো। তার জীবনই তাঁর আয়ত্তে থাকে না।

আমরা যে-মাছেই আক্রান্ত হই না কেন, যদি আমরা অন্তরের গভীরতা থেকে لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ পড়ি, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরও ওই সকল মাছের পেট থেকে বের করবেন।

২. কার্যাদি সজ্জিত হওয়ার জন্য

যেব্যক্তির কাজকর্ম এলোমেলো হয়ে থাকে, কোনো কাজই তার সহজভাবে হয় না, সে যতই পদ্ধতি অবলম্বন করুক-না কেন, তার কাজ উদ্ধারই হয় না, তাহলে সে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়বে। কারণ, যখন বান্দা এই দু'আ পড়ে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾

দেখবেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ওই সকল নেয়ামত পুনরায় দান করবেন। যদি কোনো মসিবতগ্রস্ত ব্যক্তি খালেছ অন্তরে এই দু'আ পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও তাঁর নেয়ামতরাজিসহ পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন।[১৬]

৩. হিংসুকদের অনিষ্ট থেকে বেঁছে থাকার জন্য

কিছু-কিছু মানুষের হিংসার রোগ রয়েছে। তাদের অযথাই অন্যের ওপর ঈর্ষা হয়। কারো ভালো অবস্থা তারা দেখতে পারে না। তাদের ভেতরে ষড়যন্ত্র উঁকি মারে। তাদের অন্তরে শুধু শত্রুতাই সৃষ্টি হয়। অন্যের রিযিক তাদের ভালো লাগে না। অন্যের সম্মান তাদের কাছে ভালো লাগে না। অন্যের সুস্থতাও তাদের কাছে তিক্ত মনে হয়। কারো ছেলের বিবাহ যদি ভালো কোথাও হয়ে যায়, তাহলে এটাও তাদের সহ্য হয় না। মেয়ের বিবাহ ভালো কোথাও হলেও তাদের সহ্য হয় না। কারো সন্তানের পরীক্ষার রেজাল্ট

---

১৬. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১

ভালো হলেও তারা দগ্ধ হয়। আবার কেউ আল্লাহ্ওয়ালা হলে তা-ও এ-সকল লোকদের পেরেশানির কারণ হয়। কেউ দীনের কাজ করলেও তাদের ভালো লাগে না ।

হিংসা এমনই এক খারাপ অভ্যাসের নাম।

তাই যদি কারো কোনো কারণে হিংসুকের সাথে সম্পর্ক থাকে, বন্ধুত্বের অন্তরালে শত্রুতাকারীর সাথে পরিচয় হয়, তাঁর বিভিন্ন অনিষ্টকে ভয় করে, তাহলে ওই ব্যক্তির উচিত সে যেন এই দু'আটি বেশি-বেশি পড়ে–

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللهِ

'আমার বিষয়টিকে আমি আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে দিচ্ছি।'[১৭]

কেননা, এরপরই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝

'ওরা যা ষড়যন্ত্র এঁটেছিল, তার থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন আর ফেরাউনের দলবলকে শোচনীয় শাস্তিতে নিপতিত করেছেন।'[১৮]

দেখুন, কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই শব্দগুলো আদায় করল আর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন।[১৯]

৪. জান্নাত লাভের জন্য

যেব্যক্তি জান্নাত পেতে চায়, সে যেন বেশি-বেশি এই দু'আটি পড়ে, مَا شَآءَ اللهُ কুরআনে مَا شَآءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ এর প্রতিউত্তরে ইরশাদ করা হয়েছে,

فَعَسٰى رَبِّيْٓ أَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ

'আল্লাহ্ আমাকে তোমার বাগান থেকেও উত্তম বাগান দান করবেন।[২০]

তাবিজ-কবচের অভ্যাস

একটু চিন্তা করুন তো এই কাজগুলো পালন করতে আমাদের তেমন কোনো কষ্ট হবে কিনা? কিন্তু আজ আমাদের তাবিজ-কবচের অভ্যাস হয়ে

---

১৭. সূরা গাফির : আয়াত ৪৪
১৮. সূরা গাফির : আয়াত ৪৫
১৯. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১
২০. সূরা কাহফ : আয়াত ৪০

গেছে। কবিরাজের পেছনে দৌড়াই, ঈমানেরও ভয় আছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ-সকল কবিরাজ থেকে হেফাযত করুন। তবে অনেক ভালো মানুষও আছে। এরপরও দেখা যায়, অনেক লোক এই কাজকেই নিজের ব্যবসা বানিয়ে বসে আছে। পুরুষের তুলনায় মহিলারাই তাদের পেছনে বেশি দৌড়ায়। তারাও এমন ধরনের লোক হয়, আছর-নজর কিছু আছে মনে হয়; সম্ভবত কেউ কিছু করেছে।

রোগী নিজেই যখন বলে, কেউ কিছু করেছে, তখন তারা তো বাকি কাহিনি আগে থেকেই কিছু তৈরি করে রাখে। তাই

কেউ বলে, ননদে এই করেছে।

কেউ বলে, শাশুড়ি এই করেছে।

কেউ বলে, অমুক প্রতিবেশী করেছে।

শত-শত নয়; বরং হাজার-হাজার মানুষ আসে আর বলে, হযরত! অমুক আলেম বলেছেন, জাদু করা হয়েছে। আরে ভাই! যদি জাদুই করে থাকে, তাহলে তা চিকিৎসা করে তাড়ান না কেন? তারা বলে, হুজুর! জাদু অনেক কঠিন; তাড়ানো যাবে না। অথচ কিছুই হয়নি। খামোখা অন্যকে চিন্তায় ফেলে দেয়।

কাউকে বলে, ভাই! আপনার ওপর জিনের আছর আছে। সুস্থ্য ব্যক্তিকেও চিন্তায় ফেলে দেয় যে, হ্যাঁ, এর প্রভাবও দেখা যাচ্ছে। কিছু দুর্ঘটনা কিংবা বিপদের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে।

আরে কালিমাওয়ালা বান্দা! তোমরা জিনকে ভয় কর! আমার তো মনে হয়, যখন কোথাও জিন্নাতের সমাবেশ হয়, তখন তারাই বরং একে অন্যকে ইনসান থেকে বাঁচানোর ওজীফা বলে দেয়, যাতে তাদের কোনো ব্যক্তি ইনসান দ্বারা আক্রান্ত না হয়। অথচ আজ আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা নিজেরাই জিনকে ভয় করতে শুরু করেছি।

স্মরণ রাখবেন, ঈমান এমন এক নেয়ামত, যে নেয়ামত থাকাবস্থায় কোনো কিছুই মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পালনকর্তা নিজে ক্ষতি করার ইচ্ছা না করেন। এজন্যে তরীকতের লোকদের উচিত, যত বড় মসিবত আর বিপদ কিংবা পেরেশানিতেই লিপ্ত হোক-না কেন, আল্লাহর দরবারকে কখনো ছাড়া যাবে না। এ-সকল কবিরাজের পেছনে ঘোরার কোনো অর্থ হয় না।

আপনি হয়তো বা চিন্তা করছেন, তাহলে এমতাবস্থায় মানুষ কী করবে?

দু-রাকাত সালাতুল হাজাত পড়বে।

প্রতিদিন নিজের প্রতিপালকের দরবারে হাত তুলবে।

নিকটবর্তী কোনো বুযুর্গের সাথে সাক্ষাৎ হলে তার কাছে দু'আ চাইবে।

নিজের পীর-ওস্তাদের নিকট দু'আ কামনা করবে।

মাতাপিতার কাছে দু'আ প্রার্থনা করবে।

পীর আর মুরীদের চাওয়ার মধ্যে ব্যবধান

মনে রাখবেন, পীর সাহেব যে দরবারে চান, মুরীদরাও কিন্তু সেখানেই চায়। দরবার একটিই। আলাদা কোনো রাস্তা নেই। রাস্তা একটিই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যে বারবার চায়, তার চাওয়ার একটা অভিজ্ঞতা হয়। অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে চাওয়ার পদ্ধতি তার জানা হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি খুশি হন। হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে, যখন আল্লাহর কোনো নেক বান্দা তাঁর দরবারে দু'আ করে, তখন একদল ফেরেশতা বলে, হে পালনকর্তা! এই তো পরিচিত কোনো আওয়াজ আসছে। এজন্য আমাদেরও তাঁর দরবারে সদা দু'আ করতে হবে।

এক দু'আ এই হতে পারে, 'হে মাওলা! আপনি যেভাবে হলে খুশি হন আমাদেরকে সেরূপ বানিয়ে দিন।'

এই দু'আ যদি ইখলাছের সাথে করা হয়, তাহলে অবশ্যই তা কখনো-না-কখনো ফল দেবে। আল্লাহ্ তা'আলা যদি জিজ্ঞেস করেন, এই বান্দা! তুমি ভালো হলে না কেন? তাহলে বান্দা বলবে, হে আল্লাহ্! আমি তো তোমার দরবারে খালিছ দিলে দু'আ করছিলাম, আমাকে তুমি এমন বানিয়ে দাও যেমন– হলে তুমি খুশি হও। হতে পারে, এই দু'আর উসিলায় সেদিন আল্লাহ্ ওই বান্দাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহর রহমত হলো সকল ভালোবাসার স্রোতধারা

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার রহমতের শতভাগের মাত্র এক ভাগ তাঁর মাখলুকাতের মধ্যে বণ্টন করেছেন। আর বাকি নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে সংরক্ষিত রেখেছেনে। রহমতের এই এক ভাগের কারণেই মানুষের মধ্যে এতো ভালোবাসা দৃষ্টিগোচর হয়। মা তার সন্তানদের সাথে, স্বামী তার বিবির সাথে, বন্ধু বন্ধুর সাথে, জীবজন্তুর মাঝে, মানুষের মধ্যে, পাখ-পাখালির মাঝে

আপনি যে ভালোবাসা দেখতে পান, সেটা ওই এক ভাগেরই সামান্য অংশমাত্র, যা এক বান্দা পেয়েছে। সেই ভাগটি কতই বড়, যেটি সকল মাখলুক পেয়েছে! আর সেই এক ভাগ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরও কিছু দান করেছেন।

আজ যদি আমাদের সামনে আমাদের কোনো শত্রুকেও আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে আমরাও তাকে এমন অবস্থায় দেখে পেছনে সরতে পারব না। বরং তার ব্যাপারেও আমাদের এই আকুতি, ভাই! তাকে ছেড়ে দিন। তার মানে মহব্বতের ওই একটি অংশের কারণে আজ আমরা আমাদের কোনো শত্রুকেও আগুনে জ্বলা দেখতে চাই না। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে থাকা নিরানব্বই ভাগ রহমত নিয়ে কীভাবে তাঁর কালিমাপড়ুয়া বান্দাকে জাহান্নামে প্রেরণ করবেন? তিনি তা কখনো চান না।

ক্ষমা করার বাহানা

এ-কারণেই ক্ষমা করার এমন-এমন সব রাস্তা তিনি ঠিক করে দিয়েছেন, যা মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ–

১. কেউ কোনো ভালো কাজের প্রতিজ্ঞা করলেই তার প্রতিদান লিখে দেওয়া হয়। অথচ খারাপ কাজের প্রতিজ্ঞা করলে সেটা না করা পর্যন্ত গুনাহ্ লেখা হয় না।

২. একটি নেক কাজ করার প্রতিদান দশ গুণ পর্যন্ত দেওয়া হয়। অথচ একটি গুনাহের বিনিময়ে একটি গুনাহই লিপিবদ্ধ করা হয়। এর সাথেও আবার নিয়ম করে দিয়েছেন–

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

'নিশ্চয়ই নেক কাজ গুনাহগুলোকে মিটিয়ে দেয়।'[২১]

৩. বর্ণিত আছে, এক বান্দা গুনাহের কাজ করছে। ইতিমধ্যে গুনাহ্ লেখার ফেরেশতা অন্য ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করে, এই গুনাহ্ লিখে নেব? সে বলে, না, একটু অপেক্ষা করুন। তারপর দ্বিতীয় গুনাহ্ করলেও সে জিজ্ঞেস করে, লিখব? সে বলে, একটু অপেক্ষা করুন। এরপর বান্দা তৃতীয়, তারপর চতুর্থ, তারপর পঞ্চম গুনাহ্ করার পর যখন একটি ভালো কাজ করে, এখন এক নেক কাজের প্রতিদান যেহেতু দশ নেকি তাই নেকি লেখার

২১. সূরা হূদ : আয়াত ১১৪

দায়িত্বশীল ফেরেশতা বলে, তার পাঁচটি নেকি পাঁচটি গুনাহের বিনিময় হলে আর বাকি থাকে পাঁচ নেকি। সুতরাং এই পাঁচ নেকি তার আমলনামায় লিখে নাও।

যখন ওই বান্দার আমলনামায় পাঁচটি নেকি লিখে দেওয়া হয়, তখন শয়তান আফসোস করে বলে, হায়! আদমসন্তানকে আমি কীভাবে জাহান্নামে পাঠাব, পাঁচ-পাঁচটি গুনাহ্ করালাম, এরপর একটি নেকি করার কারণে তার পাঁচটি গুনাহ্ ক্ষমা করে উল্টো আরো পাঁচ নেকি তার আমলনামায় রিখে দেওয়া হলো।

জাহান্নামিদের পরিচয়

আল্লাহ্ তা'আলা তো বান্দা এজন্যে সৃষ্টি করেছেন যে, আমার বান্দা যাতে আমার অগণিত নেয়ামত ভোগ করতে পারে এবং জাহান্নামের কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারে। অথচ আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করছি। তিনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন; কিন্তু আমরা নড়ছি না। আমাদের বোঝানো হচ্ছে; কিন্তু আমরা তা কানে তুলছি না, শুনতে চাচ্ছি না। শুনলেও বোঝার চেষ্টা করছি না। এ-কারণেই যখন ফেরেশতারা জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কাছে কি কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি? তখন তারা জবাব দেবে,

قَالُوا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ

'হ্যাঁ, আমাদের কাছে ভয় প্রদর্শনকারীগণ এসেছিলেন।'[২২]

তারা আসার পরও তোমরা কেন তাদের কথা আমলে নাওনি?

তারা বলবে,

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

'যদি আমরা শুনতাম ও বুঝতাম, তাহলে তো আজ আমরা জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।'[২৩]

বোঝা গেল, জাহান্নামি তারাই হবে, যারা হক কথা শোনে না বা শুনলেও তা বুঝতে চায় না। অর্থাৎ– সেই অনুযায়ী আমল করে না।

---

২২. সূরা মুল্ক : আয়াত ৯

২৩. সূরা মুল্ক : আয়াত ১০

তূর পাহাড় তো আছে; কিন্তু মূসা কোথায়?

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত আশেকদের অনেক কাছে থাকে। এজন্যেই তিনি ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত আশেকদের অনেক নিকটে।'[২৪]

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں

'দয়া করতে আমি উন্মুখ হয়ে আছি; কিন্তু কোনো প্রার্থনাকারী তো নেই।
পথ আমি কাকে দেখাব; গন্তব্যের কোনো পথিকই তো নেই।'

তূর পাহাড় তো রয়েছে; কিন্তু মূসা নেই। মানে অন্তরের জ্বলন নেই।

একটি আশ্চর্য বিষয়

ইমাম রাযি (রহ.) একটি আশ্চর্য কথা বলতেন, যা স্বর্ণ দিয়ে লিখে রাখার মতো। তিনি বলতেন, 'হে ঈমানদারগণ! একটু চিন্তা করুন! আল্লাহ্ তা'আলার একটিমাত্র রহমত দুনিয়ায় বণ্টন হয়েছে। আর ওই এক রহমতের বদৌলতেই তিনি দুনিয়াতে ঈমানের মতো মহা দৌলত দান করেছেন। তাহলে কেয়ামতের দিবসে যখন বাকি সকল রহমতের দুয়ার খুলে দেবেন, তখন আরও কতই-না নেয়ামতরাজি দান করা হবে!'

এজন্যই ভেবে দেখুন, এই ঈমান, এই ইসলামের নেয়ামত আমাদের ওপর আল্লাহ্র কতই-না বড় নেয়ামত।

মুক্তির ভিত্তি একমাত্র তাঁর দয়ার ওপরই

একথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা যত সন্তোষজনক আমলই করি না কেন, মুক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার দ্বারাই সম্ভব। বনী ইসরাইলে একজন বড় ইবাদাতগুজার ছিলেন। তিনি পাঁচশত বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করেছেন। তার ব্যাপারেও আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তাকে আমার দয়ার বরকতে জান্নাতে প্রবেশ করাও। সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমি তো পাঁচশত বছর ইবাদাত করেছি।

---

২৪. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৫৬

আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, ঠিক আছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই বান্দার পিপাসা সৃষ্টি করে দেবেন। তার এই পিপাসা সহ্যের বাইরে হয়ে যাবে। সে এদিক-সেদিক পানি তালাশ করতে থাকবে। এমন মুহূর্তে একজন ফেরেশতা এক গ্লাস পানি নিয়ে আসবেন। সে পানি দেখে নিজেকে সামলাতে পারবে না। বলবে, পানি দাও। ফেরেশতা বলবেন, এর বিনিময় দিতে হবে। সে জিজ্ঞেস করবে, মূল্য কত? ফেরেশতা বলবেন, এত বছরের নেকি দিতে হবে। সে বলবে, না, এত হবে না। পুনরায় ফেরেশতা বলবেন, এত বছরের নেক আমলসমূহ দিতে হবে। এদিকে তার পিপাসা আরো বাড়তে থাকবে। আর ফেরেশতা বলতে থাকবে, এর চেয়ে কমে আপনাকে পানি দেওয়া যাবে না। এভাবে তার পিপাসা বাড়তে-বাড়তে এক সময় এমন অবস্থায় দাঁড়াবে যে, সে অস্থির হয়ে বলতে বাধ্য হবে, ঠিক আছে আমার পাঁচশত বছরের নেক আমল সব দিয়ে দিলাম। এরপরও আমাকে পানি দাও।

তারপর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে বলবেন, 'হে আমার প্রিয় বান্দা! তোমার পাঁচশত বছরের ইবাদাত আমার এক গ্লাস পানির মূল্যও তো হয় না। অথচ দুনিয়াতে থাকতে তুমি কত গ্লাস পানি পান করেছ! তুমি আমার কত নেয়ামত ভোগ করেছ! তাহলে তুমি কীভাবে বলতে পার, তুমি আমার নেয়ামতরাজির হক পুরোপুরি আদায় করতে পেরেছ?'

এজন্যই আমাদের উচিত সর্বদা নিজের অন্তরে এই বিশ্বাস রাখা যে, আমরা তো একমাত্র তাঁর দয়াই জান্নাতে যেতে পারব। আমল তো শুধু এজন্যে করতে থাকা যে, এটা আমার পালনকর্তার নির্দেশ। কিন্তু এই আমলের ওপর ভরসা করা যাবে না। আমরা আর আমাদের এই ইবাদাত তো তুচ্ছমাত্র। নাজাত একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দয়ায়ই সম্ভব।

শয়তানের আফসোস

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার বান্দার গুনাহ্ অনেক তাড়াতাড়ি ক্ষমা করেন। তাই তো তিনি ইরশাদ করেছেন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

'হে নবী! আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না।'[২৫]

---

২৫. সূরা যুমার : আয়াত ৫৩

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নিজেই বলছেন, তোমরা আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে না। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কোনো-কোনো গুনাহ্গারকে আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিবসে এত বেশি প্রতিদান দেবেন যে, শয়তান তা দেখে আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! আমি যদি দুনিয়াতে তাদের গুনাহ্ না করাতাম! কারণ, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলার মাগফেরাত গুণটি প্রকাশ পাবে এবং তিনি বান্দাকে সেদিন ক্ষমা করেই বেশি আনন্দিত হবেন।

সম্মিলিত তাওবার ফযীলত

মনে রাখবেন, ঘরে তাওবা করলে কবুল হওয়ার চেয়ে সম্মিলিতভাবে তাওবা করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ, যেভাবে জামাতে নামায পড়লে কোনো এক বান্দার নামায কবুল হওয়ার বরকতে বাকিদের নামাযও কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তাহলে আমরা যদি এই মজলিসে আমাদের গুনাহের কথা স্মরণ করে তাওবা করে নেই আর কোনো বান্দার তাওবা কবুল হওয়ার কারণে তার বরকতে ইনশাআল্লাহ্ হতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তাওবাও কবুল করে নেবেন।

গুনাহের শাস্তিতে তিনি বিলম্ব কেন করবেন?

তিনি অনেক সময় গুনাহের শাস্তি দ্রুত দেন না; বরং কিছুটা দেরি করেন। রশি একটু হালকা করে দেন। কেন? এই সম্ভাবনা থাকার কারণে যে, বান্দা তাওবা করে নেবে। যদি সে তাওবা না-ও করে, তাহলেও হতে পারে তার বংশের মধ্যে এমন কোনো নেক সন্তান জন্ম নেবে, যে নাকি তার মাগফেরাত কামনা করে দু'আ করবে।

কাফেরদের সাথেও মাগফেরাতের প্রতিশ্রুতি

ঈমানদাররা তাঁর প্রিয় বান্দা। অথচ তিনি কাফেরদের ব্যাপারে বলছেন,

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ

'হে প্রিয় হাবীব! আপনি কাফেরদের বলে দিন, তারা যদি এখানেই থেমে যায়, তাহলে আমি কুফরি অবস্থায় করা তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেব।'[২৬]

---

২৬. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৮

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যখন অমুসলিমদের ব্যাপারে বলছেন, তারা তাওবা করলে তিনি তা কবুল করবেন, তাহলে ঈমানদার বান্দাদের জন্যে তার তাওবা কবুল করার প্রতিশ্রুতি কত মহান হবে! এজন্যেই আমাদের উচিত সঠিকভাবে তাওবা করা, যাতে তিনি আমাদের ক্ষমা করেন।

জনৈক যুবকের মাগফেরাতের ঘোষণা

একদা এক যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে ক্রন্দন করতে লাগল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কী হয়েছে? জবাবে সে বলল, আমি অনেক বড় অপরাধ করে ফেলেছি। আমার ভয় হচ্ছে, আসমান জমিন কিছুই আমাকে গ্রহণ করবে না। কী হয়েছে জানতে চাইলে সে বলল, আমি কাফন চুরি করতাম। এক যুবতি মেয়ের লাশ দাফন করা হয়েছে। আমি যখন তার কাফন খুলছিলাম, তখন শয়তান ধোঁকা দিল আর আমি ওই মৃত লাশের সাথেই অন্যায় কাজ করেছি।

সেখান থেকে আসার সময় আমার কানে এমন আওয়াজ এল যে, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার এতটুকু লজ্জাও করেনি যে, তুমি আমাকে কেয়ামতের দিবসে এমন অবস্থায় দাঁড় করালে যে, আমাকে মহান আল্লাহর সামনে গোসল ফরজ অবস্থায় হাজিরা দিতে হবে? তার এই কথাটা আমার মনে এমনভাবে বিদ্ধ হলো, আমার মনে হলো, আমি এমন অন্যায় করেছি, যা কখনো ক্ষমার যোগ্য নয়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একথা শুনে খুব রাগান্বিত হলেন। বললেন, তুমি এমন? তুমি এত বড় মারাত্মক অন্যায় করলে? নবীজির এমন রাগ দেখে ওই যুবক সেখান থেকে চলে গেল।

সে নির্জনে গিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকল। সেজদায় লুটিয়ে পড়ল আর বলতে লাগল, আমি অনেক জঘন্য অপরাধ করেছি, এখন আমি অনুতপ্ত। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করল। আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল করলেন, 'আল্লাহ্ চাইলে সব গুনাহই ক্ষমা করতে পারেন।'

ফকীহ আবুল্লাইস সমরকন্দি (রহ.) উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে ডেকে বললেন, গিয়ে আমার বন্ধুকে বলো, 'হে আমার হাবীব! এই বান্দাকে কি আমি সৃষ্টি করিনি?

নবীজি বললেন, আল্লাহ্! আপনিই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ বললেন, তাহলে তার গুনাহ্ কি আমি ক্ষমা করব না?

নবীজি বললেন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমা করবেন।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, সে যেহেতু আমরই বান্দা আর গুনাহ্সমূহ আমিই ক্ষমা করব; সুতরাং এই যুবক আমার কাছে এ পরিমাণ তাওবা করেছে যে, আমি তাকে ক্ষমা করার ঘোষণা করছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবিকে ডেকে বললেন, যাও ওই যুবককে সুসংবাদ দিয়ে দাও; আল্লাহ্ তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ওহে আমার মাবুদ! আপনি কতই-না করুণাময়। যে বান্দাই আপনার দরবারে খালেছ মনে তাওবা করে, আপনি তার তাওবাই কবুল করে নেন।

এক মূর্তিপূজারির ওপর তাঁর দয়ার বহিঃপ্রকাশ

জনৈক মূর্তিপূজারি মসিতবগ্রস্ত হলে ياصنم ياصنم ঝপতে থাকে। রাতের শেষাংশে ঘুমের চাপ পড়লে তার তন্দ্রাভাব আসে। তাই সে নিজের অজান্তে ياصنم এর পরিবর্তে ياصمد ঝপতে থাকে। আর তার যবান থেকে ياصمد বের হওয়ামাত্রই আল্লাহর রহমতে জোশ উঠল এবং পালনকর্তা ইরশাদ করলেন, لبيك ياعبدي হে আমার বান্দা! আমি হাজির। তুমি কী চাও?

এতে ফেরেশতারা অনেক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে মাবূদ! এ লোক তো মূর্তিপূজারি। সারা রাত মূর্তিরই পূজা করে। এখনও তারই পূজা করছিল। ঘুমের ভাব আসাতে সে ভুলে আপনার নাম ঝপেছে আর এতেই আপনার রহমত তার দিকে ঝুঁকে গেল?

এর জবাবে রব্বুল আলামীন ইরশাদ করলেন, সে তো সারা রাত মূর্তিকে ডাকার পরও তারা তার কোনো কাজে আসেনি। ভুলে ডাকলেও আমি যদি তার ডাকে সাড়া না দেই, তাহলে আমার আর ওই সকল মূর্তির মধ্যে কী ব্যবধান রইল?

তারপর আমি আপনার দরবারে কীভাবে আসব?

জনৈক বুযুর্গের নিকট তার দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এই পয়গাম প্রেরণ করলেন যে, আমি আপনার জন্যে আমার এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছি; সুতরাং আপনি আমার এখানে এসে পড়ুন।

বুযুর্গ জবাব পাঠালেন, যদি আমি আপনার দরবারে আসি আর আপনি আমাকে আপনার ঘরের কোনো নারীর সাথে খারাপ অবস্থায় দেখতে পান, তাহলে আপনি আমাকে কী করবেন?

বাদশাহ তাঁর একথা শুনে খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, দেখুন, লোকটি কত বড় পাপী, এমন খারাপ কল্পনা করে! তাই সে রাগান্বিত হয়ে দীর্ঘ নির্দেশ পাঠালেন। তারপর ওই বুযুর্গ ব্যক্তি জবাবে লিখলেন, জনাব! আমি তো একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিমাত্র, এতেই আপনি এমন ক্ষেপে গেলেন যে, আমাকে আপনার সাথে রাখবেনই না। অথচ আমার পালনকর্তা আমাকে গুনাহে রত অবস্থায় দেখেও আমাকে তাঁর দরবার থেকে বের করে দেন না। তাহলে আমি ওই পালনকর্তার দরবার ছেড়ে আপনার দরবারে কীভাবে আসব?

আমরা তো আজ সেই পালনকর্তার দরবারে হাজির। আমরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে নিজেদের গুনাহ্‌সমূহের জন্য ক্ষমা চাইব। গুনাহের পরিমাণ যত বেশিই হোক-না কেন, তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন। শুধু তাঁর রহমতের একটিমাত্র দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়লেই তিনি আমাদের গুনাহগুলোকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন।

একটি আশ্চর্যজনক দু'আ

সায়্যিদুনা হযরত হাসান (রাযি.) যখন মসজিদের দুয়ারে আসতেন, তখন একটি আশ্চর্য দু'আ করতেন। তিনি দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে দু'আ করতেন–

'হে মাবূদ! একজন গুনাহগার আপনার দরবারে হাজির। আপনি নির্দেশ করেছেন ভালো লোকেরা যাতে খারাপ লোকদের সাথে ভালো আচরণ করে। সুতরাং সে মাবূদ! আপনি ভালো আমি খারাপ। তাই আপনি আপনার ভালোর গুণ দ্বারা আমার সাথেও ভালো আচরণ করেন।'

এ-কারণেই বন্ধুগণ! আমরা যদি মসজিদের দরজায় এসেও নিজেদের গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করাতে না পারি। তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে ক্ষমা করাতে পারব? বন্ধুগণ! যদি কোনো ব্যক্তি মন্দির থেকে বের হয়ে জাহান্নামে যায় এতে কোনো আফসোস নেই। আফসোস তো ওই ব্যক্তির জন্য, যে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পরও তাওবা কবুল করাতে পারেনি, যার কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। এখন আমরা আল্লাহর দরবারে বসে আছি। এই দরবার থেকে বের হয়েও কি আমরা জাহান্নামের দিকে যাব?

আজ আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার সময় হয়েছে। নিজেদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করানোর সুযোগ এসেছে। পালনকর্তা তো চান যে, বান্দা আমার কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক। তাই তো তিনি ইরশাদ করেছেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

'হে নবী! আপনি বলুন, ও হে আমরা সেই বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।'[২৭]

আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে না। এটা তার ঘোষণা। আজ আমরা সবাই তাঁর সামনে দণ্ডায়মান। বুঝলাম, আমরা অপরাধী, আমরা অনেক ভুল করেছি। হে আমার মালিক! আমরা আমাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি করছি, ভুল থেকে ক্ষমা চাচ্ছি। হে মাবূদ! আমরা অনেক খারাপ আর আপনি অনেক ভালো। আপনিই তো নির্দেশ দিয়েছেন, ভালোরা যাতে খারাপদের সাথে ভালো আচরণ করে।

হে মাবূদ! আজ আপনি আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করুন। আমাদের অপরাধগুলোকে ক্ষমা করে দিন। রাব্বুল আলামীন! আমাদের তাওবা কবুল করে নিন। হে অপরাধীকে নেক মানুষে পরিবর্তনকারী! হে দুষ্টকে ভদ্রলোকে পরিণতকারী! হে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতদাতা! আপনার বান্দাদের প্রতি দয়া করুন এবং তাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দিন।

হে মাবূদ! আমাদের অন্তর অনেক কঠিন হয়ে গেছে। অপরাধ করার পরও আমাদের চোখে অশ্রু আসে না। চক্ষু আমাদের শুকিয়ে আছে। মাবূদ! উচিত তো ছিল, আমাদের চক্ষু অশ্রুতে সিক্ত হবে। এই মন মোমের মতো নরম হবে আর আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করব। মাবূদ! অন্তরের এই কঠোরতাকে আপনিই পারেন নরম করতে। রব্বুল আলামীন! আমাদের সঙ্গে রহমতের মুআমালা করুন। আমাদের তাওবা কবুল করুন। আমীন ছুম্মা আমীন।

---

২৭. সূরা যুমার : আয়াত ৫৩

ইল্‌মে হাদীছ

'দাওরায়ে হাদীছের ছাত্র ভাইয়েরা, যারা পবিত্র হাদীছ শরীফ পড়বেন! এই কালামের মাধ্যমে আপনাদের সাথে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রূহানি সাক্ষাৎও হতে পারে।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আমাদের শুধু শব্দের মধ্যে পড়ে থাকলেই হবে না। সামনে বহু কাজ বাকি। এই হাদীছের মাধ্যমে আমাদের কোথায় যেতে হবে? আমাদেরকে অবশ্যই এই কালামের মূল আকর্ষণ সায়্যিদুনা হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছতে হবে।

সুতরাং তৃপ্তি তো তখনই পাওয়া যাবে, যখন আমরা হাদীছের এই বছরটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন ভালোবাসায় সিক্ত হব এবং তার সুন্নাতের ওপর আমল করতে স্বচেষ্ট হব। আর আমরা আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায় ডুবে থাকব। তখনই বোঝা যাবে, ইল্‌মে হাদীছের দরসে কী পরিমাণ মজা পাওয়া যায়।'

ইল্‌মে হাদীছ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ـ

وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنِّيْ إِلَى الْإِمَامِ الْهُمَامِ يَقُوْلُ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ ذُوْ الْفِقَارِ أَحْمَدُ حَدَّثَنِيْ حَضْرَةُ الْأُسْتَاذُ حَافِظُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ مَوْلَانَا مُحَمَّدْ جَعْفَرُ بْنُ مَحَمَّدْ أَمِيْرْ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَضْرَةُ الْأُسْتَاذُ مَوْلَانَا شَيْخْ مَحَمَّدْ مَالِكْ كَانْدَهلْوِىْ نَوَّرَ اللّٰهُ مَرْقَدَهٗ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ مُحَمَّدْ إِدْرِيْسْ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مُحَمَّدْ إِسْمَاعِيْلْ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الظَّاهِرِ الْوِتْرِيُّ الْمَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَحَمَّدْ عَابِدْ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَالِحٌ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَحَمَّدْ بْنُ سَنَةٍ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ الْعَجَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ قُطْبُ الدِّيْنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْمُعَمَّرُ الشَّيْخُ يُوْسُفُ هَرَوِيْ الْمَشْهُوْرُ بِسِهْ صَدْ سَالَهْ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَحَمَّدُ بْنُ شَادْ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفَرْبَرِيْ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى رَحْمَةً وَاسِعَةً قَالَ حَدَّثَنِيْ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْحَدِيْثِ وَسَيِّدُ الْمُحَدِّثِيْنَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً

بَابٌ : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ , حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ

اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

ইল্‌মে হাদীছ

অনেক সময় ছাত্রদের মনে প্রশ্ন জাগে, ইল্‌মে হাদীছ কী জিনিস? ওলামায়ে কেরাম ইল্‌মে হাদীছের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন,

علم يدرك به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم و أفعاله و أحواله و أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم و أحوالهم

'ইল্‌মে হাদীছ ওই ইল্‌মের নাম, যার দ্বারা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও তাঁর অবস্থাসমূহকে জানতে পারি এবং এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনদের কথা, কাজ ও অবস্থাসমূহও জানা যায়।

এখানে মোট তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা,

তাঁর কাজ ও

তাঁর অবস্থাসমূহ।

তারপর সামনে বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের কথা, কাজ ও অবস্থাসমূহও এর দ্বারা জানা যায়। এর কারণ হলো, এই তিনটি যুগকেই উত্তম যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তিন যুগের ব্যাপারে উত্তম যুগ হওয়ার সুসংবাদ দান করে বলেন,

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

'সবচেয়ে উত্তম হলো আমার যামানা, তারপর তার পরের যামানা, এরপর তার পরের যামানা।'

সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবয়ে তাবেঈনদের যুগকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম যুগ হওয়ার সুসংবাদ দ্বারা ভূষিত করেছেন। তাই এই তিন যুগের লোকদের কথা, কাজ ও অবস্থাকে হাদীছের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দেখুন, আমরা শুধু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকে সুন্নাত বলি। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু এই শব্দ সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছেন। যেমন– হাদীছের মধ্যে এসেছে–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

'তোমাদের ওপর আমার এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের ওপর আমল করা জরুরি।'

তাহলে বোঝা গেল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত শব্দটি সাহাবায়ে কেরামের তরীকার ব্যাপারেও ইরশাদ করেছেন।

অন্য হাদীছে তিনি ইরশাদ করেন–

اِنَّ ابْنَ مُسْعُوْدٍ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً.

'আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ তোমাদের জন্যে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে দিয়েছে।'

এখানে তাঁর আমলকেও সুন্নাত বলেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ-কারণেই আমরা আমাদেরকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' বলি। কেননা, আমরা যেমনিভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে আমল হিসেবে গুহণ করি, তেমনি সাহাবায়ে কেরামের জামাতের আমলকেও নিজেদের আমলের মানদণ্ড বলে মনে করি এবং এর ওপরও আমল করি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মাঝে তেহাত্তরটি দল হবে, যাদের মধ্যে একটিমাত্র দল মুক্তি পাবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত ওই দলটি কারা হবে? তিনি বললেন,

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ

'যার ওপর আমি এবং আমার সাহাবারা রয়েছে।'

এই রাস্তায় যে চলবে, সে-ই মুক্তিপ্রাপ্ত হবে।

সুতরাং বোঝা গেল, ইল্‌মে হাদীছের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও অবস্থার পাশাপাশি সাহাবা তাবেঈনদের কথা, কাজ ও অবস্থার কথাও এসেছে। তাই তো আপনারা যখন হাদীছের কিতাবসমূহ পড়বেন, তো সেখানে সাহাবায়ে কেরামের মতামতের পাশাপাশি তাবেঈনদেরও অনেক আলোচনা পাবেন। যেমন– বোখারি শরীফের মধ্যে ইমাম বোখারি (রহ.) বলেন, قَالَ الْحَسَنُ এখানে হাসান বসরি উদ্দেশ্য, যিনি প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন। তার নামও অন্তর্ভুক্ত।

ইল্‌মে হাদীছের ফযীলত

আরেকটি প্রশ্ন অন্তরে জাগ্রত হয়, ইল্‌মে হাদীছের ফযীলত কী? কেননা, মানুষ যখনই কোনো বিষয়ে পড়ালেখা করে, তার পেছনে কোনো গুরুত্ব অবশ্যই থাকে, যেটা তাকে ওই ইল্‌ম শিক্ষা করতে উৎসাহিত করে। যেমন– রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ

'আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যক্তির চেহারাকে উজ্জ্বল করুন যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে এবং তা সংরক্ষণ করেছে তারপর তা মানুষদের কাছে এমনভাবে পৌঁছিয়েছে, যেভাবে সে শুনেছে।'

অর্থাৎ– যেব্যক্তি এই ইল্‌মকে শিক্ষা করবে, নিজের অন্তরে হেফাযত করবে, তদনুযায়ী আমল করবে ও অন্যকে পৌঁছিয়ে দেবে, তার জন্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে দু'আ করেছেন। কতই-না গুরুত্বপূর্ণ দু'আ। চেহারা উজ্জ্বল তো তখনই হবে, যখন কোনো পেরেশানি থাকবে না, ভয় থাকবে না, মসিবত থাকবে না। সাথে-সাথে অন্তরে প্রফুল্লতাও থাকবে। অন্যথায় অনেক ভালো মানুষের চেহারাও তো মলিন হয়ে যায়। তাহলে এবার চিন্তা করুন, নবীর যবান থেকে কত বড় মূল্যবান দু'আই না বের হয়েছে।

অন্য হাদীছের মধ্যে রয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন,

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِيْ

'হে আল্লাহ্! আপনি আমার খলীফাদের ওপর দয়া করুন।'

قِيْلَ وَمَنْ خُلَفَائُكَ ؟

'জিজ্ঞাসা করা হলো, হে রাসূল! আপনার খলীফা কারা?

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

اَلَّذِيْنَ يَرْوُوْنَ أَحَادِيْثِيْ

'যারা ভবিষ্যতে আমার হাদীছসমূহ বর্ণনা করবে।'

এ-কারণেই বলা হয়, আলেমগণ নবীগণের প্রতিনিধি, ওয়ারিছ। এটা কত বড় ফযীলতের কথা যে, এই ইল্মকে অর্জন করা, সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তী কালে অন্যের কাছে তা বর্ণনা করা এগুলোর ওপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান থেকে এমন শুভসংবাদ এসেছে। এমন সুসংবাদ শ্রবণ করার পর তো মন চায়, মানুষ যেন এর ওপর নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে, নিজের যৌবনকে মিটিয়ে দেয়, আমাদের আকাবির তো এমনই করেছেন।

ইমাম বোখারি (রহ.)

ইমাম বোখারি (রহ.) কে ছিলেন?

এই ইল্মে হাদীছ অর্জন করার জন্য আমরা এখন যে-কিতাব পড়ছি, এটি ইমাম বোখারি (রহ.)-এর সংকলন। তাই মনে প্রশ্ন আসতে পারে, ইমাম বোখারি (রহ.)-এর পরিচয় কী?

ইমাম বোখারি (রহ.) উজবেকিস্তানের একটি শহর বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন। এই বোখারা শহরের যোগাযোগব্যবস্থা হলো 'মাওরাউন নাহর' নামক এলাকার সাথে। অর্থাৎ– আমাদের আর তাদের মাঝে একটি সাগরমাত্র। যেমন– আমরা পরস্পরে কথাবার্তা বলার সময় বলি, নদীর পাড় দিয়ে, তেমনিভাবে আমাদের আকাবিরগণও এই এলাকার নাম 'মাওয়ারাউন নাহর' রেখেছেন, যার অর্থ নহরের পাড়ে। ইমাম বোখারি (রহ.)ও 'মাওয়ারাউন নাহর'-এর বাসিন্দা। তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল এবং তিনি শৈশবেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তারপর তার সম্মানিতা মাতা তার

জন্য আল্লাহর দরবারে অনেক দু'আ করেন। এমনকি তিনি একবার স্বপ্নে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দেখতে পান। ওই স্বপ্নেই তাঁকে সুসংবাদ দেওয়া হয়, তাকে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তিনি ঘুম থেকে জেগে দেখেন, ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। তখনও কিন্তু তাঁর মা জানতেন না ইমাম বোখারি কত বড় ব্যক্তিত্ব হবেন।

ইমাম বোখারি (রহ.) ছোটকালেই এতিম হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার শান যে, তিনি এই দুনিয়াতে এতিমকেই এতিমের জন্য প্রিয় বানান। দুনিয়া যাদের আশ্রয়হীন মনে করে, তাদের ওপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর খাছ রহমত প্রেরণ করেন।

ইমাম বোখারি (রহ.)-এর বড় ভাইয়ের নাম আহমাদ ইবনে ইসমাইল। প্রথমে তাঁর অধীনে ছিলেন। তাঁর মাতাও তরবিয়াত করতেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে তাঁর ভাই ও মায়ের সাথে পবিত্র হজব্রত পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ তাশরীফ নিয়ে গেলেন। এ বয়সেই তার ইল্‌ম অন্বেষণের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক ও ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ্ (রহ.)-এর বর্ণনাসমূহও এ বয়সেই মুখস্থ করেছেন। মক্কায় যাওয়ার পর সেখানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করে আরবের আলেমদের নিকট ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষা করেন।

ইল্‌মে হাদীছ অর্জন করার জন্য তিনি অনেক দেশ সফর করেছেন। খোরাসান, ইরাক, হেজায, শাম, মিশর, বাগদাদ, বসরা ও কূফার ওলামায়ে কেরামের নিকট ইল্‌মে দীন শিক্ষা করেছেন। ইমাম বোখারি (রহ.) নিজেই বলছেন, আমি ইল্‌মে হাদীছ শিক্ষা করার জন্য এত বেশি পরিমাণ কূফায় সফর করেছি, কতবার করেছি আমি নিজেই জানি না। কোনো-কোনো কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি মোট আঠারোশত ওস্তাদের নিকট ইল্‌মে হাদীছ অর্জন করার লক্ষ্যে সফর করেছেন।

তারপর মহান রব্বুল আলামীনও তাঁর থেকে ইল্‌মে দীনের অনেক খেদমত নিয়েছেন। তাঁর ছাত্রবৃন্দ পরবর্তী কালে অনেক বড়-বড় মুহাদ্দিছ হয়েছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযি (রহ.) ও ইমাম নাসাঈ (রহ.) তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি মাত্র আঠারো বছর বয়সে লেখালিখির কাজ আরম্ভ করেছিলেন। 'কিতাবুত তারীখ' তিনি মাত্র আঠারো বছর বয়সে লিখেছেন।

ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় নব্বই হাজার ছাত্রকে বোখারি শরীফের দরস দিয়েছেন। চিন্তা করুন! বর্তমানে একজন ওস্তাদ বেশির থেকে বেশি নিজের জীবনে এক-দু-হাজার ছাত্রকে পড়াতে পারেন। অথচ তিনি নব্বই হাজার ছাত্রকে শুধু নিজের বোখারি শরীফ পড়িয়েছেন।

হাদীছ মুখস্থ করার দিক থেকে একক অবস্থান

ইমাম বোখারি (রহ.) নিজের যুগে হাফেযে হাদীছ তথা হাদীছের হাফেয নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অনেক স্মরণশক্তি দান করেছেন। একদা তিনি বাগদাদ তাশরীফ নিলেন। সেখানকার ওলামায়ে কেরাম এটা প্রসিদ্ধ করে দিলেন যে, আমাদের মাঝে একজন হাফেযে হাদীছ আসছেন। সেযুগে হাফেযে হাদীছকে অনেক মর্যাদা দেওয়া হতো। যার পাঁচ লক্ষ হাদীছ মুখস্থ থাকে, তাকে হাফেযে হাদীছ বলা হয়। বয়স কম হলেও তাঁর মর্যাদা অনেক বড় ছিল। লোকেরা যখন এটা প্রসিদ্ধ করে দিল, হাফেযে হাদীছ আসছেন, তখন তাঁর সমালোচনাকারী কয়েকজন আলেম তাঁর পরীক্ষা নিতে চাইলেন, দেখি, আসলেই তিনি হাফেযে হাদীছ কিনা? সেমতে তারা নিজেরা দশজনের একটি কাফেলা তৈরি করল যে, প্রত্যেকে তাকে দশটি করে হাদীছ জিজ্ঞেস করবে। হাদীছও কোনগুলো? একেবারে মূল ইবারত এবং রাবীদের সনদসহ পরীক্ষা নেয়া হবে।

তারা হযরত ইমাম বোখারি (রহ.)কে একস্থানে আহ্বান করে বললেন, আপনি তো হাফেযে হাদীছ; দয়া করে আমাদেরকে কয়েকটি হাদীছ শোনান। তিনি বললেন, ঠিক আছে। একজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এই হাদীছটি শুনেছি; আপনার নিকট এটি পৌঁছেছে কি? তারপর সে একটি হাদীছ বলল। সেই হাদীছের মধ্যে ইবারত বা সনদগত দিক থেকে একটু ভুল ছিল, তাই ইমাম সাহেব বললেন, না এমন হাদীছ তো আমি শুনিনি।

তারপর ওই আলেম বললেন, তাহলে আরেকটি হাদীছ শোনেন। এই বলে সে অরেকটি হাদীছ শোনাল। ইমাম বোখারি (রহ.) বললেন, না, এটিও আমি শুনিনি।

তারপর সে তৃতীয় হাদীছটি শোনালে এবারও তিনি একই জবাব দিলেন। এভাবে সে দশটি হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নাসূচক জবাব দিলেন।

তারপর দ্বিতীয় আলেম দাঁড়িয়ে দশটি হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম বোখারি সবগুলোর উত্তরে নাসূচক জবাব দিলেন। এভাবে দশজন আলেমই তাঁকে বিভিন্ন হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

একটু চিন্তা করুন, ওই আলেমগণ তাঁর ওপর কতটুকু মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছেন যে, একদিকে তিনি হাফেযে হাদীছ নামে প্রসিদ্ধ আবার প্রত্যেক হাদীছের উত্তরেই নাসূচক জবাব দিচ্ছেন। সাধারণত শুনতে তো এমন মনে হয় যে, ইনি আবার কোন ধরনের হাফেযে হাদীছ, যার কোনো হাদীছই জানা নেই! তথাপিও তিনি সব হাদীছের জবাবে না দ্বারাই জবাব দিলেন।

এবার ইমাম বোখারি (রহ.) বললেন, দেখুন, আপনাদের প্রথমজন প্রথম হাদীছ এভাবে পড়েছেন। তাতে এই ভুল রয়েছে। তারপর তিনি সহীহ সনদ ও সহীহ মতনসহকারে হাদীছটি শুনিয়ে দিলেন। এভাবে তার বর্ণিত দশটি হাদীছই শোনালেন। সবগুলোর ভুল ধরিয়ে দিয়ে শুদ্ধ ইবারত ও শুদ্ধ সনদ বর্ণনা করলেন। তারপর দ্বিতীয়জনের দশ হাদীছের, তারপর তৃতীয়জনের দশ হাদীছের, এভাবে সকলের মোট একশত হাদীছের ভুলগুলো উল্লেখ করে সহীহ্ সনদ ও মতন (হাদীছের মূল ইবারত) সহকারে তাদের শুনিয়ে দিলেন।

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, একশত হাদীছ সনদ ও মতন সহকারে শুনিয়ে দেওয়া ইমাম বোখারি (রহ.)-এর জন্য কোনো কঠিন ব্যাপারই ছিল না। তবে মজার কথা হলো, ওই আলেমগণ যেভাবে এবং যে-ধারাবাহিকতায় হাদীছগুলো বলেছেন, ইমাম বোখারি (রহ.)ও জবাব দেওয়ার সময় হুবহু সেই ধারাবাকিতায় তার জবাব দিয়েছেন। এটি কতই-না আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল! আল্লাহু আকবার!

এদেরই رِجَالُ الْحَدِيْثِ তথা 'হাদীছের প্রাণপুরুষ' বলা হয়। এরা এমন মনীষী, যাদের আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন রাসূলের মহব্বত এত পরিমাণ দান করেছেন যে, তাঁদের জীবনের উদ্দেশ্যই হয়ে গেছে এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও অবস্থাকে সরাসরি মখস্থ করে নেওয়া। তাই তো ইমাম বোখারি (রহ.) লাখ-লাখ হাদীছ মুখস্থ করেছেন।

বোখারি শরীফ সংকলনের নেপথ্যে

মনের ভেতর আরেকটি কথা উঁকি মারছে যে, ইমাম বোখারি (রহ.) বোখারির সংকলন কেন করলেন? প্রত্যেক কিতাবের সংকলনের পেছনে তো

কোনো-না-কোনো কারণ নিহিত থাকে। বোখারি সংকলনের সেই কারণটি কী ছিল?

এর জবাবে ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, ইমাম বোখারি (রহ.) একদা স্বপ্নে দেখলেন, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারক থেকে মাছি তাড়াচ্ছেন। তিনি তাঁর এই স্বপ্ন আপন ওস্তাদ ইমাম আবু ইসহাক (রহ.)কে শোনালেন। আবু ইসহাক (রহ.)-এর একটি ব্যাখ্যা এই শোনালেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার মাধ্যমে ইল্‌মে হাদীছের পরিচ্ছন্নতার কাজ নেবেন। অর্থাৎ– আপনি ইল্‌মে হাদীছকে পরিষ্কার করবেন এবং ইল্‌মে হাদীছ থেকে খড়কুটাকে আলাদা করবেন। বাস্তবেই আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম বোখারি (রহ.) থেকে এমন কাজই নিয়েছেন যে, তিনি বোখারি শরীফ সংকলন করেছেন, যে কিতাবকে أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ (আল্লাহর কালামে পাকের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধতম কিতাব) মনে করা হয়। এই স্বপ্নই ইমাম বোখারি (রহ.)-এর উক্ত কিতাব সংকলনের মূল কারণ।

কিতাব সংকলনে আদব রক্ষা

ইমাম বোখারি (রহ.) এই কিতাব মদীনা শরীফে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রতিটি হাদীছ লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি গোসল করতেন এবং দু-রাকাত নামায আদায় করতেন। তারপর ওই হাদীছটি লিখতেন। কত বড় আদব আর কত বড় খোদাভীতি! এ-কারণেই তাঁর এই কিতাব এত বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

বোখারি শরীফে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা

এই কিতাবে বর্ণিত মোট হাদীছের সংখ্যা কত এ-ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামত বিভিন্ন রকম।

* ইমাম নববী (রহ.) বলেন, ইমাম বোখারি (রহ.)-এর মুখস্থ মোট হাদীছের সংখ্যা ছয় লাখ। এর মধ্য থেকে ইমাম বোখারি (রহ.) সাড়ে সাত হাজার হাদীছ একত্রিত করেছেন। বারবার এসেছে এমন হাদীছ বাদ দেওয়ার পর উক্ত কিতাবের হাদীছের সংখ্যা হয় সাড়ে তিন হাজার।

* আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, বোখারি শরীফের বর্ণিত মোট হাদীছের সংখ্যা নয় হাজার। বারবার উল্লেখিত হাদীছ বাদ দিলে আড়াই হাজার হয়।

বোখারি শরীফের হাদীছ বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে শর্তসমূহ

ইমাম বোখারি (রহ.)-এর নিকট হাদীছ বর্ণনা করার জন্যে কিছু শর্তও রয়েছে এবং বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে তাঁর এই শর্তগুলো অনেক কঠিন ছিল। যেমন– তিনি নিজেই বলছেন, প্রথমত বর্ণনাকারীকে ইনসাফের অধিকারী হতে হবে। সবার নিকটে গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং বর্ণনাকৃত হাদীছগুলো তাঁর নিজের মুখস্থ থাকতে হবে। এভাবে বললে হবে না যে, আমার মনে হয় হাদীছটি এমন হবে। বরং ইমাম বোখারি (রহ.) বলেন, বর্ণনাকারীকে হাফেয হতে হবে।

তিনি বর্ণনাকারীর ব্যাপারে একথাও বলেন, বর্ণনাকারীকে অবশ্যই তিনি যে ওস্তাদের কাছে পড়েছেন, সেই ওস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ, তাঁর কাছে পড়া অর্থাৎ– শিক্ষা-দীক্ষা এবং সফর অবস্থায় পড়েছেন, নাকি স্থির অবস্থায় এটা প্রমাণ করতে হবে।

সুতরাং যদি কোনো বর্ণনাকারীর ব্যাপারে তাঁর ওস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার বিষয়টি প্রমাণিত না হয়, তাহলে তিনি ওই বর্ণনাকারীর হাদীছ গ্রহণ করতেন না। কারণ, তাঁর এই সনদ বা সূত্র ধারাবাহিক হয় না। ইমাম বোখারি (রহ.) এই শর্তগুলোর ব্যাপারে অনেক কঠোর ছিলেন, যার ফলে তিনি তাঁর কিতাবের মধ্যে সহীহ্ হাদীছগুলো একত্রিত করতে পেরেছেন।

ইল্‌মে হাদীছের সংকলন

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) তাঁদের মহব্বতের কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় কথাবার্তা মুখস্থ করে ফেলতেন। যেমন– কোনো মা তার সন্তানের কথা মুখস্থ করে ফেলে। আপনারা নিশ্চয় মায়েদের দেখেছেন যে, তারা তাদের বাচ্চাদের কাজকর্ম, কথাবার্তা ইত্যাদি মুখস্থ করে অন্যের কাছে তা বর্ণনা করে। যার কাছে বর্ণনা করে, তার বিরক্তি লাগলেও এতে মায়ের কাছে বরং আরো খুশিই লাগে। সে সন্তানের চালচলন, কথাবার্তা, কাজকর্ম সব মুখস্থ করে নেয় একমাত্র সন্তানের প্রতি মহব্বত থাকার কারণে। তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে গভীর ভালোবাসা থাকার কারণে তাঁর কথাগুলো মুখস্থ এবং তাঁর বাচনভঙ্গিও মনে করে রেখেছেন। এভাবেই তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাচনভঙ্গির হেফাযত তথা সংরক্ষণকারী হয়েছিলেন।

আর তাই অনেক সাহাবায়ে কেরাম জীবদ্দশাতেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছগুলো লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন। যা শুনতেন, তা-ই লিখতেন। আজকাল যেমন আমরা কাগজে নোট করি, তেমনি অনেক সাহাবায়ে কেরাম নোট করতেন। এর জন্যে তাদের কাছে ছোট-ছোট সহীফা ছিল। তারা অবসর সময়ে সেগুলো পড়তেন এবং হাদীছগুলোর দাওর (বারবার পড়া) করতেন। তাই হাদীছ শরীফের এক রকম সংকলন সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)-এর যুগ থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।

কিন্তু এক হলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো কাজ করানো। আর এ কাজটি শুরু করেছেন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয। তাঁর যামানায় তিনি যখন দেখলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদীছ তো এখনো মানুষের মুখস্থ আছে। হতে পারে সামনে তাদের উত্তরসূরীদের এই পরিমাণ স্মরণে থাকবে না। সুতরাং এখনই হাদীছসমূহকে সংরক্ষণ করা উচিত। তাই তিনি তাঁর যুগের একজন বড় মাপের মুহাদ্দিছ হযরত ইবনে শিহাব (রহ.)কে বললেন, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছগুলো একত্রিত করার কাজ করুন। তাই সরকারীভাবে এটিই ইল্‌মে হাদীছ সংকলনের প্রথম কাজ ছিল যে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর নির্দেশে হযরত ইবনে শিহাব (রহ.) হাদীছ সংকলনের কাজ আরম্ভ করেন। এভাবে হাদীছ সংকলনের ধারাবাহিকতা সামনে অগ্রসর হতে থাকে, যার আলোচনা হযরত ইমাম সুয়ূতী (রহ.) তার কিতাব 'আলফিয়্যাহ্'-এর মধ্যে কয়েকটি কবিতার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। এই কিতাবে তিনি কয়েকটি কতিবা আবৃতির মাধ্যমে হাদীছ সংকলনের ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

أول جامع الحديث والأثر * ابن شهاب أمر له عمر

'ইল্‌মে হাদীছের প্রথম সংকলক হযরত ইবনে শিহাব (রহ.) ছিলেন, যাকে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) নির্দেশ দিয়েছেন।

وأول الجامع للأبواب * جماعة في العصر ذو اقتراب

'তারপর এই হাদীছগুলোকে অধ্যায় আকারে প্রথমে একত্রিত করেছেন মুহাদ্দিছীনের একটি জামাত।

كابن جريج وهشيم مالك * ومعمر وولد المبارك

'যেমন– ইবনে জুরাইজ, হিসাম, মালিক, মা'মার ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক।'

এরা সবাই ওই সকল মনীষী ছিলেন, যারা পুনরায় এই হাদীছকে অধ্যায়ের রূপ দিছেয়েন। অর্থাৎ– একটি তো হলো সব হাদীছকে এক জায়গায় একত্রিত করা আর অপরটি হলো পুনরায় সব হাদীছকে ধারাবাহিকতার মাধ্যমে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের হাদীছগুলোকে একত্রিত করা। এই কাজটি মুহাদ্দিছীনের একটি জামাত করেছেন।

তারপর ইমাম সুয়ূতী (রহ.) বলেন,

وأول الجامع باقتصار * على الصحيح فقط البخاري

'তারপর আরো বিশুদ্ধভাবে হাদীছগুলোকে সাজিয়েছেন ইমাম বোখারি (রহ.)।'

مسلم بعده والأول * على الصحيح في الصحيح أفضل

'তারপর ইমাম মুসলিম (রহ.) কিতাব লিখলেন। এরপরও বাস্তব কথা হলো, ইমাম বোখারি (রহ.)-এর বোখারি শরীফ বিশুদ্ধতম হওয়ার দিক থেকে ইমাম মুসলিম (রহ.) সংকলিত মুসলিম শরীফ থেকেও অগ্রগণ্য।

মহান আল্লাহ্ ইল্‌মে হাদীছের এই সংকলনের কাজ সম্পন্ন করলেন এবং তিনি এই ইল্‌মকে কিতাবের মধ্যে সংরক্ষণ করে দিলেন, যার বরকতে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। আর এখনও এই কিতাবগুলোর উসিলায় আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছগুলো পড়তে পারছি এবং তদনুযায়ী আমল করতে পারছি।

সিহাহ্ সিত্তা (হাদীছের বিশুদ্ধতম ছয় কিতাব)-এর অসাধারণ বর্ণনাশৈলী

অনেক মুহাদ্দিছীনে কেরামই হাদীছের বিভিন্ন কিতাব সংকলন করেছেন। যেমন–

ইমাম বোখারি (রহ.) বোখারি শরীফ লিখেছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ.) মুসলিম শরীফ রিখেছেন।

ইমাম তিরমিযি (রহ.) তিরমিযি শরীফ লিখেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) আবু দাউদ শরীফ লিখেছেন।

ইমাম নাসাঈ (রহ.) নাসাঈ শরীফ লিখেছেন।

ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রহ.) ইবনে মাজাহ্ শরীফ লিখেছেন।

প্রত্যেক সংকলনের মধ্যে সংকলকের নিজস্ব রুচি প্রকাশ পেয়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্নজন দ্বারা বিভিন্ন কিতাব সংকলন করিয়েছেন। আর এগুলো হাদীছের একেকটি ফুলবাগান হয়ে গেছে। ফুলবাগানে যেমন অনেক ধরনের ফুল থাকে, ফুলের রংও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, প্রত্যেক ফুলের ঘ্রাণও ভিন্ন-ভিন্ন হয়, আবার প্রত্যেক ফুলের আকারও এক রকম হয় না। কিন্তু পাওয়া গেলে কত যে ভালো লাগে। সিহাহ্ সিত্তার এই কিতাবগুলো যদি আপনি একত্রিত করেন, তাহলে বুঝবেন, এগুলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছভান্ডারের একেকটি ফুল বাগান। কেউ বলেন,

ہر گل را رنگ و بوئے دیگر است

অর্থাৎ– প্রত্যেক ফুলেরই ঘ্রাণ ভিন্ন-ভিন্ন।

আর সিহাহ্ সিত্তার প্রতিটি কিতাবের ধরন অন্যটি থেকে ব্যতিক্রম ও অসাধারণ। একথাটি একটু বিস্তারিতভাবে বোঝার চেষ্টা করুন!

১. ইমাম মুসলিম (রহ.) যখন মুসলিম শরীফ সংকলন করেন, তখন তিনি চিন্তা করলেন, ছাত্রদের ইল্‌মে হাদীছ বুঝতে হলে তো আগে اصول الحديث তথা হাদীছ অধ্যয়নের নীতিমালা পড়তে হবে, যাতে সে বুঝতে পারে, মূলনীতি অনুযায়ী কোন হাদীছের কী অবস্থা। তাই তিনি এ-ব্যাপারে একটি ভূমিকা লিখলেন, যা مقدمة مسلم (মুসলিম শরীফের ভূমিকা) নামে প্রসিদ্ধ। এ ভূমিকার মধ্যে ইমাম মুসলিম (রহ.) হাদীছের মূলনীতিগুলো আলোচনা করেছেন। আর বাস্তবতাও তা-ই। যদি কারো সামনে কোনো জিনিসের মূলনীতিই না থাকে, তাহলে তো সে ওই জিনিসের খাঁটি ভেজাল পৃথক করতে পারবে না। তাই ইমাম মুসলিম (রহ.) আগে হাদীছ বিষয়টিকে জানার ওপর জোর দিয়েছেন।

২. সুনানে ইবনে মাজাহ্ শরীফ দেখুন। ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রহ.)-এর উদ্দেশ্য তো ইল্‌মে হাদীছই ছিল। আর এই হাদীছের ওপর আমল ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলের মহব্বত অন্তরে জাগ্রত না হবে। তাই তিনি কিতাবের শুরু অধ্যায়ে রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে এর মাধ্যমে হাদীছ অধ্যয়নের পূর্বে ছাত্রদের মাঝে নবী কারীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত সৃষ্টি হয় এবং এই মহব্বতের কারণে তাদের মাঝে হাদীছ অনুযায়ী আমল করার মানসিকতা তৈরি হয়।

৩. ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম তিরমিযি (রহ.) ও ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল ফিকহী মাসায়েলের ধারা অনুযায়ী হাদীছগুলোকে একত্রিত করা। উদাহরণস্বরূপ ফিকহী ধারা অনুযায়ী প্রথমে কিতাঁবুস সালাত আসবে। কারণ, এটি হলো উত্তম ইল্‌ম। আর নামায ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রতা অর্জন না হবে। তাই এই তিন বুযুর্গ কিতাঁবুত তাহারাত-এর মাধ্যমে নিজেদের কিতাব শুরু করেছেন।

৪. ইমাম বোখারি (রহ.) এদের থেকে একটু ব্যতিক্রমভাবে নিজের কিতাব আরম্ভ করেছন। তিনি তাঁর কিতাব শুরু করেছেন

بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْأُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী অবতীর্ণ হওয়া কীভাবে আরম্ভ হয়?) এই অধ্যায়ের মাধ্যমে।

এর দ্বারা ইমাম বোখারি (রহ.)-এর উদ্দেশ্য কী ছিল? তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শরয়ী বিধিবিধানগুলোকে স্পষ্ট করা। আর শরয়ী বিধান এর স্পষ্টকরণ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিধান আমাদের কাছে কীভাবে এসেছে তা না জানব। এই ইল্‌ম মানুষের কাছে অহীর মাধ্যমে এসেছে।

পঞ্চইন্দ্রিয় ও ইল্‌ম অর্জন

মানুষের কাছে ইল্‌ম অর্জন করার অনেক উপকরণ রয়েছে। আপনারা মাদরাসায় পঞ্চইন্দ্রিয় সম্পর্কে পড়েছেন। কেন পড়েছেন? কারণ, এর দ্বারা মানুষ ইল্‌ম অর্জন করে। সুতরাং মানুষ যখন কোনো জিনিসকে

দেখতে পারে, তখন তার ইল্‌ম হাসিল হয়।

যখন শুনতে পারে, তখন তার ইল্‌ম হাসিল হয়।

যখন হাত দ্বারা ধরতে পারে, তখন তার ইল্‌ম হাসিল হয়।

যখন মজা আস্বাদন করতে পারে, তখন তার ইল্‌ম হাসিল হয়।

যখন ঘ্রাণ নিতে পারে, তখন তার ইল্‌ম হাসিল হয়।

এই ইন্দ্রিয়গুলো ইল্‌ম অর্জন করার মাধ্যম। এর একটু ব্যাখ্যাও বুঝুন।

ক. বাচ্চারা কোনো জিনিস দেখলে সাধারণত সেটা ধরার চেষ্টা করে। সে কোনো মুক্তা ধরার চেষ্টা করে তো এটি তার জ্ঞান অর্জন করার একটি পদ্ধতি, যাকে ইংরেজিতে Learning Curve বলে। আপনি দুনিয়ার যে শিশুটিকেই দেখেন না কেন, এ-ব্যাপারে সবাইকে একই রকম পাবেন।

এমনকি যখন সে আগুনের কোনো কয়লা দেখবে, তখন সেটাও ধরার চেষ্টা করবে। তার কি এই খবর আছে যে, এটা কষ্টদায়ক বস্তু। সে কেন এই জিনসগুলোকে ধরে? সে জানতে চায়, এই জিনিসটা কি নরম, নাকি শক্ত। কারণ স্পর্শ করলেই কোনো জিনিস নরম বা শক্ত হওয়া বুঝে আসে।

খ. স্পর্শ করার কারণে কোনো একটি জিনিসের ব্যাপারে যখন সে জানতে পারে, এটা নরম বা শক্ত তখন আরেকটা কাজ করে। আর তাহলো ওই জিনিসটাকে সে তার মুখে নেবে। সব শিশুই এমন করে জিনিসটা মজাদার কিনা বোঝার জন্য।

গ. স্বাদ গ্রহণ করে যখন সে জানতে পারে, এই বস্তুটা মিষ্ট বা তিক্ত, তখন পরবর্তী যে কাজটা সে করে, তাহলো সে ওই বস্তুটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। বুঝেশুনে সে এটাকে নিক্ষেপ করে। কিন্তু তার তো এতটুকু অনুভূতি থাকে না যে, এই জিনিস কাঁচের; এটা এভাবে ফেললে ভেঙে যেতে পারে। বরং সে একে নিচে ফেলে শুনতে চায়, এর আওয়াজ কেমন? এতে কোনো ক্ষতি হলে তো মা-বাবার হয়, বাচ্চার কী-ইবা আসে যায়? এটিই হলো শিশুদের ইল্‌ম হাসিল করার একটি পদ্ধতি, যা তাদেরকে জন্মগতভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। কারণ, তারা সব জিনিসের সাথেই এ-কাজগুলো করে থাকে।

বোঝা গেল, এই অঙ্গগুলোর দ্বারা মানুষের ইল্‌ম অর্জিত হয়। তবে এই অঙ্গগুলো দ্বারা যে-ইল্‌ম অর্জন করা হয়, তাতে কখনো-কখনো ভুলও হয়। যেমন–

১. মনে করুন, আপনি গরমকালে গাড়ি চালাচ্ছেন। রাস্তায় সামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন যে, মনে হয় সামনে রাস্তার ওপরে পানি দেখা যাচ্ছে। অথচ পানি থাকে না। বোঝা গেল, চক্ষু দ্বারা জানা তো গেল; কিন্তু এই জানাটা ভুল ছিল।

২. আরেকটি উদাহরণ শুনুন। আপনি একটা রেলগাড়িতে আছেন। আরেকটা রেলগাড়ি তার পাশে আসছে আর আপনি সেদিকে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় আপনি অনুভব করতে পারলেন, আপনার গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। আপনি মনে করছেন আপনাকে বহন করা গাড়িটা চলছে। একটু পরেই জানতে পারলেন, আপনারটা নয়, পাশের গাড়িটাই বরং চলছে। অথচ যখন উভয় গাড়ি বরাবর এসেছিল, তখন কিন্তু আপনি মনে করেছিলেন, আপনাদের গাড়ি চলছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু তো দেখেছে

ঠিক; কিন্তু তার এই দেখা দ্বারা যে-ইল্‌ম হাসিল হয়েছে, তা ভুল ছিল। একে ইংরেজীতে Illusion বা ধোঁকা বলা হয়। অর্থাৎ– দৃষ্টির ধোঁকা।

৩. কোনো মানুষ যখন অসুস্থ হয়, তখন সব কিছুই তার কাছে তিক্ত মনে হয়। এমনকি পানিও তার কাছে তিক্ত মনে হতে থাকে। অথচ পানি তো তিক্ত নয়। কিন্তু রোগী বলবে, আমার পক্ষে এক কুলি পানিও পান করা সম্ভব নয়; এগুলো তিক্ত। চিন্তা করুন, পানি তো ঠিকই আছে; কিন্তু তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই পানিই তার কাছে তিক্ত মনে হচ্ছে। বোঝা গেল, জিহ্বার মাধ্যমে তার যে-ইল্‌ম অর্জিত হয়েছে তা সঠিক নয়।

৪. আপনি কখনো-কখনো বলে থাকেন, মনে হয় বাইরে কেউ আওয়াজ করেছে। অথচ গিয়ে দেখলেন, সেখানে কিছুই নেই। অথচ আপনার কান তো শুনেছে; কিন্তু কোনোটা ভুল ছিল।

বোঝা গেল, এই পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা যে-ইল্‌ম হাসিল হয় এটা যেমন কখনো-কখনো সঠিক হয় আবার তাতে ভুল হওয়ারও আশঙ্কা থেকে যায়। এ-কারণে এগুলোর ওপর সর্বদা ভরসা করা যায় না।

জ্ঞান অর্জন ও বিবেক

উক্ত পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যতীত আরো ইন্দ্রিয় রয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ ইল্‌ম হাসিল করে থাকে। যেমন– আকল তথা 'বিবেক'। বিবেক দ্বারা জ্ঞান অর্জন করার কয়েকটি উদাহরণ–

১. আপনি ঘরে এসে দেখলেন, আপনার আলমারি থেকে কিছু জিনিস হারিয়ে গেছে। এখন আপনি ভাবতে শুরু করলেন, এই কাজটা কে করেছে। অথচ চোর যখন চুরি করেছে, তখন কিন্তু আপনি এখানে ছিলেন না। কিন্তু আপনি আপনার আলমারিতে জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ধারণা করলেন, মনে হয় কিছু চুরি হয়েছে। এখন আপনি এদিক-সেদিক আলামত তালাশ করতে লাগলেন যে, দেখি কোনো নিশানা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। আপনি দেখলেন, বাসার ছাদের ওপর কিছু ইট উল্টে পড়ে আছে। সাথে-সাথে ধারণা করতে শুরু করলেন, চোর নিশ্চয়ই ছাদ হয়ে এসেছে। অথচ সে ছাদ হয়েই এসেছে সেটা কিন্তু আপনি নিজচোখে দেখেননি। পরে দেখা গেল, বাস্তবেই চোর এদিক থেকেই এসেছে। এদিক দিয়েই চুরি করার পর পুনরায় সে পালিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত তো আপনি আকল তথা আপনার বিবেক দ্বারাই নিলেন।

২. একজন বিজ্ঞানী ছিলেন, যার নাম আইনস্টাইন। তিনি একটি থিউরি আবিষ্কার করলেন, যার ভিত্তি শুধুই একটি ধারণার ওপর। তিনি চিন্তা করলেন, একটি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, যার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, চোখ দিয়েও সে দেখে না, হাত দিয়ে ধরেও কিছু ধারণা করতে পারে না, কিন্তু শুধু একটি ধারণার ভিত্তিতে সেই বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট। এমন একটি থিউরি আবিষ্কার করল যে, আজ পুরা দুনিয়ার বিজ্ঞান তা বিশ্বাস করে। তার এই ইল্‌ম শুধু আকল তথা বিবেক দ্বারা অর্জিত হয়েছে।

বিবেক দ্বারা অর্জিত ইল্‌ম সর্বদা সঠিক হতে হবে এটা জরুরি নয়। কারণ, বিবেক অনেক সময় মানুষকে ধোঁকা দেয়। যেমন–

ক. একজন পথভ্রষ্ট লোক ছিল, যার নাম আবদুর রহমান। নামটা বড় উত্তম হলেও তার কাজ ছিল একেবারেই খারাপ। এই লোকটা একটা মতবাদ তৈরি করল এবং বলতে লাগল, ভাইয়ের জন্যে তার বোনকে বিবাহ করা জায়েয। সে তার এই দাবির দলিল হিসেবে একথা বলে যে, ভালো স্ত্রী তো সে হতে পারে, যে তার স্বামীর সব কিছু ভালোভাবে বোঝে। অথচ বোনের চেয়ে ভাইকে আর কে বেশি বোঝে? সুতরাং বোনকে বিবাহ করা জায়েয। তার বিবেক তাকে ধোঁকা দিয়েছে। কারণ, বোন হলো মাহরাম। যদি নিকটবর্তী কোনো মাহরামের ওপরও মানুষের কুদৃষ্টি পতিত হয়, তাহলে তো দুনিয়া থেকে লজ্জা-শরম একেবারেই উঠে যাবে।

খ. কোনো একটি রাষ্ট্রের পার্লামেন্টে সম্মিলিত করতালির মাধ্যমে একটি বিল পাশ করা হলো, পুরুষের সাথে পুরুষের বিবাহ বৈধ। দেখুন, বিবেক তাদের কেমন ধোঁকা দিয়েছে! বলার সময় তো তারা নিজেদের উন্নতির শীর্ষে অবস্থানকারী এবং বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণকারী বলে দাবি করে। অথচ তাদের বিবেক তাদের কত বড় ধোঁকাটা দিল যে, বিবেকহীন একটি বিল তারা পাশ করল। জানোয়াররাও তো এমন কাজ করে না। অথচ মানুষ হয়ে তারা আইনই করে ফেলল, পুরুষের সাথে পুরুষের বিবাহ বৈধ।

সুতরাং বোঝা গেল, পঞ্চইন্দ্রিয় বলি আর বিবেক বলি এসবই মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে।

আল্লাহর অহী ও ইল্‌ম অর্জন

আরো একটি ইল্‌ম রয়েছে, যাকে 'ইল্‌মে অহী' বলা হয়। এই ইল্‌ম মানুষ কলব দ্বারা অর্জন করে। এই অহীর ইল্‌ম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলবে আতহার তথা পবিত্র আত্মায় প্রবেশ করেছে, যাকে আল্লাহ্ এভাবে উপস্থাপন করেছেন–

نُزِّلَ عَلٰى قَلْبِكَ

'এই ইল্‌মে অহী আপনার অন্তরে নাযিল করা হয়েছে।'

এই অহীর মাধ্যমে যে ইল্‌ম হাসিল হয়, সেটিই সত্য ও নির্ভেজাল হয়। কারণ, সেটি হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। ইমাম বোখারি (রহ.) নিজের কিতাবও শুরু করেছেন অহী অবতীর্ণ হওয়ার শুরু অবস্থা বর্ণনা করার মাধ্যমে একথা বোঝানোর জন্যে, তোমরা যে-আহকামে শরীয়ত শিখতে এসেছ এটি সত্য। কারণ, এটি অহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছে।

অহী দু-ধরনের।

১. অহীয়ে মাতলু।

২. অহীয়ে গায়রে মাতলু।

প্রথম প্রকার অহী হলো, যা তেলাওয়াত করা হয়। অর্থাৎ– কুরআন শরীফ, যা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে নাযিল করেছেন আর তাঁর হাবীব উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা একে কিতাব বলি। এছাড়া আরো কিছু বিষয় আছে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে নাযিল করার পর তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছে বর্ণনা করেছেন, যেগুলোকে হাদীছ বলা হয়। এই হাদীছেরই আরেক নাম হলো 'অহীয়ে গায়রে মাতলু'।

যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল সম্পর্কে বলছেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوحٰى ۝

'নবী যা কিছুই বলছে না কেন, সেগুলো আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অহী পাওয়ার মাধ্যমেই বলছে।'[২৮]

এসব হাদীছের ইল্‌মও ওই ইল্‌ম, যা তিনি তাঁর হাবীবকে দান করেছেন। সুতরাং এতে কোনো ধরনের অলসতার সুযোগই নেই। এটি একদম সত্য ও সঠিক ইল্‌ম। এ-কারণেই ইমাম বোখারি (রহ.) একথা দ্বারা নিজের কিতাব আরম্ভ করেছেন, যাতে ছাত্রদের মনে একথা পোক্ত হয়ে যায়, আমি যে ইল্‌ম

---

২৮. সূরা নাজম : আয়াত ৩, ৪

শিখতে এসেছি, তা অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আর জীবন যাপনের জন্য এই ইল্‌মই শতভাগ সত্য ও সঠিক দিকনির্দেশনা করবে।

হাদীছের কিতাবে চিত্তাকর্ষক দিকসমূহ

১. যদি আমরা সিহাহ সিত্তাহ্ অধ্যয়ন করার মাধ্যমে বিভিন্ন ইমাম হাদীছ সম্পর্কে কী বলেন তা জানতে চাই, তাহলে আমরা এটি তিরমিযি শরীফ থেকে জানতে পারব।

২. আর যদি কোনো ইমামের দলিল জানতে চাই, তাহলে তা আবু দাউদ শরীফ থেকে জানতে পারব।

৩. আর যদি হাদীছ থেকে মাসআলা বের করার পদ্ধতি জানতে চাই, তাহলে বোখারি শরীফ থেকে জানতে পারব।

৪. আর যদি মনে করি, এই দলিলকে আরো মজবুত করার জন্য আর কোনো হাদীছ আছে কি, তাহলে মুসলিম শরীফ থেকে জানতে পারব।

৫. যদি দলিল হিসেবে ব্যবহার করা এই হাদীছের মধ্যে কোনো দুর্বলতা আছে কিনা জানতে চাই, তাহলে সেটা নাসাঈ শরীফ থেকে জানতে পারব।

৬. যদি কেউ চায়, গ্রন্থপ্রণেতার সাহায্য ছাড়া কোনো হাদীছের দুর্বলতা বের করবে, তাহলে তাকে ইবনে মাজাহ শরীফ থেকে সাহায্য নিতে হবে।

তাহলে বোঝা যায়, হাদীছের প্রতিটি কিতাবের স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কেমন যেন রব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইল্‌মকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দ্বারা রঙিন করেছেন। এখন কেউ যেভাবেই হাদীছের কিতাবগুলো অধ্যয়ন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা ওই বিষয়ের ইল্‌ম তাকে দান করবেন।

বোখারি সংকলনের বছর

শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)-এর মতানুযায়ী ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর উক্ত কিতাবের সংকলনের কাজ ২১৭ হিজরীতে আরম্ভ করে ২৩৩ হিজরীতে শেষ করেছেন।

নিয়তের সংশোধন

ইমাম বোখারি (রহ.) তাঁর কিতাবে সর্বপ্রথম যে-হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, তাতে কী বলা হয়েছে, এখন আমি সেই হাদীছটি তেলাওয়াত করছি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

'আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর যে যে-জিনিসের নিয়ত করবে, সে তা-ই পাবে।'

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا

'সুতরাং যেব্যক্তির হিজরত দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে হয়

أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

'অথবা যার হিজরত কোনো নারীকে পাওয়ার জন্যে হয়, তাহলে যার জন্য সে হিজরত করেছে, সে সেটাই পাবে।'

উক্ত হাদীছ শরীফের প্রতি একটু লক্ষ করলেই একথাগুলো বুঝে আসে–

ইমাম বোখারি (রহ.) উক্ত হাদীছটিকে এজন্যে প্রথমে এনেছেন যে, আমলের গ্রহণযোগ্যতা যেহেতু নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, তাই প্রথমেই নিয়তকে বিশুদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় তার আমলই সঠিক হবে না। উদাহরণস্বরূপ যেব্যক্তির শরীরে ওজন বেশি, সে কোনো একদিন পানাহার করল না, স্ত্রী সহবাসও করল না, এভাবে পুরা দিন কাটালেও সে রোযা রাখার ছাওয়াব পাবে না। কারণ, সে তো রোযার নিয়ত করেনি। তার উদ্দেশ্য হলো শরীরের ওজন কমানো। উক্ত আমলের মধ্যে নিয়তের এতটুকু প্রভাব যে, পানাহার ত্যাগ এবং স্ত্রী সহবাস থেকে দূরে থাকার পরও সে রোযার ছাওয়াব পেল না।

কোনো এক বুযুর্গকে তাঁর একছাত্র দু'আর জন্যে বাড়িতে দাওয়াত করল। বুযুর্গ ছাত্রের ঘর দেখেই প্রশ্ন করলেন, মিয়া! তুমি এটা কী বানালে? সে বলল, হুজুর! এখান দিয়ে আলো আসার জায়গা রাখা হয়েছে। তিনি বললেন, কেন বানালে? ছাত্র বলল, হুজুর! এজন্যে বানিয়েছি, যাতে ঘরে আলো-বাতাস আসতে পারে। তখন হযরত তাকে বুঝিয়ে বললেন, আপনি বললেন, এই ফাঁকটা আলো ও বাতাসের জন্যে বানিয়েছেন।

যদি আপনি এই উত্তর দিতেন যে, হুজুর! এটা বানিয়েছি, যাতে মসজিদ থেকে আযানের আওয়াজ আসে, তাহলে আপনার এই জানালা বানানোও ইবাদাত হয়ে যেত। আর আলো বাতাস তো এমনিতেই পাওয়া যেত। বোঝা গেল, সব কাজেই আগে নিয়তকে ঠিক করতে হবে।

নিয়ত শুদ্ধ করার মর্মকথা

আমাদের থেকে মাত্র স্বল্প সময় আগে একজন বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন সুলতানুল আরেফীন হযরত সুলতান বাহু। তিনি পাঞ্জাবি ভাষায় একটি আশ্চর্য কথা বলতেন,

جے ناتیاں دھوتیاں رب ملداتے ملدا کیاں مچھلیاں نوں

'যদি ধোওয়া আর গোসল করলেই খোদা পাওয়া যেত, তাহলে সবার আগে খোদাকে পেত মাছ। কারণ সে তো সবর্দা গোসল করতেই থাকে।'

جے ذکر کیتیاں رب ملداتے ملدا کال کڑچھیاں نوں

'একটা কালো পাখি যেটা উল্টে গাছের মধ্যে ঝুলে থাকে আর সারা রাত শুধু আওয়াজ করে, তো তিনি বলছেন, যদি যিকির করার দ্বারা খোদা পাওয়া যেত, তাহলে তো এই পাখিই সবার আগে খোদাকে পেত।'

جے سر منایا رب ملداتے ملدا بھیڑاں سسیاں نوں

'একধরনের ভেড়া রয়েছে যেগুলোর মাথায় ছোট-ছোট পশম থাকে। তিনি বলছেন, যদি মাথা ন্যাড়া করলে খোদাকে পাওয়া যেত, তাহলে প্রথমে ওই ভেড়া খোদাকে পেত।'

جے جتیاں ستیاں رب ملداتے ملدا داناں کھیاں نوں

'যদি অবিবাহিত থাকলেই খোদাকে পাওয়া যেত, তাহলে খাসি প্রাণীগুলোই খোদাকে পেত।'

সবশেষে তিনি বলছেন–

جے رب ملداتے ملدا نیتاں اچھیاں نوں

'যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলাকে পায়, তবে ভালো নিয়তের অধিকারীরা-ই পায়।'

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! একথা শতভাগ সত্য। সুতরাং আপনারা এখন থেকেই নিয়ত করুন, কেউ যদি আমার সাথে অন্যায় করে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আমরা আজ থেকে আর আল্লাহর কোনো বান্দার প্রতি জুলুম করব না। হাদীছ শরীফে এসেছে, যেব্যক্তি কারো অপরাধকে ক্ষমা করবে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার অপরাধসমূহ অতিদ্রুত ক্ষমা করে দেবেন। তাই আজ থেকে সব আমলকে আখেরাতের নিয়তে করব।

নিয়তের শরয়ী অবস্থান

উক্ত হাদীছ দ্বারা নিয়তের শরয়ী অবস্থানও পরিষ্কার হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ত সঠিক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইমামগণের মতামত হলো, নিয়ত না করলে কোনো আমলেই ছাওয়াব পাওয়া যাবে না।

কেউ-কেউ বলেছেন, আমলের বিশুদ্ধতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

আবার কেউ-কেউ বলেছেন, গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

ইমাম আবুহানিফা (রহ.) বলেন, আমলে ছাওয়াব পাওয়া না পাওয়া নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। নিয়ত না করলে আমল হয়ে যাবে, তবে ছাওয়াব পাওয়া যাবে না।

উদাহরণস্বরূপ কেউ কাউকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিল। এতে তার উজু হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো ছাওয়াব হয়নি। কারণ, সে তো উজুর নিয়ত করেনি। এভাবে কেউ গোসল করল; কিন্তু উজুর নিয়ত করল না, সেও ছাওয়াব পাবে না; অথচ তারও উজু হয়ে যাবে। তাই ইমাম সাহেব বলেন, ছাওয়াবের নির্ভরতা নিয়তের ওপর।

এখান থেকেই ইমামগণের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। যাঁরা বলেন, নিয়ত ব্যতীত আমল বিশুদ্ধই হয় না, তাঁরা মাসআলা এভাবে বলেন। আর যারা বলেন, আমল তো হয়ে গেছে; কিন্তু ছাওয়াব পাবে না, তাদের নিকটে মাসআলাটি বিরোধপূর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং বোঝা গেল, ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ কীভাবে দেখা দিল। কারণ, তারা একটি শব্দের ভাবার্থকে বিভিন্নভাবে নিয়েছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-কথাটির মর্ম আরো বেশি স্পষ্ট করেছেন। তিনি প্রথমে বলেছেন–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'

তারপর সামনে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বলছেন,

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

'আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই অপেক্ষা করছে, যার সে নিয়ত করেছে।'

তারপর সামনে বলছেন,

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا

'সুতরাং যেব্যক্তি হিজরত করল দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্যে, সে দুনিয়া পেল।'

উক্ত হাদীছের পটভূমি

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীছটি একটি বিশেষ স্থানে ইরশাদ করেছেন। সেই স্থানটি কী ছিল? একজন সাহাবি এক নারীকে বিবাহ করতে চাইলেন। তিনি যখন ওই নারীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন, প্রতিউত্তরে ওই নারী বললেন, আপনি হিজরত করলে আপনার সাথে আমার বিবাহ হতে পারে। আর যদি আপনি হিজরত না করেন, তাহলে আপনার সাথে আমার বিবাহ সম্ভব নয়। তাই ওই সাহাবি উক্ত নারীকে বিবাহ করার লক্ষ্যে হিজরত করলেন, যার নাম ছিল উম্মে কায়স। সেই হিসেবে ওই সাহাবি বাকি সকল সাহাবির মাঝে 'মুহাজেরে উম্মে কায়স' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

এই ঘটনাটা নবীজির নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করলেন। কিন্তু এতে গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয় হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু কারো নাম উল্লেখ করেননি। শুধু বলেছেন–

أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

'যেকোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করল, তার হিজরত ওই বস্তুর জন্য, যার জন্য সে হিজরত করেছে।

অর্থাৎ– তিনি এখানে কারো নাম উল্লেখ করা বতীত কথা বলেছেন।

একটি জ্ঞানভিত্তিক রহস্য

এখানে একটি ইল্‌মি রহস্য রয়েছে। সূরা ইউসুফে আছে, যখন যুলায়খা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করল এবং খারাপ কাজের প্রস্তাব দিল, তখন পবিত্র কুরআনে সেই ঘটনাটি এভাবে এসেছে–

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ

'এবং ওই নারী তাকে ফুঁসলিয়েছিল, যার ঘরে সে ছিল।'[২৯]

---

২৯. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৩

এখানে কিন্তু ওই নারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। অথচ যদি তার মনিব যুলায়খার নাম উল্লেখ করা হতো, যে তাকে ফুঁসলিয়েছে, তাহলে দুটি শব্দেই কথা পূর্ণ হয়ে যেত। আর কুরআনে কারীমের বাচবভঙ্গিও এমন যে, বাক্য সংক্ষিপ্ত; কিন্তু বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তথাপিও কুরআনে কারীম এখানে বাড়তি শব্দ উল্লেখ করেও কারো নাম উল্লেখ করেনি যে, মিশরের বাদশাহর স্ত্রী ইউসুফকে গুনাহের দাওয়াত দিয়েছে। নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, নির্দিষ্ট করে বললে সেটা গীবত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ্ নিজেই বান্দাদের গীবত থেকে সতর্ক করেছেন। তাহলে তিনি নিজে কেন এমন ভাষা ব্যবহার করবেন? তাই তিনি শব্দ বেশি ব্যবহার করে হলেও বিষয়টিকে একটু অস্পষ্ট রেখেছেন, যাতে বিষয়টি বুঝেও আসে আবার একটু আড়ালও বাকি থাকে। যেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ওই নারীর নাম উল্লেখ না করে তাকে অপমান করা থেকে বিরত ছিলেন। তার স্বামীকেও অপমান করেননি; বরং বিষয়টিকে একটু রহস্যের ভেতরে রেখেছেন।

ঠিক তেমনিভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও করেছেন। কথা তো ছিল উম্মে কায়স এবং তার স্বামীর ব্যাপারে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে কথাটিকে একটু রহস্যের ভেতরে রাখলেন। একেই বলা হয়–

تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ

'তোমরা আল্লাহ্র চরিত্রে চরিত্রবান হও।'

আমাদেরও এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যদি আমরা কারো ব্যাপারে কোনো কথা বলি, তাহলে এভাবে সংক্ষেপেই বলব। কারো নাম উল্লেখ করে কথা বলব না; বরং নিজেকে পরনিন্দা থেকে রক্ষা করব। সুতরাং তরবিয়াতের এই পদ্ধতিটিও পবিত্র হাদীছ দ্বারা জানা গেল।

তাসাওউফ-এর শুরু

এই হাদীছটি ইল্মে মারেফতের সূচনামাত্র। একদা একব্যক্তি হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেবের নিকটে গিয়ে বলল, তাসাওউফটা আবার কী জিনিস? সে কোথাও সফরে যাওয়ার প্রস্তুতিতে ছিল। তাই বলল, আমি সফরে যাচ্ছি। ফিরে এসে আপনার সাথে বিস্তারিত কথা হবে। হযরত তাকে বললেন, এখনই জবাবটা নিয়ে নিন।

তাসাওউফ-এর শুরু হলো–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

আর এর শেষ হলো–

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

এমনভাবে ইবাদাত করবে যে, তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন।

সে বলল, হযরত! আপনি তো দেখি, অনেক তাড়াতাড়ি মাসআলাটি সমাধান করে ফেললেন। বোখারি শরীফের শুরুর হাদীছও এটি আবার তাসাওউফের শুরুও এখান থেকে যে, প্রথমে নিজের নিয়তকে ঠিক করে নাও।

নববী হাদীছের ঝলক

কিছু কালাম এমন হয়, যেগুলোতে নূর থাকে। যেমন– আল্লাহপাকের কালাম। তাঁর এই কালামের মধ্যে এমন নূর বিদ্যমান যে, যেব্যক্তি এই কিতাব অধ্যয়ন করে, তার মধ্যে এক ধরনের নূর তৈরি হয়। তার ওপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হতে থাকে। তাই তো আল্লাহ্ নিজেই বলছেন–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

'আর যখন কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা চুপ থাকো এবং মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ কর, যাতে তোমাদের ওপর রহমত বর্ষিত হয়।'[৩০]

তাঁর এই পবিত্র কালাম নূরে ভরপুর আর এই নূর অন্তরে অনুভব করা যায়। হাদীছে উল্লেখ আছে–

تَبَرَّكُ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللهِ

'তোমরা কুরআন দ্বারা বরকত হাসিল করো। কারণ, এটা আল্লাহর কালাম।'

আল্লাহ্‌র কালামের মধ্যে যেমন নূর আছে, তেমনি তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কালামের মধ্যেও নূর রয়েছে। কারণ, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নূরানী মানুষ ছিলেন। আল্লাহর নবী ছিলেন

---

৩০. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৪

এবং তাঁর পক্ষ থেকে ইল্‌মে অহী প্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর কথাগুলো কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা ছিল।

আল্লাহ্ বলেন–

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

'যাতে আপনি মানুষদের বর্ণনা করেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।'[৩১]

সুতরাং রাসূলের কালামেও নূর বিদ্যমান। এ-কারণে রাসূলের হাদীছ অধ্যয়নেও নূর পাওয়া যায়। আমরা যে-ইল্‌ম অর্জন করার জন্যে এখানে বসে আছি, তার উদ্দেশ্যও এটিই, যাতে এই শব্দভান্ডার ও হরফসমূহের মাঝে যে-নূর লুকায়িত আছে, তার কিছু অংশ আমরাও প্রাপ্ত হই। তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য পুরা হবে। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) বলেন, ইল্‌ম এমন এক নূরের নাম, যা অর্জন করার পর সেই অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত অন্তরে প্রশান্তি বা স্থিরতা আসে না।

এর উদ্দেশ্য হলো, যদি আমরা হাদীছ শরীফকে আদবের সাথে, আগ্রহের সাথে এবং গভীর ভালোবাসার সাথে অধ্যয়ন করি, তাহলে এর শব্দ ও অক্ষরের ভেতরে যে নূর বিদ্যমান, তা আমাদের বক্ষে আসবে। আর এই নূরের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এর মর্ম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করবেন। সুতরাং প্রত্যেক ছাত্র ভাই চেষ্টা করবেন, যাতে আপনি এই দাওরায়ে হাদীছের বছরই আগ্রহ ও আদবের সাথে দরসে উপস্থিত থাকতে পারেন। কোনো সবক যেন বাদ না পড়ে এবং ওস্তাদের আদবের দিকেও লক্ষ রাখবেন। মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবেন, যাতে হাদীছে পাকের এই নূর আমাদের অন্তরেও আসতে পারে।

কথা অনুসরণ করে বক্তা পর্যন্ত পৌঁছা

একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, কথা দ্বারাই বক্তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ–

১. মির্জা গালিব এমন কবি ছিলেন যে, সর্বদা মানুষের ভালোবাসার কামনায় থাকতেন। তাই তাঁর লেখাগুলো পড়লে তাতে নারীর সৌন্দর্যের প্রাচুর্য পাওয়া যাবে।

---

৩১. সূরা নাহল : আয়াত ৪৪

২. আর মীরদর্দ একজন সূফি কবি ছিলেন। আপনি যদি তার লেখাগুলো পড়েন, তাতে আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসার গল্প পাবেন। যেমন–

جگ میں آکر ادھر ادھر دیکھا * تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا

'এদিক-সেদিক যেদিকেই আমি তাকাই শুধু তোমাকেই দেখতে পাই।'

جان سے ہو گئے بدن خالی * جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا

'তুমি যেদিক থেকেই দেখা দাও, আমার এই শরীরে তখন আর প্রাণ বাকি থাকে না।'

অন্য এক কবিতার মধ্যে তিনি বলছেন–

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی * حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

'তাঁর দেওয়া জীবন তো তাঁকে দেওয়া উচিত ছিল। এটাই হক ছিল। কিন্তু হক আদায় করা হয়নি।'

এই কবিতাগুলো দ্বারাই বুঝে আসে, এই বান্দার অন্তরে অবশ্যই আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা ছিল।

৩. আল্লামা ইকবাল (রহ.) একজন বিদ্রোহী কবি ছিলেন। তাই তার কবিতাগুলো পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন, সে চেয়েছিল, যাতে আমরা বিধর্মীদের থেকে মুক্তি পেয়ে যাই। আর এই উম্মত ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হয়ে যায়। যেমন–

کبھی اے نوجواں مسلم! تدبر بھی کیا تو نے؟
وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے اک ٹوٹا ہوا تارا

'হে মুসলিম যুবক! তুমি কি কখনো চিন্তা করেছ কোন ভাগ্যের কারণে আজ তুমি পতিত তারকা?'

تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں
کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا

'তোমাকে তো এই জাতি ভালোবাসার বন্ধনে লালনপালন করেছে, রাজত্বের মুকুটকে যারা পদতলে পিষ্ট করেছিল।'

تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی

تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارا

'তোমার সাথে তো এখন পূর্বপুরুষদের কোনো সম্পর্ক বাকি নেই। কারণ, তুমি এখন কথার বেলায় আছ আর তারা কাজ করে দেখিয়েছেন। তুমি এখন জমে আছ; অথচ তারা সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছেন।'

তার এই কবিতা দ্বারাই বুঝে আসে, যে তার মন-মানসিকতা বিদ্রোহে ভরা ছিল।

৪. বাদশাহ্ আলমগীরের এক মেয়ের নাম ছিল যিবুন্নিসা। সেও ফারসী ভাষায় কবিতা আবৃতি করত। সে তার ছদ্মনাম 'مخفی' (মাখফী) রেখেছিলেন। তার কাব্যগ্রন্থ دیوان مخفی অন্তর্লোকে ছিল। তিনি অনেক ভালো-ভালো কবিতা আবৃতি করতেন। ওই যুগে ইরানের এক রাজকন্যা একটি কবিতার একাংশ আবৃতি করল।

درِّ ابلق کسے کم دیدہ موجود

'সাদা-কালো মুক্তা কজন আর দেখেছে! কারণ, এর পরিমাণ অনেক কম হয়।'

এক ধরনের মুক্তাকে دراِبلق বলা হয়, যা সাদা ও মাটি কালার মিশ্রিত হয়ে থাকে। আবার তাতে একটু কালো বর্ণের লাইনও টানা থাকে। একে বলা হয় ابلق। তাই সে বলল, দুররে আবলাক কজনে দেখেছে? এর পরিমাণ খুবই কম হয়। প্রথম পঙ্‌ক্তিটি বানানোর পর তিনি আর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি আবৃতি করছেন না এবং ঘোষণা করলেন, যেব্যক্তি দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি আবৃতি করে দিতে পারবে, তাকে মোটা অংকের পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এই ঘোষণা পৌঁছতে-পৌঁছতে ইরান থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত চলে এল। এখানে কবিগণও বহু পরিশ্রম করলেন। কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। مخفی ও এই পঙ্‌ক্তিটির অনেক প্রসিদ্ধি শুনলেন। একদিন হঠাৎ এই পঙ্‌ক্তিটির দ্বিতীয় উক্তিটি তিনি আবৃত্তি করে দিলেন।

একদা তিনি গোসল করার পর চোখে সুরমা ব্যবহার করলেন। সুরমা ব্যবহার করলে অনেক সময় চোখে পানি চলে আসে। সুরমা ব্যবহার করার পর যখন আয়নায় চেহারা দেখলেন, তখন তার অশ্রুগুলো পলকের ওপর

ছিল আর তাতে সুরমার হালকা রেখা ছিল। তা দেখেই তিনি বুঝে ফেললেন, এটা তো দেখতে دراہلق (দুররে আবলাক)-এরই মতো। তৎক্ষণাত তিনি দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি আবৃতি করে কবিতাটিকে পূর্ণতা দান করলেন।

دراہلق کسے کم دیدہ موجود * مگر اشک بتان سرمہ آلود

'সাদা-কালোমিশ্রিত মুক্তা খুব কম জনেই দেখেছে, কিন্তু সুরমামিশ্রিত অশ্রু তো সেই মুক্তারই মতো দেখায়।'

তার এই পঙ্‌ক্তিটির কারণে উক্ত কবিতাটি এমন মজাদার হলো, মানুষ শুনে আশ্চর্য হয়ে যেত। তার এ উক্তি ওই রাজকন্যা পর্যন্ত পৌঁছলে পুরস্কার দেওয়ার জন্যে রাজকন্যা তাকে অন্দরমহলে ডেকে পাঠাল।

একথা যখন বাদশাহ্ আলমগীর পর্যন্ত পৌঁছে তিনি মেয়েকে বললেন, আদরের কন্যা! আমি না তোমাকে এই সব কবিতা বলতে নিষেধ করেছিলাম?

মখফী বলল, আব্বাজান! আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমার আরো দুটি কবিতা তার কাছে পাঠিয়ে দিন; তাহলেই সে বুঝে যাবে, আমি কে? তাই সে কবিতা আবৃত্তি করল–

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل

ہر کہ خواہد میل دارد در سخن خواہد مرا

'আমি আমার কথার মাঝে এমনভাবে লুকায়িত যেমন ফুলের মাঝে ঘ্রাণ। যে আমার সাক্ষাৎ পেতে চায়, সে যেন আমার কবিতা অধ্যয়ন করে। কবিতা অধ্যয়ন দ্বারাই আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে।'

এই কবিতাগুলো পাঠানোর ফলে সব আশঙ্কা শেষ হয়ে গেল।

এখানে বলার কথা তো এটিই যে, তার মতো একজন নারী যদি বলতে পারে, আমর কথার মধ্যেই আমার সাক্ষাৎ লুকায়িত, তাহলে আমরা দাওরায়ে হাদীছের ছাত্ররাও যারা হাদীছে পাক অধ্যয়ন করছি, এই কালামের মাধ্যমে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী সাক্ষাৎ আশা করতে পারি।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! শব্দ নিয়ে পড়ে থাকলেই হবে না। আমাদেরকে আরো অনেক সামনে যেতে হবে। কথা দ্বারা তার কথক পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছতে হবে। তাই মজার কথা তো হলো, হাদীছে পাকের এই বছরই

আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায় সিক্ত হই এবং তাঁর সুন্নতের এমন অনুসারী হয়ে যাই যে, সর্বদা তাঁর মহব্বতেই ডুবে থাকি। তাহলেই হাদীছ পড়ার প্রকৃত স্বাদ আমরা উপভোগ করতে পারব।

এজন্যে কোনো-কোনো বুযুর্গ বলে থাকেন, যেব্যক্তি ইখলাছের সাথে দাওরায়ে হাদীছ জামাতে অধ্যয়ন করবে, পুরা বছরে বহুবার স্বপ্নযোগে সে অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। বরং এই অধম তো এমন অনেক ছাত্র ভাইকে দেখেছে, যাদের সাথে অধমের বায়'আতের সম্পর্ক। তারা এসে অবস্থা বর্ণনা করেন, প্রতি মাসে তাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেয়ারত নসিব হয়। অনেক সৌভাগ্যবান এমনও আছেন, যাদের প্রতি সপ্তাহে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে।

সুতরাং যে-ছাত্র প্রবল আগ্রহ, ভালোবাসা ও ইখলাছের সাথে হাদীছ অধ্যয়ন করবে, সে অবশ্যই একথাগুলো দ্বারা কথক পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। তাই সারা বছর এই দু'আ অবশ্যই করবেন যে, আমাদেরও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এমন আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠুক, এটাই তো মূল উদ্দেশ্য। প্রথমত এই হাদীছে পাকের নূর অর্জন করতে হবে। তারপর তার কথক পর্যন্তও আমাদের পৌঁছতে হবে, যাতে তাঁর সাথে আত্মার একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

নববী দরবারে হাদীছ অধ্যয়নের মূল্যায়ন

হযরত শাহ্ ওলী উল্লাহ্ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) বলেন, আমি যখন হজে যাই, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা মোবারকে সালাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে গিয়ে দেখি, সেখানে হাদীছের যেকোনো ছাত্র সালাম পেশ করতে আসছে, সাথে-সাথে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কল্‌ব থেকে সূর্যের আলোর ন্যায় একটি আলো বিচ্ছুরিত হয়ে তার অন্তরকে আলোকিত করে দিচ্ছে।

সুতরাং হে আমার ভাইয়েরা! হাদীছের ছাত্রদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত থাকে। তাই আপনারা সকলে এ-বছরটা অনেক গুরুত্বসহকারে বিভিন্ন মাসনূন দু'আ পাঠ করবেন। সব কাজে সুন্নতের অনুসরণের প্রতি লক্ষ রাখবেন এবং সর্বদা খোদাভীতির সাথে চলবেন। তারপর যখন আপনি হাদীছে পাক অধ্যয়ন করবেন, তখনই এর নূর অনুভব করতে পারবেন। আর

এই নূরের বরকতে কথক পর্যন্ত আপনার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা কতই-না দয়াবান! তিনি আমাদেরকে তার প্রিয়তমের সেই নির্ভেজাল মহব্বত দান করুন। আমীন।

کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا * گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں

'আমরা তো ভাই! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আল্লাহ্ মহান ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলে আমাদেরও তাঁর ভালোবাসায় সিক্ত করতে পারেন।

নূরানী চেহারা

হাদীছ অধ্যয়নকারীগণ প্রতিদিনই হাদীছের নূর প্রাপ্ত হন, যা তাদের চেহারায় দৃশ্যমান হয়। শান্তির নীড় দারুল উলূম দেওবন্দ-এ যখন হাদীছের দরস হয়, তারপর ছাত্ররা দরস শেষ করে বের হন, তখন তাদের চেহারায় এমন নূর থাকে যে, যারাই দেখবে তারাই ভাববে, মনে হয় এই ব্যক্তি রমাযানুল মোবারকে ইতিকাফ পালন করে মসজিদ থেকে নূরানী চেহারা নিয়ে বের হচ্ছে। আল্লাহু আকবার! আমরাও যদি রুচি ও আগ্রহের সাথে হাদীছ অধ্যয়ন করি, তাহলে আমরাও নূরানী চেহারা নিয়ে বের হতে পারব। এই নূর আমাদেরকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

নূর অর্জন করার জন্য মাসনূন দু'আসমূহ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَعَظِّمْ لِي نُورًا

'হে আল্লাহ্! আমার অন্তরকে নূরানী করে দিন। আমার চক্ষুকে নূরানী করে দিন। আমার কানকে নূরানী করে দিন। আমার ডানে -বামে, সামনে-পেছনে নূর দান করুন। আপনি আমাকে অনেক বড় নূর দান করেন।

এই নূর অর্জন করা অত্যাবশ্যকীয় কেন?

বাস্তব সত্য কথা এই যে, এই নূর যখন কারো মধ্যে আসবে, তার কাছে দীনের কাজ করতে মজা লাগবে। এ-কারণেই আল্লাহ্ কুরআনে কারীমের এক জায়গায় ইরশাদ করেন–

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ

'আমি ওই মৃত (অন্তর বিশিষ্ট্য) ব্যক্তিকে জীবিত করে যখন তাকে নূর দান করলাম, সে ওই নূর নিয়ে মানুষদের মাঝে দীনের কাজ করতে লাগল।'[৩২]

ভাইয়েরা আমার! যদি আমাদের অন্তরে আল্লাহ্প্রদত্ব এই নূরই না থাকে, তাহলে আমার এই নূরবিহীন কথাবার্তা মানুষদের মাঝে কী প্রভাব ফেলবে? কেন আজ এই অভিযোগ করা হয়, মানুষ আমাদের কথা শোনে না? মানুষ নূরহীন এসব কথা শুনবে কেন? এজন্যেই এটাই সেই নূরে এলাহী অর্জন করার সময় আপনাদের।

কুদরতের সেই নূর অর্জনে সবচেয়ে বড় বাধা

আর নূরে ইলাহীর মতো এই মহান নেয়ামত প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো গুনাহ্। কেননা,

فَإِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِّنْ إِلٰهِي * وَنُوْرُ اللهِ لَا يُعْطٰى لِعَاصِيْ

'ইল্ম আল্লাহ্র নূর, আর তাঁর এই নূর কোনো গুনাহ্গার তথা অপরাধীকে দেওয়া হয় না।'

দাওরায়ে হাদীছের ছাত্র ভাইদের অবশ্যই চিন্তাশীল হতে হবে যে, আট-নয় বছর পর্যন্ত এই বিছানায় বসতে-বসতে শরীরে দাগ ফেলে দিলাম; কিন্তু ইল্মের এই নূর যদি আমার ভেতরে সৃষ্টি না হয়, তাহলে আমাদের এই বসা কী কাজে এল? আপনারা গ্রামের গরু-মহিষকে দেখবেন, এগুলো জমিনে বসতে-বসতে তাদের হাঁটুতে এক ধরনের দাগ সৃষ্টি হয়। আমাদেরও যদি বসতে-বসতে শুধু দাগই পড়ল, তাহলে ব্যবধান কোথায়?

মূলকথা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে এই ইল্মের নূর দ্বারা সৌভাগ্যবান করুন। তবে এর জন্যে প্রথমে আমাদেরকে গুনাহ্ ত্যাগ করতে হবে, তাওবা করতে হবে, ইখলাছ ও ইত্তেবায়ে সুন্নাতের সাথে এই বছরটি কাটাতে হবে, যাতে তিনি আমাদের অন্তরকে দ্বীনি বুঝ দ্বারা আলোকিত করে দেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলের প্রতি তাঁর খাছ রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদের জন্যে হাদীছে পাকের এই দরসকে সহজ করে দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

---

৩২. সূরা আন'আম : আয়াত ১২২

বায়তুল্লাহ্‌র মহত্ত্ব

'বায়তুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র ঘর খানায়ে কাবা যতবার দেখা হয়, ততবারই আলাদা স্বাদ আস্বাদন করা যায়। এই ঘরকে যতবারই দেখুক না কেন, কখনো মানুষের অন্তর জুড়াবে না। বরং একবার দেখলে দ্বিতীয়বার দেখার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়।

آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے

دیدۂ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے

যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরচক্ষু দান করেছেন, গভীর দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, তারা যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে দৃষ্টি দেন, তখন তারা বাস্তব নূরের ঝলক অবলোকন করতে পারেন। তখন তাদের কাছে বায়তুল্লাহ্‌র রূপ-লাবণ্য প্রকাশ পেয়ে যায়।'

বায়তুল্লাহর মহত্ত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۶﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ
اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

পৃথিবীর সূচনা

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ

'নিঃসন্দেহে সেই প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্যে বানানো হয়েছে সেটি ছিল 'বাক্কা'য়।[৩৩]

বায়তুল্লাহ্ শরীফের একটি নাম হলো 'বাক্কা' আর উক্ত শহরের নাম হলো 'মক্কা'।

হাদীছে পাকে উল্লেখ আছে, পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে সব জায়গা শুধু পানি আর পানি ছিল। এর কোনো এক জায়গা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি করলেন আর সেটা বাড়তে-বাড়তে পৃথিবীর আকৃতি ধারণ করল। যেখানে সেই ভূখণ্ড সৃষ্টি হয়েছিল তাকে পৃথিবীর শুরু বলা হয়। সেখানে তিনি তাঁর ঘর নির্মাণ করলেন, যাকে 'বায়তুল্লাহ্' বলা হয়।

---

৩৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৭

বায়তুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণ

বায়তুল্লাহ্ শরীফকে ছয়বার তার ভিত্তির ওপর নির্মাণ করা হয়েছে।

১. সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস সালামের জন্মেরও আগে আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন।

২. দ্বিতীয়বার হযরত আদম আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেছেন।

৩. তৃতীয়বার হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেছেন, যার আলোচনা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ আছে।

৪. চতুর্থ নির্মাণ ছিল আরবের 'কুরাইশ' বংশের, যাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাজরে আসওয়াদ'কে স্বস্থানে স্থাপন করেছেন।

৫. পঞ্চম নির্মাণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) করেছেন এবং নির্মাণ করার সময় মক্কার কুরাইশরা যে 'হাতীমে কাবা'কে ছেড়ে দিয়েছিল, হযরত ইবনে যুবায়ের (রাযি.) সেটিকেও নির্মাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

৬. তারপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাঁর শাসনামলে পুনরায় কাবা শরীফ নির্মাণ করেন এবং 'হাতীম'কে কুরাইশদের মতোই বাইরে রেখে দেন।

তারপর তৎকালীন সময়ের সকল ফুকাহায়ে কেরাম এইমর্মে ফাতওয়া প্রদান করেন, ভবিষ্যতে আর কেউ খানায়ে কাবাকে এই ভিত্তি থেকে বিচ্ছুৎ করতে পারবে না। কারণ, এমন হতে থাকলে বায়তুল্লাহ্ শরীফ রাজা-বাদশাহদের হাতের পুতুলে পরিণত হবে। তাই বর্তমানেও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ভিত্তিই বিদ্যমান।

বায়তুল্লাহ্'র নামকরণ

এই ঘরকে 'বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহর ঘর বলা হয়। এর মূল কারণ হলো, এই ঘরেই আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার ঝলকসমূহ নিপতিত হয়। এভাবে বোঝেন যে, নূরের একটি নালা বা ড্রেন রয়েছে, যা আরশের ওপর থেকে বর্ষিত হচ্ছে এবং সেই জায়গা পর্যন্ত আসছে। এই নালা বা ড্রেন উর্ধ্বজগতের যেস্থান দিয়ে অতিক্রম করেছে, তাকে 'বায়তুল মা'মূর' বলা হয়। আর এই নালা বা ড্রেনই যখন সেখান থেকে এসে জমিনের এই ভূখণ্ডে পতিত হলো, তখন তার নাম রেখে দেওয়া হলো 'বায়তুল্লাহ্'। আমরা এই বায়তুল্লাহ্'র চতুর্দিকে তাওয়াফ করি আর ফেরেশতাগণ 'বায়তুল মা'মূর'-এর চতুর্দিকে তাওয়াফ করেন। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার সেই তাজাল্লি বা নূরের

ঝলক লক্ষ করেই সেজদা করি। অন্যথায় এই ঘর তো হলো ইটের তৈরীমাত্র, যাতে দিক ঠিক হয়ে যায় আর আমরা সেদিকে মনোনিবেশ করি।

আমরা তো ওই ইট আর পাথরকে সেজদা করি না; বরং এগুলোর ওপর নূরের যে-ঝলক পড়ছে, সেগুলোকে লক্ষ করেই সেজদা করি। ঝলকের পরিবর্তে ছায়া বা আকৃতি দ্বারা বুঝলে আরো সহজ হবে। কোনো ব্যক্তি যখন পানির সামনে দাঁড়ানো থাকে, তখন তার একটা আকৃতি পানিতে দৃশ্যমান থাকে।

এবার বুঝুন। সেখানে (কাবাঘরে) আল্লাহ্ তা'আলার একটি আকৃতি অনুভূত হয়। এখন আসল বস্তু যদি সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, তাহলে তার আকৃতিও সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার রূপের ব্যাপারে কী বলার আছে? সেখানে যেহেতু তাঁর জাতের তাজাল্লি বা ঝলক পতিত হয়, তাই সকলের কাছেই বায়তুল্লাহর দর্শন উপভোগ্য মনে হয়।

চক্ষুধারী তোমার যৌবনের তামাশা দেখছে

ওলামায়ে কেরাম বলেন, কিছু জিনিস এমন রয়েছে, যার থেকে কখনো মানুষের দৃষ্টি সরানো যায় না।

১. আসমানের দিকে যখন দেখবেন, ওই নীল আকাশ, ওই তারকারাজির ঝলকানি, ওই মেঘমালার হেলেদুলে চলা সারা জীবন দেখলেও আপনার তৃপ্তি মিটবে না। প্রতিদিন নতুন-নতুন মজা আর স্বাদ অনুভব করা যায়।

২. পানি পান করা। বয়স শত বছর হলেও কিন্তু পিপাসা হয় এবং প্রতিদিনই পানি পান করতে ভালো লাগে। দুনিয়ার কোনো মানুষকে আপনি এমন পাবেন না, যে বলবে, পানি পান করতে-করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

৩. বায়তুল্লাহ্ শরীফের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। যতবারই দেখবেন, প্রতিবার দেখার মজাই আলাদা। এর দিকে তাকালে কখনো মানুষের মন তৃপ্ত হয় না; বরং মানুষ বলে, একবার দেখেছি; আরো দেখার আশা রাখি।

آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے * دیدۂ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے

যাদেরকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন অন্তরচক্ষু দান করেছেন, দৃষ্টির গভীরতা দান করেছেন, তারা যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে তাকায়, তখন তারা কুদরতের বাস্তব ঝলক দেখতে পায়। এর রূপ-লাবণ্য তখন তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে যায়।

মূল ও মধ্য ভূমণ্ডল

বায়তুল্লাহ্ শরীফ পৃথিবীর প্রথম ভূমি এবং পৃথিবীর মূল ভূমি। কারণ, জমিন হলো মাটির আর মাটিই হলো আমাদের মূল। এমনিভাবে বায়তুল্লাহ্ শরীফ পৃথিবীর মাঝখানও।

হযরত মাওলানা কারী তাইয়্যেব সাহেব (রহ.) লিখেন, যদি কেউ পৃথিবীর ইশ্কাকে সামনে রাখে, তাহলে বায়তুল্লাহ্ শরীফকে পৃথিবীর মাঝখানে দেখতে পাবে। আর যদি ভৌগোলিক দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে পুরা আরব ভূখণ্ডকে তিন দিক থেকে পানিতে ঘেরা দেখতে পাবে এবং আরেক দিক থেকে জমিনের সাথে সংযুক্ত দেখতে পাবে। যেমন– মানুষের শরীরের মধ্যে তার অন্তর ওপরের দিক থেকে সংযুক্ত এবং নিচের দিকে ঝোলানো থাকে। আপনি যখনই এই আরব ভূখণ্ডের দিকে গভীর দৃষ্টি দেবেন, তখনই দেখতে পাবেন, পৃথিবীর মাঝে আরব ভূখণ্ডটিও ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে কলবের অবস্থানের মতোই।

বায়তুল্লাহর প্রতি স্থায়ী আকর্ষণ

ছোট কিংবা বড়, সব বান্দার অন্তরেই বায়তুল্লাহ্ শরীফ দর্শনের আগ্রহ থাকে। আপনি ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত যাকেই জিজ্ঞেস করবেন তার মধ্যেই এই ঘরটি দেখার আগ্রহ খুঁজে পাবেন। সে বলবে, আমিও আল্লাহর ঘর দেখতে চাই। এমন লোকও দুনিয়াতে আছে, যারা নিজের ঘরের আসবাবপত্র বিক্রি করেও এই ঘরটি দেখার জন্যে সফর করছে। বোঝা গেল, আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘরের ভিত্তির মাঝেই এমন কোনো আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন।

মেঘের ছায়া থেকেই হারাম শরীফের সীমানা নির্ধরণ করা হয়েছে

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক খণ্ড মেঘ এসে তার ওপর ছেয়ে গেল। তারপর তিনি ইরশাদ করলেন– 'হে আমার প্রিয় ইবরাহীম! যতটুকু জায়গা পর্যন্ত আসমানের এই মেঘের ছায়া বিস্তৃত, ততটুকু পর্যন্তই আমি হারামের সীমানা করে দিলাম। অর্থাৎ– এই জমিনকেও সম্মানিত করে দিলাম। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সেই জায়গায় চিহ্ন দিলেন আর তাকেই বর্তমানে হারামের সীমানা ধরা হয়।

এটি এমন একটি জায়গা, যেখানে সব নবী-ই এসে তাওয়াফ করেছেন। এ-কারণেই সকলের অন্তর সেদিকে ধাবিত হয়।

হজের ঘোষণা

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বললেন,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا

'হে ইবরাহীম! আপনি মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা করুন।'[৩৪]

তিনি বললেন, হে মাবূদ! আমার আওয়াজ তো সব মানুষের কানে পৌঁছবে না।

আল্লাহ্ বললেন, প্রিয় ইবরাহীম! আপনার কাজ আওয়াজ দেওয়া আর সেই আওয়াজ সকলের কান পর্যন্ত পৌঁছানো আমার কাজ। সুতরাং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হজের ঘোষণা দিলেন আর আল্লাহ্ তা'আলা এই আওয়াজকে রূহজগতের প্রতিটি রূহের কানে পৌঁছিয়ে দিলেন। যে-রূহ যতবার এর জবাবে 'লাব্বাইক' বলেছে, তার ততবার হজ নসিব হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দু'আ

এই ঘর নির্মাণ করার পর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দু'আ করলেন–

'রব্বুল আলামীন! আমি তো এই ঘরকে নির্মাণ করলাম। এখন আপনি এই ঘরকে জনবহুল করার জন্যে কোনো মহান ব্যক্তিত্বকে পাঠিয়ে দেন।

দু'আ করেছেন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্।

আমীন বলেছেন হযরত ইসমাইল যবীহুল্লাহ্।

দু'আ চাওয়ার স্থানের নাম বায়তুল্লাহ্।

যাঁর কাছে দু'আ করেছেন, সেই সত্তার নাম আল্লাহ্।

যে-মহান ব্যক্তিত্ব এই দু'আর উদ্দেশ্য ছিলেন, তাঁর নাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তারপর নবী কারীম আগমন করে এই স্থানকে জনবহুল করলেন। সুবহানাল্লাহ্!

---

৩৪. সূরা হজ : আয়াত ২৭

হেদায়াতের কেন্দ্র

এই ঘরকে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত দুনিয়াবাসীর পথপ্রদর্শনের কেন্দ্র বানিয়ে দিলেন।

তিনটি জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এক. রাসূলুল্লাহ্।

দুই. কালামুল্লাহ্।

তিন. বায়তুল্লাহ্।

এবার দেখুন, এই তিনটি স্থানকে আল্লাহ্ তা'আলা কী-কী নাম দ্বারা ভূষিত করেছেন।

এক. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তিনি বলেন, رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (রাহমাতুল্লিল আলামীন)।

দুই. কালামুল্লাহ্র ব্যাপারে তিনি বলেন, ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ (যিকরা লিল আলামীন)

তিন. বায়তুল্লাহ্ শরীফের ব্যাপারে তিনি ইরশাদ করেন هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ (হুদান লিল আলামীন)।

সুতরাং বোঝা গেল, বায়তুল্লাহ্ হলো সমস্ত দুনিয়ার জন্যে হেদায়াতের কেন্দ্র। এখান থেকেই হেদায়াত পাওয়া যায়; বরং এই জায়গাই হলো আমাদের আত্মার অবস্থানের জায়গা।

তিনি ইরশাদ করেন–

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ

এ-কারণেই কেয়ামতের নিদর্শনসমূহ থেকে এটিও একটি নিদর্শন যে, বায়তুল্লাহ্কে ধসিয়ে দেওয়া হবে আর আল্লাহ্ তা'আলা জমিনের এই বিছানাকে সমান করে ফেলবেন।[৩৫]

ওগো মাবূদ! শোকর কেবল তোমারই!

হাজী সাহেবগণ যখন হজের উদ্দেশ্যে নিজঘর থেকে বের হন, তখন কেমন যেন তিনি আল্লাহ্র মহব্বত আর ভালোবাসার সফর আরম্ভ করলেন। এটা তাঁর কতই-না দয়া যে, আমাদের মতো অক্ষম আর সম্বলহীনদেরও

---

৩৫. সূরা মায়েদা : আয়াত ৯৭

এমন পবিত্র স্থানে হাজিরা দেওয়ার তাওফীক দান করলেন। যদি নিজ যোগ্যতার ভিত্তিতে আচরণ করতেন, তাহলে তো আমাদেরকে নিজঘরেই বসে থাকতে হতো। এটা আল্লাহ্‌র বড়ই দয়া যে, তিনি কারো যোগ্যতা দেখেন না; বরং কবুলিয়্যাত তথা গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী আচরণ করেন। যদি আচরণের ক্ষেত্রে তিনিও যোগ্যতা দেখতেন, তাহলে আমাদের থেকে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক লোক রয়েছে। মালসম্পদ, বংশ পরিচয়, শিক্ষা-দীক্ষায় তারা আমাদের থেকে অনেক উন্নত। আরো কত গুণে গুণান্বিত তার কোনো হিসাবই নেই। তথাপিও রব্বুল আলামীন আমাদের মতো অনুপযুক্তদের জন্যেও এখানে আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

شکر ہے تیرا خدایا ! میں تو اس قابل نہ تھا

تو نے اپنا گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'ওহে মাবূদ! সকল প্রশংসা আপনার। কারণ, আমি তো এর (খানায়ে কাবা যেয়ারতের) যোগ্য ছিলাম না। তথাপি আপনি আপনার ঘরে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا

جام زم زم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'যমযমের পানি পান করিয়ে দীর্ঘ দিনের পিপাসা আপনি মিটিয়ে দিয়েছেন। আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

ڈال دی ٹھنڈک مرے سینے میں تو نے ساقیا

اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'ওহে প্রেমাস্পদ! আপনার সিনার সাথে লাগিয়ে আমার সিনাকে ঠান্ডা করে দিয়েছেন। আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

بارگاہ سید الکونین میں جا کر نفیس

سوچتا ہوں کیسے آیا! میں تو اس قابل نہ تھا

'সায়্যিদুল কাওনাইন তথা দোজাহানের বাদশাহর দরবারে গিয়ে আমি ভাবছি, এখানে কীভাবে এলাম! আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

تیری رحمت، تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب
گنبد خضری کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا

‘ আপনার দয়া আর মেহেরবানিতে অধমের সবুজ গম্বুজের যেয়ারত নসিব হয়েছে। অন্যথায় আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।

আমরা তো বাস্তবেই এর যোগ্য ছিলাম না। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ করলেন এবং আমাদেরকে এই পবিত্র স্থানে সফর করার তাওফীক দান করেছেন।

মহব্বত আর ভালোবাসার পাগলামি

হজের এই সফর আল্লাহ্র রহমত ও বরকত নাযিল হওয়ার সফর। তাঁর রহমতকে নিজের সাথে জড়িয়ে নেওয়ার সফর। আল্লাহ্ তা‘আলা এই সফরের ব্যাপারে বলে দিয়েছেন, চাকচিক্য আর সৌন্দর্যকে পরিত্যাগ করে দুটি চদর মুড়ি দিয়ে আমার ঘরের দিকে আস; যেমন প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে পাওয়ার লক্ষ্যে ঘোরাফেরা করে। আরো বলেছেন, তোমরা এমনভাবে আওয়াজ তোল যেমন প্রেমিকের দল তুলে থাকে। কীসের আওয়াজ তুলবে? বললেন,

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

ওপরে উঠলেও তালবিয়া বলো।

নিচে নামলেও তালবিয়া বলো।

কারো সাথে সাক্ষাৎ করবে তখনও তালবিয়া বলো।

সুবহানাল্লাহ্! এলোমেলো চুল, পুরোপুরি পাগলামির অবস্থায় আল্লাহর ভালোবাসায় সবাই ছুটে চলছে। কি পুরুষ কি নারী, সবাই তাঁর ঘরের দিকে ছুটছে। এক সাথে তাওয়াফ করছে। পুরুষ তার পুরুষত্ব ভুলে, নারী তার নারিত্ব ভুলে সবাই খোদার দরবারে ক্রন্দন করছে। এটা এমন জায়গা যে, সবাই নিজ-নিজ চিন্তায় মগ্ন। পুরুষও কাঁদছে , নারীও কাঁদছে, সবাই শুধু কাঁদছে। কেন? কারণ, তারা আল্লাহ্র রহমত জড়িয়ে আছে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো, এই সফর থেকে যত বেশি উপকার গ্রহণ করা যায় সেই চেষ্টায় রত থাকা এবং রব্বুল আলামীনের দরবারে নিজেদের কৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

আরাফার দিন

এই দিনকে وقوف عرفة তথা আরাফায় অবস্থানের দিন বলা হয়। এটি একটি বিশেষ দিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে, হজ কী জিনিস?

উত্তরে তিনি বলেছেন, হজ হচ্ছে আরাফায় অবস্থানের নাম।

জিলহজ মাসের ৯ তারিখ যোহর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করাকে وقوف عرفة (উকূফে আরাফাহ্) বলা হয়। এটাই হজ আর এটাই হজের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ আমল। এই সময়ের অনেক তাৎপর্য রয়েছে। যে এই সময় সঠিকভাবে কাজে লাগাল সে-ই সফল।

ইবলিসের অপমানিত হওয়ার দিন

বিষয়টি এভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন। আমরা এখন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত করছি। জীবনে এর চেয়ে দামি সময় আর হতে পারে না। وقوف عرفة এর মুহূর্তটি হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান একটি সময়।

নবী কারীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'আমি বদর যুদ্ধের দিন আর আরাফাহর দিন শয়তানকে যে-পরিমাণ অপমানিত-অপদস্থ হতে দেখেছি, অন্য কোনো দিন এ-পরিমাণ অপমানিত-অপদস্থ হতে দেখিনি।'

বোঝা গেল, এই দিনে শয়তান অনেক অপমানিত হয়। সে বলতে থাকে, হায়! আমার সারা বছরের সকল প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ হয়ে গেল।

আল্লাহ্‌র রহমতের সাগর হলো কূলহীন

এদিন আল্লাহ্ তা'আলার রহমত পূর্ণ যৌবন অবস্থায় জোশ মারতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ বান্দাদের প্রতি খুবই দয়া প্রদর্শন করেন। কারণ, তাঁর বান্দাগণ দূরদূরান্ত থেকে সফর করে এসে থাকে। নারী-পুরুষ সকলে তাঁর দরবারে দু'আয় মগ্ন থাকে। দুনিয়ার পাগলরাও সেদিন মেহমানদের সম্মান করে। আর সবচেয়ে বেশি ইজ্জত ও সম্মানদাতা তো হলেন রব্বুল আলামীন। তিনিও আগত মেহমানদের সম্মান করেন। আর মেহমান যা-ই চায়, তাকে তার চাওয়া সব কিছুই সেদিন তিনি দান করেন। চাইতে ঘাটতি থাকলেও তিনি দান করতে কার্পণ্য করেন না। তাঁর রহমতের ভান্ডার এত প্রশস্ত যে, তিনি দিতে পারলেই বরং খুশি হন

লক্ষ করুন। আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম রয়েছে। প্রতিটি নাম তাঁর কোনো-না-কোনো গুণ বোঝায়। কিন্তু তাঁর রহমত গুণটি বোঝানোর জন্যে দুটি নাম রয়েছে। এক হলো 'রহমান' আরেকটি 'রহীম'। কতই-না মজার মতো বিষয় যে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রতিটি গুণের জন্যে একটি করে নাম থাকে আর রহমত গুণের জন্যে দুটি নাম। তিনি এতই দয়াময়! এতই করুণাময়!

তিনি ইরশাদ করেন–

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

'আমার বান্দাদের বলে দিন, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল এবং আমিই বড়ই দয়াবান।'[৩৬]

এর উদাহরণ এভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন। যদি কোনো দানশীল ব্যক্তি কাউকে বলে, ঘোষণা করে দাও, আমি বড় দানশীল, তাহলে এর উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য হলো, হে অনাথ লোকেরা! তোমাদের যা কিছুর প্রয়োজন নিয়ে নাও। আমি কাউকে ফিরিয়ে দেব না। সুতরাং আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নিজেই যখন বলছেন, আমার বান্দাদের ঘোষণা করে দিন, আমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। এর উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই এটি যে, তিনি চান তাঁর বান্দারাও তাঁর কাছ থেকে রহমতের অংশ চেয়ে নেয় এবং নিজ-নিজ অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এখানে আসার উদ্দেশ্যও হলো এটিই যে, আমি পেছনে যত অপরাধ করেছি, সবগুলো থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইব এবং ভবিষ্যতে খোদাভীতি ও পবিত্রতার সাথে জীবন যাপনের অঙ্গীকার করব। যেব্যক্তি উক্ত বিষয়টি বুঝে মহান প্রভুর কাছ ক্ষমা চেয়ে নিল, সে-ই জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হলো। এজন্যেই বলছি, আজ এই দিনটি হলো তাঁর কাছে চাওয়ার দিন।

হজের আমলসমূহের ওপর গুনাহ্মাফির অঙ্গীকার

হজের আমলসমূহের মাধ্যমে হাজী সাহেবগণ অনেক ছাওয়াব প্রাপ্ত হন। কোনো এক হাদীছে উল্লেখ আছে, 'যখন কোনো হজ পালনকারী শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে, তখন প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের বিনিময়ে তার এমন বড়-

৩৬. সূরা হিজ্‌র : আয়াত ৪৯

বড় অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদি ওই গুনাহ্গুলো ক্ষমা করা না হতো, তাহলে তাকে নিশ্চিত জাহান্নামে যেতে হতো।'

একটু চিন্তা করুন। যে-হজ করার কারণে কত বড়-বড় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার এই বিশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত হবেন না এবং আজ এই সময়ে তাঁর কাছে বেশি-বেশি চাইতে থাকুন। কারণ, তিনি দান করতে পারলেই খুশি হন। দুনিয়াদারদের কাছে একবারের বেশি কোনো কিছু কামনা করলে তারা নারাজ হয়ে যান, কিন্তু আমার প্রভুর নিকটে এক-দুই কিংবা তিন-চার; তার থেকেও অধিক পরিমাণ চাইতে থাকলেও তিনি খুশি হন। বরং যেব্যক্তি সব সময় সব কিছু সর্বস্থানে রব্বুল আলামীনের কাছে চায়, তিনি তাকে তাঁর ওলী বানিয়ে দেন। তিনি বলেন, এ যেহেতু আমি ছাড়া অন্য কারো কাছে চায় না, শুধু আমার কাছেই চায়; সুতরাং এ হলো আমার বন্ধু। সুবহানাল্লাহ্! তিনি যেহেতু দিয়েই এত খুশি হন, তাহলে আমাদের উচিত তার কাছে বেশি-বেশি কামনা করা।

ফকিরের বেশ ধারণ করার বরকত

দেখুন, দুনিয়ার সম্পদশালীদেরও এই নীতি হয় যে, তারা ফকির বেশে কাউকে দেখলেই তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। অনেক সময় দুনিয়াদার পয়সাওয়ালাদের দেখবেন, তারা শুধু ফকিরের বেশ ধারণ করা কাউকে দেখলেই দান করে। কারণ, এই লোককে দেখতে ফকিরের মতোই মনে হয়। তাহলে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনও বেশ-ভূষার কারণে আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। যদি আমরা দুটি চাদরে ফকিরের বেশ ধারণ করে তাঁর সামনে হাত উঠাই আর আপন প্রভুর নিকটে চাই, তাঁর মহব্বত কামনা করি আর বলি, হে মাবূদ! তুমি অনেক দয়া করে আমাদের এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছ, এখন আমরা তো শুধু বেশ ধারণ করে বসে আছি। পরওয়ারদেগারে আলম! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, দয়া করুন, তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন এবং আমাদের এই স্থানের উপস্থিতি কবুল করবেন।

তিনি তো দয়ালু প্রভু; সকলের প্রতিই দয়া প্রদর্শন করেন। তিনি চান, তাঁর বান্দারা তাঁর কাছে আরো বেশি-বেশি কামনা করুক। এ-কারণে তাঁর কাছে আরো বেশি-বেশি প্রার্থনা করুন। এই মহামূল্যবান সময়কে বেশি-বেশি দু'আ ও মুনাজাতে কাটানোর চেষ্টা করুন।

অশ্রুর মূল্যায়ন

একটি মূলনীতি স্মরণ রাখবেন যে, প্রতিটি দেশেই আমদানি করা পণ্যের আলাদা একটি মর্যাদা থাকে। আমদানি তো করা হয় ওই জিনিসকে, যা সেই দেশে পাওয়া যায় না; তাই বাইরে থেকে আনতে হয়। এর অনেক বেশি মূল্য হয়। তবুও মানুষ তা খরিদ করে। কেন? কারণ একটিই– এটি বাইরে থেকে আমদানি করা জিনিস।

সাধারণ দুনিয়ার নীতি যদি এটা হয়, তাহলে মানুষের চক্ষু দিয়ে যে অশ্রু বের হয়, তাও আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে ওই আমদানি করা বস্তুরই মতো। কারণ, ফেরেশতাগণ তো ক্রন্দন করতেই জানে না। তারা নামায পড়ে। কত ফেরেশতা এমন রয়েছে যে, তারা সারা জীবন শুধু রুকুতেই আছে। এমনও রয়েছে, যারা শুধু সেজদা করছে। এমনও রয়েছে, যারা শুধু কেয়াম করছে; তথা দণ্ডায়মান। কিন্তু কোনো ফেরেশতা এমন নেই, যে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করতে পারে। ক্রন্দন করা সেখানকার কাজ নয়। ক্রন্দন তো দুনিয়া থেকে সেখানে পৌঁছে। এভাবে বুঝতে পারেন যে, এই অনুতপ্ত হওয়ার অশ্রু দুনিয়া থেকে মহান প্রভুর দরবারে পৌঁছে। এ-কারণে ফেরেশতারা একে আমদানি করা বস্তু মনে করে। তাই তারাও একে অনেক যত্নসহকারে বহন করে।

موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لئے

قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے

'আমার অনুতাপের এই অশ্রুকে মুক্তা মনে করেই দয়াময়ের দরবার তা গ্রহণ করেছে।'

আল্লাহ্র দরবারে এই অশ্রুর অনেক মূল্যায়ন করা হয়। এমনকি এই অশ্রুর ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'মুমিন ব্যক্তির চক্ষু থেকে যে-অশ্রু বের হবে, যদি সেই অশ্রু মশার মাথাবরাবরও হয়, তবুও তা কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন নেভানোর কারণ হবে।'

চক্ষুর পলকের পশমও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কারণ হবে

এ-বর্ণনা অনুযায়ী কেয়ামতের দিন একটা সময় এমন হবে যে, সব গুনাহ্গার জাহান্নামিদের বের করে নিয়ে আসা হবে। সুপারিশকারীগণ সুপারিশ করা শেষ করবেন আর কোনো সুপারিশকারীও অবশিষ্ট থাকবে না।

তখন এক বান্দা খুবই পেরেশান হয়ে বলতে থাকবে, হায়! আমার বুঝি সুপারিশ করার মতোও কেউ নেই। আমি এখান থেকে কীভাবে বের হব? তখন তার চক্ষুর পলকের একটি পশম এমন হবে, যে আল্লাহ্ পাকের সামনে বলবে, হে মাবূদ! পুরা জীবনে তোমার এই বান্দা কোনো একদিন তোমার ভয়ে নিজের অপরাধের কথা চিন্তা করে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন করেছিল, তার চক্ষু দিয়ে শুধু এতটুকু অশ্রু বের হয়েছিল যে, আমি সিক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি পশম সাক্ষ্য দিচ্ছি।

রব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের বলবেন, আমি এই পশমের সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম। ঘোষণা করে দাও, আমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাত দান করলাম।

রব্বুল আলামীনের দরবারের এটিই যখন নীতি যে, তিনি একটি পশমের সাক্ষ্যও গ্রহণ করেন, তাহলে আজ এই দিন তো তাঁর দরবারে আগ্রহভরে কামনা করার দিন, ক্রন্দন করতে-করতে দু'আ করার দিন। কারণ, আমাদের আমলের পাল্লা তো খালি।

আমরা শূন্যহস্ত; কিন্তু অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া এই জায়গায় আমাদের কাছে আর কী সম্বল রয়েছে?

আল্লাহ্র খাছ বান্দাগণ এখানে নিজেদের ঝুলি নেকি দ্বারা পূর্ণ করে নেবেন।

তারা তো এখানে রাত্রি যাপন করা নিয়ে এসেছেন।

দিনের রোযা নিয়ে এসেছেন।

কুরআন পাকের তেলাওয়াত নিয়ে এসেছেন।

খোদাভীতি ও পবিত্রতা নিয়ে এসেছেন।

আমরা তো এসেছি ঝুলিতে গুনাহের বোঝা নিয়ে।

অন্তরের অন্ধকার নিয়ে।

মনের কঠোরতা নিয়ে।

আর উদাসিনতা নিয়ে।

আমরা এমন অন্তর নিয়ে এখানে এসেছি, যেটা আল্লাহ্র দরবারে পেশ করার যোগ্য নয়। এজন্যেই অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো রাস্তা নেই। সুতরাং আমরা তাঁর দরবারে নিজেদের গুনাহের কথা চিন্তা করে শুধু কামনা করব–

'ওহে আমার মাওলা! আমি অনেক দূর থেকে অনেক দেরিতে এখানে আপনার দরবারে এসেছি। আপনার দয়ার সঙ্গ নিয়ে এখানে আসতে পেরেছি। মাবূদ! আমার প্রতি দয়া করুন, আমার এই অন্তরকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে দিন। আমার আমলনামাকে নেকি দ্বারা ভরে দিন।'

মহান প্রভুর দরবারে এভাবে দু'আ করলে অবশ্যই তিনি আমাদের দু'আ কবুল করবেন। আমরা মনে-মনে এই নিয়ত করব যে,

وَفَدْتُ عَلَى الْكَرِيْمِ بِغَيْرِ زَادٍ

'আমি দয়াময়ের দরবারে এসেছি কোনো সম্বল ছাড়া।'

مِنَ الْأَعْمَالِ بَلْ قَلْبُ السَّلِيْمِ

'আমার কাছে না ভালো কোনো আমল আছে, না ভালো অন্তর আছে।'

فَإِنَّ الزَّادَ أَقْبَحُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

'আসবাবপত্র আর সম্বল নিয়ে যাওয়া তো দৃষ্টিকটু বিষয়।'

إِذَا كَانَ الْوُفُوْدُ عَلَى الْكَرِيْمِ

'যখন হাজিরা দেওয়া হবে দয়াশীল কোনো সত্তার নিকট।'

যেমন কেউ দাওয়াত করলে যদি ঘর থেকে খানা নিয়ে সেখানে যাওয়া হয়, তহালে ওই মেজবান এই কাজকে কতই-না খারাপ দৃষ্টিতে দেখেন এজন্যে যে, আমি দাওয়াত করার পরও আপনি খানা নিয়ে এলেন?

সুতরাং আমাদেরও যেহেতু একজন দয়াশীল মহানুভব সত্তা দাওয়াত করে এখানে নিয়ে এসছেন আর আমাদের কাছে তো তাঁর সামনে পেশ করার মতো কিছুই নেই। তাহলে মনে করব, আমরা তো দয়াময়ের দরবারেই এসেছি। আর অন্তরে কল্পনা করব,

إِلٰهِي! كَيْفَ أَدْعُوْكَ وَأَنَا آثِمٌ * وَكَيْفَ لَا أَدْعُوْكَ وَأَنْتَ كَرِيْمٌ

'মাবূদ আমার! আমি আপনার দরবারে কীভাবে দু'আ করব? কারণ, আমি তো বড় গুনাহ্গার। আর দু'আ আপনার কাছে কেনইবা করব না; আপনি হলেন বড় মেহেরবান।'

ভাইয়েরা আমার! দয়াশীল যিনি হন তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছু চেয়ে নেওয়া অনেক সহজ। কারণ, দয়াশীল তো হন তিনি, যিনি চাওয়ার আগেই দেওয়ার জন্যে তৈরী থাকেন। ওলামায়ে কেরাম 'কারীম' শব্দের যে-অর্থ

লিখেছেন, তাহলো, 'কারীম' তথা দয়াময় বা দয়াশীল ওই সত্তাকে বলা হয়, যিনি কেউ তার কাছে চাওয়ার পূর্বেই তার অবস্থা দেখেই দান করেন।'

নিজের নিকৃষ্ট হওয়া স্বীকার করবেন

আমরা যখন এখানে আল্লাহ্‌র দরবারে এসেই পড়েছি এবং তাঁর দরবারে নিজেদের হাত প্রসারিত করেছি আর তিনি তো হলেন অন্তর্যামী। তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন, এই বান্দা এখানে কেন বসে আছে? তার মনের আশা কী? তিনি সবই জানেন। সুতরাং অন্তরের আশা ভালো হওয়া চাই। তারপর দেখবেন, তিনি কীভাবে আমাদের ব্যাপারে ক্ষমার ফয়সালা করবেন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজকে সহজ করে দেবেন।

রব্বুল আলামীন অনেক বড় মেহেরবান। তিনি চান, বান্দা আমার সামনে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করুক। পবিত্র ওই মহান সত্তা, যিনি নিজের দরবারে যাওয়ার জন্যে রাস্তা হিসেবে রেখেছেন একমাত্র অক্ষমতাকে। তিনি ওই মহান সত্তা, যার সামনে পৃথিবীর বড়-বড় প্রভাবশালী-প্রতাপশালীদেরও মাথা নত করতে হয়। এখানে এসে সবাইকে ঝুঁকতেই হবে। আজ আমরা নিজেদের মাথা নত করব, তাঁর সামনে হাত বাড়িয়ে দেব এবং নিজের নিকৃষ্টতা স্বীকার করব আর বলে দেব,

مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے
مگر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے

'হে প্রভু! আমার অন্তরে নিজের হীনতা এবং আপনার বড়ত্ব বিদ্যমান।
'কিন্তু আমার অন্তর যে সবর্দা আপনার সঙ্গী হতে ব্যাকুল!'

ওহে মাবূদ! আমাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিন। আমার কাছে তো অন্য কোনো সম্পদ নেই। এরপরও আমরা এখানে এসে গেছি। আমরা আপনার দরবারে হাত পেতে বসে আছি। আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে পরিবর্তন করে দিন। ভালো কাজ করার তাওফীক দান করুন।

আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা খুবই সহজ

বলা হয়, দুনিয়াতে মাকে নিজ আয়ত্তে নিয়ে আসা খুব সহজ। কিতাবেও পাওয়া যায়, দুনিয়াতে মাকে বশে আনাই সবচেয়ে সহজ। তাই সাধারণত মাকে বসে আনাকেই সবচেয়ে সহজ মনে করা হয়। কারণ, মা কখনো

সন্তানের প্রতি নারাজ হলেও অন্তর থেকে কিন্তু নারাজ হন না। আমরা এমনও দেখতে পাই যে, যেকোনো কারণবশত মা তার ছেলের সাথে রাগ করলেও মেয়ের মাধ্যমে খবর রাখেন, ছেলে খানাপিনা করেছে কিনা। যে মা মনের মধ্যে এত পরিমাণ ব্যথা পাওয়ার কারণে ছেলের সাথে কথা পর্যন্ত বলেন না, সেই মা আবার মেয়ের মাধ্যমে খবর রাখেন, আমার ছেলে খেয়েছে কিনা, ঘুমাল কিনা? একদিকে রাগের কারণে কথা বলছেন না, আবার অন্য দিকে মমতার কারণে জিজ্ঞেস করছেন, আমার ছেলে খাবার খেল কিনা? ছেলে না খেলে মেয়ের মাধ্যমে খাবার পাঠানো হয়। মায়ের নারাজ হওয়া তো এমনই হয়।

এজন্যেই মা যতই নারাজ হন-না কেন, ছেলে ক্ষমা চাইলেই মা তাকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করে দেন। মায়ের সামনে হাত জোড় করলেই মা ক্ষমা করতে প্রস্তুত। বরং ছেলে যদি মায়ের সামনে এসে দুই চোখের অশ্রু ফেলে বলে, মা আমার! ভুল করেছি। মা ছেলের সেই অশ্রু সহ্য না করতে পেরে বলে দেন, যাও বেটা! আমি তোমাকে ক্ষমা ব-রে দিয়েছি। মহান রব্বুল আলামীন মায়ের মাঝে এই পরিমাণ মমতা আর আদর-স্নেহ রেখে দিয়েছেন যে, মাকে বসে আনা একেবারেই সহজ ব্যাপার।

কিন্তু আমার বন্ধুগণ ও আমার শ্রদ্ধাভাজন ওলামায়ে কেরাম! এই দুনিয়াতে মাকে বশে আনার চেয়েও সহজ আরেকটি কাজ রয়েছে। আর সেটি হলো আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনকে নিজের বশে আনা।

এরপরও মাকে আয়ত্তে আনতে হলে মুখে কিছু বলতে হয়, না হয় হাত দ্বারা বোঝাতে হয় বা মায়ের হাত ধরতে হয় কিংবা তার আঁচল ধরতে হয় অথবা মুখে এমন কিছু বোঝাতে হয়, যাতে মা বুঝতে পারেন, আমার ছেলে আমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে।

আর মহান রব্বুল আলামীনকে আয়ত্তে আনতে মুখ নাড়াছাড়ার প্রয়োজন নেই। যেখানেই থাকি না কেন শুধু অন্তর দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাই যথেষ্ট। তিনি এতই দয়াবান পালনকর্তা যে, অন্তরের ইচ্ছা দ্বারাই তাওবা কবুল করেন এবং বান্দার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা। একদা কোনো এক বৈঠকে কেউ অন্যের সমালোচনা করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। সকলে ওই মজলিসেই বসা ছিল। হঠাৎ আবার বৃষ্টি আরম্ভ হলে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফরিয়াদ করলেন, পরওয়ারদেগার! বৃষ্টি কীভাবে এল? বলা হলো,

আমার প্রিয়নবী! যার কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, তার কারণেই আবার তা শুরু হলো। তিনি বললেন, কীভাবে? বলা হলো, ওই ব্যক্তি অন্তরে প্রতিজ্ঞা করেছে, হে মাবূদ! আমি যখন গুনাহ্ করেছি, তুমি আমাকে অপদস্থ ও অপমানিত করনি। এখন আমি মনে-মনে এই প্রতিজ্ঞা করছি, আর কারো সমালোচনা করব না। আমার তাওবা কবুল করে নিয়ে আমাকে আবারো তুমি অপমানের হাত থেকে রক্ষা করো, যাতে আমাকে এই মজলিস থেকে বহিস্কৃত হতে না হয়। সেখানে বসা অবস্থাতেই তার এই তাওবা কবুল হয়ে গেল। বোঝা গেল, দুনিয়াতে সবচেয়ে সহজ কাজ হলো আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করা।

এর জন্যে মনে-মনে লজ্জিত হওয়া-ই যথেষ্ট।

হাদীছে আছে,

اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ

'মনের অনুশোচনা-ই হলো তাওবা।'

লজ্জিত হওয়ার কারণে আল্লাহ্ নিজ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি বান্দার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ আমাদের সকলের আজকের এই উপস্থিতিকে কবুল করুন। আমীন।

হাফেয ইবনে কাইয়েম (রহ.) একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আমি একদা এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, একটি ঘরের দরজা খোলা অবস্থায় মা তার সন্তানকে শাস্তি দিচ্ছেন। চড়-থাপ্পর দিচ্ছেন, ধাক্কা দিচ্ছেন। সন্তান কান্নাকাটি করছে। তথাপিও মা তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলছেন, তুমি আমার কোনো কথাই শুনতে চাও না, আমাকে অনেক পেরেশানিতে ফেলছ, আমি তোমার যন্ত্রণায় অতিষ্ট। আমার কথা না শুনলে এই ঘর থেকে বের হয়ে যাও। একথা বলে ছেলেকে ঘর থেকে বের করেই দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তিনি বলেন, আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর দেখলাম, ওই বাচ্চাটা ক্রন্দন করতে-করতে গলিপথ দিয়ে অন্য দিকে রওনা দেওয়ার পর আবার ফিরে এসে ওই বন্ধ দরজার পাশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। তিনি বলেন, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, শেষ পর্যন্ত কী হয়?

কিছুক্ষণ পরই দেখি, ওই ছেলেটির মা কোনো কাজে দরজা খুলেই দেখতে পায়, ছেলেটি দরজার পাশে মাথা রখে ঘুমিয়ে আছে। আর এটা

দেখে মায়ের সব রাগ মুহূর্তেই ঠান্ডা হয়ে তার অন্তরে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। সে ছেলেটিকে সেখান থেকে তুলে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে নিল আর বলতে থাকল–

'ছেলে আমার! আমি তোমার প্রতি প্রচণ্ড নারাজ ছিলাম। এমনকি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বেরও করে দিয়েছি। কিন্তু তুমি যখন চিন্তা করলে এই দুয়ার ছাড়া তো তোমার আর কোনো গতি নেই। তোমার দ্বিতীয় আর কোনো মা নেই, যে তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে, যে তোমাকে মায়া-মমতা আর আদর-সোহাগ দ্বারা কাছে টেনে নিতে পারে। প্রিয় বৎস! তুমি এখানেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছ। তোমার যেহেতু আর কোনো ঘর নেই চলে এসো; আমার দুয়ার খোলা আছে। আমি তো তোমার 'মা'। আর এই ঘর তো তোমারই জন্য।

বলা হয়, একটা ছোট্ট বাচ্চার প্রতি যখন মায়ের এত দরদ থাকে এবং এই বলে প্রচণ্ড রাগ থাকা সত্ত্বেও নিজসন্তানকে ঘরে তুলে নেয়, তাহলে আপনিও যখন মহান প্রভুর দরবারে এসে দুহাত প্রসারিত করবেন আর বলবেন, 'হে আমার পালনকর্তা! আপনার দুয়ার ব্যতীত আর কোনো দুয়ার নেই। নবীগণও এই দুয়ারে ধরনা দিয়েছে, ওলীগণও দিয়েছে। হে প্রভু! আমি অপরাধীও আপনার দুয়ারে হাজির। আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েন না।

যেব্যক্তি আপন সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে এল, তার মতো হতভাগা আর কেউ হতে পারে না। এজন্যে আমাদের সকলকেই এই দু'আ করতে হবে যে, দয়াময় প্রভু! আমাদের এই উপস্থিতিকে আপনি মঞ্জুর করুন। আমাদেরকে এই পথেই মুক্তি দান করুন।

إلهى! عبدك العاصى أتاك * مقر بالذنوب وقد دعاك

'মহান প্রভু! আপনার অপরাধী বান্দা অপরাধের স্বীকারোক্তি নিয়ে আপনার দুয়ারে এসে আপনাকে ডাকছে।'

فإن تغفر فأنت لذاك أهل * وإن تطرد فمن يرحم سواك

'আপনি যদি ক্ষমা করেন আর ক্ষমাশীল তো একমাত্র আপনিই। আর যদি আপনার দুয়ার থেকে দূরে সরিয়ে দেন, তাহলে আমাদের মতো হতভাগাদের প্রতি কে দয়া প্রদর্শন করবে?'

এখন ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে হাত প্রসারিত করুন

যেহেতু চাইতেও হবে এই দুয়ারে আর কিছু মিলতেও পারে এই দুয়ার থেকেই, তাহলে আসুন, আমরা সকলে মিলে তাঁর সামনে দুহাত প্রসারিত করি। রব্বুল আলামীন এস্থানে আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামের তাওবাও কবুল করেছিলেন। আজ আমরাও আমাদের গুনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে এখানে এসেছি। তিনি আমাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে আমাদেরকে তাঁর অফুরন্ত রহমত দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন।

آہ جاتی ہے فلک پر اثر لانے کیلئے

بادلو! ہٹ جاؤ دید در اہ جانے کے لئے

'আহ' আকাশে ছুটে চলল দাবি আদায়ের জন্য,

হে মেঘমালা! সরে দাড়াও; যাওয়ার জন্যে পথ করে দাও।

اے دعا! عرض کر عرش الٰہی تھام کر

اے خدا! اب پھیر دے رخ گردش ایام کے

হে দু'আ! আরশে ইলাহীর আঁচল ধরে মিনতি করো,

হে প্রভু! এবার যামানার উত্থান-পতনের গতি পাল্টে দাও।

صلح تھی کل جن سے اب وہ تقدیر دونوں درپئے آزار ہیں

وقت اور تقدیر دونوں در پئے آزار ہیں

গতকালও যার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, আজ সে শত্রুতায় লিপ্ত,

সময় ও ভাগ্য উভয়ই কষ্ট দেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لئے

کر رہے ہیں زخمی دل فریاد مرہم کے لئے

এখন তো বেদনা দূর করার জন্য কোনো ওষুধ খুঁজছি,

আহত অন্তর কোনো বেদনা লোকের ফরিয়াদ করছে।

رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا

ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا

একটু দয়া করো; স্বীয় করুণার রীতি ভুলে যেয়ো না প্রভু!
আমরা তো তোমাকে ভুলে গেছি, তুমি আমাদের ভুলো না।

خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے
آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے

মানুষের কাছে প্রবঞ্চিত হয়ে, দুনিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতে আহত হয়ে,
এসেছি এবার তোমার দুয়ারে দুহাত প্রসারিত করে।

خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں
کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں

আমি নিকৃষ্ট, পাপিষ্ঠ, অপমানের চাকায় পিষ্ট, বিধ্বস্ত,
যা-ই হই; চেয়ে দেখো, আমি তোমার প্রিয়তমের উম্মতীও।

حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں
طعنہ دیں کے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں

সত্যসন্ধ্যানীদের মান যদি তুমি রক্ষা না কর,
তবে মিথ্যা পূজারীরা ভর্ৎসনা দিবে,
দেখো, মুসলিমদের কোনো খোদাই নেই!

এমনি একটি সম্পর্ক নিয়েই তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। হে মাবূদ! আমরা তো তোমার বন্ধুর গোলাম। এটাই আমাদের পরিচয়। আমরা তোমার কালিমাপড়া মুসলমান। হে মাবূদ! আমার জন্যে এই পরিচয়ই যথেষ্ট যে, তুমি আমার পালনকর্তা। দয়াময় খোদা! দয়া করে আমাদের এই উপস্থিতিকে কবুল করুন।

রব্বুল আলামীন! আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন এবং এখানে যা কিছু আলোচনা করা হলো, শ্রবণ করা হলো এগুলো আপনি মঞ্জুর করে নিন এবং এর উসিলায় আপনি আমাদেরকে আপনার রহমত নিয়ে ফেরত যাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

'মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের যে-শিক্ষা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন, এমন শিক্ষা অন্য কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি।

নবীগণের আগমনের ধারাবাকিতায় সর্বশেষ বিশ্বনবী তাশরীফ আনলেন। তিনি দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র সর্বশেষ বাণী নিয়ে আগমন করলেন। বান্দার মস্তক আল্লাহ্‌ দরবারে লুটিয়ে দিতে এসেছেন, বান্দাদের মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শেখাতে এসেছেন। তিনি আসাতেই দুনিয়াতে মানুষের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি এসেছেন বলেই দুনিয়াতে থাকতেই বান্দাগণ ফেরেশতার পক্ষ থেকে সালাম প্রাপ্ত হয়েছে।'

মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

সীরাতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টিকোণ

রবিউল আওয়াল-এর পবিত্র এই মাস মানবতার প্রতি অনুগ্রহশীল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় জন্মের মাস। আমদের পূর্বপুরুষদের নীতি ছিল, তাঁরা এই মাসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় জীবনী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতেন, যাতে উম্মত তাঁর পবিত্র জীবনী শ্রবণ করে সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গঠন করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের একটি আকর্ষণীয় দিক হলো, তিনি মানুষকে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছেন। মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং মানুষদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনও পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

'আর নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি।'[৩৭]

---

৩৭. সূরা ইসরা : আয়াত ৭০

تكريم শব্দের অর্থ

احترام ও اكرام শব্দ দুটির অর্থ কাছাকাছি। এমন অর্থবোধক আরো একটি শব্দ আছে التكريم যার মূল অক্ষর হলো, ك ر م। যার উদ্দেশ্য হলো شرف الشيء في نفسه অর্থাৎ– 'কোনো জিনিস নিজে নিজেই সম্মানিত হওয়া।'

القاموس الوحيد (একটি আরবি শব্দকোষের নাম)-এ এর অর্থ লেখা হয়েছে اعزاز বা কাউকে সম্মান প্রদর্শন করা।

الكريم এর বাস্তব নমুনা

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নামসমূহ থেকে একটি হলো الكريم। ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন,

الكريم هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالى كم أعطى ولا من أعطى

'কারীম ওই মহান সত্তাকে বলা হয়, যিনি কারো থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেলে তাকে ক্ষমা করে দেন। তিনি কোনো ব্যাপারে অঙ্গীকার করলে তা পুরা করেন। আর যখন দান করেন, তখন গ্রহীতাদের চাহিদার চেয়েও বেশি দান করেন এবং তিনি একথা মোটেও কল্পনা করেন না যে, কাকে দিচ্ছেন, কী পরিমাণ দিচ্ছেন।'

অর্থাৎ–

তিনি আপনজনকেও দান করেন, শত্রুকেও দান করেন।

অনুগতকেও দান করেন, গাদ্দারকেও দান করেন।

আশেককেও দান করেন, বদকারকেও দান করেন।

وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى

'আর যদি প্রয়োজন পুরা করার আরজি পেশ করা হয়, তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে, তাহলে তিনি নারাজ হন।'

অর্থাৎ– তিনি একথার ওপর অসন্তুষ্ট হন যে, তাঁর কাছে ছাড়া অন্যের কাছে চাইবে।

واذا جفى عاتب وما استقصى

'আর যখন তাঁর অবাধ্যতা করা হবে, তখন তিনি শাস্তি দেন। কিন্তু শাস্তিদানে তিনি চূড়ান্ত করেন না।'

ولا يضيع من لا ذبه والتجاء و يغنيه عن الوسائل والشفعاء

'আর যে বান্দা তাঁর আশ্রয় কামনা করে এবং তাঁর দরবারমুখী হয়, তাহলে তিনি ওই বান্দাকে যাবতীয় আসবাবপত্র এবং অন্য কারো সুপারিশ থেকে বিমুখ করে দেন।'

যেমন আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়ার জন্যে বান্দা সরাসরি দু'আ করতে পারে।

فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف

'সুতরাং যে সত্তার মাঝে এ-সকল গুণ একত্রে পাওয়া যায় فهو الكريم المطلق অর্থাৎ– তাঁকেই 'কারীম' বলা হয়। আর সেই মহান সত্তার নামই হলো 'আল্লাহ্'।

আর একথা সুস্পষ্টভাবেই বুঝে আসে যে, এসব গুণ কেবল আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের জন্যেই সাজে।

التكريم এর পারিভাষিক অর্থ

ইমাম কুরতবী (রহ.) বলেন,

تكريم الإنسان هو ما جعله الله له من الشرف والفضل

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে বুযুর্গি ও মর্যাদা দান করেছেন, এটাই তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া সম্মান বা 'তাকরীম'।

মানুষকে মর্যাদা দেওয়ার কয়েকটি উদাহরণ

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে-মর্যাদা দিয়েছেন, সে সম্পর্কে তিনি নিজেই বলছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

'আর আমি আদম সন্তানদের মর্যাদাবান করেছি।'

এই মর্যাদার কয়েকটি উদাহরণ শুনুন।

১. خلقه بيده আল্লাহ্ মানুষকে (হযরত আদম আলাইহিস সালামকে) নিজহাতে সৃষ্টি করেছেন।

২. الصورة الحسنة তিনি মানুষকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

৩. منحه العقل অর্থাৎ– আমি মানুষকে উত্তম গঠন দ্বারা সৃষ্টি করেছি।

৪. منحه النطق তিনি মানুষকে বিবেকের মতো মহান নেয়ামত দান করেছেন।

৫. اكرمه بالنعم কথা বলার মতো শক্তি দান করেছেন।

৬. তিনি তাঁর বিভিন্ন মহামূল্যবান নেয়ামত দ্বারা তাদের সম্মানিত করেছেন।

কী সেসব নেয়ামত?

তিনি বলেন,

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا

'যদি তোমরা আল্লাহর নেয়মতসমূহ গণনা করতে চাও, তবে তোমরা তা পারবে না।'[৩৮]

৭. আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন দুনিয়ার অন্য সকল সৃষ্টির ওপর মানুষকে মর্যাদা দান করেছেন। যেমন– তিনি মানুষদেরকে দুটি হাত দান করেছেন। এই দুহাত দ্বারা তারা এমন কাজ করতে পারে, যা অন্যান্য প্রাণীরা পারে না।

৮. فضله على كثير ممن خلق আল্লাহ মানুষকে অন্যান্য মাখলুকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

তারপর তিনি হেদায়াতে মতো মহান নেয়ামত দান করে মানুষকে আরো বেশি সম্মান দান করেছেন।

৯. حب الله للانسان তিনি নিজে স্বয়ং মানুষকে ভালোবাসেন।

---

৩৮. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৪

মানুষকে তিনি এমন-এমন গুণ দান করেছেন, যেসব গুণে গুণান্বিতদের তিনি ভালোবাসেন। যেমন–

অনুগ্রহশীলদের তিনি ভালোবাসেন।

তাওবাকারীদের তিনি ভালোবাসেন।

খোদাভীরুদের তিনি ভালোবাসেন।

ভরসাকারীদের তিনি ভালোবাসেন।

এই গুণগুলোর প্রতি তাঁর ভালোবাসা আছে। তাই যারা এসব গুণের অধিকারী হবে, তাদেরও তিনি ভালোবাসবেন।

১০. معية الله للانسان هو خلقكم اين ما كنتم সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলা নিজে তাদের সাথে থাকার ঘোষণার মাধ্যমে মানুষদের সম্মানিত করেছেন।

১১. নিরাপত্তা দেওয়ার মাধ্যমে মানুষকে সম্মান দিয়েছেন।

মানুষ মনে করে, তারা নিজেদের ক্ষমতা বলে এই জমিনে আরামে আছে। অথচ তাদের ধারণা নেই যে, কত ধরনের হাজারো পদার্থ এই জমিনের দিকে ধেয়ে আসছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই জমিনের চারপাশে এমনসব নিরাপত্তা প্রাচীর প্রস্তুত করে রেখেছেন যে, এর কারণে সেসব পদার্থ সেখানেই জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় আর মানুষ তার কোনো খবরই রাখে না।

মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের দুটি মূলনীতি

ইসলাম মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের দুটি মূলনীতি বর্ণনা করেছে।

১. যখন তোমরা পরস্পরে মিলিত হবে, তখন মানুষের মতোই মিলিত হবে। তিনি বলছেন,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

'তুমি যখন কারো সাথে মিলিত হবে, হাসিমুখে মিলিত হও।'[৩৯]

আল্লাহ্ বলেন, তুমি মুখ ফুলিয়ে মিলিত হবে না। যেমন– কতক মানুষ যখন কারো সাথে রাগের মুহূর্তে সাক্ষাৎ করে তো তার মুখটা গোমরা থাকে। তিনি বলেন, তুমি যখনই কারো সাথে মিলিত হবে, হাস্যোজ্জল চেহারা নিয়ে, হাসিখুশিভাবে মিলিত হও। কারণ, তোমাকে রগান্বিত অবস্থায় দেখে অন্যরা তোমার থেকে দূরে সরে যাবে। আর তোমার চেহারায় মায়া আর আনন্দভাব

---

৩৯. সূরা লুকমান : আয়াত ১৮

দেখে অন্যরা কাছে আসবে। তারা আতঙ্কিত হবে না। এই নীতি শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়; বরং বলা হয়েছে, للناس অর্থাৎ– সকল মানুষের জন্যে। কুরআন আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে, যখনই আল্লাহর কোনো বান্দার সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন তার সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করবে।

সাক্ষাৎ করা আর মহব্বত রাখা ভিন্ন বিষয়। মহব্বতের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের ভালো-মন্দ অবস্থা নিয়ে অন্যের সাথে মতবিনিময় করতে পারে। আর শরীয়ত বলে দিয়েছে, মহব্বত শুধু ঈমানদারের সাথে রাখবে। কারণ, অমুসলিমের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করার কারণে তার ধর্মবিশ্বাস তোমার মধ্যেও চলে আসতে পারে। এজন্যে মহব্বতের সম্পর্ক শুধু ঈমানদারদের সাথে রাখার অনুমতি আছে। আর দেখা-সাক্ষাৎ, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য সব মানুষের সাথেই করা যায়।

২. আরেকটি কথা এই বলেছেন,

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

'মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করো।'[৪০]

তোমার ব্যবহারে শব্দচয়ন এমন হবে যে, কথার ভাষা এমন হবে যে, কথা মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। অন্যের অন্তরে মহব্বতের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়।

এই দুটি জিনিস এমন যে, এগুলো দিয়েই মানুষ অন্যের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করতে পারে লোকটি কেমন। চিন্তা করুন, ইসলামি শরীয়ত এই দুটি মূলনীতিকে এমনভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, যখনই তুমি কারো সাথে মিলিত হবে তো হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও উত্তম ব্যবহার নিয়ে মিলিত হও।

ভাষা হবে নরম।

তাতে মেশানো থাকবে মহব্বত।

তাতে চমকাবে ভদ্রতা।

যদি আমরা এ দুটি মূলনীতির ওপর আমল করি, তাহলে মানুষ আমাদের সাথে চলাফেরা করতে ভয় ও অচেনা ভাব অনুভব করবে না।

---

৪০. সূরা বাকারা : আয়াত ৮৩

অন্যায় রোধ এবং উপকার পৌঁছানোর শিক্ষা

নবীজি এই শিক্ষাকে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ

'তুমি মানুষ থেকে নিজের খারাবিকে গুটিয়ে নাও।'

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভালো-খারাপ উভয় চরিত্র বিদ্যমান। এজন্যেই বলা হয়েছে, তোমরা নিজেদের খারাবিকে অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না। একে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখো। উদাহরণস্বরূপ, অনেক সময় মানুষ চায়, অন্যের সমালোচনা করবে। শরীয়ত বলে, তোমার ভেতরে এক ধরনের ভাব সৃষ্টি হচ্ছে; তুমি একে বাধা দাও। তোমার জন্যে অন্য কাউকে ভরমজলিসে অপমান করা ঠিক হবে না। তাই তোমার ভেতর লুকিয়ে থাকা এই খারাবি থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হবে।

স্ত্রী নিজের খারাবি থেকে স্বামীকে,

স্বামী নিজের খারাবি থেকে স্ত্রীকে,

ভাই নিজের খারাবি থেকে ভাইকে,

বন্ধু নিজের খারাবি থেকে বন্ধুকে,

এক ছাত্র নিজের খারাবি থেকে অপর ছাত্রক রক্ষা করবে।

খারাপ দিকটা সবারই মধ্যে বিদ্যমান। আমরা কেউই এখানে ফেরেশতা নই। কিন্তু আমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা এই খারাবি থেকে অন্যকে রক্ষা করা আমার ঈমানি দায়িত্ব।

নবীজি অন্যত্র আরো নির্দিষ্ট করে বলেছেন,

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা সে, যে মানুষের বেশি উপকারে আসে।'

তিনি বলেন, শুধু খারাবি থেকে রক্ষা করলেই দায়িত্ব শেষ নয়; বরং নিজের মধ্যে যে-সমস্ত ভালো গুণ রয়েছে, সেটিও অন্যের কাছে পৌঁছাতে হবে। মানুষ আপনার এসব গুণ দ্বারা উপকৃত হবে। এখানেও শুধু মুসলমানদের আলোচনাই নয়; বরং للناس তথা পুরা মানবজাতির জন্যে। যেব্যক্তি তাঁর বান্দাদের বেশি উপকারে আসে, সে-ই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। আল্লাহর প্রিয়নবী আমাদের কত উত্তম শিক্ষাই-না দান করেছেন।

শ্রেষ্ঠ কাজ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এর একটি সামগ্রিক নীতিও বলে দিয়েছেন। আর তা হলো,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ

'সব সৃষ্টিই আল্লাহ্‌র পরিবারভুক্ত।'

فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ

'সুতরাং আল্লাহর কাছে তাঁর ওই বান্দা বেশি প্রিয়, যে তার সৃষ্টির সাথে ভালো আচরণ করে।'

তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার লক্ষ্যে তাঁর বান্দাদের সাথে ভালো আচরণই সর্বোত্তম আমল।

মানুষের পেরেশানি দূর করার ফযিলত

এই পদ্ধতির ব্যাপারে আমরা তখনই ধারণা করতে পারব, যখন আমরা মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হব। মুসলিম শরীফে একটি হাদীছ আছে, 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কোনো এক বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন,

'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম; তুমি আমার সেবা-যত্ন নাওনি।'

এই অভিযোগ শুনে বান্দা অনেক পেরেশান হয়ে বলবে, 'হে মাবূদ! আমি আপনার সেবা-যত্ন কীভাবে করব? আপনি তো সমস্ত জাহানের পালনকর্তা।

আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি কি জান না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল; অথচ তুমি তার সেবা-যত্ন করনি?'

তুমি যদি তার সেবা-যত্ন করতে, তাহলে তুমি সেখানেই আমাকে পেতে। ওই বান্দার সেবা-যত্ন করার দ্বারা তুমি আমার সন্তুষ্টি পেতে। আমার সাথে তোমার সম্পর্ক তৈরি হতো।

আল্লাহু আকবার!

কোনো রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করা আল্লাহর কাছে এতই প্রিয়!

তারপর তিনি বলবেন, হে আদম সন্তান!

اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَا تُطْعِمْنِي

আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছি; তুমি আমাকে খাবার দাওনি।'

সে বলবে, 'হে প্রভু! আমি আপনাকে কীভাবে খাবার দেব, আপনি তো বিশ্বপালনকর্তা।'

আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি কি জান না, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল; কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। যদি তুমি তাকে খাবার দিতে, তবে সেখানেই আমাকে পেতে।'

'হে আদম সন্তান!

اِنِّي اسْتَقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِي

আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছি; কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি।'

সে বলবে, 'হে বিশ্বপ্রতিপালক! আমি আপনাকে কীভাবে পানি পান করাব! আপনি তো হলেন বিশ্বজাহানের পালনকর্তা।'

আল্লাহ্ বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল; কিন্তু তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তাকে পানি দিতে, তাহলে সেখানে আমাকে পেতে।'

উক্ত হাদীছে পাকের মধ্যে তিনটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে–

১. কোনো বান্দা অসুস্থ হলে তার সেবা করা।

২. কাউকে খাবার দেওয়া।

৩. কাউকে পানি পান করানো।

এই তিনটি কাজ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, বলা হয়েছে, যদি তুমি এই কাজগুলো করতে, তাহলে আমাকে সেখানেই পেতে। তাহলে বুঝুন; আল্লাহ্র বান্দাদের পেরেশানি দূর করা তাঁর কাছে কতটুকু গুরুত্ববহ। এমনিতেই তিনি চান, তাঁর বান্দারা পরস্পর একে অন্যের মসিবতে এগিয়ে আসুক। এমন যাতে না হয়, এক বান্দা কঠিন বিপদগ্রস্ত আর অপরজন খুব আনন্দ আর ফুর্তিতে কালাতিপাত করছে। মুমিন তো এমনই হওয়া উচিত।

خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

'পৃথিবীর যে-প্রান্তেই কেউ কোনোভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আমাদের অন্তর এতে ব্যথিত হয়।'

মুমিনকে যে-কারো ব্যথাই ব্যথিত করে। ইসলাম আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও মানবতা শিক্ষা দেয়।

اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں

تو ہندوستاں کا ہر پیر وجواں بے تاب ہو جائے

'ভ্রাতৃত্ব বলা হয়, যদি আফগানের কাবুলে কেউ কাঁটাবিদ্ধ হয়, তাহলে হিন্দুস্তানের সকল যুবক-বৃদ্ধ এতে পেরেশান হয়ে যায়।'

এটি মানবতা

এক ইংরেজ লেখক তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ভবিষ্যতে আমরা বিজ্ঞানে এত বেশি উন্নতি করব যে, বিভিন্ন মেশিন ও রোবট আবিষ্কার করব। এমন রোবট বানাব, যেটা দেখতে, বলতে ও কাজ করতে মানুষ থেকে অনেক উচ্চমানের হবে। মোটকথা, সব দিক থেকেই সেটা মানুষ থেকে উঁচুমানের হবে। সেই ইংরেজ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে বলবে,

'হে আল্লাহ্! আপনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন আর আমি রোবট সৃষ্টি করেছি। দেখুন, আমার রোবটই বরং শ্রেষ্ঠ। স্টিলের তৈরী, ঝং ধরে না, বৃদ্ধ হয় না, অসুস্থ হয় না।'

আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বলবেন, দেখি তোমার রোবট কেমন? সে তার রোবটকে চালাতে শুরু করলে দু-তিনটা মেশিন চলতে শুরু করবে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতে তাতে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি করে দেবেন আর এতে রোবট অকেজো হয়ে যাবে। তার একটা মেশিন বন্ধ হয়ে বাকি দুটা চলতে থাকবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, দেখো, তোমার রোবটের একটা মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে আর বাকিগুলো চলছে।

তারপর তিনি তাঁর দু-তিনজন বান্দাকে দাঁড় করিয়ে তাদের একজনের পেটে ব্যথা সৃষ্টি করে দেবেন। যখন সে ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠবে, তখন অন্য বান্দা তার কাছে আসবে। জিজ্ঞেস করবে, আপনার কী হয়েছে? কোথায় ব্যথা পাচ্ছেন? কেউ পা মালিশ করতে থাকবে। কেউ মাথা মালিশ করতে থাকবে। আরেকজনের চোখে পানি চলে আসবে এই ভেবে যে, এর কতই-না কষ্ট হচ্ছে!

মহান প্রভু তখন তাকে লক্ষ করে বলবেন, দেখো, আমার এক বান্দার কষ্ট দেখে অন্যদের চোখে পানি চলে এসেছে। এটাই মানবতা। তারপর

সেই বান্দা স্বীকার করবে, হে মহান সত্তা! আপনার বানানো মানুষ আমার তৈরী রোবট থেকে অনেক অনেক গুণ উত্তম!

যদি আমাদের মধ্যে এই সহমর্মিতা না থাকে, ভ্রাতৃত্ব না থাকে, একে অন্যের সাথে মহব্বত আর মমতা নিয়ে থাকতে না পারি, তাহলে আমাদের আর যন্ত্রের মাঝে কী ব্যবধান রয়েছে? মানুষদের মর্যাদা তো এখানেই যে, তারা পরস্পরে একে অন্যের দুঃখে-সুখে অংশীদার হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এটাই বান্দার কাছ থেকে আশা করেন।

আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহশীল হওয়ার শিক্ষা

তিরমিযি শরীফে হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ

'যে অন্যের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়াবান হন। সুতরাং তোমরা যদি জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আসমানের মালিকও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।'

উক্ত হাদীছটি مسلسل بالأوليت (মুসালসাল বিল আওয়ালিয়্যাত) অর্থাৎ– সকল মুহাদ্দিছীনে কেরাম হাদীছের দরসের সময় উক্ত হাদীছ দিয়ে তাদের বর্ণনা শুরু করতেন।

কতই-না সুন্দর মর্ম যে, তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর; তাহলে আসমানের অধিপতি তোমাদের প্রতিও দয়া করবেন।

یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدی کا * کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا

'পবিত্র কুরআনের এটিই প্রথম শিক্ষা যে, সমস্ত সৃষ্টি হলো আল্লাহ্ তা'আলার পরিবারভুক্ত।'

আমরা একে অন্যের সাথে মহব্বত আর ভালোবাসার সাথে থাকব।

خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں * بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے

'তাঁর হাজারো বান্দা বনে-জঙ্গলে হিংস্রভাবে ঘুরে বেড়ায়।'

میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو * خدا کے بندوں سے پیار ہوگا

'আমরা তারই গোলামি করব, যার সাথে আল্লাহর বান্দাদের ভালোবাসা থাকে।'

তাঁর বান্দাদের সাথে ভালোবাসা হবে কেবল তাঁকেই সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে।

অন্য হাদীছে আছে, নবীজি বলেছেন–

لَنْ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَرَاحَمُوْا قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كُلُّنَا رَحِيْمٌ

'হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দয়াবান হতে না পারবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো সবাই একে অপরের প্রতি দয়া করি।'

এই গুণ তো আমাদের মাঝে বিদ্যমান।

'রাসূল বললেন, এর অর্থ তোমরা তোমাদের কোনো বন্ধুর সাথে দয়াবান হয়ে থাকার নাম নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ব্যাপক দয়া।

মোটকথা, মুমিনের মেজাজ সর্বদা স্নেহময় হতে হবে। দাম্ভিকতার সাথে, ফেরাউনি মেজাজে, অংকারের সাথে অন্যের সাথে মিলিত হওয়া আল্লাহ্‌র নিকট খুবই অপছন্দনীয় কাজ। বলা হয়েছে, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে এ গুণটি প্রতিষ্ঠিত না হবে। কিছুলোক এমন আছে, যারা মনে করে, আমি ঘরে এলেই কারফিউ জারি। বাচ্ছারা তখন আওয়াজ করতে পারবে না, স্ত্রী স্বামীর ভয়ে কাঁপতে থাকবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے

'কোন বাঘটা এল যে, রণক্ষেত্র কাঁপতে শুরু করল!'

সাম্যের শিক্ষা

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে কতই-না সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন! 'সবার মাঝে সাম্য!'। এভাবে যে, আমরা তাঁরই বান্দা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সবাই এক ও অভিন্ন। ভাষা কিংবা সাদা-কালোর কারণে কারো ওপর কারো কোনো প্রাধান্য নেই। বর্তমান দুনিয়া চৌদ্দশত বছর পরে এসে নিজেকে বড় শিক্ষিত মনে করে বলে থাকে, 'আকৃতি কিংবা ভাষার কারণে কোনো ভেদাভেদ না হওয়া উচিত। অথচ এই শিক্ষা নবী নবীজি আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই দিয়েছিলেন।

তিনি ইরশাদ করেন–

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ

'আরব ব্যক্তির অনারব ব্যক্তি থেকে বাড়তি কোনো মর্যাদা নেই।'

وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ

'আর অনারবেরও আরবদের ওপর কোনো মর্যাদা নেই।'

وَلَا لِأَبْيَضَ عَلٰى أَسْوَدَ

''কালোর ওপর সাদারও কোনো মর্যাদা নেই।'

وَلَا لِأَسْوَدَ عَلٰى أَبْيَضَ, إِلَّا بِالتَّقْوٰى

'আবার সাদার ওপর কালোরও কোনো আলাদা মর্যাদা নেই। এদের সকলের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি।'

ক্রীতদাসের সাথে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা

একদা একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল। হযরত আবুযর গিফারী (রাযি.)-এর এক কাফ্রী ক্রীতদাস ছিল। সে কোনো একটা ভুল করলে তিনি তাকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন, 'হে কালির সন্তান!'

যেন মায়ের দিক থেকে তাকে তিরস্কার করলেন। এর আলোচনাও পবিত্র হাদীছ শরীফে এসেছে। বোখারি শরীফে এসেছে, হযরত আবুযর (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একব্যক্তিকে তার মায়ের প্রতি সম্বোধন করে তিরস্কার করে বলি, 'তুমি কালির বেটা'। শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

يَا أَبَا ذَرٍّ! أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُءٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

হে আবুযর! তুমি তাকে তার মায়ের দিক থেকে অপমান করলে? তোমার ভেতরে এখনো জাহিলি মনোভাব বিদ্যমান।'

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

'তোমাদের এই ক্রীতদাসরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং যার কোনো ক্রীতদাস থাকবে, সে

যেন নিজে যা আহার করে, তাকেও তা-ই খেতে দেয়। নিজে যা পরিধান করবে তাকেও তা-ই পরতে দেয় এবং তাদের ওপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিবে না, যা তারা বহন করতে অক্ষম। আর কখনও এমন বোঝা চাপাতে হলে তুমিও তাঁর সহযোগিতা করবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এই নসীহত শুনে হযরত আবুযর (রাযি.)-এর অনুভূতি জাগ্রত হলো। তাই তিনি বলেন, এরপর আমি গোলামের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ি। আল্লামা কিরমানী (রহ.) বোখারি শরীফের ব্যাখ্যাগন্থে উল্লেখ করেন, হযরত আবুযর গিফারী (রাযি.) নিজের মাথা জমিনে রেখে গোলামকে লক্ষ করে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার গণ্ডদেশে তোমার পা না রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই জমিন থেকে উঠব না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হওয়ার দাবি আদায় করত গোলামও তাঁর গণ্ডদেশে পা রাখে আর তিনি সেখান থেকে উঠে দাঁড়ান।

এই ঘটনা থেকেই জেনে নিতে পারেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামগণকে কেমন শিক্ষা-ই-না দান করেছেন!

সামাজিকতার সোনালি নীতি

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওাসাল্লাম মিলেমিশে থাকার একটি সুন্দর নীতিমালা বর্ণনা করেছেন।

১. উদাহরণস্বরূপ তিনি ইরশাদ করেন–

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

'তোমরা সহজ করো– কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও– ঘৃণা সৃষ্টি করো না।'

এখানে পরস্পরের মাঝে সম্মানবোধ শেখানো হয়েছে।

২. অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

'যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

৩. তিনি আরো ইরশাদ করেন–

أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

'তোমরা লোকদেরকে তাদের নিজ-নিজ স্থানে রাখ।'

অর্থাৎ– তার সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করো।

৪. এমনকি এ-ও বলেছেন,

إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ

'যখন তোমাদের কাছে কোনো গোত্রের নেতা আসবে, তোমরা তাকে সম্মান করো।'

চিন্তা করুন। এতে কিন্তু শুধু মুসলমানদের কথা বলা হয়নি। যেকোনো গোত্রের নেতাই আসুক-না কেন, তাকে সম্মান করার কথা বলা হয়েছে।

ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা

মুসলমানদের তিনি সামাজিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে, পরস্পরে শ্রদ্ধাবোধ আর স্নেহ-মমতার সাথে বসবাস করবে।

১. তাই তিনি ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا

'তোমরা একে অন্যের খারাবি ও দোষ তালাশ করবে না।'

২. তিনি আরো বলেন,

وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا

'একে অন্যের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে না এবং একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না।'

৩. তারপর বলেন,

وَكُونُوا إِخْوَانًا

'আর তোমরা ভাই-ভাই হিসেবে জীবন যাপন করো।'

সুবহানাল্লাহ্! এটা কতই-না সুন্দর অনুভূতি যে, আমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা এবং মানুষ হিসেবে পরস্পর ভাই-ভাই।

কাউকে নিয়ে তামাশা করার প্রতি তিরস্কার

কাউকে নিয়ে হাসি-তামাশা করা বা তাকে কোনো লোকসমাগমে অপমান করা এটা আল্লাহ্‌র খুবই অপছন্দনীয় একটা কাজ। তিনি পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন–

لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ

'তোমারের কেউ যাতে অন্যের ব্যাপারে হাসি-তামাশা না করে।'[৪১]

অথচ আমরা তো আজ একে কিছুই মনে করি না।

কাউকে তাচ্ছিল্যকারীর পরিণতি

অন্যকে তাচ্ছিল্যকারীর পরিণতি কী হবে? একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة, فيقال له: هلم هلم فيجئ بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه, ثم يفتح له باب أخر فيقال له: هلم هلم فيجئ بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه فما يزال كذالك, حتى أن الرجل ليفتح له الباب فيقال له: هلم هلم, فما يأتيه.

'হযরত হাসান (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যারা অন্যেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে (অর্থাৎ– কথায়-কথায় হাসিঠাট্টা করে, তার দোষ ধরতে থাকে, তাকে নিয়ে তামাশা করতে থাকে) এসব তাচ্ছিল্যকারীদের জন্যে কেয়ামতের দিন যখন জান্নাতের দরজা খোলা হবে, তখন তাদের বলা হবে, এ দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে এসো। তারপর তারা তাদের পেরেশানি সত্ত্বেও সেখানে উপস্থিত হবে। কিন্তু দরজায় উপস্থিত হওয়ামাত্রই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারপর তার জন্যে আরেকটি দরজা খোলা হবে এবং বলা হবে, এই দরজা দিয়ে এসো। সেখানেও যখন সে প্রবেশ করতে যাবে, তৎক্ষণাৎ তার জন্যে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এভাবে কয়েকবার তার সাথে এমন আচরণ হতে থাকবে। এমনকি একসময় তার জন্যে জান্নাতের দরজা খোলা হবে কিন্তু সে আর ওই দিকে অগ্রসর হবে না।'

---

৪১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১১

সে এজন্যে জান্নাতের দরজার দিকে যাবে না যে, সে বুঝতে পারবে, তার সাথে মশকারা করা হচ্ছে। যে দুনিয়াতে কারো সাথে তামাশা করবে, তারই সাথে সেখানে এমন আচরণ করা হবে। একেই বলে কর্মের মতোই ফলাফল। তাকে বলা হবে, তুমি দুনিয়াতে মানুষের সাথে এমন করতে আজ নিজে তা ভোগ করো। সেদিন তার অনুভূতি হবে, হায়! আমি কেন আল্লাহর বান্দাদের নিয়ে তামাশা করতাম! এ-কারণেই আমাদেরকে এই দুনিয়াতে শ্রদ্ধা ও মমতা নিয়ে বসবাস করা চাই।

শ্রেষ্ঠ কালাম

এ-ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ইরশাদ করেছেন, তা স্বর্ণের অক্ষরে লিখে রাখার মতো। মানুষ এর ওপর আমল করলে দুনিয়াতে থেকেই জান্নাতের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। তিনি ইরশাদ করেন–

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ

'যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তার সাথে তুমি সম্পর্ক গড়ো। আর যে তোমার প্রতি অন্যায় করে, তাকে ক্ষমা করে দাও। আর যেব্যক্তি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করো।'

এটা বেলায়াত পদধারীদের এমন একটি গুণ, যা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেন। প্রতিটি মুমিন বান্দার মাঝে এই গুণটি বিদ্যমান থাকুক।

মানুষের আত্মীয়তার চার চক্র

দুনিয়াতে আমাদের আত্মীয়তার মূলতত্ত্ব কিন্তু সবাই আল্লাহর বান্দা হওয়ার মাঝে প্রতিষ্ঠিত। তারপর বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ রেখে আত্মীয়তার এই বন্ধনকে কল্পনা করা যায়।

১. বংশ : যে সীমানাটা এই মূলতত্ত্বের একেবারে কাছাকাছি তার নাম হলো বংশ। অর্থাৎ– রক্তের সম্পর্কের কারণে যারা আত্মীয় হয়। এক ঘরে যারা বসবাস করে এবং তাদের বন্ধুবান্ধব, হীতাকাঙ্ক্ষী ও নিকটাত্মীয়গণ। তারা বংশের এই চক্রের অন্তর্ভুক্ত। শরীয়ত আমাদেরকে এদের সবার সাথে শ্রদ্ধা ও স্নেহ-ভালোবাসার সাথে আচার-ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়। তাদের মধ্যে কেউ আমাদের মা, কেউ পিতা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়েসহ

অন্যান্য আত্মীয়। ইসলামি শরীয়ত এদের সবার সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে তার শিক্ষা দেয়।

যেমন– মায়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ أُمَّهَاتِكُمْ

'জান্নাত হলো তোমাদের মায়ের পদতলে।'

পিতার ব্যাপারে বলা হয়েছে,

رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الوَالِدِ

'পিতার সন্তুষ্টির মাঝে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত।'

স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি সম্মান শিখিয়ে বলা হয়েছে,

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَّسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

'যদি আমি সৃষ্টির মাঝে কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে নারীদের আদেশ করতাম, তারা যেন নিজেদের স্বামীকে সেজদা করে।'

এমনভাবে সম্মান করার শিক্ষা দিয়েছেন।

স্বামীকে শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

'তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে তার পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

ছেলের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন,

رِيْحُ الْوَلَدِ مِنْ رِيْحِ الْجَنَّةِ

'ছেলের সুবাস হলো জান্নাতের সুবাস।'

মেয়ের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

'যেব্যক্তির মেয়ে সন্তান থাকে আর সে তাকে জীবন্ত হত্যা না করে এবং ছেলেকে তার ওপরে প্রাধান্য না দেয়, ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'

ভাইয়ের ব্যাপারে তিনি বলছেন,

حَقُّ كَبِيْرِ الْإِخْوَةِ عَلَى الصَّغِيْرِ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ

'ছোট ভাইয়ের ওপর বড় ভাইয়ের অধিকার ছেলের ওপর পিতার অধিকারের মতো।'

এতে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের শ্রদ্ধাবোধ শিক্ষা দিয়েছেন। এভাবে নিকটাত্মীয়দের সাথে শ্রদ্ধা ও স্নেহের সাথে ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন। একে আত্মীয়তার বন্ধন বলা হয়েছে। যেখানেই আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক পাওয়া যাবে, সেখানেই সম্পর্ক ধরে রাখা চাই। এর মর্যাদা এতো বেশি দেওয়া হয়েছে, এ-ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই বলছেন,

'যে তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।'

যেব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করে, আল্লাহ্ তাকে অপছন্দ করেন। তাই তো তিনি ইরশাদ করেন–

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ

'আল্লাহ্ যেসব সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক ত্যাগ করে।'[৪২]

বর্তমানে তো এসব সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা হয় না।

ভাই ভাইকে বলে, আজ থেকে তোমার সাথে কোনো কথা নেই।

এভাবে বোন ভাইকে বলে।

এক আত্মীয় অপর আত্মীয়কে বলে ইত্যাদি।

বহু বছরের সম্পর্ক চোখের পলকেই শেষ। রক্ত এতোই সাদা হয়ে যায়। সন্তান বৃদ্ধ বয়সে তার পিতাকে ছেড়ে চলে যায়। কারণ, তখন তো পিতার সেবা-যত্নের প্রয়োজন পড়ে।

২. প্রতিবেশী : বংশের কাছাকাছিই আরো একটি সম্পর্ক রয়েছে, যা হলো প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক। মানুষের ঘরের আশেপাশে এমনকি পুরা একটি মহল্লায় যত ঘরবাড়ি থাকে এর অধিবাসীগণ সবাই একে অন্যের প্রতিবেশী হন। ইসলামি শরীয়ত প্রতিবেশীদের অধিকার স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ করেছে।

---

৪২. সূরা বাকারা : আয়াত ২৭

প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা

হাদীছে পাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

'আল্লাহর শপথ! আল্লাহর শপথ! আল্লাহর শপথ! ওই ব্যক্তি কখনো ঈমানদার হতে পারে না, যার প্রতিবেশীরা তার অনিষ্ট থেকে নিস্তার পায় না।'

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমনিতেই বলে দেওয়া যথেষ্ট ছিল। তথাপি তিনি তিন-তিনবার শপথ করে বলেছেন, ওই ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যার প্রতিবেশীরা তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়।

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ فِي الْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

'প্রতিবেশীদের অধিকারের ব্যাপারে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এত বেশি এসেছেন যে, আমি আশঙ্কা করতে লাগলাম, সম্ভবত প্রতিবেশীদের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে।'

প্রতিবেশী তিন ধরনের

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إن الجيران ثلاثة : جار له حق واحد , جار له حقان , و جار له ثلاثة حقوق . فالجار الذي له ثلاثة حقوق : الجار المسلم ذو الرحم فله حق الجوار و حق الإسلام و حق الرحم . و أما الجار الذي له حقان : فالجار المسلم له حق الإسلام و حق الجوار . و أما الذي له حق واحد : فالجار المشرك .

'প্রতিবেশী মোট তিন ধরনের হয়।

১. যার অধিকার একটি।

২. যার অধিকার দুটি।

৩. যার অধিকার তিনটি।

যে প্রতিবেশীর অধিকার তিনটি, সে হলো মুসলমান আত্মীয় প্রতিবেশী। তাই তার একটি অধিকার হলো প্রতিবেশী হিসেবে, আরেকটি হলো মুসলমান হিসেবে আর তৃতীয়টি হলো আত্মীয় হিসেবে।

আর যে-প্রতিবেশীর অধিকার দুটি, সে হলো মুসলমান প্রতিবেশী। তার একটি অধিকার হলো মুসলমান হিসেবে আর অন্যটি হলো প্রতিবেশী হিসেবে।

তারপর যেব্যক্তির অধিকার মাত্র একটি, সে হলো অমুসলিম প্রতিবেশী।'

অর্থাৎ– যদি কোনো অমুসলিমও প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করে, তাহলে ওই অমুসলিমেরও প্রতিবেশী হিসেবে একটি অধিকার রয়েছে। এটিই ইসলামের শিক্ষা।

৩. ঈমানদার : আত্মীয়তার সীমার ভেতরে আরো একজন ব্যক্তি রয়েছেন। আর তিনি হলেন ঈমানদার। অর্থাৎ– পৃথিবীতে যত ঈমানদার রয়েছে, এরা সবাই একে অন্যের আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ সকলেই একে অন্যের ভাই। তাই তো তিনি ইরশাদ করেছেন,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।'

সীরাতুন্নাবী থেকে মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কয়েকটি নমুনা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানদারদের খুবই যত্ন নিতেন।

১. আশ্চর্যের বিষয় হলো, হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে, যদি কেউ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করে, তবে তিনি জবাবে لبيك বলেন।

২. কোনো ভিক্ষুক এলে তাকে কখনো ফিরিয়ে দিতেন না।

৩. বৃদ্ধদের অগ্রাধিকার দিতেন। হযরত আবুবকর (রাযি.) তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে কালিমা পড়াতে নিয়ে এলে তিনি ইরশাদ করেন– আপনি আপনার বৃদ্ধ পিতাকে কেন নিয়ে এলেন? বললে তো আমি নিজেই সেখানে পৌঁছে যেতাম।

৪. তিনি ইরশাদ করেন– আমি রাতে যখন ঘুমাই, তখন আমার মনে কারো ব্যাপারে কোনো ঘৃণা বা শত্রুতা থাকে না। এটা আমার সুন্নাত। আর যে আমার সুন্নাতের ওপর আমল করবে, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।

৫. আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারে এতো বেশি ব্যথা ছিল যে, তিনি মন্তব্য করলেন, যার অন্তরে আমার উম্মতের ব্যাপারে কোনো দরদ থাকবে না, সে আমার উম্মত নয়।

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا * مرادیں غریبوں کی بر لانے والا

'নবীদের মাঝে রহমত উপাধিপ্রাপ্ত তিনি। অসহায়দের উদ্দেশ্য পূরণকারী তিনি।

غریبوں کا ملجا یتیموں کا ماوا * وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا

'গরিবের ভরসা আর এতিমদের ঠিকানা তিনি। তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের দুঃখে দুঃখিত।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

একটি আশ্চর্য ঘটনা শুনুন। একথার ওপর মুহাদ্দিছীনে কেরাম তাঁদের কিতাবে একটি অধ্যায়ও রচনা করেছেন।

যেমন– ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যেব্যক্তি মারা গেল, তার রেখে যাওয়া সম্পদ তার ওয়ারিসগণ পাবে।'

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) ইরশাদ করেন– (সুবহানাল্লাহ্! পড়লে হয়রান হতে হয়) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

'আমি ঈমানদারদের জন্যে তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়।'

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

'আর তাদের থেকে যেব্যক্তি ইন্তেকাল করে এবং তার নিকট কারো ঋণ থেকে যায়; কিন্তু এ পরিমাণ সম্পদ তার না থাকে, তাহলে তা আমাদের দায়িত্বে। আর যেব্যক্তি সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করে, তার সম্পদ তার ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা হবে।

দয়ালু নবীর মমতাপূর্ণ দু'আ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আশ্চর্য দু'আ করেছেন। তিনি কখনো-কখনো কাউকে কোনো একটি বিষয় নরম মেজাজে বুঝিয়ে বলতেন আবার গরম মেজাজেও কখনো-কখনো বলতেন। যখন তবিয়ত যে-রকম থাকত। কিন্তু তিনি ওই ব্যক্তির জন্যে এক আশ্চর্য দু'আ করেছেন। কী সেই দু'আ?হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَللّٰهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَالِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হে মাবূদ! আমি যদি দুনিয়াতে তোমার কোনো বান্দার সাথে কঠোরতা করি, তবে ওই কঠোরতাকে তার জন্যে কেয়ামতের দিবসে নৈকট্য লাভের উসিলা বানিয়ে দাও।'

আল্লাহু আকবার!

মানবতার এই প্রাণপুরুষের কর্ম দেখে বিবেক পর্যন্ত হয়রান হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্! বোঝাতে গিয়ে আমি যদি কারো সাথে কোনো ধরনের কঠোর মনোভাব পোষণ করি, তাহলে আমার এই কঠোরতাকেও আপনি কেয়ামতের দিন তার জন্যে রহমত ও নৈকট্য লাভের কারণ বানিয়ে দিন।'

৪. মানবতার সীমা রেখা : ঈমানের সীমানার চতুর্দিকে আরো একটি বেষ্টনী রয়েছে। আর তা হলো মানবতার বেষ্টনী। সুতরাং মানুষ হওয়ার সুবাদে আমরা সবাই আল্লাহ্র বান্দা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

كُوْنُوْا عِبَادَاللهِ إِخْوَانًا

'আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও।'

মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে আমাদের। কারণ, এটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা।

মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অনুপম উদাহরণ

শুনুন! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বমানবতার কী উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

জনৈক ইহুদির জানাযার প্রতি সম্মান

মানুষ তো জীবিত লোকদের সম্মান করে আর তিনি মৃত লোকদেরও সম্মান করতেন। হাদীছে এসেছে,

كان سهل ابن حنيف و قيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة ,
فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أى من أهل الذمة , فقالا إن النبي صلى الله
عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه جنازة يهودي فقال أليست نفسا

'একদা হযরত সাহ্ল ইবনে হানীফ ও কায়েস ইবনে সা'দ কাদেসিয়ায় বসা ছিলেন। তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলে তারা উভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদের বলা হলো, এটা তো একজন কাফেরের জানাযা! তারা জবাবে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে একদা জানাযা অতিক্রম করার সময় তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। বলা হলো, এটা তো একজন ইহুদির জানাযা ছিল। তিনি জবাবে বললেন, এটা কি একজন মানুষের প্রাণ নয়?'

আল্লাহু আকবার!

একজন ইহুদির জানাযা দেখে শুধু মানবতার প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন! যদি আল্লাহর হাবীব একজন ইহুদির লাশকে সম্মান করতে পারেন, তাহলে আমরা কি একজন জীবিত মানুষকে সম্মান করতে পারি না? অথচ সে তো কালিমাপড়া আল্লাহর নেক বান্দা।

জনৈক ইহুদি আলেমের সাথে সদ্ব্যবহার

ইহুদিদের জনৈক আলেমের নাম ছিল যায়েদ বিন সা'না, যার আলোচনা হাদীছে পাকেও এসেছে।

زيد بن سعنة الحبر أحد أحبار يهود ومن أكثرهم مالا أسلم فحسن إسلامه و
شهد مع النبي مشاهد كثيرة وتوفي في غزوة تبوك مقبلا إلى المدينة

'যায়েদ ইবনে সা'না ইহুদি আলেমদের একজন ছিলেন। সম্পদশালী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। অনেক ভালোভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কয়েকটি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁবুকের যুদ্ধ থেকে মদীনায় আসার পথে ইন্তেকাল করেন।

روى عنه عبد الله بن سلام أنه قال: لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنين لم أخبرهما

তাঁর থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাযি.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেল, যখন আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক দেখলাম, তখন আমি তাঁর মাঝে নবুওতের সবগুলো নিদর্শনই দেখতে পেয়েছি। কিন্তু দুটি নির্দশন সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারিনি।

সেই দুটি নিদর্শন কী ছিল? তাওরাত কিতাবে উল্লেখ আছে,

منه: يسبق حلمه غضبه ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما

'সর্বশেষ নবীর ধৈর্য তাঁর রাগের ওপর প্রাধান্য পাবে। আর যদি তাঁর সাথে কেউ অজ্ঞতাপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে, তাহলে তাঁর ধৈর্য আরো বেড়ে যাবে।'

তিনি বলেন, এই দুটি নিদর্শন এমন ছিল, যেগুলো আমার তালাশ করার প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি বলেন,

فكنت أتلطف له لأن أخالطه وأعرف حلمه وجهله

'তাই আমি পরিকল্পনা করছিলাম, কখন সুযোগ পাই আর তাঁর সাথে মিলেমিশে তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করি।

তারপর তিনি বলেন,

قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام من الحجرات, ومعه علي بن أبي طالب فأتاه رجل على راحلته كالبدوي, فقال: يا رسول الله! إن قرية بني فلان قد أسلموا فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت وقد أصابتهم سنة وشدة فلم يكن معه شيء قال زيد: فدنوت منه فقلت يا محمد! إن رأيت أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا

'তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর কামরা থেকে বের হলেন এবং হযরত আলী (রাযি.)ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। একলোক তার বাহনের ওপর আরোহণ করে এল যেমন– কোনো গ্রাম্য ব্যক্তি

এসে থাকে। সে বলতে লাগল, হে আল্লাহর প্রিয় হাবীব! অমুক গ্রামের মানুষেরা ঈমান গ্রহণ করেছে। আপনি চাইলে তাদের কোনো সাহায্য করতে পারেন। তাদের সেখানে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে। তখন দেওয়ার মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছুই ছিল না। হযরত যায়েদ (রাযি.) বলেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হুজুর! আপানি চাইলে অমুক বাগানের খেজুরগুলো আমার কাছে বিক্রি করতে পারেন।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, আমি এখনই মূল্য দিয়ে দেব; আপনি আমাকে খেজুরগুলো দিয়ে দেবেন।

فقال: لا يا أخا يهود ولكن أبيعك تمرا معلوما

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, আমি তোমাকে এই পরিমাণ খেজুর দেব; নির্দিষ্ট কোনো বাগানের খেজুর শর্ত নয়।

একে بيع سلم (মূল্য নগদ পণ্য বাকি) বলে।

فقلت: نعم فبايعني وأعطيته ثمانين دينارا فأعطاه الرجل, قال زيد: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه, فلما صلى الجنازة أتيته, فأخذت بمجامع قميصه ورداءه ونظرت إليه بوجه غيظ ثم قلت: ألا تقضي يا محمد حقي فوالله ما علمتك يا بني عبد المطلب لسئ القضاء مطل, قال: فنظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه ثم قال: أي عدو الله, أتقول لرسول الله ما أسمع! فو الذي بعثه بالحق لولا ما احاذر فوته لضربت بسيفي رأسك ورسول الله ينظر إلى عمر في سكون وتبسم ثم قال: يا عمر! أنا وهو إلى غير هذا منك احوج أن تأمره بحسن الاقتضاء وتأمرني بحسن القضاء, اذهب يا عمر! فاقضه حقه وزده عشرين صاعا مكان ما روعته, قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني وزادني فأسلمت

'আমি বললাম, চলুন ঠিক আছে। সুতরাং লেনদেন হয়ে গেল এবং আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মূল্য দিয়ে দিলাম। তিনি দীনারগুলো

উক্ত গ্রাম্য ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন, এগুলো তাদের জন্যে নিয়ে যাও। যায়েদ বলেন, এখনো নিধারিত দিন থেকে (যে দিন তিনি আমাকে খেজুর দেবেন) কিছু দিন বাকি ছিল। তিনি এক আনসারী সাহাবির জানাযার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিলেন এবং তাঁর সাথে হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতও ছিল। জানাযার শেষে আমি এসে তাঁর জামা চেপে ধরলাম এবং রাগান্বিত হয়ে তাকে বললাম, 'মুহাম্মাদ! তুমি কি আমার হক আদায় করবে না? খোদার কসম করে বলছি, আবদুল মুত্তালিবের বংশধর ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে খুবই উদাসিন। অর্থাৎ তালবাহানা করতে অভ্যস্ত। তিনি হুজুর নবীজির রাগ উঠানোর জন্য এমনটা করেছেন।

তিনি বলেন, তারপর আমি যখন ওমরের দিকে তাকালাম। দেখলাম, তাঁর চোখ আমার দিকে নিপতিত।

তারপর ওমর (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি আল্লাহর প্রিয় দোস্তকে কী বলছ? আল্লাহর কসম, যদি তোমার এই হক আদায় না হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে আমি তোমার মাথাটা উড়িয়ে দিতাম।

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাযি.)-এর দিকে স্বাভাবিকভাবে মুচকি হেসে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, হে ওমর! আমি ও সে তোমার এমন ধমকের মুখাপেক্ষী নই। তোমার ধমক তো অন্যভাবে হওয়া উচিত ছিল। আর তাহলো, তুমি তাকে বলতে, তুমি তোমার হক সুন্দরভাবে চাও আর আমাকে বলতে, আপনি তার হক দ্রুত আদায় করুন।

তারপর তিনি বললেন, ওমর! যাও তাকে তার প্রাপ্য খেজুর দিয়ে দাও। তবে বিশ কেজি খেজুর বেশি দিবে। কারণ, তুমি তাকে ধমক দিয়েছ।

যায়েদ বলেন, তারপর ওমর আমাকে সাথে নিয়ে আমার হক আদায় করে দিলেন এবং বিশ কেজি খেজুর বেশি দিলেন আর আমি তখনই মুসলমান হয়ে গেলাম।

আল্লাহু আকবার! আল্লাহর প্রিয় হাবীব আমাদেরকে অমুসলিমদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে কেমন শিক্ষা প্রদান করেছেন!

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অমুসলিমদের জন্য স্বচ্ছলতার দু'আ

মক্কার ওই কাফেররা, যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতই-না কষ্ট দিয়েছে এবং সাধারণ মুসলমানদের সাথে কত দুর্ব্যবহার

করেছে। একদা তাদের এমন কঠোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, তারা চামড়া খাওয়া আরম্ভ করল। এমনকি মৃত জানোয়ার ভক্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছিল। ক্ষুধায় তাদের অবস্থা এমন আকার ধারণ করল যে, আসমানের দিকে তাকালে তারা শুধু ধোঁয়া দেখতে পায়। দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী শত্রুর এমন অবস্থা দেখলে তো সবাই আনন্দিত হয়। কিন্তু মক্কাবাসীর বেলায় এমনটা হয়নি। বরং আবু সুফিয়ান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলতে লাগলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেন, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার আদেশ দেন, অথচ আপনার নিজ জাতি আজ ধ্বংসের সম্মুখিন। আপনি তাদের জন্যে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন।'

হাদীছ শরীফে এসেছে, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্যে দু'আ করলেন আর আল্লাহ্ তাঁর এই দু'আর বরকতে মক্কার অধিবাসীদের থেকে দুর্ভিক্ষ তুলে নিলেন।

মক্কার কাফেরদের জন্যে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ

ছুমামা ইবনে আছাল (রাযি.) একজন সাহাবি ছিলেন, যিনি ইয়ামামায় বাস করতেন। তার পক্ষ থেকে মক্কার অধিবাসীদের জন্যে গম আসত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে যখন জানতে পারলেন, মক্কার মানুষেরা নবী কারীমের সাথে অন্যায় আচরণ করেছে, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আজ থেকে মক্কায় গমের একটা দানাও যাবে না। আর এতে মক্কার মানুষ চরম মসিবতে নিপতিত হলো।

فلما قدم مكة ثمامة بن اثال قال لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم زاد ابن هشام ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا

'হযরত ছুমাম ইবনে আছাল (রাযি.) যখন মক্কায় এলেন, তখন তিনি তাদের বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রিয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি না দেবেন, ইয়ামামা থেকে গমের একটা দানাও মক্কায় প্রবেশ করবে না।

তারপর কী হলো?

فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم إنك تأمر بصلة الرحم

'মক্কার অধিবাসীরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে একটি চিরকুট লিখল, আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। আমাদের গম বন্ধ হয়ে গেছে আর অনাহারে আমাদের মৃতপ্রায় অবস্থা। আমাদের প্রতি একটু দয়া করুন।

فكتب إلى ثمامة أن يخلي بينهم و بين الحمل إليهم

'তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামার উদ্দেশে আরেকটি চিরকুট লিখলেন, হে ছুমামা! তাদের গম দেওয়া বন্ধ করো না। তাঁর এই অনুরোধে পুনরায় মক্কায় গম আসা আরম্ভ হলো। তিনি এমনটি কেন করলেন? একমাত্র মানবতার খাতিরে করেছেন। এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

হাতেম তাঈ-এর কন্যার সাথে সদ্ব্যবহার

প্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাঈর মেয়েকে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করা হলো, তখন সে অমুসলিম ছিল। তথাপিও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করলেন। যেমন– হাদীছে আছে,

أصابت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حاتم, فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه و سلم في سبايا طئ فجعلت ابنة حاتم في حظيرة بباب المسجد فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه و كانت امرأة جزلة, فقالت: يا رسول الله! هلك الوالد و غاب الوافد, فامنن علي من الله عليك, قال من وافدك, قالت عدي بن حاتم قال الفار من الله و رسوله ثم مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم و تركني حتى مر بي ثلاثا فأشار إلى رجل من خلفه ان قومي فكلميه, فقمت فقلت: يا رسول الله! هلك الوالد و غاب الوافد, فامنن على من الله عليك قال: قد فعلت, فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك ثم آذنيني فسألت عن الرجل الذي أشار إلى فقيل علي بن أبي طالب و قدم ركب من بلي فأتيت رسول الله

صلى الله عليه وسلم فقلت : قدم رهط من قومي قالت : فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم و حملني, و أعطاني نفقة فخرجت حتي قدمت الشام على أخي عدي بن حاتم , فقال لها عدي : ماترين فى أمر هذا الرجل, قالت أرى أن تلحق به

'তাঈ গোত্রের লোকজন যখন সাহাবায়ে কেরামের হাতে বন্দি হলো এবং তাদেরকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করা হলো, তখন তাদের মধ্যে হাতিম তাঈ-এর এক মেয়েও ছিল। মসজিদে নববির দরজার পাশের একটি জায়গায় তাকে আলাদা থাকতে দেওয়া হলো। নবীজি যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে দাঁড়িয়ে গেল। সে বড় বিচক্ষণ মহিলা ছিল। বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন আর আমার অভিভাবক ভাইটিও আমার কাছে নেই। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অভিভাবক কে? সে বলল, আমার ভাই আদী ইবনে হাতিম।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল থেকে পলায়নকারী। যেহেতু আদী ইবনে হাতিম উক্ত লড়াই থেকে আগেই পলায়ন করেছিল, তাই নবীজি তার ব্যাপারে এভাবে বললেন।

হাতিমের মেয়ে বলছে, তারপর নবীজি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। এভাবে তিনবার এমন হলো। আর আমি প্রতিবারেই একই দরখাস্ত করেছি। কিন্তু হুজুর চুপ করে চলে যান। তাঁর পেছনে একজন লোক ছিল। তিনি আমাকে ইশারা করলেন, দাঁড়িয়ে পুনরায় আবেদন করো। আমি পুনরায় দাঁড়িয়ে চতুর্থবারের মতো বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন আর আমার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাই আমার থেকে অনেক দূরে। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন; আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করবেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি তোমার বিষয়টি দেখছি; তুমি তাড়াহুড়ো করো না। এমন কাউকে তালাশ করো, যে তোমাকে নিরাপদে তোমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে।

অর্থাৎ– আমার ব্যাপারে তিনি এ-কারণেই চুপ করে আছেন যে, কোনো বিশ্বস্ত লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। কারণ, সে একজন নারী ছিল আর তাকে

ঠিকমতো পৌঁছিয়ে দেওয়া একটি বিরাট দায়িত্ব। তাঁর জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের হেফাযত খুবই স্পর্শকাতর ছিল। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে দিলেন, এমন কোনো লোকের সন্ধান পেলে আমাকে জানাবে।

তারপর আমি আমার দিকে ইশারাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারি, তাঁর নাম আলী ইবনে আবী তালিব (রাযি.)।

শেষ পর্যন্ত আরোহীদের আরো একটি দল গ্রেফতার হয়ে এল। তাই আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোত্রের কিছু নির্ভরযোগ্য লোক এসে পড়েছে।

সে বলল, আল্লাহর রাসূল আমাকে কাপড় দিয়েছেন, বাহন দিয়েছেন এবং যাওয়ার খরচের অর্থও দিয়েছেন। তারপর আমি সেখান থেকে বের হয়ে সিরিয়ায় আমার ভাই আদী ইবনে হাতিম-এর কাছে পৌঁছে যাই। তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মতামত কী?

আমি বললাম, আমি চাই, তুমিও তাঁর গোলাম হয়ে যাও। তারপর আদী ইবনে হাতিম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

অমুসলিম মেয়ের মাথায় রাসূলের চাদর

তাঈ গোত্রের লোকেরা যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এল, তখন এক যুবতি মেয়ের সন্তান হারিয়ে গেল। সে মা ছিল। তাই এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করছে যে, আমার সন্তানটা কোথায় গেল? এমতাবস্থায় তার মাথা থেকে চাদরও পড়ে গেল। আর এ অবস্থায় সে নবীজির সামনে এসে পড়ল। নবীজি নিজের চাদরখানা এক সাহাবিকে দিয়ে বললেন, ওই মহিলাকে বলো এটা পরিধান করে নিতে। সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো একজন অমুসলিমের সন্তান। তিনি বললেন,

'যদিও সে অমুসলিমের মেয়ে; কিন্তু মেয়ে তো। আজ তুমি যদি তাকে ঢেকে দাও; তাহলে কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তোমার অপরাধগুলো ঢেকে দেবেন। মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের এই শিক্ষা প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন।

কয়েদিদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ

তিনি ইরশাদ করেন–

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

'প্রকৃত মুমিন সে, যার থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদ থাকে।

এমনকি যেসব অমুসলিম মুসলমানদের অধীনে জিম্মি হিসেবে থাকে, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেন সাথেও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

دِمَائُهُمْ كَدِمَائِنَا وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا

'তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো। তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতো।'

আর যদি অকারণে কেউ কোনো জিম্মিকে হত্যা করে, তার ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا

'এদের কেউ হত্যা করলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেই পাওয়া যায়।'

অন্য হাদীছে তিনি একটি আশ্চর্য কথা বলেছেন,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَةٍ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'সাবধান! যে কোনো জিম্মির প্রতি অন্যায় করবে বা তার কোনো ক্ষতি করবে অথবা তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি মাল বহন করাবে অথবা তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে তার থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নেবে, আমি কেয়ামতের দিন সেই অমুসলিমের উকিল হব। (অর্থাৎ– ওই ঈমানদার থেকে তার হক আদায় করিয়ে দেব।) আল্লাহু আকবার!

মানবতার প্রতি সম্মানের যে-শিক্ষা রাসূলে পাক দিয়েছেন, এমন শিক্ষা দুনিয়ার ইতিহাসে অন্য কেউ দিতে পারেনি।

نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے
وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیغام آئے

'নবীদের আগমনের ধারাবাহিকতায় নবীদের ইমাম (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশেষ বাণী নিয়ে এলেন।'

جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر

سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے

'তিনি বান্দার ফিকির আল্লাহর দরবারে ফেরাতে এবং মানুষকে মানবতা শিক্ষা দিতে এসেছেন।'

وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی

وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے

'তাঁর আগমনে দুনিয়ার বুকে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। কারণ, তাঁর আগমনের পর মানুষের কাছে ফেরেশতা থেকেও সালাম আসে।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে মানুষ হিসেবে সবার প্রতি দয়াশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন। মুসলমান হিসেবে একে অন্যের প্রতি মর্যাদাবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

ইল্‌ম ও তাসাওউফ

'আলহামদুলিল্লাহ্! আমাদের এই পথ হলো মধ্যপন্থার পথ, যা কঠোরতা ও শিথিলতা থেকে মুক্ত। বর্তমান দুনিয়াতে এমন কিছু দরবেশ লোকও রয়েছে, যারা ইল্‌মকে বড় বাধা বলে মানুষদের ওলামায়ে কেরাম থেকে দূরে সরানোর ষড়যন্ত্র করছে। তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত। আবার কিছুলোক এমনও রয়েছে, যারা বলে, তাসাওউফ হলো অজ্ঞদের সৃষ্টি। এটা আরবরা নয়– অনারবরা আবিষ্কার করেছে। তাদের মতে তাসাওউফের সম্পর্ক ইউনানের সাথে– মদীনার সাথে নয়। অথচ তাসাওউফ তথা ইহ্সানের যে-আলোচনা পবিত্র হাদীছে পাকে করা হয়েছে, একে তারা বেমালুম ভুলেই গেছে যে, ইহ্সান দ্বারা তাসাওউফের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।'

ইল্‌ম ও তাসাওউফ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ

و قال تعالى فى مقام آخر : يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

ইল্‌মে শরীয়ত ও ইল্‌মে তাসাওউফ

ইল্‌মের দুটি দিক রয়েছে।

এক. বাহ্যিক অবস্থা, যার দ্বারা ইসলামি শরীয়তের বিধবিধান জানা যায়।

দুই. প্রথমোক্ত ইল্‌মের প্রভাব, যা মানুষের অন্তরে বিস্তার করে।

প্রথমটিকে ইল্‌মে শরীয়ত আর দ্বিতীয়টিকে ইল্‌মুল ইহসান বা ইল্‌মে তাসাওউফ বলে।

আমাদের যেসকল পূর্বসূরীগণ কুরআনুল কারীম থেকে রিসার্চ করে সকল ইল্‌ম বা বিদ্যা আবিষ্কার করেছেন এবং সেগুলোকে বিভিন্ন নামের মাধ্যমে চিহ্নিত করেছেন, উম্মত তাদেরকে ইমাম বলে সম্বোধন করেন। যেমন– ইমাম আবুহানিফা (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.)সহ প্রমুখ ইমামগণ। ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়াতে কিছু মনীষী এমনও ছিলেন, যাঁরা কুরআন ও হাদীছ থেকে রিসার্চ করে ইল্‌মুল ইহসান তথা ইল্‌মে তাসাওউফ সংকলন করেছেন। তাদেরও উম্মত ইমাম উপাধিতে ভূষিত করেছে। যেমন– শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (রহ.), খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরি (রহ.) ও খাজা বাহাউদ্দিন ইশ্‌কবন্দি বোখারি (রহ.) প্রমুখ।

তাসাওউফ ও সুলুকের জন্যে ইল্‌মের প্রয়োজন

সায়্যিদুত তায়েফাহ্ হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) বলেন, তাসাওউফ ও সুলূকের জন্যে ইল্‌ম থাকা আবশ্যক। তিনি বলেন,

مَنْ لَّمْ يَقْرَأِ الْقُرْاٰنَ وَلَمْ يَكْتُبِ الْحَدِيْثَ لَا يُقْتَدٰى بِهٖ فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ

'যেব্যক্তি কুরআন ও হাদীছ পড়েনি, সে দ্বীনি বিষয়ে অনুসরণীয় হওয়ার উপযুক্ত নয়।'

তাই যিকির ও সুলুকের লাইনের লোকদের ইল্‌ম থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইল্‌মে দীন অর্জন করতে বুযুর্গদের উৎসাহ

প্রথম তবকার বুযুর্গগণ তাদের মুরীদদের ইল্‌ম অর্জন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। মাকতূবাতে উল্লেখ আছে, 'সালেক (মুরীদ)-এর জন্য ইল্‌মে দীন অর্জন করা ব্যতীত এপথে অগ্রসর হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। অন্যথায় কাফের বা পাগল হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।'

ইবনুল জাওযি (রহ.)-এর মতো বিজ্ঞ মুহাদ্দিছ ও বুযুর্গ নিজের কিতাব 'তালবীসে ইবলীস'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন,

وما كان المتقدمون في التصوف إلا رءوس في القرآن و الفقه والحديث

'পূর্বেকার যেসকল বুযুর্গ ইল্‌মে তাসাওউফের সর্দার ছিলেন, তাঁরা ইল্‌মে তাফসীর, ইল্‌মে হাদীছ ও ইল্‌মুল ফিকহেও সুপণ্ডিত ছিলেন।'

এ-কারণেই হযরত হাসান বসরি (রহ.) মুসলিম জাতির নিকট যেভাবে একজন বড় বুযুর্গ হিসেবে পরিচিত, তেমনি একজন বড় মুহাদ্দিছ হিসেবেও পরিচিত। বোখারি শরীফে তাঁর হাদীছসমূহ অবশ্যই আপনাদের নজরে আসবে। যেমন– ইমাম বোখারি (রহ.) বলেন, قال الحسن البصري হযরত হাসান বসরি (রহ.) বলেন।

অজ্ঞতা শত্রুতার কারণ

এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে, যদি এ-সকল আলেম ইল্‌মের সুপণ্ডিত হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অধিক পরিমাণে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কেন? এর মৌলিক কারণ হলো, তাঁদের কথাবার্তা যেহেতু মারেফত ও ইশারা-ইঙ্গিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই সবার ভেতরে এই

যোগ্যতা থাকে না যে, সে এ-সকল কথাবার্তা বুঝবে। কারণ, একটি মূলনীতি আছে,

اَلنَّاسُ أَعْدَاءٌ لِّمَا جَهِلُوْا

'মানুষ যে সম্পর্কে অজ্ঞ, সে তার শত্রু হয়।'

কিছুলোক এমনও রয়েছে, যারা বুযুর্গদের কথাবার্তার উদ্দেশ্য ও ভাবভঙ্গিমাকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে তার ওপর ফতোয়া জারি করে বেড়ায়। অর্থাৎ– মূল কথাটি তাঁদের হলেও ব্যাখ্যাটা কিন্তু নিজের। একে বলে, توجيه القول بما لا يرضى به القائل 'বক্তা যে উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো একটি কথা বলেছেন আর ব্যাখাকারী নিজের মতো করে এর একটি ব্যাখ্যা ঠিক করেছেন, যার সাথে বক্তার কোনো সম্পর্ক নেই।'

এর একটি সহজ উদাহরণ হলো, আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে দেওবন্দ। তাদের বিভিন্ন রচনার আলোচনাগুলোকে কাটছাট করে এমন অর্থ সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তাদের ওপর এখন রাসূলে পাকের সাথে ধৃষ্টতার ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে। সকল যুগ আর সব ক্ষেত্রেই এমনটা হয়েছে।

সূফিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে আলেমদের সংকলন

এটাও একটা অশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে এমন কিছু মনীষী সৃষ্টি করেছেন, যারা বড়-বড় সূফি-সাধকদের পবিত্র আত্মাকে মানুষের সামনে পরিতৃপ্ত করে উপস্থাপন করেছেন। তাদের মধ্যে বড়-বড় মুহাদ্দিছ এবং আলেমগণও ছিলেন। যেমন–

১. ইবনুল জাওযী (রহ.) নিজেই صفوة الصفوة (সফওয়াতুস সফওয়াহ্) নামক কিতাব সংকলন করেছেন, যাতে বিভিন্ন মাশায়েখ ও সূফিদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

২. আল্লামা হাফেয যাহাবি (রহ.) سير أعلام النبلاء (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা) নামক একটি কিতাব সংকলন করেছেন।

৩. হযরত আবদুর রহমান মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) أخبار الأخيار (আখবারুল আখয়ার) নামক গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

৪. আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানি (রহ.) একজন বড় ফকীহ্ এবং সূফিও ছিলেন। তিনি তাসাওউফ সম্পর্কে الطبقات الكبرى (আত্ তাবকাতুল

কুবরা) নামক কিতাব সংকলন করেছেন এবং এতে সকল মাশায়েখের অবস্থা একত্রিত করে দিয়েছেন। আর ইল্‌মুল ফিকহ্ সম্পর্কে সংকলিত তার দুটি কিতাব كشف الغمة (কাশফুল গুম্মা) এবং ميزان الكبرى (মীযানুল কুবরা) তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

৫. ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)কে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এ-পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন যে, তিনি তাসাওউফের ওপর আরোপিত হতে পারে এমন সব ধরনের অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন।

৬. তারপরও যতসামান্য অভিযোগ যদি বাকি থাকে, তাকেও হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যেমন তাঁর লিখিত তাফসীরের কিতাব 'বয়ানুল কুরআন'-এর টীকায় 'মাসায়েলে সুলূক' নামে আপনি একটি খাজানা পাবেন। তিনি সেখানে তাসাওউফ ও পীর-মুরীদির হাকিকত এবং তার গোপন রহস্যকে কুরআন ও হাদীছের আলোকে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

তাসাওউফ কি অনারবদের তৈরী?

আলহামদু লিল্লাহ্! আমাদের মধ্যপন্থার এই রাস্তা কঠোরতা ও শিথিলতা থেকে মুক্ত। বর্তমান দুনিয়াতে এমন কিছু সুফি লোক বিদ্যমান, যারা দ্বীনি শিক্ষার উন্নতির পথে বড় বাধা বলে সাধারণ মানুষদের ওলামায়ে কেরাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে! তারা নিজেরাও গোমরা; অন্যদেরও গোমরা করার পাঁয়তারা করছে। আবার কিছুলোক এমনও রয়েছে, যারা তাসাওউফকে অনারবদের বানানো বলে দাবি করে। তারা বলে, এটা (তাসাওউফ) আরব নয়– আজমিদের বানানো। তারা তাসাওউফের সম্পর্ক ইউনানের সাথে উল্লেখ করে আর একথা ভুলে যায়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র হাদীসের মধ্যে ইহসানের যে নাম উল্লেখ করেছেন এটিও কোনো-না-কোনো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে। তারা অমনোযোগীতার সাথে নামায পড়ে; কিন্তু কারো কাছে গিয়ে নামায শিখবে এমন সুযোগ তাদের হয় না। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষ ওলামায়ে দেওবন্দ সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন।

এটা সব বান্দার আয়ত্তে থাকেও না। তাই ইজতেমার বাকি বয়ানগুলোতে নামায কীভাবে গঠন করতে হবে, কাজ-কর্মের খসড়া প্রস্তুতকরণ, কুরআনুল

কুবরা) নামক কিতাব সংকলন করেছেন এবং এতে সকল মাশায়েখের অবস্থা একত্রিত করে দিয়েছেন। আর ইল্‌মুল ফিকহ্ সম্পর্কে সংকলিত তার দুটি কিতাব كشف الغمة (কাশফুল গুম্মা) এবং ميزان الكبرى (মীযানুল কুবরা) তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

৫. ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.)কে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এ-পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন যে, তিনি তাসাওউফের ওপর আরোপিত হতে পারে এমন সব ধরনের অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন।

৬. তারপরও যতসামান্য অভিযোগ যদি বাকি থাকে, তাকেও হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যেমন তাঁর লিখিত তাফসীরের কিতাব 'বয়ানুল কুরআন'-এর টীকায় 'মাসায়েলে সুলূক' নামে আপনি একটি খাজানা পাবেন। তিনি সেখানে তাসাওউফ ও পীর-মুরীদির হাকিকত এবং তার গোপন রহস্যকে কুরআন ও হাদীছের আলোকে প্রমাণ করে দিয়েছেন।

তাসাওউফ কি অনারবদের তৈরী?

আলহামদু লিল্লাহ্! আমাদের মধ্যপন্থার এই রাস্তা কঠোরতা ও শিথিলতা থেকে মুক্ত। বর্তমান দুনিয়াতে এমন কিছু সুফি লোক বিদ্যমান, যারা দ্বীনি শিক্ষার উন্নতির পথে বড় বাধা বলে সাধারণ মানুষদের ওলামায়ে কেরাম থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে! তারা নিজেরাও গোমরা; অন্যদেরও গোমরা করার পাঁয়তারা করছে। আবার কিছুলোক এমনও রয়েছে, যারা তাসাওউফকে অনারবদের বানানো বলে দাবি করে। তারা বলে, এটা (তাসাওউফ) আরব নয়– আজমিদের বানানো। তারা তাসাওউফের সম্পর্ক ইউনানের সাথে উল্লেখ করে আর একথা ভুলে যায়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র হাদীসের মধ্যে ইহসানের যে নাম উল্লেখ করেছেন এটিও কোনো-না-কোনো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে। তারা অমনোযোগীতার সাথে নামায পড়ে; কিন্তু কারো কাছে গিয়ে নামায শিখবে এমন সুযোগ তাদের হয় না। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষ ওলামায়ে দেওবন্দ সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন।

এটা সব বান্দার আয়ত্তে থাকেও না। তাই ইজতেমার বাকি বয়ানগুলোতে নামায কীভাবে গঠন করতে হবে, কাজ-কর্মের খসড়া প্রস্তুতকরণ, কুরআনুল

কারীমের তেলাওয়াত কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি নিয়েও আলোচনা করা হবে।

میر جمع ہیں احباب درد دل کہ دے
پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے

মীর! বন্ধুরা তো কাছেই; বুকের বেদনা বলে দাও;
পাছে বন্ধুদের হৃদয়ের উষ্ণতা হারিয়ে না যায়।

দুটি আয়াতের মাঝে বিস্ময়কর সামঞ্জস্য!

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝

'হে মানবজাতি! তোমাকে তোমার প্রভু থেকে কোন বস্তু ধোঁকায় ফেলেছে?'[৪৩]

উক্ত আয়াতের অর্থের প্রতি একটু গভীরভাবে মনোনিবেশ করুন। সন্তান যখন রাগ করে, তখন মা তাকে অনেক আদর-যত্ন করে বোঝানোর চেষ্টা করে, বাবা! তুমি কেন রাগ করছ? আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের ওপর আমাদের জীবন উৎসর্গ হোক, যে তিনি তাঁর উদাসিন বান্দাদের প্রতিও রহমতের দৃষ্টি দেন। এটি কতই-না দয়ার দৃষ্টি!

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝

'এখানে আল্লাহ্ তা'আলা يا শব্দ ব্যবহার করেছেন। একে حرف ندا (আহ্বানসূচক শব্দ) বলা হয়। কেউ দূরে থাকলে তাকে উক্ত শব্দ দ্বারা আহ্বান করা হয়। এর দ্বারা জানা যায়, বান্দা তাঁর থেকে অনেক দূরে। কিন্তু কুরআনুল কারীমের অন্য একটি আয়াতে উল্লেখ আছে,

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

'আমি তার প্রাণসন্ধি থেকেও অতি নিকটে।'[৪৪]

আর এই আয়াত দ্বারা জানা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার জীবনসন্ধির থেকেও অনেক কাছে। অথচ حرف ندا (আহ্বানসূচক শব্দ) দ্বারা জানা যায়,

---

৪৩. সূরা ইনফিতার : আয়াত ৬
৪৪. সূরা কাফ : আয়াত ১৬

তিনি অনেক দূরে। ওলামায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, মানুষ ইল্‌মের দিক থেকে আল্লাহ্‌র অনেক কাছে আর গুণাবলির দিক থেকে অনেক দূরে।

'ইনসান' শব্দের পরিচয়

'ইনসান' শব্দটিও অনেক আশ্চর্যজনক। আলেমগণ এর তিনটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

১. إنسان (ইনসান) শব্দটি أُنس থেকে নির্গত। আর أُنس (উন্‌স) বলা হয় মহব্বতকে।

২. إنسان (ইনসান) শব্দটি نسيان (নিসইয়ান) থেকে নির্গত, যার অর্থ ভুলে যাওয়া।

৩. إنسان (ইনসান) শব্দটি آنس থেকে নির্গত। কুরআনে উল্লেখ আছে,

آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا

آنس শব্দের অর্থ হলো দেখা। তাহলে এখন إنسان (ইনসান) শব্দটির মোট তিনটি অর্থ হলো;

১. মহব্বতকারী।

২. যে ভুলে যায়।

৩. যে কোনো কিছু দেখে।

আমাদের আকাবিরগণ বলেন, ইনসানের জন্য উক্ত তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। তা এভাবে যে, মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখে। আর তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দার প্রতি তাঁর নূরের আলোকরশ্মি বর্ষণ করতে থাকেন। আর তা দেখে মানুষ সমস্ত দুনিয়াকে ভুলে থাকে।

رب শব্দের পরিচয়

তারপর তিনি ইরশাদ করেন غرك 'তোমাকে ধোঁকায় ফেলেছে।' بربك 'তোমার প্রভু থেকে।'

রব বলা হয় ওই সত্তাকে, যিনি কাউকে লালনপালন করেন। এই শব্দটি মাতাপিতার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন– তিনি ইরশাদ করেন–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

'হে আমার রব! আপনি তাদের ওপর রহম করুন, যেভাবে তারা ছোটকালে আমাকে লালনপালন করেছেন।'[৪৫]

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামও বলেছিলেন,

اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ

' তোমার রবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো।'[৪৬]

অর্থাৎ– রব শব্দটি মাখলুকের জন্যেও ব্যবহৃত হয় আবার সৃষ্টিকর্তার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উভয় ব্যবহারে ব্যবধান রয়েছে।

আল্লাহ্‌র রব হওয়া কখনো স্থান-কাল-পাত্র বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাই তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে,

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

'তিনি আসমান জমিনের রব।'

বরং তার চেয়েও আরো বেশি বলা হয়েছে,

رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ

'যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও রব।'[৪৭]

এখানে স্থান কিংবা কালের কোনো ব্যাপার নেই। আর মাতাপিতা যখন মুরুব্বী হন, তখন এর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে এবং তারা শুধু বিশেষ কয়েকজনের মুরুব্বী হন।

পালনকর্তা কে?

رب শব্দের অর্থ হলো পালনকর্তা, প্রয়োজনসমূহ পূর্ণকারী। অথচ বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় ধোঁকা হলো এই যে, মানুষ নিজেদের উপকরণকেই পালনকর্তা মনে করে।

কেউ তার দোকানকে।

---

৪৫. সূরা ইসরা : আয়াত ৩৪

৪৬. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪২

৪৭. সূরা সাফফাত : আয়াত ১৩৬

কেউ তার অফিসকে।

কেউ তার শিক্ষাকে।

আবার কেউ তার কর্মকে।

এ-কারণেই তারা শরীয়তের বিধিবিধান লঙ্ঘন করে; তথাপি এ-সকল জিনিসের ওপর আঁচড় লাগতে দেয় না। ব্যবসার জন্যে সুদের কারবারে জড়াতে হলেও সমস্যা হয় না। যেহেতু শরীয়তের বিধিনিষেধকে অমান্য করে তারা দুনিয়ার পেছনে পড়েছে। তাই বোঝা যায়, তারা একেই নিজেদের পালনকর্তা মনে করছে। এটাও মূর্তিপূজা। মূর্তি শুধু পাথরেরই হয় না; বরং চিন্তারও মূর্তি হয়।

بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے

'পাথরের তৈরী হোক কিংবা ধ্যানধারণা থেকে হোক, মূর্তির কল্পনা ছেড়ে দাও।'

یہ قوم اپنے براہیم کی تلاش میں ہے

صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ

'এই জাতি আজ আবার ইবরাহীমের সন্ধানে রয়েছে। কারণ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র আস্তানা আজ মন্দির হয়ে আছে।'

দৃষ্টি যখন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন থেকে সরে গিয়ে সৃষ্টির ওপর নিপতিত হয়, তখনই মানুষ তার সঠিক রাস্তা হারিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

'তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন আল্লাহ্‌কে ছেড়ে মূর্তির দিকে, তাহলে আমাকে বলো, তোমার এই চিন্তাধারা আর কুফরির মাঝে ব্যবধান কী?

ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

'এই চার ধরনের লোক হলো আমার পক্ষ থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত। নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালেহগণ।'[৪৮]

এদের মধ্য থেকে প্রথম দুজনের সম্পর্ক বেশি ইল্‌মের সাথে। নবীগণ অহী নিয়ে আগমন করেছেন আর সিদ্দীকগণ তা বিশ্বাস করেছেন। তাই নবীগণ ও সিদ্দীকগণের মাঝে ইল্‌মের সম্পর্ক অনেক মজবুত। আর দ্বিতীয় দুজন; অর্থাৎ– শহীদ ও সালেহগণের মাঝে আমলের সম্পর্ক মজবুত।

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝে আসে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইহ ও পরকালীন সৌভাগ্যকে ইল্‌ম ও আমলের মাঝে নিহিত রেখেছেন। যদি আমরাও সৌভাগ্যের সিঁড়ি অতিক্রম করতে চাই, তাহলে আমাদেরও ইল্‌ম ও আমলের এই রাস্তা গ্রহণ করতে হবে।

অজ্ঞ, স্বল্প জ্ঞানী ও রুগ্ন জ্ঞানী

মানুষের ইল্‌মের অবস্থাও খুব আশ্চর্যজনক। যখন দুনিয়াতে আসে, তখন ছিল শিশু– কোনো ইল্‌ম তার ছিল না। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ

'তোমারা যখন মায়েদের গর্ভে ছিলে, তখন তোমাদের কোনো ইল্‌ম ছিল না।'[৪৯]

অর্থাৎ– শুরু জীবনে মানুষ ছিল عديم العلم বা ইল্‌মবিহীন। তার কাছে কোনো ধরনের ইল্‌মই ছিল না।

তারপর দুনিয়াতে এসে কিছু ইল্‌ম শিক্ষা করল। যা শিখল তাও সীমিত। এজন্যই কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۭ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

'তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, রূহ আমার রবের একটি আদেশমাত্র। তোমাদেরকে জ্ঞানের অল্পই দান করা করা হয়েছে।'[৫০]

---

৪৮. সূরা নিসা : আয়াত ৬৯
৪৯. সূরা নাজ্‌ম : আয়াত ৩২
৫০. সূরা ইসরা : আয়াত ৮৫

তারপর যুবক বয়সে স্বল্প বিদ্যার অধিকারী হলো।

আর যখন বৃদ্ধ হলো, তখনকার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا

'যাতে জানার পর সে জ্ঞানহীন হয়ে যায়।'[৫১]

একে عليل العلم বা রুগ্ন ইল্‌ম বলা হয়। অর্থাৎ– যতটুকু ইল্‌ম ছিল সেটুকুও বিদায় নিল বা ভুলে গেল।

যেহেতু মানুষ শুরুতে عديم العلم (জ্ঞানহীন), মধ্যখানে قليل العلم (স্বল্পজ্ঞানী) আর সর্বশেষে عليل العلم (রুগ্নজ্ঞানী) হয়, তাহলে তার এই ইল্‌মের ওপর কি গর্ব থাকতে পারে?

খোদপ্রদত্ত ইল্‌মের যোগ্য কারা?

এটি স্বীকৃত কথা যে, আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ নৈকট্য কোনো অজ্ঞ লোককে দেন না। যদি কোনো ব্যক্তির কাছে প্রকাশ্য ইল্‌ম না-ও থাকে আর ওই ব্যক্তি আধ্যাত্মিক সাধনা করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকেও ইল্‌মে লাদুন্নি দান করবেন এবং তাকেও আলেমদের মধ্যে গণ্য করবেন। তিনি ইরশাদ করেন–

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

'তারপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমার বান্দাদের মধ্য থেকে একজনের, যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার নিকট থেকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।'[৫২]

খোদা প্রদত্ত ইল্‌ম ও হাবীব আ'জমি

হাবীব আ'জমি একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। অথচ তার সামনে যখন কুরআনের কোনো আয়াত তেলাওয়াত করা হতো, তিনি বুঝে ফেলতেন। আর যখন কোনো হাদীছ তেলাওয়াত করা হতো, তখনও তিনি তা বুঝতেন। এমনকি যে কারো কথা যখন তার সামনে পেশ করা হতো, তিনি বুঝতেন। মানুষ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করত, আপনি কীভাবে বোঝেন? তিনি বলতেন,

---

৫১. সূরা নাহ্‌ল : আয়াত ৭০

৫২. সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ৬৫

'যখন কুরআনের কোনো আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তখন আমার সামনে এমন একটি নূর এসে হাজির হয়। তা দেখেই আমি বুঝতে পারি, এটি আমার মনিবের কালাম। আর যখন কোনো হাদীছ তেলাওয়াত করা হয়, তখন আরেক ধরনের নূর এসে উপস্থিত হয়। যখন অন্য কারো কথা আমার সামনে আসে, তখন তাতে কোনো ধরনের নূর অনুভূত হয় না।'

আমিও সেসব নূর পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারি, এটি আমার মাওলার কালাম, এটি রাসূলের কালাম আর এটি মানুষের কালাম। এভাবে বুঝতে পারতেন যে যোগ্যতার কারণে, তাকেই ইল্‌মে লাদুন্নি বা খোদাপ্রদত্ত ইল্‌ম বলা হয়।

মসজিদে নববীর প্রাথমিক অবস্থা

আপনারা সকলে ইজতেমার এই তিনটি দিন বড় আনন্দ ও উদ্দীপনার সাথে থাকুন। এতে আপনাদেরকে অনেক মুজাহাদা বা পরিশ্রম করতে হবে। এতে মনোবল হারাবেন না যে, জায়গা এতো সংকীর্ণ কেন? আমাদের অন্তরের জায়গা কিন্তু অনেক প্রশস্ত। মসজিদে নববীও শুরুতে এত ছোট ছিল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেন–

'আমাকে এমন চাপড়া বানিয়ে দাও, যেমন মূসার ছিল।'

বৃষ্টির সময় নীচ দিয়ে পানি আসত, মানুষ সেজদা করলে তাদের কপালে কাদা লেগে যেত।

ওলামায়ে কেরামকে সামনে স্থান করে দেওয়ার মাঝে অন্যদের উপকার

ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গদের সামনে জায়গা দেওয়ার মধ্যেও একটি রহস্য নিহিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাযি.) একজন সাহাবি ছিলেন, যিনি একসময় ইহুদিদের একজন বড় মাপের আলেম ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলে কারীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি হলেন। দুজন নবীর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছেন।

হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, আমি দেখি, যখন নামাযের সময় হয়, তখন তাঁর চেষ্টা হতো, অন্য লোকেরা যাতে আগে জায়গা পায় আর আমি পেছনে নামায পড়ি। তিনি বলেন, এ-বিষয়টি

আমাদের বুঝে আসত না। কারণ, প্রথম কাতারে নামায পড়ার ফযিলত অনেক বেশি হওয়ার কারণে মানুষ সুযোগ পেলে সেখানে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে। আর এই বুযুর্গ যখন সামনের কাতারে জায়গা পান, তখন নিজে না গিয়ে বরং অন্যদের সামনে বসার সুযোগ করে দিচ্ছেন আর নিজে পেছনে নামায পড়ছেন।

তিনি বলেন, আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আপনার এই আমলের ভিত্তি কী? তিনি জবাবে বলেন, আমি হলাম তাওরাতের আলেম আর তাতে এই উম্মতের যেসব নিশানা বা নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো, এই উম্মতের কিছু বুযুর্গ এমন হবেন, যখন তারা নামাযে দাঁড়াবেন তখন তাদের পেছনে যত লোক সেজদা করবে, আল্লাহ তাদের সকলের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।

এ-কারণে যখন আলেম ও নেক বান্দাদের সামনে জায়গা দেওয়া হয়, তখন এতে আপনার ফায়দা বেশি হবে। অসম্ভব কী যে, কোনো এক বুযুর্গের সেজদা আমাদের নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں
جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لئے ہوئے

'মন চায় এমন জায়গায় অবস্থান করি, যেখানে অন্তরের ব্যথা নিয়ে কেউ একজন থাকে।'

এ-সকল লোক দূরদূরান্ত থেকে মনে অনেক ব্যথা নিয়ে এখানে এসেছে। আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি।

ফাযায়েল ও মাসায়েলের ইল্‌ম

ইল্‌ম দু-ধরনের।

এক. ফাযায়েলে ইল্‌ম।

দুই. মাসায়েলে ইল্‌ম।

ফাযায়েলে ইল্‌ম শিক্ষা করার মাধ্যমে মানুষ আমলের প্রতি আগ্রহী হয় আর মাসায়েলে ইল্‌মের শিক্ষা করার কারণে মানুষ সেই আমলকে সঠিকভাবে পালন করার সুযোগ পায়।

عيش الدنيا والآخرة এর সঠিক মর্ম কী?

عبديت এবং علم, عمل এই তিনটি শব্দের প্রথম অক্ষর ع দ্বারা শুরু। আর عيش শব্দটিও ع দ্বারা শুরু হয়েছে। যেমন–

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

'বোঝা গেল, যেব্যক্তি ইল্‌মের ওপর আমল করে عبديت তথা প্রকৃত বান্দা হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছে, আল্লাহ্ তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের যাবতীয় আরাম নসিব করবেন।

হাদীছ বর্ণনায় শ্রবণের গুরুত্ব

ইল্‌মের সম্পর্ক শ্রবণের সাথেই বেশি হয়। এ-কারণে মুহাদ্দিছীনে কেরাম تسلسل বা ধারাবাহিক বর্ণনা কেবল তাকেই মনে করেন, যেটি ছাত্র তাঁর ওস্তাদ থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শ্রবণ করেছে। ধরুন, ওস্তাদের নিকট হাদীছের একটি কিতাব লিখিত আছে। তিনি উক্ত কিতাব এই বলে ছাত্রকে দিলেন যে, এতে অনেক হাদীছ রয়েছে এবং আমি আপনাকে উক্ত হাদীছগুলো বর্ণনার অনুমতি দিলাম। এখন এই ছাত্র উক্ত কিতাবের হাদীছগুলো বর্ণনা করলে একে تسلسل বা 'ধারাবাহিকতা' বলা হয় না। কারণ, তাঁদের নিকটে হাদীছ বর্ণনার জন্য শ্রবণ শর্ত।

কোনো নবী বধির ছিলেন না কেন?

এটা বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, দুনিয়াতে যত নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে, তাদের কেউই বধির ছিলেন না। অন্ধ ছিলেন কেউ-কেউ। তবে বধির কেউ ছিলেন না। হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন,

وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ

'শোকে তার চোখদুটো সাদা হয়ে গিয়েছিল।'[৫৩]

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর আদরের সন্তান হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরহে এত বেশি ক্রন্দন করলেন যে, তিনি দৃষ্টিশক্তি

---

৫৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৪

হারিয়ে ফেললেন। এ-রকমভাবে হযরত শুআইব আলাইহিস সালামেরও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মোটকথা, নবীদের মাঝে অন্ধ ছিলেন, কিন্তু কেউ বধির ছিলেন না। কারণ, ইল্‌মের সম্পর্কই হলো শ্রবণের সাথে।

হেদায়াতের নূর প্রাপ্তির জন্য শ্রবণের গুরুত্ব

শরীয়ত আমাদের এই নির্দেশ প্রদান করেছে যে, আমরা খুব মনোযোগসহকারে হেদায়াতের কথাবার্তা শ্রবণ করব। আমলের আগ্রহ নিয়ে শ্রবণ করব। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ

'আর যদি আল্লাহ্ তাদের সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করতেন, তাহলে তাদের শ্রবণ করার তাওফীক দান করতেন।'[৫৪]

এজন্য সর্বদা মনোযোগের সাথে বসবেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন–

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

'নিশ্চয় এর মাঝে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য নানা দিনর্শন রয়েছে।'[৫৫]

তাই তো তিনি কুরআন পড়ার মুহূর্তের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন,

فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا

'সুতরাং তোমরা তা শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো।'[৫৬]

বলা হয়,

اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا

তোমরা শ্রবণ করো এবং আনুগত্য করো।

ভালোভাবে একটি বিষয় শ্রবণ করাও একটি গুণ। অন্যথায় মানুষ এক কান দিয়ে শ্রবণ করে তা অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়।

আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ ۝

---

৫৪. সূরা ক্বাফ : আয়াত ৩৭

৫৫. সূরা রূম : আয়াত ৩৩

৫৬. সূরা আনফাল : আয়াত ২৩

'অন্তরবিশিষ্ট লোকদের জন্য এতে (কুরআনে) রয়েছে নসীহত।'[৫৭]

প্রথম গুণ হলো, অন্তর মনোযোগী হবে।

আর দ্বিতীয় গুণ হলো,

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ

'অথবা খুব বেশি মনোযোগী হবে।'[৫৮]

আর তৃতীয় গুণ হলো,

وَهُوَ شَهِيدٌ

'আর সে ব্যক্তিই হলো হাজির।'[৫৯]

সুতরাং আপনি যখন কোনো একটি কথা মন দিয়ে শ্রবণ করবেন, খুব বেশি মনোযোগী হবেন এবং উপস্থিত হবেন, তাহলে আপনাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়াতের নূর দান করা হবে।

এর নামই হলো 'বেলায়াত'

যে কালেমা পড়ে, সে হেদায়াতের রাস্তায় থাকে। তারপর তার জন্য হেদায়াতের মধ্যে উন্নতিরও সুযোগ রয়েছে। এ-সকল মজলিসে আসার উদ্দেশ্যও এটিই যে, হেদায়াতের নূর আরো বৃদ্ধি পাবে। পবিত্র কুরআনুল কারীম 'আসহাবে কাহফ' সম্পর্কে বলেছে,

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

'তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের ওপর ঈমান এনেছিল। আর আমি তাদের হেদায়াত বাড়িয়ে দিই।'[৬০]

এর নামই হলো 'বেলায়াত'।

ইসলামের মৌলিক বিধান অথবা ...

যদি অমনোযোগী হয়ে কথা শোনেন, তাহলে কোনো উপকার হবে না। যেমন– কোনো বাচ্চাকে ওস্তাদ শেখালেন, ইসলামের 'আরকান' (মৌলিক

---

৫৭. সূরা ক্বাফ : আয়াত ৩৭
৫৮. সূরা ক্বাফ : আয়াত ৩৭
৫৯. সূরা ক্বাফ : আয়াত ৩৭
৬০. সূরা কাহফ : আয়াত ১৩

বিধান) পাঁচটি। তারপর ঘরে এলে তার পিতা জিজ্ঞেস করলেন, বেটা! আজ কী পড়ে এসেছ? সে বলল, ওস্তাদ বলেছেন, ইসলামের পাঁচটি 'কান' থাকে।

এ-ও 'যাহাবী' সে-ও 'যাহাবী'

আল্লামা হাফেয শামছুদ্দীন যাহাবী (রহ.) যা শুনতেন, তৎক্ষণাৎ মুখস্থ হয়ে যেত। আমিও মাঝেমাঝে আমার অনেক ছাত্রকে বলি, তুমি হলে আল্লামা 'যাহাবী'। কিন্তু এই যাহাবী ذهب থেকে, যার অর্থ বিদায় নেওয়া। অর্থাৎ– যা শোনে সব পরক্ষণেই বিদায় নিয়ে যায়। তাই এরা হলো 'আল্লামা যাহাবী'।

একটি আশ্চর্য দু'আ

হযরত মুফতী মাহমূদ (রহ.) মক্কা-মদীনার যেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরে বের হলেন। সেখানে গিয়ে তাওয়াফ করে 'মাকামে ইবরাহীম'-এ নফল নামায পড়ে একটি আশ্চর্য দু'আ করলেন। তিনি বলছেন. হে আল্লাহ্! সারা দুনিয়াবাসী আমাকে মুফতী বলে। আপনি আমাকে মুফতেই (এমনিতেই ফ্রি ফ্রি) ক্ষমা করে দেন।'

مفتى শব্দটি এসেছে فتوى থেকে। কিন্তু শব্দটি যেহেতু যুক্ত অর্থবোধক ছিল, তাই তিনিও এর উর্দূ ভাষার অর্থ ব্যবহার করেছেন।

মুরীদের পরিচিতি

শ্রবণশক্তি স্পষ্ট হওয়া মুরীদের পরিচিতি। দেখুন, আবুজাহল হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে মে'রাজের ঘটনা শ্রবণ করা সত্ত্বেও সে তা বিশ্বাস করেনি। অথচ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) উক্ত ঘটনা একজন কাফেরের মুখ থেকে শোনামাত্র তা বিশ্বাস করেছেন। তালিবুল ইল্মের জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ কীভাবে? হাদীছে উল্লেখ আছে,

مَنْ كَانَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ الْجَنَّةُ فِيْ طَلَبِهٖ

'যেব্যক্তি ইল্ম অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে, জান্নাত তার তালাশে ব্যস্ত থাকে।'

অন্য হাদীছে আছে,

'যেব্যক্তি ইল্মে দীন অর্জন করার লক্ষ্যে ঘর থেকে বের হয়, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।'

সহজ করার কী উদ্দেশ্য? আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন, যারা স্কুল-কলেজের ছাত্র, তাদের একটি কার্ড থাকে। তারা যখন বাসে সফর করে, তখন তাদের থেকে হাফ ভাড়া আদায় করা হয়। একে বলা হয় সফরের মধ্যে সহজ করা।

এভাবে যারা ইল্‌মে দীন অর্জন করার উদ্দেশ্যে সফর করে, কেয়ামতের দিন তদের জন্যও জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সহজ করে দেওয়া হবে। এজন্যে প্রত্যেকেরই দুনিয়ার জীবনে ইল্‌মে দীন অর্জন করা কর্তব্য।

মানুষের শরীরে ওলামা ও মজুরের বসবাস

হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তাইয়েব (রহ.) তাঁর মাওয়ায়েজে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মানুষের শরীরের ওপরের অংশ হলো আলেমদের বাসস্থান। এতে কান, চোখ, ব্রেন ও জিহ্বা অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এগুলো সবই হলো ইল্‌ম অর্জন করার অঙ্গ এবং এগুলো দ্বারাই মানুষ ইল্‌মে দীন হাসিল করে।

তিনি বলেন, আর মানুষের নিচের অংশ হলো মজদুর তথা শ্রমিকদের বাসস্থান। এতে হাত, পা, শ্বাসযন্ত্র ও দুই কাঁধ অন্তর্ভুক্ত। এগুলো দিয়ে শ্রমিক কাজ করে থাকে। আর এই দু-ধরনের বাসস্থানের মধ্যখানে আল্লাহ্ তা'আলা গুরুত্বপূর্ণ দিল তথা অন্তর সৃষ্টি করেছেন। এই দু-ধরনের অঙ্গগুলোর জন্য অন্তর হলো নির্দেশক। কেমন যেন এ দু-ধরনের অঙ্গের নিয়ন্ত্রককে মধ্যখানে রেখেছেন।

তিনি বলেন, যখন কোনো প্রাণীকে যবাই করা হয়, তখন তার গলায় চুরি ধরা হয়। আর গলার মধ্যে চুরি ধরার উদ্দেশ্য ওই প্রাণীর ইল্‌ম ও আমলের মধ্যকার বন্ধনকে শেষ করে দেওয়া। এর দ্বারা বোঝা যায়, যে-বান্দার ইল্‌ম ও আমলের বন্ধন শেষ হয়ে যায়, সে জীবিত নয়– মৃত মানুষ। জীবিত তো তাকে বলা যাবে, যার ইল্‌ম ও আমলের মাঝে সমন্বয় রয়েছে।

আল্লাহ্‌র রূহানী দয়ায় বাধা

আল্লাহ্ নিজেই কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ করার কারণ উল্লেখ করে বলছেন,

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝

'সুতরাং আপনি তাদের কুরআন দ্বারা নসীহত করুন, যাতে তারা আল্লাহর সর্তকবাণীকে ভয় করে।'[৬১]

---

৬১. সূরা ক্বাফ : আয়াত ৪৫

বোঝা গেল, কুরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্যই হলো, বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা, যাতে তারা আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ও মহত্ত্বকে বুঝতে পারে এবং গুনাহ্ ত্যাগ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে মানুষকে নিজের চাহিদার বুকে চুরি মারতে হবে। মুরীদের পথের সবচেয়ে বড় কাটা হলো মনের চাহিদা ও মনোবৃত্তির অনুকরণ।

نہ جب تک صدق دل سے ترک کردیں حظ نفسانی
کبھی بھی آپ کو حاصل نہ ہوگا لطف رحمانی

'যতদিন পর্যন্ত মনোবৃত্তিকে অন্তর থকে বের করা সম্ভব না হবে, ততদিন মাওলার রূহানী ফয়েজ হাসিল হবে না।'

মাওলার রূহানী ফয়েয পেতে হলে আগে নিজের নফসের চাহিদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে।

মেনে চলা শিখুন

এখানে তিন দিনের বিভিন্ন মজলিসে অপনারা যা কিছুই শুনবেন, এ নিয়তে শুনতে হবে যে, এর ওপর আমাকে আমল করতে হবে। সাথে-সাথে এ-বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখতে হবে যে, আপনারা এখানে আসার পরেও কিন্তু শয়তান আপনাদের পিছু ছাড়েনি। আপনারা তাকে কিন্তু ঘরে রেখে আসেননি; বরং সে আপনাদের সাথে এখানেই অবস্থান করছে। সে এখানে চেষ্টায় রত আছে, আপনাদের কীভাবে উদ্দেশ্য হাসিল করা থেকে বিরত রাখা যায়। যখন ঘুমের সময় হবে, তখন কথামালা ঝরাবে, যাতে জেগেই থাকেন, বর্তমান অবস্থার ওপর আলোকপাত করেন। আর যখন বয়ান শোনার সময় হবে, তখন মুরাকাবার গুরুত্ব বোঝাবে; বলবে ঘুমিয়ে পড়ুন। কাগজে লেখা একটি সময়সূচি আপনাদের সামনে পেশ করা হবে। আপনারা তা পড়ে সে অনুযায়ী সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করবেন।

শোওয়ার সময় আরাম করবেন।

খাওয়ার সময় খাবার খেতে যাবেন।

ইবাদাতের সময় ইবাদাত করবেন।

এখানে তো আপনাদের মেনে চলার অভ্যাস গড়তে হবে। এমন যাতে না হয়, এখানে আসার পরও শয়তান আমাদের এমন বরকতময় মজলিসের বরকত থেকে বঞ্চিত করে দিল।

স্থির অন্তর নিয়ে বসুন

নিজের সময়গুলোতে স্থির অন্তর নিয়ে থাকবেন। অন্তরের স্থিরতা বলা হয়, নিজের দৃষ্টি অন্তরের দিকে আর অন্তরের দৃষ্টি আল্লাহ্‌র দিকে থাকবে।

مشغول ہو کر کلمہء طیب کے ذکر میں

دل پہ لگا جو زنگ ہے اس کو چھڑایئے

'কালেমার যিকিরে মশগুল হয়ে নিজের অন্তরের জং দূর করুন।'

مشغول اسم ذات میں ہوں آپ اس طرح

اس کے سوا ہر ایک کو بس بھول جایئے

'এমনভাবে আল্লাহর নামে মশগুল হয়ে যান, যাতে দুনিয়ার অন্য সব কিছুই আপনি ভুলে থাকতে পারেন।

এই তিন দিন একথার অনুশীলন করবেন যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া বাকি সবই ভুলে যাব। অন্তরে একমাত্র তাঁরই স্মরণ থাকবে।

অধিক যিকির নম্রতার কারণ হবে

যিকিরের আধিক্য আপনার মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি করবে। এটি যিকিরের বৈশিষ্ট্য। শক্ত জমিনকে বৃষ্টির পানি যেমন নরম করে ফেলে, এমনিভাবে মানুষ যখন যিকির করে, তখন খোদাপ্রদত্ত নূরের বৃষ্টি তাঁর অন্তরকে বিনম্র করে দেয়। বিনম্র অভ্যাসের মাধ্যমেই মানুষ উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়।

হাড়ের ওপর গোশত কেন?

লক্ষ করুন! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের শরীরের শক্ত হাড়গুলোর ওপর নরম গোশত আর চামড়া সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ– শক্তকে নরমের ভেতর প্যাকেট করে দিয়েছেন। ঠিক একইভাবে তিনি তাঁর রাগকেও আপন রহমত দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন।

কুরআনুল কারীমের মৌলিক নির্দেশনা

আপনি যদি কুরআনুল কারীমের শব্দগুলো গণনা করেন, তবে দেখবেন, তার একেবারে মাঝের শব্দটি হলো وليتلطف (বিনয়সুলভ আচরণ করো)। মানে পুরা কুরআন শরীফের কেন্দ্রীয় নির্দেশ হলো বিনম্র হয়ে যাও।

ফেরাউনের সাথে নরম আচরণ করার নির্দেশ

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা ও হারূন (আ.)কে ফেরাউনের নিকট পাঠাচ্ছেন, যে-ফেরাউন নিজে খোদায়িত্বের দাবি করেছে, সে কত বড় বেয়াদব! কিন্তু তথাপিও আল্লাহ্ বলছেন,

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

'আপনারা তার সাথে নরম ব্যবহার করবেন।'[৬২]

আমরা যদি আমাদের বন্ধু কিংবা কোনো ছাত্রের সাথে এমন আচরণ করি, তাহলে ভাবব, আমি তো মূসা (আ.) থেকে মর্যাদাবান নই। আর এরাও ফেরাউন থেকে খারাপ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা নম্রতার ওপর যে-পরিমাণ দয়াশীল হন, কঠোরতার ওপর ততটা হন না। এ-কারণে অনেকে এসে বলেন, হুজুর! আমরা তো যিকির করি; কিন্তু–

বাচ্চারা কথা শোনে না।

স্ত্রী কথা মানে না।

ঘরের পরিবেশ ভালো নয়।

চিন্তা করলেই বুঝবেন, এর পেছনের কারণ হলো আপনার কঠোরতা। আপনার চরিত্রের ঘাটতিই এর জন্য দায়ী।

যিকিরের ফায়দা হলো–

এর দ্বারা মানুষের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি হবে।

তারপর তার চরিত্র ভালো হবে।

আর এর কারণে অন্যের কাছে সে সম্মানিত হবে।

শেষমেষ এর দ্বারা মানুষ দীনের নিকটবর্তী হবে।

জামাতের জন্য অপেক্ষা

এ-দিনগুলোতে আপনারা নামাযের সময়ের আগেই জামাতের অপেক্ষায় উপস্থিত হবেন। এ সুন্নাতটি আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে। আজ অবস্থা অনেকটা এমন হয়ে গেছে যে, যদি পাঁচ মিনিট সময়ও বাকি থাকে, তাহলে মসজিদের বাইরে পরস্পর গল্প করতে থাকি। কেউ যদি বলেও দেন, ভাই! নামাযের সময় নিকটবর্তী, তৎক্ষণাৎ জবাব দেওয়া হয়, এখনো পাঁচ মিনিট বাকি

---

৬২. সূরা ত্বহা : আয়াত ৪৪

আছে। এর চেয়ে বরং মসজিদে এসে নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকেল কতই-না ছাওয়াব হতো।

এই সময়গুলো আমাদের কাছে আমানত

আপনারা সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মনোযোগী থাকবেন। নানা কারণে কোনো ব্যক্তি যেমন পেরেশান থাকে, তেমনিভাবে বান্দাকেও সর্বদা পেরেশান থাকতে হবে। কারণ, এই সময়টি আমরা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করেছি। তাই সময়টি আমাদের কাছে আমানত। তাই সময়গুলো আমরা আল্লাহ্র ধ্যান, দৃষ্টি আর মনোযোগের সাথে কাটাব। তাহলেই কেবল এখান থেকে যাওয়ার সময় আপনার অন্তর সাক্ষ্য দেবে, হ্যাঁ, এই তিন দিনে আমার অনেক উপকার হয়েছে।

আন্তরিক সম্পর্ক ও তার উপকারিতা

সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকবেন। এমনকি বয়ান শ্রবণ করার সময়ও। আর শায়খের সামনে থাকলে আন্তরিক সম্পর্ক আর পেছনে থাকলে স্থিতিশীলতার খেয়াল রাখবেন। আন্তরিক সম্পর্কের অর্থ হলো নিজের অন্তরকে অন্য সব কিছু থেকে খালি মনে করবেন। আর ভাববেন, আল্লাহ্র রহমত নবীগণের অন্তর হয়ে বুযুর্গদের অন্তরের মাধ্যমে আমার অন্তরের দিকে ধেয়ে আসছে। আর সেখান থেকে আমার অন্তরে প্রবেশ করছে। এটিই হলো পরস্পরের রূহানী সম্পর্কের নমুনা। যেমন– সূর্য অনেক দূরে হলেও তার কিরণ ঠিকই দুনিয়াতে আঁচড়ে পড়ে।

কোথাও সবজির পরিমাণ বাড়ছে।

কোথাও ফুলের রং দৃষ্টিনন্দন হচ্ছে।

কোথাও ফলের স্বাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সবাই নিজ-নিজ অংশের ভাগিদার হচ্ছে। এভাবে শায়খের দৃষ্টিও সবার ওপর নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু প্রত্যেক মুরীদ নিজ-নিজ আগ্রহ অনুযায়ী অংশ পেতে থাকে।

عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں
ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے

'ইশ্ক-ভালোবাসা সবার প্রতি সমভাবে ধাবমান। কিন্তু গ্রহণকারী পাত্রের ছোট-বড় হওয়ার কারণে পরিমাণে ব্যবধান সৃষ্টি হয়।'

যে যতটুকু আগ্রহ নিয়ে বসবে, সে ততটুকু নেয়ামত পাবে। তাই এই সময়টায় সবর্দা আপনাদের অন্তর যেন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি স্থির থাকে।

ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے
معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے

'আমরা তো এই গোপন সম্পর্কের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত। অন্য কারো কাছে এর রহস্য উন্মোচিত কিনা জানা নেই।'

تم سا کوئی ہم دم کوئی دم ساز نہیں ہے
باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے

'তোমরা ছাড়া আমার আর কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী নেই। কথা থাকলেও সেখানে কোনো আওয়াজ নেই।'

অন্তরের স্থিতিশীলতার সহায়ক দুটি বিষয়

আমাদের মুরুব্বীগণ বলতেন, সময়ে-সময়ে এ-শব্দগুলো উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করা চাই, যাকে তারা بازگشت (প্রতিধ্বনি) বলেন। অর্থাৎ– এটা বান্দাকে আল্লাহর দিকে ফেরানোর একটি সহজ উপায়। তাই নিম্নের শব্দগুলো মুখস্থ করে নেবেন।

'ইলাহী! তুমিই আমার উদ্দেশ্য, তুমিই আমার আগ্রহ। আমার মধ্যে ভালোবাসা আর মারেফতের আগ্রহ সৃষ্টি করে দাও। হে মাওলা! আপনিই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আর আমি আপনারই সন্তুষ্টির ভিখারি। আমাকে আপনার মহব্বত আর প্রেমপ্রীতি দান করুন।'

একে সুলূকের পরিভাষায় بازگشت বলা হয়। অর্থাৎ– যদি কিছুক্ষণ পরপর মুরীদ তা জপতে থাকে, তাহলে এটি তাকে স্থির অন্তর প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে। আর অন্যান্য সুন্নাত দু'আসমূহ পড়া দ্বারাও স্থিতিশীল অন্তর হাসিল করা যায়। এ-কারণে এ দুটি কাজ খুবই গুরুত্ব দিয়ে করবেন।

আল্লাহ অন্যেষণকারী পথিক

সম্মানিত হাজিরীন! বর্তমান দুনিয়ায় বহু লোক ব্যবসায়িক কাজে সফর করে থাকে। আবার কেউ-কেউ আত্মীয়তার খাতিরে সফর করে। কেউ-কেউ

আবার সুন্দর-সুন্দর দৃশ্যাবলি অবলোকন করার জন্যেও ভ্রমণ করে থাকে। কিন্তু আপনাদের এ-সফর কেবলই আল্লাহর জন্য। তাঁর দরবারে এ সম্পর্কে অনেক মর্যাদা রয়েছে। আমাদের আকাবিরগণ অনেক বেশি সফর করেছেন।

১. হযরত মাওলানা খাজা ফজলে আলী কোরাইশী (রহ.) তাঁর শায়খের নিকট তিনশত মাইলের সফর পায়ে হেঁটে করেছেন। যেতে এক মাস এবং আসতে এক মাস সময় ব্যয় হতো। আর শায়খের কাছে অবস্থান করার সময় তো এর চেয়ে আলাদা ছিল।

২. এমন একজন বুযুর্গও ছিলেন, যিনি সারা দুনিয়া সফর করেছেন। এমনকি এর কারণে তাঁর নামই হয়ে গেছে বৈশ্বিক মানুষ বা বিশ্ব সফরকারী।

এরা কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করবে, 'হে মাবূদ! আমরা আপনার তালাশে আর আপনাকে পাওয়ার আশায় এ-সফর করেছি, তখন সেখানে আমাদের আমলনামায়ও একটি সফর থাকবে, যেখানে আমরাও তাঁরই তালাশে একটি সফর করেছি। জামাতের সাথে নামায পড়ার দ্বারা যদি কোনো একজনের নামায আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়, তাহলে এর দ্বারা সকলের নামাযই গ্রহণ করে নেওয়া হয়। যদি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁর এ-সকল মাকবুল বান্দার সফরগুলোকে কবুল করে নেন, তবে তিনি আমাদের এ-সফরকেও কবুল করে নেবেন। কারণ, দীনের জন্য এ-সফর বড়ই মূল্যবান। আমাদের অবস্থা তো হলো ওই বৃদ্ধা নারীর মতো, যে নাকি হযরত ইউসুফ (আ.)কে খরিদ করার জন্য একটি সুতা নিয়ে উপস্থিত ছিল। তাকে যখন কেউ বলল, আপনি তো ইউসুফকে ক্রয় করতে পারবেন না। কারণ, তাঁকে ক্রয় করতে এখানে অনেক বিত্তশাল্য উপস্থিত হয়েছেন। সে জবাব দিল, একথা তো আমিও জানি যে, আমি ইউসুফকে ক্রয় করতে পারব না। তথাপি এ-কারণে হাজির হয়েছি, যাতে যখন কেয়ামতের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, ইউসুফের খরিদদাররা কোথায়? তখন আমার সেদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসিব হবে।

এ-কারণেই আল্লাহর তা'আলা যখন কেয়ামতের দিন ঘোষণা দেবেন, দুনিয়াতে আমাকে পাওয়ার লক্ষ্যে ভ্রমণকারীরা কোথায়? তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আমাদের এ পদক্ষেপও অবশ্যই তাঁর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সংশোধন করে দিন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

প্রতিদান ও বিচারের দিন

'অনেকে বলে থাকে, সেখানে গেলেই দেখব কী হয়। কেমন যেন পরকালের প্রস্তুতি তারা মৃত্যুর পূর্বে করার পরিবর্তে এমনটা ভাবে যে, সেখানে গেলে তো মুক্তির কোনো-না-কোনো একটা ব্যবস্থা হবেই। এটা মানুষের ভুল ধারণা। কারণ, আগুন একবার লেগে গেলে তখন আর কূপ খনন করে পানি সংগ্রহ করা যায় না। যদি আগে থেকেই কূপ খননকৃত থাকে, তাহলে তার পানিই কাজে লাগে। এজন্যে যেব্যক্তি দুনিয়াতেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, কেয়ামতের দিন সেই প্রস্তুতি তার কাজে আসবে।'

প্রতিদান ও বিচারের দিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنِّيْ إِلَى الْإِمَامِ الْهُمَامِ يَقُوْلُ الْعَبْدُ الْفَقِيْرُ ذُوْ الْفِقَارِ أَحْمَدُ حَدَّثَنِيْ حَضْرَةُ الْأُسْتَاذُ حَافِظُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ جَعْفَرُ بْنُ مَحَمَّدُ أَمِيْرُ قَالَ حَدَّثَنِيْ حَضْرَةُ الْأُسْتَاذُ مَوْلَانَا شَيْخُ مَحَمَّدُ مَالِكُ كَانْدَهلْوِىْ نَوَّرَ اللّٰهُ مَرْقَدَهٗ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ مُحَمَّدُ إِدْرِيْسُ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مُحَمَّدُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الظَّاهِرِ الْوِتْرِيُّ الْمَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَحَمَّدُ عَابِدُ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَالِحُ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَحَمَّدُ بْنُ سَنَةِ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ الْعَجَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ قُطْبُ الدِّيْنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ الْمُعَمَّرُ الشَّيْخُ يُوْسُفُ هَرَوِيْ الْمَشْهُوْرُ بِسِهْ صَدْ سَالَهْ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَحَمَّدُ بْنُ شَادُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفُ الْفَرْبَرِيْ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى رَحْمَةً وَاسِعَةً قَالَ حَدَّثَنِيْ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ وَسَيِّدُ الْمُحَدِّثِيْنَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً

بَابٌ : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلٰى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

সাহায্য কামনা করার দিন

বোখারি শরীফের একটি হাদীছ আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয়েছে। জামেয়া আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর শিক্ষাবর্ষের আজ প্রথম দিন। যখনই কোনো একটি ভালো কাজের শুভ উদ্বোধন হয়, সেটি আল্লাহর দরবারে হাত প্রসারিত করে চাওয়ার দিন হয়। কেননা, আমরা তো তাঁর সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারব না।

যেভাবে বাচ্ছারা তাদের সকল কাজে বড়দের মুখাপেক্ষী, আমরা তো তার চেয়েও বেশি আমাদের পালনকর্তার মুখাপেক্ষী। আজ আমরা এখানে এজন্যেই একত্রিত হয়েছি যে, সকলে মিলে তাঁর দরবারে দু'আ করব, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আপনার অপরিসীম নেয়ামত দ্বারা ভরপুর করে দেন এবং এ ছাত্রীদের যারা দাওরা কিংবা মেশকাত জামাতে উপনীত হয়েছে, তাদের শিক্ষাবর্ষের শুরু দু'আর মাধ্যমে হবে, যাতে তারা আরো বেশি আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে এবং সত্যিকার ফায়দা হাসিল করে এখান থেকে যেতে পারে।

তিনটি মৌলিক বিশ্বাস

ইসলাম তিনটি মৌলিক বিশ্বাস পেশ করেছে।

১. তাওহীদ। অর্থাৎ– আমাদের সত্যিকার উপাস্য একমাত্র আল্লাহ।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

২. রেসালাত। অর্থাৎ– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীগণের সর্দার এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়তম নবী এবং তাঁর প্রেরিত সত্যবাদী রাসূল।

৩. কেয়ামত। অর্থাৎ– সামনে এমন একটি দিন আসছে, যেদিন সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে এবং সবাইকে নিজের কর্মের হিসাব দিতে হবে।

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

'প্রত্যেককেই নিজের কৃতকর্মের কাছে দায়বদ্ধ।'[৬৩]

যেভাবে বন্ধকের জিনিস উদ্ধার করতে হলে কোনো একটা কিছু পরিশোধ করতে হয়, তেমনিভাবে বান্দাকেও নিজের জীবন উদ্ধার করার জন্যে নেকির আকারে কিছু মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ওই দিনটিকে প্রতিদান ও বিচারের দিন বলা হয়।

এই তিনটি বিশ্বাস হলো মৌলিক আকীদা। আর বাকি সকল বিশ্বাস এগুলোকে নিয়েই আবর্তিত হয়। সেগুলো শাখাগত বিশ্বাসের বিষয়। বাস্তব কথা হলো, মানুষের প্রথম ও দ্বিতীয় আকীদা তখনই ঠিক থাকে যদি তার তৃতীয় আকীদাটি মজবুত হয়। যদি তার অন্তরে কেয়ামতের ভয় এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় থাকে, তাহলে সে দুনিয়াতেই নিজের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শয়তানের পেছনে আর চলে না, মনোবৃত্তিকেও তখন সে আর নিজের জন্য অনুসরণীয় হিসেবে গ্রহণ করে না। বরং তখন সে কষ্ট করে হলেও ধৈর্য ও মজবুতির সাথে পালনকর্তার নির্দেশাবলি পালন করার সাথে-সাথে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতসমূহের অনুসরণ করে নিজের জীবন গড়তে সচেষ্ট হয়। বড়ই আফসোসের বিষয় যে, আজ আমাদের এই তৃতীয় প্রকারের বিশ্বাসটি একবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

যখন মুসলামন হয়ে এমন ভাবনা মনের ভেতরে জাগ্রত হয়, তাহলে এর উদ্দেশ্য হলো, তাঁর অন্তরে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়ানোর কোনো বিশ্বাস নেই। বরং অধিকাংশ লোক একথা বলে যে, সেখানে গেলেই তবে দেখব। কেমন যেন পরকালের প্রস্তুতি তারা দুনিয়াতে মৃত্যুর আগে করার পরিবর্তে এটা

---

৬৩. সূরা তূর : আয়াত ২১

ভাবে যে, সেখানে গেলে তো মুক্তির একটি ব্যবস্থা অবশ্যই হবে। এটা মানুষের ভুল ধারণা। কারণ, আগুন একবার লেগে গেলে কূপ খনন করে কোনো লাভ নেই; বরং এই কূপ আগে থেকেই যদি খনন করা থাকত, তাহলে এখন তার পানি কাজে আসত। এমনভিাবে যেব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে কেয়ামতের দিন তার সেই প্রস্তুতি কাজে আসবে। আর যেব্যক্তি প্রস্তুতি ছাড়াই দুনিয়ার জগত থেকে হারিয়ে গেছে, তার উদাহরণ এমন যেমন– কেউ সাগরে বৈঠা ছাড়াই নৌকা ভাসিয়ে দিল।

কেয়ামত দিবসের বিভিন্ন নাম

সাধারণ একটি নিয়ম হলো, যে-জিনিস কোনোভাবে একটু মূল্যবান হয়, তার একাধিক নাম থাকে। সেই হিসাবে কেয়ামতেরও অনেকগুলো নাম আছে।

১. তাকে 'কেয়ামতের দিন' বলা হয়। অর্থাৎ– দাঁড়ানোর দিন, আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার দিন।

২. 'আফসোসের দিন'ও বলা হয়। অর্থাৎ– এদিন বহু লোক এমন হবে, যাদের আফসোসের কোনো শেষ থাকবে না। তারা আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! আমরা যদি দুনিয়াতে নেক কাজ করতাম, তাহলে আজ আমরা এভাবে অপমানিত হতাম না।

৩. 'ফয়সালার দিন'ও বলা হয়। কারণ, কেয়ামতের দিন সকলের জন্য চূড়ান্ত ফয়সালা তথা মীমাংসারও দিন হবে। এদিনই সবার ভাগ্য চূড়ান্ত হবে। আল্লাহ্ বলেন,

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

'যেদিন তিনি তোমাদের একত্রিত করার দিন একত্রিত করবেন, সেদিন হবে জয় আর পরাজয়ের দিন।'[৬৪]

হে মানুষের দল! সেই দিনটি তোমাদের জন্য জয়-পরাজয়ের দিন হবে। সেদিন হয়তো জীবনের জন্য হেরে যেতে হবে, না হয় আজীবনের জন্যে মুক্তি মিলবে।

৪. সেই দিনকে 'ভীতিকর দিন'ও বলা হয়।

৫. 'পার্থক্য সৃষ্টিকারী দিন'ও বলা হয়।

---

৬৪. সূরা তাগাবুন : আয়াত ৯

কেয়ামতের দিবসের যেসব নাম কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত হয়েছে, যদি সেগুলোর ভাষান্তর করা হয়, তাহলে নিম্নরূপ হবে–

১. কেয়ামতের দিন।
২. আফসোসের দিন।
৩. হিসাবের দিন।
৪. লজ্জিত হওয়ার দিন।
৫. কম্পন সৃষ্টি হওয়ার দিন।
৬. বজ্রপাতের দিন।
৭. ঘটনাবহুল দিন।
৮. দাঁড়িয়ে থাকার দিন।
৯. ছড়িয়ে পড়ার দিন।
১০. অন্তরকে নাড়িয়ে দেওয়ার দিন।
১১. সত্যিকারের দিন।
১২. হট্টগোলের দিন।
১৩. আওয়াজ ও হইচই করার দিন।
১৪. সাক্ষাৎ করার দিন।
১৫. পরস্পর আহ্বান করার দিন।
১৬. বিনিময়ের দিন।
১৭. ভয়ের দিন।
১৮. সামনাসামনি হওয়ার দিন।
১৯. আমলের ওজন হওয়ার দিন।
২০. ফয়সালার দিন।
২১. একত্রিত হওয়ার দিন।
২২. পুনরুত্থানের দিন।
২৩. অপদস্থ হওয়ার দিন।
২৪. কঠোর দিন।
২৫. ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিন।
২৬. বিস্তৃত করার দিন।
২৭. সন্দেহাতীত দিন।

২৮. ওই দিন, যেদিন কারো কোনো উপকারে আসবে না।

২৯. যেদিন চক্ষু কেবল খোলা-ই থাকবে; মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হবে না।

এই কটি নাম দ্বারা একটু কল্পনা করুন যে, কেয়ামতের দিন কতই-না ভয়াবহ হবে।

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় খবর

দুনিয়ার একটি চিরাচরিত নিয়ম হলো, যখন কোনো একটি বিষয়কে অনেক বড় জিনিস বলা হয়, তখন সেটি বাস্তবেও অনেক বড় হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এ কেয়ামত দিবসের ব্যাপারে বলছেন,

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ ۝

'তারা কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? সেই মহা ঘটনা সম্পর্কে।'[৬৫]

এখানে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কেয়ামত দিবসকে نبأ عظيم বলে সম্বোধন করে বলছেন, প্রিয় হাবীব! তারা আপনাকে বড় খবর, বড় ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে।

আল্লাহ নিজেই যখন ঘটনাটিকে বড় বলছেন, তাহলে বাস্তবে এটি অবশ্যই বড় ঘটনাই হবে এতে কোনোই সন্দেহ নেই। যেমন– আমরা দুনিয়াতে অনেক বড়-বড় খবর শুনতে পাই। যেমন–

১. আমরা শুনতে পাই, হযরত আদম (আ.)কে ফেরেশতারা সেজদা করেছেন; কিন্তু ইবলীস করেনি। এটাও বড় ধরনের কোনো খবর নয়।

২. হযরত আদম (আ.)কে জান্নাত থেকে জমিনে প্রেরণ করা হয়েছে। এটাও বড় কোনো খবর হয়নি।

৩. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের যুগে সারা দুনিয়া ভারী বর্ষণে তলিয়ে গিয়েছিল। এটাও বড় কোনো খবর হয়নি।

৪. একজন নবীর হাড় থেকে লোহার চিরুনি দ্বারা গোশত পৃথক করা হয়েছে। এটাও কোনো বড় ধরনের খবর হয়নি।

৫. ছামূদ গোত্রের ওপর আযাব এসেছে। এটাও বড় কোনো খবর ছিল না।

৬. কওমে আদের ওপর বিপদ এসেছে। এটাও বড় কোনো খবর নয়।

---

৬৫. সূরা নাবা : আয়াত ১, ২

৭. হযরত শুআইব (আ.)-এর জাতির ওপর শাস্তি এসেছে। এটাও বড় ধরনের কোনো বিষয় ছিল না।

৮. হযরত মূসা (আ.)-এর বদদু'আর কারণে ফেরাউন তার দলবল নিয়ে নদীতে নিমজ্জিত হয়েছে। এটাও বড় ধরনের কোনো ঘটনা ছিল না।

৯. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে। এটাও আশ্চর্যজনক কোনো খবর ছিল না।

কিন্তু যখন আল্লাহর প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধরায় তাশরীফ এনেছেন, তখন তিনিই সর্বপ্রথম সবচেয়ে বড় খবর দুনিয়াবাসীকে শুনিয়েছেন। সেই বড় খবরটি কী ছিল? আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলছেন, হে আমার প্রিয় হাবীব! তারা আপনাকে عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ তথা বড় খবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। এমন বড় সংবাদের ঘোষণা দেওয়ার জন্যেই বড় পয়গম্বরের আগমন হয়েছে। আর তিনি এসেই বর্ণনা করেছেন সেই দিনটি কখন হবে এবং কেমন হবে।

সাহাবায়ে কেরাম বলছে, একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর বয়ান করা আরম্ভ করলেন এবং কেয়ামতের পূর্বে সংগঠিত হবে এমন ছোট-বড় বহু ঘটনার বর্ণনা দিতে লাগলেন। এভাবে যোহরের সময় হয়ে গেল। আমরা যোহরের নামায আদায় করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন। এভাবে আছরের সময় হয়ে গেল। একেবারেই স্পষ্ট করে তিনি আমাদের কেয়ামতের পূর্বের ঘটনাবলি বর্ণনা করলেন।

অন্যস্থানে আল্লাহ্ ইরশাদ ফরমান,

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①

'হে মানুষেরা! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কেয়ামতের কম্পন বড়ই কঠিন হবে।'[৬৬]

তারপর এর আরো বিস্তারিত বলতে গিয়ে তিনি ফরমান,

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

৬৬. সূরা হজ : আয়াত ১

'যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী সেই শিশুকে (পর্যন্ত) ভুলে যাবে, যাকে সে দুধ পান করিয়েছে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী নারী তার গর্ভপাত ঘটিয়ে ফেলবে আর মানুষকে তুমি এমন দেখবে, যেন তারা নেশাগ্রস্ত; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং (সেদিন) আল্লাহর শাস্তি হবে অতি কঠোর।'[৬৭]

কুরআনুল কারীমে কেয়ামতের আলোচনা

কুরআন শরীফে কেয়ামত দিবসের আলোচনা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। বরং কয়েকটি মক্কী সূরার মধ্যে তো একটু পরপরই কেয়ামতের আলোচনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ–

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

'যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে মেঘকে পথ করে দেবে এবং ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করা হবে লাগাতার। সেদিন সত্যিকারের রাজত্ব হবে দয়াময় (আল্লাহ)র আর সেই দিনটি কাফেরদের জন্য হবে অতি কঠিন এবং যেদিন জালেম ব্যক্তি (মনস্তাপে) নিজের হাত কামড়াবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে একই পথ অবলম্বন করতাম। হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে তো উপদেশ এসেছিল; কিন্তু সে (ওই বন্ধু) আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আর শয়তানই তো এমনই চরিত্রের যে, সে মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যায়।'[৬৮]

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ

'যখন আকাশ ফেটে যাবে।'[৬৯]

---

৬৭. সূরা হজ: আয়াত ২
৬৮. সূরা ফুরকান: আয়াত ২৫-২৯
৬৯. সূরা ইনফিতার : আয়াত ১

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝١

' যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।'[৭০]

অরো একস্থানে ইরশাদ করেন–

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢ وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤

'যখন পৃথিবীকে আপন কম্পনে ঝাঁকিয়ে দেওয়া হবে এবং ভূমি তার ভার বের করে দেবে এবং মানুষ বলবে, তার কী হলো। সেদিন পৃথিবী তার যাবতীয় সংবাদ জানিয়ে দেবে।'[৭১]

এটি এমন দিন হবে যে, জমিন তার সব খবর প্রকাশ করবে। জমিন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে রিপোর্ট পেশ করবে, হে মালিক! তোমার অমুক বান্দা ওই স্থানে এ-কাজটি করেছে, এখানে এ গুনাহ্ করেছে, মানুষ সেদিন পেরেশান থাকবে যে, আমি তো কোনোদিন কল্পনাও করিনি যে, যেখানে বসে অপরাধ করেছি, সেই জায়গাটা-ই আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দেবে।

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

الْقَارِعَةُ ۝١ مَا الْقَارِعَةُ ۝٢ وَ مَآ أَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوْثِ ۝٤ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥

'(স্মরণ করো) সেই ঘটনা, যা অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেবে। অন্তরাত্মা প্রকম্পিতকারী সেই ঘটনাটি কী? তুমি কি জান, অন্তরাত্মা প্রকম্পিতকারী সেই ঘটনাটি কী? যেদিন সমস্ত মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো হয়ে যাবে এবং পাহাড়সমূহ হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো।'[৭২]

কুরআন শরীফের মধ্যে এমন একটি সূরাও রয়েছে, যার নামই রেখে দেওয়া হয়েছে 'সূরাতুল কিয়ামাহ্'।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো একস্থানে ইরশাদ করছেন,

---

৭০. সূরা ইনশিকাক : আয়াত ১
৭১. সূরা যিলযাল : আয়াত ১-৪
৭২. সূরা কারিয়া : আয়াত ১-৫

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾

'তা ঘটবে সেদিন যেদিন মানুষ তার ভাই থেকেও পালাবে এবং নিজ মাতাপিতা থেকেও এবং নিজ স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি থেকেও।'[৭৩]

আরেক স্থানে বলছেন,

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

'সেদিন তোমাদের হাজিরা হবে এমনভাবে যে, তোমাদের কোনো গুপ্ত বিষয় গোপন থাকবে না।'[৭৪]

আরেক স্থানে বলেছেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

'কেয়ামতের দিন আমি এমন তুলাদণ্ড স্থাপন করব, যা পুরোপুরি ন্যায়ানুগ হবে।'[৭৫]

কেয়ামত দিবসের চারজন সাক্ষী

১. মানুষের অঙ্গসমূহ।

এরাই হবে প্রধান সাক্ষী। এরা নিজেরাই বলতে থাকবে, আমরা দুনিয়াতে এই-এই কাজ করেছি।

২. আল্লাহর ফেরেশতাগণ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾

' অথচ তোমাদের জন্য কিছু তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে, সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ, যারা তোমাদের সকল কাজ জানে।'[৭৬]

৩. আমলনামা।

মানুষের আমলনামাও সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে। সেদিন যদি প্রত্যেকের আমলনামা ডান হাতে হয়ে আসে, তাহলে তার আর খুশির সীমা থাকবে না। সে বলতে থাকবে,

---

৭৩. সূরা আবাসা : আয়াত ৩৪-৩৬
৭৪. সূরা আলহাক্কা : আয়াত ১৮
৭৫. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৪৭
৭৬. সূরা ইনফিতার : আয়াত ১০-১২

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ۝١٩ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝٢٠

'তারপর যাকে আমলনামা দেওয়া হবে তার ডান হাতে, সে বলবে, হে লোকজন! এই যে আমার আমলনামা; তোমরা পড়ে দেখো। আমি আগেই বিশ্বাস করেছিলাম, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।'[৭৭]

এরা ওই সমস্ত লোক হবে, যাদের অন্তরে এ বিশ্বাস থাকবে যে, আমাদেরকে কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হিসাব দিতে হবে। আর যাদের আমলনামা বাম হাত হয়ে আসবে, তারা বলবে,

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ۝٢٥ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝٢٦ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۝٢٧ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ۝٢٨ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ ۝٢٩

'যার আমলনামা দেওয়া হবে তার বাম হাতে, সে বলবে, আহা! আমাকে যদি আমলনামা দেওয়াই না হতো আর আমি জানতেই না পারতাম, আমার হিসাব কী? আহা! মৃত্যুতেই যদি আমার সব শেষ হয়ে যেত! আমার অর্থসম্পদ আমার কোনোই কাজে এল না! আমার থেকে আমার সব ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেল।[৭৮]

৪. জমিন।

মানুষ যেখানেই গুনাহ্ করুক, জমিনের ওই অংশটিও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং রিপোর্ট পেশ করবে যে, সে এস্থানে বসে এ অপরাধটা করেছিল।

আল্লাহ্ বলছেন,

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

'সেদিন পৃথিবী তার যাবতীয় সংবাদ জানিয়ে দেবে।'[৭৯]

আল্লাহ্র সান্নিধ্যের অনুভূতি

চাহিদা এমনই একটি জিনিস, যা মানুষকে গুনাহের ওপর উৎসাহ জোগায়। কিন্তু নেক বান্দা আল্লাহ্র সামনে লজ্জিত ও অপদস্থ হওয়ার ভয়ে

---

৭৭. সূরা আলহাক্কা : আয়াত ১৯, ২০
৭৮. সূরা আলহাক্কা : আয়াত ২৫-২৯
৭৯. সূরা যিলযাল : আয়াত ৪

নিজের এই চাহিদার মাঝে লাগাম লাগিয়ে নেয় এবং শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ সে করতে চায় না। আমাদের আকাবিরগণ ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তরে এমন একটি নকশা অঙ্কন করে দেন যে, সারা বৎসর তারা নিজের অন্তরে এটাই ভাবতে থাকে যে, আমরা তো আল্লাহ্‌র সামনেই উপস্থিত আছি। সেহেতু তারা যে-কাজই করুক-না কেন সর্বদা ভাবে, আমার পালনকর্তা আমাকে দেখছেন।

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'আর তোমরা যেখানেই থাক-না কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা করছ, তিনি তা প্রত্যক্ষ করছেন।'[৮০]

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

জনৈক ব্যক্তি তার সন্তানকে সাথে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। পথে তিনি আঙ্গুরের একটি বাগান দেখতে পেলেন। তখন তার অন্তরে চিন্তা এল, আমি আঙ্গুর পাড়ব। তাই সে তাঁর ছেলেকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বলল, বৎস! কেউ এলে আমাকে খবর দেবে; আমি আঙ্গুর পাড়তে যাচ্ছি।

যখনই লোকটি আঙ্গুর গাছে উঠতে যাবে, তার ছেলে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল,

يَا أَبِي! يَا أَبِي! أَحَدٌ يَرَانَا

'আব্বু! আব্বু! একজন আমাদের দেখছেন।'

একথা শোনামাত্র পিতা ফিরে এল। কিন্তু দেখল, না; কোনো লোক তো নেই। তাই জিজ্ঞেস করল, বৎস! আমাদের কে দেখছে? ছেলে বলল, আব্বু! কোনো মানুষ তো দেখছে না, তবে মানুষের পালনকর্তা দেখছেন। তখনকার ছোট্ট-ছোট্ট বাচ্চাদের অন্তরেও আল্লাহ্‌র এমন ভয় জাগ্রত ছিল।

জনৈক শিশুর আশ্চর্যজনক উত্তর

বাহলুল দরবেশ বলছেন, আমি একদা একটি গলিপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথে কিছু ছেলেপেলে দেখলাম, যারা রাস্তায় খেলছিল। তাদের নিকটেই আরো কয়েকটা ছোট্ট বাচ্চা উপস্থিত ছিল। কিন্তু একটি বাচ্চাকে বড় পেরেশান ও উদাসিন মনে হলো। আমার অন্তরে চিন্তা এল, আমি গিয়ে ওই

---

৮০. সূরা হাদীদ : আয়াত ৪

ছেলেটির মনটা ভালো করে দেব। জানা নেই, সে কেন এভাবে উদাসিন আর পেরেশান হয়ে বসে আছে? আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বেটা! তোমার কী হয়েছে? তুমি ওদের সাথে খেলছ না কেন? ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, চাচাজান!

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'আপনি কি ধারণা করেছেন, আমাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে?[৮১]

তিনি বলছেন, আমি বাচ্চাটির একথ শোনামাত্র অত্যন্ত প্রভাবিত হলাম। আর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বেটা! তুমি তো এখনও অনেক ছোট এত তাড়াতাড়ি তোমার এত চিন্তাশীল হওয়ার কী প্রয়োজন?

সে বলল, চাচাজান! আমি নিজঘরে সর্বদা দেখতে পাই, আমাদের ঘরে আমার আম্মাজান যখন আগুন জ্বালান, তখন চুলার ভেতরে ছোট-ছোট লাকড়িগুলো আগে প্রবেশ করান। এভাবে তিনি আগুনের তেজ বৃদ্ধি করেন। আর যখন আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে, তখন তিনি বড় লাকড়িগুলো প্রবেশ করান।

চাচাজান! আমি যখন এ-দৃশ্য অবলোকন করি, তখন আমার কেয়ামত দিবসের কথা স্মরণ হয়ে যায়। আমার আশঙ্কা হয়, না জানি আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের আগুন জ্বালাতে আগে ছোট-ছোট বাচ্চাদের সেখানে নিক্ষেপ করেন। আর যখন আগুন উত্তাপ ছড়াবে, তখন বড়-বড় লোকদের সিরিয়াল আসবে। আল্লাহু আকবার!

নবীজির অন্তরে কেয়ামতের ভয়

আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দাঁড়ানোর বিষয়টিই এমন যে, এটিই মানুষকে অনেক গুনাহ্ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। ওই ভয়াবহ দিনের ব্যাপারে আল্লাহর নবী বলছেন,

يَا لَيْتَ رَبُّ مَحَمَّدٍ لَمْ يَخْلُقْ مُحَمَّدًا

'হায়! যদি মুহাম্মাদের পালনকর্তা তাকে সৃষ্টি না করতেন।'

---

৮১. সূরা মুমিনূন : আয়াত ১১৫

হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর অন্তরে কেয়ামতের ভয়

এ-কারণেই হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) বলছেন,

يَا لَيْتَنِيْ! كُنْتُ عُصْفُوْرًا

আফসোস! আমি যদি চড়ুই হতাম!

আফসোস! আমি যদি কোনো মুমিন বান্দার শরীরের পশম হতাম!

আফসোস! আমি যদি কোনো বৃক্ষের শাখা হতাম!

হায় আফসোস! আমি যদি কোনো বৃক্ষের পাতা হতাম!

আফসোস! আমার মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন!

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর অন্তরে কেয়ামতের ভয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর দরবারে একদা একব্যক্তি প্রশ্ন করার পর বলতে লাগল,

يَا لَيْتَنِيْ! أَكُوْنُ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ

'হায় আফসোস! আমি যদি ডানপন্থিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!'

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) তার একথা শুনে বললেন,

يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ إِذَا مِتُّ لَمْ أُبْعَثْ

'হায় আফসোস! আমি যদি মৃত্যুর পর পুনঃজীবন না পেতাম।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর মতো প্রভাবশালী সাহাবি যখন কেয়ামত দিবসের ব্যাপারে এমন ধারণা রাখেন, তাহলে আন্দাজ করুন সেই দিনটি কেমন ভয়াবহ হবে! এ-কারণেই সাহাবায়ে কেরাম সেই দিনটিকে খুব বেশি ভয় করতেন।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর অন্তরে কেয়ামতের ভয়

সায়্যিদুনা হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর খেলাফতকালে একদা অলিগলিতে টহল দিচ্ছিলেন। ফজরের সময় নিকটবর্তী ছিল। একটি ঘর থেকে এক বৃদ্ধ মহিলার কণ্ঠ ভেসে উঠল। সেই ঘরের কাউকে জিজ্ঞেস করছে, বকরি দুধ দিয়েছে কি?

তাকে উত্তর দেওয়া হলো, হ্যাঁ, দুধ দিয়েছে।

মহিলা আবার জিজ্ঞেস করল, কতটুকু দিয়েছে?

উত্তর দেওয়া হলো, কমই দিয়েছে।

বৃদ্ধা বলল, গ্রাহকরা এসে যাবে; তাড়াতাড়ি একটু পানি মিশিয়ে দাও।

বাচ্চা জবাব দিল, আমি পানি কেন মেশাব? খলীফা ওমর (রাযি.) এমন করতে নিষেধ করেছেন।

বৃদ্ধা বললেন, এখন কোন ওমর দেখছে তোমাকে?

মেয়েটি এবার জবাব দিল, ওমর না দেখলে কী হবে, তাঁর খোদা তো দেখছেন।

হযরত ওমর (রাযি.) মেয়েটির এই জবাব শুনে ফিরে চলে এলেন। দিনের বেলায় তিনি তাঁর অন্যান্য কাজকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে তাদের উভয়কে ডাকালে জানতে পারলেন, জবাবদাতা একজন যুবতি মেয়ে ছিল। তাই তিনি নিজের ছেলের জন্য তার ব্যাপারে প্রস্তাব রাখলেন। তারপর বিবাহ হয়ে গেল।

ছেলের বৌকে ঘরে এনে একদিন হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, আদরের কন্যা! তোমাকে একটি কাজ প্রতিদিন করতে হবে।

বৌ বলল, কী কাজ হে আমীরুল মুমিনীন?

তিনি বললেন, প্রতিদিন সকাল বেলায় প্রস্তুতি নিয়ে আমি যখন দারুল খেলাফতের দিকে যাব, তখন তুমি আমাকে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

সে বলল, আমীরুল মুমিনীন! কী কথা?

ওমর (রাযি.) বললেন, শুধু এতটুকু বললেই হবে যে, 'ওমর না দেখলে কী হবে, তাঁর খোদা তো দেখছেন।'

এ ঘটনায় হযরত ওমর (রাযি.) এত বেশি প্রভাবিত হলেন যে, তিনি মাঝে-মাঝে একাকিই চমকিয়ে উঠে বলতে থাকতেন, 'ওমর না দেখলে কী হবে, ওমরের খোদা তো দেখছেন।'

হযরত ওমর (রাযি.)-এর শাহাদাতের সময় যখন নিকটবর্তী ছিল, তখন তিনি ইন্তেকালের পূর্বে ওসিয়ত করলেন, আমাকে খুব দ্রুত কাফন-দাফন করবে।

এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা তো নিশ্চয়ই জলদি করব। কিন্তু আপনি তাড়াতাড়ি করার তাগাদা কেন দিচ্ছেন?

তিনি জবাবে বললেন, 'বিষয়টি হলো, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে তোমরা তাড়াতাড়ি নিজেদের কাঁধ থেকে আমার বোঝা নামিয়ে নিলে। আর ওমরের চূড়ান্ত অবস্থা তো আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।

এসব বড়-বড় সাহাবায়ে কেরাম ওই ভয়াবহ দিনের ব্যাপারে সর্বদা এভাবে শঙ্কিত থাকতেন।

জনৈক রাখালের অন্তরে কেয়ামতের ভয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাযি.) একটি ঘটনা শোনাতেন। এক রাখাল, যে নাকি সব সময় ছাগল ইত্যাদি নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। তার অন্তরে আল্লাহর ভয় এত বেশি কাজ করত যে, তাকে যখন শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করতে বলা হতো, তখন সে জবাবে বলত, أَيْنَ اللهُ؟ আল্লাহ্ কোথায়?

রাবেয়া বসরির অন্তরে কেয়ামতের ভয়

একদা হযরত রাবেয়া বসরি (রহ.)-এর সামনে ভুনা মুরগির গোশত আনা হলে তিনি কেঁদে ফেললেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, আমার থেকে তো এ মুরগিটা অনেক উত্তম ছিল।

আগন্তুক ব্যক্তি বলল, সেটা কীভাবে?

রাবেয়া বসরি জবাব দিলেন, 'এ মুরগিটাকে প্রথমে জবাই করে তার জীবন বের করা হয়েছে। তারপর তাকে আগুনে পুড়িয়ে ভুনা করা হয়েছে। আর রাবেয়া যদি কেয়ামতের দিন ক্ষমা না পায়, তাহলে তো তাকে জীবন্ত জাহান্নামের আগুনে ভুনা করা হবে!'

ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর অন্তরে কেয়ামতের ভয়

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)-এর এক আত্মীয় বৃদ্ধা তাকে বললেন, আপনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ আপনার সন্তান ও নিজের জন্যে খরচ করেন না কেন?

জবাবে তিনি একটি দিনার চেয়ে নিলেন এবং তাকে গরম করে এক টুকরা গোশতের ওপর রাখলেন। এতে গোশতের টুকরাটা জ্বলে সেখান থেকে পোড়া গন্ধ আসতে লাগল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছ কেন?

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) বললেন, আপনি একটু চিন্তা করুন! কেয়ামতের দিন তো আমার গোশতও এভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ.)-এর ভয়

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ.) একজন উঁচুস্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তিনি একদা দুপুর বেলায় রোদের নিচে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করছেন। কেউ কাছে গিয়ে শুনছে, তিনি দু'আর সময় নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করছেন,

لِيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ

'কেয়ামতের দিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[৮২]

উক্ত আয়াতখানা তেলাওয়াত করে তিনি দু'আ করছেন, 'হে মাবূদ! আপনি যাকে সত্যবাদী বলছেন, যেহেতু তাদেরকে কেয়ামতের দিন আপনি তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেনই, তাহলে আমাদের মতো মিথ্যাবদীদের কী অবস্থা হবে?!'

সেদিন হায় আফসোসের জগত কায়েম হবে

কেয়ামতের দিন সবাই হায় আফসোস, হায় আফসোস করতে থাকবে। সবাই পেরেশান হবে। জাহান্নামকে সামনে নিয়ে আসা হবে, যাতে ঊনিশটি লাগাম লাগানো থাকবে এবং প্রতিটি লাগাম একজন করে ফেরেশতার হাতে ধরা থাকবে। এর নিচে আরো সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন। তখন জাহান্নাম চিৎকার করতে থাকবে আর মানুষদের দেখে রাগে তার মধ্যে এক ধরনের টগবগে অবস্থার সৃষ্টি হবে। এমনকি তার টগবগে অবস্থার মুহূর্তে তাতে এমন বড়-বড় স্ফুলিঙ্গ ফুটতে থাকবে, যেগুলো একেকটা খচ্চরের মতো বড়-বড় হবে এবং ওই টগবগে মুহূর্তে জাহান্নাম বলতে থাকবে, 'হে মাবূদ! আমাকে অপরাধীদের ওপর চড়াও হওয়ার অনুমতি দিন।'

এই অবস্থা দেখে সবাই ঘাবড়ে যাবে। কারণ, কার সাথে আজ কী আচরণ করা হবে কেউ জানে না।

---

৮২. সূরা আহযাব : আয়াত ৮

এমন কঠিন পরিস্থিতি দেখে সবাই হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। তিনি তাদের উপকার করতে নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে বলবেন, আমি এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াতে পারব না। কারণ, আমিও ভুলবশত একটি নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেছিলাম। এ-কারণে আজ আমারও নিজের প্রভুর সামনে হাজির হতে ভয় হচ্ছে।

তারপর সবাই হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে যে, আপনি আমাদের আজ এ কঠিন মুহূর্ত থেকে আল্লাহর সামনে নিয়ে চলেন, যাতে আমরা বেঁচে যেতে পারি।

তিনি বলবেন, কখনও নয়, আমি তো আমার অপরাধী সন্তানের জন্যে দু'আ করেছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তখন আমার প্রতি সহমর্মিতার ব্যবহার করেছিলেন এবং বলেছিলেন,

إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ

'আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি; তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'[৮৩]

এ-কারণে আমিও তো তাঁর সামনে উপস্থিত হতে পারব না।

তারপর সবাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দরবারে আসবেন। তিনি আল্লাহ্‌র দোস্ত হওয়া সত্ত্বেও অস্বীকার করবেন এবং বলবেন, আমিও তাঁর সামনে যেতে পারব না।

তারপর সবাই মূসা আলাইসি সালামের দরবারে আসবেন এবং আরজ করবেন, আপনি হলেন কালীমুল্লাহ্ (যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ্ কথা বলেন)। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, না; আমি পারব না। আমার ভুলের কারণেই তো একজন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছিল, যাকে বোঝাতে আমি ঘুসি মেরেছিলাম। এ-কারণে আমিও আজ তাঁর সামনে উপস্থিত হতে পারব না।

তারপর তারা সবাই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে অনুরোধ করবে। তিনি বলবেন, পথভ্রষ্ট লোকেরা আমাকে ও আমার সম্মানিতা মাতাকে মাবূদ বানিয়েছিল। আমি কীভাবে আজ আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতে পারি?

---

৮৩. সূরা হূদ: আয়াত ৪৬

রহমাতুল্লিল আলামীনের সুপারিশ

সর্বশেষ সবাই হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বলবে, 'হে রব্বুল আলামীনের প্রিয়তম! আপনি একটু আল্লাহকে অনুরোধ করুন। তিনি যাতে আমাদের ওপর দয়া করেন এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন। জাহান্নাম যেভাবে টগবগ করছে। তার আগুন দেখে আমাদের অন্তর পানি হয়ে যাচ্ছে। এখন আমাদের কী অবস্থা হবে? আমরা এখন পাপ থেকে জীবন কীভাবে রক্ষা করব?

হাদীছ শরীফে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাকামে মাহমূদ-এ আরোহণ করাবেন। আর তিনি সেখানে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং আল্লাহ্র এমন প্রশংসা করবেন, যা অতীতে কেউ করেনি, ভবিষ্যতেও কেউ করবে না। তিনি ইরশাদ করেন, আমি তখন আল্লাহ্র প্রশংসা করতে-করতে কাঁদতে থাকব। এক সময় তিনি বলবেন, হে আমার প্রিয়তম! আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি মাথা তুলুন। কারণ, আপনার সাথে আমার ওয়াদা রয়েছে–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

'এবং আপনার প্রভু আপনাকে এ-পরিমাণ দান করবেন যে, আপনি এতে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।'[৮৪]

হে আমার প্রিয়তম! আপনি যা চাইবেন আমি আপনাকে তা-ই দিতে প্রস্তুত আছি।

আল্লাহ্র উক্ত বাক্যের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজ করবেন,

'হে মাবূদ! আপনার বান্দাদের এ কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিন এবং তাদের হিসাব-নিকাশ আরম্ভ করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে লক্ষ্য করে বলবেন, তাহলে কাউকে হিসাবের জন্যে উপস্থিত করুন। মুহূর্তটি এমন হবে যে, কারো হালে পানি থাকবে না। নবী-ওলী সবাই তখন কাঁপতে থাকবেন।

---

৮৪. সূরা জুহা: আয়াত ৫

খোলাফায়ে রাশেদীনের ওপর রহমতে ইলাহীর বর্ষণ

তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)কে সামনে অগ্রসর করবেন, যাতে তিনি আল্লাহ্‌র সামনে হিসাব পেশ করেন। হযরত আবুবকর (রাযি.) ক্রন্দন করতে আরম্ভ করবেন এবং বলবেন, হে প্রিয় রাসূল! আমার জীবনের একটি বড় অংশ তো ইসলামের আগের, ইসলাম পরবর্তী জীবন তো আমার একেবারেই কম। তাই আমি কীভাবে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হব?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, আপনি অগ্রসর হোন। কিন্তু তিনি ভয়ে ক্রন্দন করতে থাকবেন। কিন্তু প্রিয়তমের নির্দেশ দেখে হযরত আবুবকর (রাযি.)ও সেজদায় পড়ে যাবেন এবং এমনভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবেন যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকেও লক্ষ করে বলবেন, হে আবুবকর! তুমি দুনিয়াতে আমার প্রিয় হাবীবের সঙ্গী ছিলে। আজ তুমিও বুঝি সেজদায় পড়ে আমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছ এবং ক্রন্দন করছ! প্রিয়! মাথা উঠাও, তোমার ব্যাপারে তো পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى

'আপনাকেও এ-পরিমাণ দেওয়া হবে যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।'

আপনার তো আমার প্রিয় হাবীবের ওপর অনেক ইহসান রয়েছে। আমার প্রিয় হাবীব ইরশাদ করেছেন, আমি দুনিয়াতে সকলের উপকার মিটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হে আবুবকর! কেয়ামতের দিন তোমার বদলা আল্লাহ্ নিজ হাতে দেবেন। হে আবুবকর! এসে যাও; আজ আমি আমার মাহবূবের ওপর কৃত এহসানের বদলা পরিশোধ করব এবং আপনার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেব। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা আপনি প্রবেশ করতে পারবেন।

তারপর হযরত ওমর (রাযি.)কে হাজির করা হবে। হযরত ওমর (রাযি.)-এর নেকি আসমানের তারার সমান হবে। তথাপিও তিনি ভয় পেয়ে যাবেন। আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হয়ে তিনিও ক্রন্দন আরম্ভ করবেন। তবে তাঁর ওপর আল্লাহ্‌র বিশেষ দয়া হবে। আল্লাহ্ বলবেন, হে ওমর! তুমি তো আমার হাবীবের বিশেষ বন্ধু ছিলে। তিনি লাগাতার দু'আ করে তোমাকে নিজের জন্য চেয়ে নিয়েছে। আজ আমি তোমার কাছ থেকে কীভাবে হিসাব নেব?

তারপর হযরত ওছমান (রাযি.)কে হাজির করা হবে। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সামনে যাওয়ামাত্র তাঁকে দেখে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন এবং বলবেন, হে ওছমান! তুমি আমার প্রিয় বন্ধুর ওপর এমন একটি এহসান করেছ, যার বদলা আজ তুমি পাবে।

সেই ঘটনাটি হলো, একদা ঈদের দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কিছু অর্থ দিয়ে যান, যাতে আমরা কিছু রান্না করতে পারি। মদীনার এতিম-বিধবারা আসবে এবং তারাও আমাদের কাছে কিছু চাইবে। আমরা আর তারা একসাথে পানাহার করতে পারব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে প্রিয়তমা স্ত্রী! আমার পকেটে কিছুই নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। হযরত আয়েশা (রাযি.) ধৈর্য ধারণ করলেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায থেকে ফিরে এসে দেখলেন, তাঁর ঘরে খানা তৈরী হয়ে আছে। সেখানে এতিম-বিধবাসহ ঘরের সদস্যরাও খাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! তুমি এসব কোথায় পেয়েছ? তিনি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যখন নামায পড়াতে মাঠে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন হযরত ওছমান একটা-একটা উট বোঝাই করে তাঁর সকল আম্মাজানের, মানে নবীজির সব কজন স্ত্রীর ঘরে হাদিয়া পাঠায়। একথা শুনে তাঁর অন্তর অনেক বেশি আনন্দিত হলো এবং তিনি দু'আ করলেন।

يَا رَحْمٰنُ! سَهِّلِ الْحِسَابَ عَلَى الْعُثْمَانِ

'হে দয়াময়! ওছমানের ওপর কেয়ামতের দিনের হিসাব সহজ করুন।'

তাই আল্লাহ্ সেদিন হযরত ওছমানকে লক্ষ করে বলবেন, আমার প্রিয় হাবীব আপনার জন্য সহজ হিসাবের দু'আ করেই রেখেছেন। আমি আজ সেই দু'আর মূল্যায়ন করতে চাই। হে ওছমান! আমি আজ তোমার হিসাব সহজ করে দিচ্ছি।

তারপর হযরত আলী (রাযি.)কে পেশ করা হবে। হাদীছে উল্লেখ আছে,

أَسْرَعُ الْمُحَاسَبَةِ حِسَابُ عَلِيٍّ

'কেয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ হিসাব হবে আলীর হিসাব।'

তারপর বাকি সবার হিসাব আরম্ভ হয়ে যাবে।

নবীজির সামনে লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা

চিন্তার বিষয় হলো, যখন এসব বড়-বড় মনোনীত ব্যক্তিবর্গের অবস্থা এমন হবে, তাহলে সেখানে আমরা কোন আমলনামা নিয়ে যাওয়ার ভরসা করছি। আমাদের কি অবস্থা হবে সেদিন? এজন্যেই কেউ বলেছেন,

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر * روز محشر عذرہائے من پذیر

'হে মাবূদ! আপনি উভয় জাহানের বাদশাহ আর আমি নিঃস্ব। দয়া করে কেয়ামতের দিন আমার আপত্তিগুলো গ্রহণ করুন।

گر تو می بینی حسابم نا گزیر * از نگاہ مصطفے پنہاں بگیر

'হে মাবূদ! আপনি যদি আমার হিসাব নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে অনুগ্রহ করে হিসাবটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগোচরে নেবেন।'

যাতে তাঁর সামনে আমাকে লজ্জিত হতে না হয়, যাতে আমার মনিব একথা বলতে না পারেন যে, তুমি আমার কেমন সন্তান ছিলে? তুমি তো আমার রূহানী সন্তান ছিলে। তুমিই যখন আমার বিধান মেনে চলনি, তাহলে বাকিরা তো সবাই অজ্ঞ ছিল। তারা তো দীনের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু তুমি তো কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলে। হাদীছের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলে। উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করেছিলে। তুমিই তো আমার অশ্রুর মূল্য দিলে না। অথচ আমি তোমাদের মাগফেরাতের জন্যে কত রাতই-না ক্রন্দন করেছি। আর তুমি দিনের বেলায় দৌড়ঝাঁপ করে-করে গুনাহে লিপ্ত হয়ে ছিলে। তোমার দৃষ্টি সর্বদা গুনাহের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তুমি আমার কোনো দু'আরই মর্যাদা রক্ষা করনি। তুমি ইল্‌ম অর্জন করে আমার উত্তরাধিকার অর্জন করেছ বটে; কিন্তু একে নিজের আমল দ্বারা সুসজ্জিত করনি। গভীরভাবে চিন্তা করুন, তখন আমাদের অবস্থা কেমন হবে?

হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) একদা দু'আ করলেন, 'হে মাবূদ! কেয়ামতের দিবসে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে মাবূদ! কেয়ামত দিবসে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

অনেকক্ষণ এ দু'আ করার পর বলতে লাগলেন, 'হে মাবূদ! যদি কেয়ামতের দিন আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন, তাহলে দয়া করে আমাকে অন্ধ বানিয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করবেন, যাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমাকে লজ্জা পেতে না হয়।

একটু চিন্তা করুন! আমাদের আকাবিরগণ কীরূপ দু'আ করতেন। সেদিন আমাদেরও তাঁর সামনে উপস্থিত হতে হবে। যারা আশেক হবে, যারা মুত্তাকী হবে, কেয়ামতের দিন তারাই মুক্তি পাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন,

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

'আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাঁর নবী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অপমান করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশে ধাবিত হবে।'[৮৫]

এটি ঈমানের নূর, যা তারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে অর্জন করেছে। হাদীছ পড়ে অর্জন করেছে, সাধনা করে অর্জন করেছে। সারা জীবন মাদরাসার মধ্যে সরলতার জীবন যাপন করেছে। পর্দার ভেতরে থেকে জীবন যাপন করেছে। খোদাভীতির সাথে জীবন যাপন করেছে। তাই তাদের প্রাপ্ত এ নূর কেয়ামতের দিন তাদের উপকারে আসবে। সুতরাং কেয়ামতের দিনটি হবে বড়ই আশ্চর্যের দিন, যেদিন বড়-বড় মুহাদ্দিছ-মুফাসসিরগণ পর্যন্ত ভয়ে কম্পমান থাকবেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর অন্তরে কেয়ামতের ভয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (রহ.) এমন মর্যাদাবান বুযুর্গ ছিলেন যে, তাঁর দরসে হাদীছে কমপক্ষে চল্লিশ হাজার মানুষ উপস্থিত থাকত। তাঁর উসিলায় লাখো মানুষের জীবনে পরিবর্তন এসেছে। তাঁর মৃত্যুকাল যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে ওসিয়ত করলেন, আমাকে খাট থেকে নামিয়ে জমিনে শুইয়ে দাও।

ছাত্ররা চিন্তা করল, ওস্তাদ নির্দেশ দিয়েছেন। الأمر فوق الأدب 'তথা নির্দেশ পালন করা আদব থেকে বড়'। তাই ছাত্ররা তাঁকে খাটের নিচে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। নিচে নরম কোনো বিছানা বা কোনো গদি ছিল না; বরং শক্ত মাটিই ছিল। ওস্তাদকে জমিনে শোওয়া অবস্থায় দেখে তারা কাঁদতে আরম্ভ করল যে, আমাদের ওস্তাদ আজ বিদায় বেলায় জমিনে গড়াগড়ি খাচ্ছেন আর নিজের সাদা দাড়ি ধরে ক্রন্দন করতঃ বলছেন, 'হে মাবূদ! আবদুল্লাহ্র বার্ধক্যের প্রতি দয়া করুন।'

---

৮৫. সূরা তাহরীম: আয়াত ৮

তিনি একথা বলেননি, হে মাবূদ! আমি বড় মুহাদ্দিছ, আমি বড় মুফাসসির, আমি বহুদিন যাবত হাদীছের খেদমত করেছি, ছাত্রদের পাঠদান করেছি, রাতের বেলায় আপনার ভয়ে জাগ্রত থেকেছি। আমি আপনার জন্য কতই-না সেজদা করেছি, আমি কতই-না উত্তম জীবন যাপন করেছি। নিজের কোনো আমল আল্লাহর সামনে পেশ করেননি। যেটা পেশ করেছেন, সেটা কী ছিল? সেটা ছিল 'হে মাবূদ! আবদুল্লাহর বার্ধক্যের প্রতি দয়া করুন।' মনে হচ্চে, যেন নিজের সাদা পশমগুলো আল্লাহর দরবারে হাজির করছেন।

বড়-বড় আকাবির হযরতের যখন এই অবস্থা, তখন আমরা কোন বাগানের ফসল! কেয়ামতের দিন আমাদের কী অবস্থা হবে? এজন্যই আজ নিজের জীবনের সব গুনাহের সত্যিকার ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে। এমন যাতে না হয় যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে অপমানিত হতে হয়।

চুপিসারে আমল করার আগ্রহ

আমাদের আকাবিরগণ কেয়ামতের দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন গোপনে বিভিন্ন আমল করার মাধ্যমে, যাতে অন্যরা তা জানতে না পারে। তারা চাইতেন, যাতে আমার আমলটি একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় আর কেয়ামতের দিন উক্ত আমল দ্বারা আমার নাজাতের ফয়সালা হয়ে যায়। বর্তমানে আমরা তো এমন ফিকির খুব কমই করে থাকি।

আমলের গ্রহণযোগ্যতার ফিকির

হযরত ওছমান খায়রাবাদি (রহ.) ব্যবসা করতেন। তাঁর কাছে যদি কেউ জাল টাকা নিয়ে আসত, তখন তিনি তার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে তাকে জিনিসপত্র দিয়ে দিতেন আর তিনি ওই জাল টাকাগুলো আলাদা করে নিজের কাছে রেখে দিতেন। তিনি সারা জীবন একাজ করতেন যে, জাল টাকাওয়ালাদের কখনো ফেরত দিতেন না। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে দু'আ করছিলেন, 'হে মাবূদ! আমার কাছে মানুষ জাল টাকা-পয়সা নিয়ে এসেছে। আমি তাদেরকে কখনও ফেরত দিইনি। তাদের জাল টাকাও আমি গ্রহণ করেছি। আজ তুমি আমার ত্রুটিযুক্ত আমলগুলোও কবুল করে নাও।'

একটু চিন্তা করে দেখুন! আমাদের আকাবির কীভাবে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন!

ত্রুটিযুক্ত আমলের কোনো বিনিময় নেই

এক বুযুর্গ দোকানে গেলেন কিছু ক্রয় করতে। দোকানদারকে পয়সা দেওয়ার পর সে বলছে, হযরত! এটা তো জাল টাকা। একথা শুনে তিনি এত পরিমাণ ক্রন্দন করলেন যে, বেহুঁশ হওয়ার উপক্রম হলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, এত কাঁদার কারণ কী? কয়েকটি টাকামাত্র জাল ধরা পড়েছে। আমরা আপনাকে এর চেয়ে বেশি টাকা দিয়ে দিচ্ছি। তিনি বললেন–

'আমি এ-কারণে কাঁদছি না যে, আমাকে প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া হবে না। বরং এজন্য কাঁদছি যে, আমি এখনো জাল টাকা সঠিকভাবে চিনতে পারছি না। যখন এটা দোকানদারের হাতে এসেছে, তখন সে বলে দিল, এই টাকা জাল। দুনিয়াতে তো আমি এগুলো ছাড়াও আরো টাকা জোগাড় করতে পারব। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা যেসব আমলকে সঠিক মনে করছেন, কাল যদি এই আমলগুলো আল্লাহর দরবারে পেশ করার পর তিনি বলে দেন, তোমার এই আমলগুলো জাল, তাহলে সেখানে আমার কী অবস্থা হবে? আমি তো সেখানে বিকল্প কোনো আমল পেশ করতে পারব না। এজন্যে সেদিনের কথা স্মরণ হওয়ায় আমার কান্না এসে পড়ে।

জনৈক বাদশাহর অস্থিরতা

নাম মুহাম্মাদ শাহ্। মুকরানের বাদশাহ ছিলেন। তিনি একদা তাঁর সিপাহীদলসহ জঙ্গলে শিকার করতে বের হলেন। সেই জঙ্গলে বাস করত একজন বৃদ্ধা। বৃদ্ধার একটা গাভি ছিল, যেটা বাদশাহর সিপাহীরা জবাই করে খেয়ে ফেলল। মহিলা সিপাহীদের বলল, আমাকে আমার গাভির মূল্য দিয়ে দাও, যাতে আমি আরেকটা গাভি ক্রয় করতে পারি। কিন্তু তারা মহিলাকে তার গাভির কোনো মূল্য পরিশোধ করল না। মহিলা নিরুপায় হয়ে একজন আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন, আপনি গিয়ে মুহাম্মাদ শাহ্র সাথে দেখা করে তাকে ঘটনাটি খুলে বলুন; তিনি আপনাকে মূল্য পরিশোধ করে দেবেন। মহিলা বলল, তারা তো আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে দিচ্ছে না।

আলেম বললেন, তিনি অমুক দিন অমুক পুল দিয়ে যাবেন। এ এলাকায় ওই পুলটি ছাড়া যাতায়াতের আর কোনো রাস্তা নেই। আপনি গিয়ে তার

ওপর মুহাম্মাদ শাহ্‌র পথে দাঁড়িয়ে থাকুন এবং আপনার ঘটনাটি তাকে জানান।

বৃদ্ধা সেখানে গেলেন।

তৃতীয় দিন যখন মুহাম্মাদ শাহ্‌র গাড়িবহর সেই পুল দিয়ে যাচ্ছিল, তখন বৃদ্ধা অগ্রসর হয়ে তাঁর বাহনের লাগাম চেপে ধরল।

মুহাম্মাদ শাহ্ প্রশ্ন করলেন, মা! আমার পথ আটকালেন কেন?

বৃদ্ধা বলতে লাগল, মুহাম্মাদ শাহ্! আমার কথা শোনো, তোমার কাছে আমার একটি মকদ্দমা আছে। আমি শুধু এতটুকু জানতে চাই যে, তুমি এর সমাধান এখন এই পুলের ওপর করবে, নাকি কেয়ামতের দিন পুলসেরাতের ওপর এর সমাধান হবে?'

বৃদ্ধা মহিলার উক্ত বক্তব্য শ্রবণ করে মুহাম্মাদ শাহ্‌র শরীরের পশম দাঁড়িয়ে গেল। তিনি বাহন থেকে নিচে নেমে বললেন, মা! কী এমন ঘটনা ঘটেছে? বৃদ্ধা ঘটনা বর্ণনা করার পর মুহাম্মাদ শাহ্ তাকে সত্তরটা গাভির মূল্য পরিশোধ করে দিলেন এবং তার পা ধরে অক্ষমতার স্বরে বললেন–

'মা! এখন এ পুলের ওপরই আমাকে ক্ষমা করুন। পুলসেরাতের ওপর হিসাব দেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই।'

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরও নিজেদের জীবন পরিবর্তন করে পরকালীন ভাবনা দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

কেয়ামতের নিদর্শন

'বহু লোক এমন রয়েছে, যাদের প্রচুর অর্থসম্পদ আছে। কিন্তু তারা নিজেদের মনমতো জীবন যাপন করার সামানা জোগাড় করে রেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরও এ-জগত ছেড়ে একদিন চলে যেতে হয়েছে। তারা একথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল যে, আমরা তো এখানে রাস্তায় রয়েছি, মুসাফির অবস্থায় রয়েছি। আমরা তো আমাদের আসল ঠিকানায় পৌঁছার আগেই পথে সময় নষ্ট করে ফেলেছি। যেভাবে কোনো বৃদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও পুলের ওপর ঘর তৈরি করে না, তদ্রূপ কোনো বিবেকবান মানুষ এ-জগতের সাথে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ

'তোমরা দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন পরবাসী।'

কেয়ামতের নিদর্শন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি, তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং তাঁর যাবতীয় গুণাবলির উৎকৃষ্ট প্রকাশস্থল। এ দুনিয়া আমাদের জন্য পরীক্ষাগার। এটা সফর, তামাশা আর বিশ্রামাগার নয়। আফসোসের বিষয় যে, আমরা এ দুনিয়াকে নিজেদের চারণভূমি বানিয়ে নিয়েছি। জীবনের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি এবং হায়াতের উদ্দেশ্য তাঁর স্মরণ নিজের অন্তরে ধারণ করা।

সর্বোচ্চ উন্নতির সন্ধানে

বর্তমানে জীবনের উদ্দেশ্য যেন এটাই হয়ে পড়ছে যে, সকলেই নিজ-নিজ বাগান সাজাতে ব্যস্ত। আল্লাহ্ ঈমানদারদের জন্যে পরকালে জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। তথাপিও মানুষ দুনিয়াতেই তার জান্নাত সাজাতে ব্যস্ত। তা এভাবে যে,

আমার ঘর এমন হতে হবে।

আমার স্ত্রী এমন হতে হবে।

আমার সন্তান এমন হতে হবে।

আমার পোশাক এ-ধরনের হতে হবে।

আমার গাড়ি এমন মডেলের হতে হবে।

আমার ব্যবসা এমন সিস্টেমের হতে হবে।

আমার সম্মান এভাবে-এভাবে পেতে হবে ইত্যাদি।

বর্তমানে সর্ব বিষয়ে অনেক-অনেক উন্নতির তালাশে সবাই নিজ-নিজ জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছে। মনে হয়, সবাই দুনিয়াতেই নিজের জান্নাত নির্মাণে মহাব্যস্ত। অথচ তার এ-খবরও নেই যে, আমি যাকে জান্নাত মনে করে দৌড়াচ্ছি, তার মেয়াদ খুব বেশি দিন বাকি নেই। আর আমি নিজেই তো এখানে চিরকাল থাকতে পারব না। বহু লোক এমন রয়েছে, যাদের কাছে অঢেল সম্পদ আছে এবং তারা এর দ্বারা নিজের মনমতো অট্টালিকা তৈরি করে রেখেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরও এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

তারা একথা একেবারেই ভুলে গেছে যে, আমরা তো এখানে রাস্তায় রয়েছি, মুসাফির অবস্থায় রয়েছি। আমরা নিজেদের প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবর্তে এখানে রাস্তায় সময় নষ্ট করে চলছি। যেভাবে কোনো বিজ্ঞ লোক পুলের ওপর বাড়ি নির্মাণ করে না, ঠিক তদ্রূপ কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এ দুনিয়ার সাথে নিজের সখ্য গড়ে না।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ

'তোমরা দুনিয়াতে এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন পরবাসী।'

ধোঁকার ঘর

আমাদের আসল বাড়ি হলো জান্নাত। দুনিয়া তো কয়েকদিন অবস্থান করার জায়গামাত্র। সামান্য কিছু সময়ের জন্য আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে। আর এ-সময়টুকুও প্রস্তুতির জন্য। কিন্তু আমরা আসল উদ্দেশ্যকে ভুলে কত ধরনের আশা-ভরসায় বুক বেঁধে বসে আছি। আমরা মনে করি, মেয়ের বিবাহের সময় এমনভাবে আয়োজন করতে হবে, যাতে সবার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। ছেলের বিবাহের আয়োজনও এমনভাবে করতে হবে, যাতে ঘটনাটা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে। আমার ভেতরে এই যে এক ধরনের চাহিদা যে, আমি আমার মনের সব বাসনাই পূর্ণ করব; এটা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এ-কারণেই এমন চাহিদা আর মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য মানুষ জায়েয-নাজায়েযের ধার ধারে না। তাকে নিজের চাহিদা পূরণ করতেই হবে। অথচ আল্লাহ্‌র চাহিদা পূরণ করার কথা তার স্মরণে থাকে না। এটা একটা ধোঁকা। আর এ-কারণেই দুনিয়াকে دار الغرور বা 'ধোঁকার ঘর' বলা হয়। এ

ধোঁকা শিক্ষিতরা খাচ্ছে। জ্ঞানী আর বুঝমানরাও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। বড়-বড় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গেরও জীবনের চাহিদা দুনিয়ার এসব আসবাবের প্রতি। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন,

الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

'ওই সমস্ত মানুষ, যারা এ দুনিয়ার জীবন গঠন করার জন্য ব্যস্ত রয়েছে। অথচ তারা ধারণা করে, তারা ভালো কাজে লিপ্ত রয়েছে।'[৮৬]

অন্তরের চক্ষু খোলা প্রয়োজন

আজ বেনামাযীকে জিজ্ঞেস করুন, কী অবস্থা তোমার? জবাব দেওয়া হবে, যা অতীত হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কী লাভ? এখন চিন্তা করুন! রাত-দিন যেখানে আল্লাহ্র নাফরমানি হচ্ছে, জাহান্নামের রাস্তা প্রশস্ত হচ্ছে; অথচ জিজ্ঞেস করার পর উত্তর পাওয়া যায়, যা অতীত হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কী লাভ? এই অনীহা দূর করার পদ্ধতি কী হবে? এজন্যেই এসব দ্বীনি মাহফিলে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের অন্তরের চক্ষু খুলতে হবে।

পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি কীভাবে হবে?

বর্তমানে তো মেয়ে সন্তান ভুমিষ্ট হলে মাতাপিতার চিন্তার শেষ থাকে না যে, মেয়ে যখন যুবতি হবে, তখন কীভাবে তাকে বিবাহ দেওয়া হবে এবং তার বিবাহে কী-কী আসবাবপত্র দিতে হবে? প্রত্যেক মা এ-চিন্তাই বেশি করে যে, যদি আমার মেয়ে তার শশুর বাড়িতে উত্তম-উত্তম, দামি-দামি বস্তু নিয়ে যেতে না পারে, তাহলে তো সেই বাড়িতে তার সম্মান থাকবে না।

আরে! মেয়ে তো এখনও দোলনা আর কোলে-কোলেই গড়াগড়ি খাচ্ছে। তার জন্য এখন থেকেই এত চিন্তা! এত পরিকল্পনা!

তাহলে মা এটা কেন ভাবছে না যে, আমাকে একদিন আমার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হতে হবে। যদি আমি সেখানে দামি-দামি নেকির আসবাব নিয়ে যেতে না পারি, তাহলে সেখানে আমার কি ইজ্জত থাকবে? আমি আমার প্রভুকে কীভাবে মুখ দেখাব ? সাধারণত যদি কারো কাছে যেতে হয় বা কোনো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়, তাহলে নারীরা নিজের চেহারাকে ধুয়েমুছে আরো বেশি উজ্জ্বল করে যাওয়ার চেষ্টা

---

৮৬. সূরা কাহফ : আয়াত ১০৪

করে। ভালো কাপড়চোপড় পরিধান করে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এটা কোন ধরনের আচরণ? সব সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি রয়েছে, সব নৈকট্যের জন্য প্রস্তুতি রয়েছে; কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে ?

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

'যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, আমাকে আমার প্রভুর সামনে উপস্থিত হতে হবে, তার উচিত সৎকাজে লিপ্ত থাকা। সে কখনও নিজের ইবাদাতে অন্যকে অংশীদার করে না।'[৮৭]

আল্লাহ্‌র বন্দেগি ভিন্ন বিষয়

নিজের অন্তরে এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ভালোবাসাকে স্থান দেবে না। মনের ভেতরে যত ধরনের চাহিদা আর বাসনা সৃষ্টি হয়, বাস্তবে এগুলো সবই শির্ক। মানুষ মনে করে, আমি তো সম্পর্ক সৃষ্টি করছিমাত্র। অথচ এগুলো সবই শির্ক হয়। বান্দা মনে করে, 'তুমি আমার দীন-ঈমান। এটাই ভালোবাসা।'

ওই মহব্বত, যার হক একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রাপ্য, আমরা আজ তা মাখলূকের ভেতরেই ব্যয় করে দিচ্ছি। কোনো একটি ছবি আমাদের এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে,

দিনেও অন্তরে এর খেয়াল থাকে,
রাতেও এর খেয়াল থাকে।
তার ফোনের জন্য অপেক্ষা,
তার সাথে কথা বলার জন্য অস্থির।

আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

'এবং মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের এমনভাবে তার অংশীদার সাব্যস্ত করে যে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো।[৮৮]

---

৮৭. সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ১১০
৮৮. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

এসব হলো মূর্তি, যার কারণে মানুষ মূর্তিপূজক হয়। স্মরণ রাখবেন, মনের পূজা, নারীর পূজা, টাকা পয়সা আর অর্থসম্পদের পূজা এসবই মূর্তিপূজার প্রকারভুক্ত। আল্লাহর ইবাদাত ভিন্ন জিনিস। বর্তমানে আমাদের যে-অবস্থা, তাতে কল্পনা করলে বোঝা যায়, আমাদের সকল চিন্তাচেতনা হলো দুনিয়াসংক্রান্ত। যদি আমরা নিজেদের আরজু আর উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বানিয়ে নিতাম!

تیرے دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی
مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے

'তোমার দু'আ দ্বারা আসমানি ফয়সালা পরিবর্তন সম্ভব না হলেও তোমার নিজের পরিবর্তন সম্ভব।'

تری دعا ہے کہ ہو تری آرزو پوری
مری دعا ہے کہ تری آرزو بدل جائے

'তোমার দু'আ হলো নিজের আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার জন্যে, আমার দু'আ হলো, তোমার এই আকাঙ্ক্ষায় যাতে পরিবর্তন আসে।'

আল্লাহ্ চাহেন তো আমাদের আশা-ভরসার চূড়ান্ত এবং আমাদের ভালোবাসার মারকায একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই হয়ে যান। আমরা তাঁর স্মরণে জীবন উৎসর্গ করব। তাঁরই জন্য দিন-রাত কাটাব, তাঁর জন্য ধ্যান করব। আমাদের অবস্থা এমন হবে যেন আমরা মহান রব্বুল আলামীনের সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি। এই অবস্থার ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلتَّجَافِيْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ , وَالْاِنَابَةُ إِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ

'ধোঁকা আর ধ্বংসশীল আবাসস্থল থেকে চিরস্থায়ী ঠিকানার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।'

জীবনের কোনো ভরসা নেই

দুনিয়ার এই জীবনটা হলো ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল, যা শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে পরকালীন জীবন হলো চিরস্থায়ী। দুনিয়ার এ-জীবনের ওপর কোনো ভরসা নেই যে, তা কখন শেষ হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ

'মানুষের হিসাবের দিন একবারেই নিকটবর্তী। অথচ তারা এখনও গাফলতের মধ্যে নিমজ্জিত।'[৮৯]

আমাদের মাঝে এর কোনো অনুভূতিই সৃষ্টি হয়নি যে, প্রত্যেকটি দিনই আমাদেরকে অন্ধকার কবরের আরো নিকটবর্তী নিয়ে যাচ্ছে। আমার এ-জীবনের সুযোগ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা এর থেকে সম্পূর্ণ উদাসিন অবস্থায় জীবন যাপন করছি।

ইমাম গাযযালি (রহ.) বলেন, 'হে বন্ধু! তোমার কি খবর আছে যে, সম্ভবত তোমার কাফনের কাপড় বাজারে চলে এসেছে।'

আমরা মৃত্যুকে ভুলে গেলেও মৃত্যু কিন্তু আমাদের ভুলে যায়নি। সুতরাং নিজেকে এখন থেকেই পরকালের জন্যে প্রস্তুত করা এবং নিজের পালনকর্তাকে খুশি করার ব্যবস্থা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

বর্তমানকালে কেয়ামতের বিভিন্ন নিদর্শন

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের অনেক নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকে কতগুলো নিদর্শন আমরা আজ ঘটে চলছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণ করা

হাদীছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

'পবিত্র মক্কা মুকাররামার বুক চিরে যখন রাস্তা নির্মাণ করা হবে এবং বিশাল-বিশাল অট্টালিকা যখন পাহাড়ের চূড়ার চেয়েও উঁচু হবে, তখন তোমরা কেয়ামতের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

মক্কা মুকার্‌রামার পেট চেরার অর্থ কী? এখন সেখানে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ট্যানেল নির্মাণ করে যাতায়াতের জন্যে সড়ক নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এসব দেখে মনে হচ্ছে, বান্দা আজ মক্কা মুকাররামার পেট চিরে রাস্তা নির্মাণ করাকে স্বচক্ষে অবলোকন করছে।

---

৮৯. সূরা আম্বিয়া: আয়াত ১

বিশালাকৃতির অট্টালিকা নির্মাণ

এরপর তিনি বলছেন, ভবনসমূহ যখন পাহাড়সম বা তার চেয়েও উঁচু হবে। কী উদ্দেশ্য? আজ আপনি হারাম শরীফ থেকে বাইরে এলেই দেখতে পাবেন, সেখানে পাহাড় থেকেও উঁচু-উঁচু হোটেলভবন নির্মাণ করা হয়েছে। চৌদ্দশত বছর পূর্বে যেখান ছোট-ছোট ঘরবাড়ি নির্মাণের অভ্যাস ছিল, কোনো ধরনের মেশিনারি জিনিস ব্যবহার করা হতো না এবং বিল্ডিং প্লানিং-এর মাধ্যমে কোনো ডিজাইন-ইশ্‌কাও প্রণয়ন করা হতো না, তখনকার যুগে একথা বলা যে, 'ভবনসমূহ পাহাড়ের চূড়া থেকেও উঁচু হবে' এটা কোনো সাধারণ লোকের কথা হতে পারে না। কেমন যেন নববিদৃষ্টি বর্তমান যুগের এসব অবলোকন করেই একথা বলেছেন। সুতরাং উক্ত হাদীছের মধ্যে যেদুটি বিষয়কে কেয়ামতের নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা আজ সেগুলো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি।

ইরাকবাসীর খাদ্যসরবরাহ বন্ধ হওয়া

এক হাদীছে উল্লেখ রয়েছে, একদা মদীনা শরীফে প্রবল ঝঞ্ঝা দেখা দিল। তখন উম্মুল মুমিনীনদের মধ্য থেকে কোনো একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! কেয়ামত এসে গেল নাকি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোওয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি সেখান থেকে উঠে বসে পড়লেন এবং ইরশাদ করলেন,

'কেয়ামত কীভাবে আসবে? এখনও তো ইরাকবাসীর খাদ্যসরবরাহ বন্ধ হয়নি আর আরবের মরুভূমিও এখনও সবুজ রং ধারণ করেনি।'

ইরাকবাসীর খানাপিনা বন্ধ হওয়া ওই নিদর্শন, যা আমরা আমাদের জীবদ্দশায়ই দেখেছি। ইরাকবাসীর ওপর কয়েক বছর পূর্বে এমন একটি সময় এসেছে যে, কোথায় পানাহার, অসুস্থদের জন্য সেখানে ওষুধ পর্যন্ত যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আরবভূমিতে কৃষি উৎপন্ন হওয়া

এবং বলেছেন, আরবের ভূমি এখনো সবুজ হয়নি। বর্তমানে আরব দেশগুলোতে এত বেশি পরিমাণ ক্ষেতখামার হচ্ছে যে, গম উৎপাদনে তারা আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছে ;বরং সারা বছরের উদ্বৃত্ত গম তারা বাইরের দেশগুলোতেও রপ্তানি করছে।

টাকার বিনিময়ে স্ত্রীর আনুগত্য করা

এভাবে কেয়ামরে বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَأَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنٰى صَدِيْقَهُ وَأَقْصٰى أَبَاهُ

'মানুষ নিজের মায়ের পরিবর্তে স্ত্রীর আনুগত্য প্রদর্শন করতে থাকবে এবং পিতার পরিবর্তে বন্ধুর কথা মানতে আরম্ভ করবে।'

দেখুন, তিনি কতই-না আশ্চর্য কথা বলেছেন! শরীয়ত মায়ের ও স্ত্রীর অধিকারের সীমা বর্ণনা করে দিয়েছে। কেউ যখন তাতে বেশকম করবে, মাতাপিতাকে এড়িয়ে চলবে আর স্ত্রীর সব ধরনের কথাই গ্রহণ করবে, এটাও কেয়ামতেরই একটা নিদর্শন।

পিতার পরিবর্তে বন্ধুর কথায় চলা

দ্বিতীয়ত তিনি বলেছেন, পিতার কথা এড়িয়ে যাবে আর বন্ধুর কথা গ্রাহ্য করবে। বর্তমানের যুবকদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, তারা নিজের পিতাকে এমনভাবে ঘৃণা করছে যেমন কেউ পাপকে ঘৃণা করে। এটা কেন হয়েছে? কারণ, পিতা ভালো কথার উপদেশ দেন এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করেন। আর বন্ধু সব সময় তার মনের চাহিদা পূরণের কথা বলে। এ-কারণেই পিতাকে মন্দ লাগে আর বন্ধুকে ভালো মনে হয়।

মা যেন নিজের নির্দেশদাতাকে জন্ম দিয়েছেন

তিনি আরো একটি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন যে, 'যখন মা তার নির্দেশদাতাকে জন্ম দিবে।'

আজ কত-কত মেয়ে এতই বদমেজাজী যে, খোদ তাদের মা তাদের ভয় করে। তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ বিষয় নিয়েও মায়ের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। মায়ের সাথে জিদ ধরে। এই নির্দশনগুলোই আজকাল বেশি নজরে পড়ছে।

বুযুর্গদের কোনো যোগ্য স্থলাভিষিক্ত না থাকা

আরেকটি নির্দশন এ বলেছেন, 'যখন আউলিয়ায়ে কেরাম তাদের যোগ্য কাউকে রেখে যেতে পারবে না।'

বাস্তবেই আজ সে-সময়টিই বিরাজমান। যে-আলেমই দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন, তাঁরপর তাঁর মতো দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের বিকল্প তৈরি হচ্ছে না।

যাকাতকে জরিমানা মনে করা

তিনি আরো বলেন, 'মানুষ যখন যাকাতকে জরিমানা ভাবতে আরম্ভ করবে।'

অর্থাৎ– মানুষ যখন যাকাত আদায় করাকে বোঝা মনে করবে। যাকাত দেওয়া তাদের কাছে অনেক বেশি ভারী মনে হবে। বর্তমানে নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মানুষ কেমন আগ্রহ নিয়ে যাকাত আদায় করে। অধিকাংশই তো একে নিজের জন্য বোঝা মনে করে।

প্রত্যেক কানে গান-বাদ্যের আওয়াজ ঢোকা

'তিনি আরো বলেছেন, 'যখন সব মানুষের কানেই বাদ্যযন্ত্র দ্বারা গান গাইবে।'

বর্তমান যুগের মোবাইল এমন হয়ে গেছে যে, এর মধ্যে এখন আর ফোন করার গুণই বাকি রয়নি। তাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মিউজিক আর গানের বাদ্য বা স্বর। এছাড়া বর্তমানের যুবসমাজ যে এ মোবাইল দ্বারা মেমোরিসহ আরো বিভিন্ন পন্থায় কত ধরনের গান-বাদ্য শুনছে আর কত ধরনের অবৈধ জিনিস দেখছে, তার তো কোনো হিসাবই নেই (আল্লাহ্ আমাদের হেফাযত করুন)।

হজের সময় তাওয়াফ চলাকালে এক যুবককে দেখলাম, হঠাৎ তার মুঠোফোনে কল এল আর ইন্ডিয়ান হিন্দি গান বাজতে আরম্ভ করল। যুবক পকেট থেকে মোবাইল বের করে ফোন রিসিভ করল। এখন বলুন দেখি! যদি বায়তুল্লাহ্ শরীফের সামনে তাওয়াফরত অবস্থায়ও এ সমস্ত গায়কদের আওয়াজ শুনতে হয়, তাহলে এটা কি কেয়ামতের নিদর্শন নয়? অনেক সময় নামাযরত অবস্থায় মসজিদের মধ্যেই এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। কারণ মানুষ নিজের মোবাইলটা বন্ধ করতেও ভুলে যায়।

উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ও ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করা

তিনি ইরশাদ করেন, 'যখন দেখবে উলঙ্গপনা, বেয়াহাপনা ও ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করবে।'

আপনারা নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে পূর্ণ অবগত রয়েছেন যে, আজ সমাজে উলঙ্গপনা মহামারির আকৃতি ধারণ করেছে। এমন মুহূর্তের ব্যাপারেই হাদীছে উল্লেখিত আছে, তখন তুফান ও ভূমিকম্পন ব্যাপক আকার ধারণ করবে।

ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের হত্যা করা

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, 'দীনদার, বুযুর্গ ও ইসলামি ব্যক্তিত্বদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হবে।'

বর্তমানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, দীনদার, বুযুর্গ আর ইসলামি ব্যক্তিবর্গকে দুনিয়ায় জীবিত থাকার অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। সর্বত্র আজ মুসলিমরাই নির্যাতিত-নিপীড়িত। বরং আজ বিশ্ব মুসলিমকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যু, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ এবং আওয়াজ সৃষ্টি হওয়া

তিনি আরো একটি আশ্চর্যজনক নিদর্শন বর্ণনা করেছেন যে, 'আরবের বাদশাহর মৃত্যু হবে।'

আপনি যদি একটু চিন্তা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, গত কয়েকদিন পূর্বে এই নিদর্শনটিও পূর্ণতা লাভ করেছে।

এরপর আগামী রমাযানের প্রথম তারিখে সূর্যগ্রহণ এবং পনেরো তারিখে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে।

গত কয়েকদিন পূর্বেও সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ নিশ্চয়ই আপনারা অবলোকন করেছেন। তারপর তিনি ইরশাদ করেছেন, 'ওই মুহূর্তে দুনিয়াতে এমন একটি আওয়াজ আসবে, যা সারা দুনিয়াব্যাপী শোনা যাবে।'

এটাও সম্ভব হতে পারে যে, পাকিস্তানের কিছু-কিছু অঞ্চলে যে-ভূকম্পন এসেছে, এটাই সেই আওয়াজ যেটা সারা দুনিয়ার জীবজন্তুও শুনেছে এবং খবরের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার মানুষও জানতে পেরেছে। সেটা কত মারাত্মক ভূকম্পন ছিল! আল্লাহু আকবার! মানুষের জন্য নিজের নিঃস্বতা এবং অসহায়ত্বের এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর কী হতে পারে?

কখনও-কখনও মানুষ যখন নিজের সব আসবাবপত্র ঠিকঠাকমতো ব্যবস্থা করতে পারে, তখন তারা খোদার মতো আচার-ব্যবহার করতে থাকে। তাই ওই বান্দাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আল্লাহ্ কখনও-কখনও জমিনে এসব ভূকম্পন সৃষ্টি করেন। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য এর একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

ভূমিকম্পের দুটি কারণ

ভূমিকম্পের দুটি কারণ রয়েছে।

১. প্রাকৃতিক কারণ।

২. শরয়ী কারণ।

প্রাকৃতিক কারণসমূহ

এই জমিন সৃষ্টির সময় অত্যন্ত গরম ছিল। ওপরের ছাদ এখন ঠান্ডা আর শীতল হয়ে আছে। কিন্তু এর ভেতরে এখনও অগ্নিকুণ্ড বিদ্যমান আছে। এখন যখনই এসব অগ্নিকুণ্ড পরস্পরে সংঘর্ষ হয়, তখনই দুনিয়ায় তার কম্পন অনুভূত হয়।

এই কম্পন জমিনের বিভিন্ন অংশে হতে থাকে। এমনকি দৈনিক জমিনে প্রায় শতবার কম্পন দেখা দেয়। কিন্তু এগুলো যেহেতু এতো মারাত্মকভাবে হয় না, তাই মানুষও সেভাবে অনুভব করতে পারে না। যদিও বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে তা নির্ণয় করা হয়।

শরয়ী কারণসমূহ

ভূকম্পনের অনেক শরয়ী কারণও রয়েছে। কখনও-কখনও মানুষের কার্যক্রম এতটাই বিকৃত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হুঁশ ফেরানোর জন্য জমিনকে কম্পমান হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন আর তাতেই জমিন দুলতে আরম্ভ করে।

إن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها, ثم قال: اسكن فإنه لم يأن لك ثم التفت إلى أصحابه, فقال: إن ربكم ليستأتبكم فأتبوه

'একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ভূকম্পন দেখা দিলে তিনি তাঁর হাত মোবারক জমিনে রেখে ইরশাদ করলেন, থেমে যাও; এখনও কেয়ামতের সময় হয়নি। তারপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের প্রতি দৃষ্টি ফেরালেন এবং ইরশাদ করলেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রভু চাচ্ছেন, যাতে তোমরা তাওবাকারী হয়ে যাও। সুতরাং সবাই তাওবা করো।'

নবীজির উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারাই বোঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা চান, যাতে সব মানুষ তাওবাকারী হয়ে যায়। নিজের গাফলত, অলসতা, গুনাহ্ ও অন্যায় কাজকর্ম থেকে তাওবা করুক এবং তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করুক। এ-কারণেই তিনি মাঝে-মাঝে জমিনকে নাড়া দিয়ে থাকেন।

কোনো-কোনো বর্ণনায় রয়েছে, একদা হযরত ওমর (রাযি.)-এর খেলাফাতকালে মদীনা মুনাওয়ারায় ভূমিকম্প হলো। তিনি পেরেশান হয়ে বললেন, এটা কী? তোমাদের মধ্যে কে আবার নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে? এমনটা যদি আরেকবার হয়, তাহলে আমি তোমাদের মাঝে থাকব না।'

অর্থাৎ– তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, এ ভূমিকম্প কোনো-না-কোনো পাপের কারণে হয়েছে।

অন্যকে আনন্দ দিতে সুগন্ধি ব্যবহার করা

হাদীছ শরীফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাযি.)কে প্রশ্ন করা হলো, ভূমিকম্প কেন হয়? উত্তরে তিনি ভূমিকম্প আসার তিনটি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটি হলো, 'যখন নারীরা নিজের স্বামী ছাড়া অন্যকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে সুগন্ধি ব্যবহার করবে।'

কতই-না বাস্তব কথা বলেছেন তিনি! আজ আপনি যেদিকেই তাকাবেন, দেখবেন, নারীরা স্বামীকে খুশি করার জন্য সুগন্ধি খুব কমই ব্যবহার করে থাকে। অথচ বাইরে বের হলে মানুষের নৈকট্য অর্জন করার জন্য সে বেশি-বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করে। বহু তরুণী স্কুলে যাওয়ার সময় সুগন্ধি নিয়ে যায়। নিজের সুঘ্রাণের জন্য এসব খুশবু ব্যবহার করে। নারী তার দেহে যখন এ-নিয়তে সুগন্ধি ব্যবহার করে যে, অন্যরা আমার দিকে আকৃষ্ট হবে, তাহলে এর কারণে তো ভূমিকম্প হবেই। এটা ভূমিকম্প হওয়ার অন্যতম নিদর্শন।

অন্যের সামনে উলঙ্গ ও অর্ধনগ্ন হওয়াতে সঙ্কোচবোধ না করা

দ্বিতীয় নিদর্শন এই বর্ণনা করেছেন যে, 'যখন দেখবে, গায়রে মাহরাম তথা পরপুরুষের সামনে নারীরা নগ্ন হওয়াতে সঙ্কোচবোধ করবে না।'

এখন দেখুন, এটা কত বড় নিদর্শনের বর্ণনা যে, যখন নারীরা নগ্ন হওয়াতে সঙ্কোচবোধ করবে না। এই নগ্ন হওয়ারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে।

আজকাল মহিলারা বলে, চেহারার পর্দা নেই। তারা মুফতী হয়ে বসে আছে। তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ইহরামের মতো গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের ব্যাপারে যখন বলা হয়েছে, কাপড় যাতে চেহারায় লেগে না থাকে, এটা কি একথার প্রমাণ বহন করে না যে, ইহরাম ছাড়া অন্য সময় অবশ্যই চেহারায় কাপড় থাকতে হবে? চেহারায় যদি আগে থেকেই কাপড় না থাকার বিধান প্রযোজ্য হতো, তাহলে তো ইহরাম অবস্থায় কাপড় লেগে না থাকার কথাটি অনর্থক হতো। এর অর্থ তো এটা নয় যে, ইহরামের অবস্থায় কাপড়

একেবারে সরিয়ে নিবে। বরং বলা হয়েছে, কাপড়কে এমনভাবে রাখবে, যাতে সেটা চেহারা থেকে একটু দূরে থাকে। তথাপিও কিন্তু গায়রে মাহরাম তথা পরপুরুষের সাথে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ যখন সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে এই বিধান জারি করেছেন যে, যখন তোমরা একে অন্যের কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবে, তখন,

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

'সুতরাং তোমরা নিজেরা যদি না জান, তবে উপদেশ সম্পর্কে জ্ঞাতদের জিজ্ঞেস করো।'[৯০]

চেহারা যদি সতরই না হতো, তাহলে 'পর্দার আড়াল' শব্দ ব্যবহার হলো কেন? কুরআনেইবা এ শব্দ কেন উল্লেখ করা হয়েছে? অথচ আজ সমাজে উন্মুক্ত চেহারায় কারো সামনে উপস্থিত হওয়াকে দোষই মনে করা হয় না।

আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়ে কল্পনা করুন, কতই-না যুবতি-তরুণী এমন রয়েছে, যারা নিজেদের মাথাই ঢেকে রাখে না, বুক ঢেকে রাখে না, তাদের হাতের বাজুও অর্ধনগ্ন থাকে। এই নগ্ন হওয়ারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। অনেক যুবতি এমন রয়েছে, যারা কোনো-না-কোনো পর্যায়ে এমন মারাত্মক অপরাধে অপরাধী। ঘরে কাজকর্মকারী পুরুষদের তো এরা মাহরামই মনে করে থাকে। অথচ তারা তো তাদের ক্রীতদাস নয়।

মোটকথা, দ্বিতীয় নিদর্শন এই বর্ণনা করেছেন যে, যখন নারীরা পরপুরুষের সামনে নগ্ন হওয়াতে সঙ্কোচবোধ করবে না। বর্তমানে কোনো নারী নিজের অফিসে কাজকর্ম করে এমন পুরুষদের সামনে নগ্ন হয়ে আসতে কোনো ধরনের সঙ্কোচবোধ করে নাকি? না। বোঝা গেল, আমরা আজ কোনো-না-কোনোভাবে এমন মারাত্মক ধরনের অপরাধের মধ্যে জড়িয়ে আছি।

মদ-গাঁজা আর বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপকতা

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) কেয়ামতের তৃতীয় নিদর্শন এই বর্ণনা করেছেন যে, 'যখন নেশাজাতীয় দ্রব্য ও গান-বাজনা ব্যাপক আকার ধারণ করবে, তখন তোমরা ভূমিকম্পের জন্য অপেক্ষা করবে।'

এ-কারণেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেছেন,

---

৯০. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৭

مَا ظَهَرَ فِيْ قَوْمٍ الزِّنَا وَلَا رِبَا إِلَّا أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَقَابَ اللهِ

'যখন কোনো জাতির মধ্যে সুদ ও ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করবে, তখন বুঝতে হবে, তারা নিজেদেরকে আল্লাহর শাস্তির সামনে প্রস্তুত করছে।'

এখানে দুটি গুনাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. ব্যভিচারের গুনাহ্।

২. সুদ খাওয়ার গুনাহ্।

বর্তমান সমাজে ব্যভিচারও ব্যাপক আকার ধারন করেছে। এক তো হলো অপকর্মের ভূমিকা। এটা মহামারির আকার ধারণ করেছে বলা যায়।

১. গায়রে মাহরাম তথা পরপুরুষ আর পরনারীর দিকে তাকানো চোখের যেনা। আজ শতের মধ্যে এমন ভাগ্যবান লোক হয়তো একজনই পাওয়া যাবে, যে নিজের চক্ষুকে শতভাগ হেফাযত করে। অন্যথায় আজ পুরুষের দৃষ্টি তো সর্বদা নারীর তালাশেই লেগে আছে। আর মহিলাদের বক্র দৃষ্টি পুরুষের দিকে নিবদ্ধ।

২. কানের যেনাও আজ ব্যাপক। মোবাইল আজ এমন একটি মহামারি হিসেবে দেখা দিয়েছে যে, ঘন্টার-পর-ঘন্টা পরনারীর সাথে কথা চলছে তো চলছেই। ম্যাসেজ পাঠানো হচ্ছে এর চেয়ে আরো ভয়ংকর গতিতে।

৩. অন্তরে পরনারীর কল্পনা করা অন্তরের যেনা।

৪. বেগানা নারীর সাথে বা নারী বেগানা পুরুষের সাথে সাক্ষাতের জন্যে গেলে পায়ের যেনা।

আজ যদি আপনি যেনার এ-সকল প্রাথমিক স্তরের দিকে গভীরভাবে লক্ষ করেন, তাহলে দেখবেন, এটা এত ব্যাপক আকৃতি ধারণ করেছে যে, এখন পরিপূর্ণ যেনার দিকে ধাবিত হতে মনে হয় সামান্যই বাকি আছে।

এ তো হলো যেনার বর্ণনা। আরেকটা হলো সুদের বর্ণনা। আজ প্রায় সকল ব্যবসায়ীই নিজেদের একাউন্ট সুদি ব্যাংকে খুলতে পছন্দ করে। বিষয়টি এমন হলো যেমন কেউ তার কোনো পবিত্র জিনিসের সাথে একটু প্রস্রাব মিশিয়ে নিল, যার কারণে সবই অপবিত্র হয়ে গেল। তাই হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, যখন কোনো জাতি নিজেদের মধ্যে এদুটি মহামারিকে প্রকাশ্যে পালন করতে আরম্ভ করে, তখন তারা আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

গুনাহের শাস্তি বিভিন্ন ধরনের ভূকম্পনের মাধ্যমে

আগেকার বিভিন্ন নবী-রাসূলের উম্মতকেও তাদের অপরাধের শাস্তি ভূমিকম্পের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।

১. মাদয়ানবাসীর মধ্যে উচ্চ-নিম্নের ব্যবধান ছিল। তাদের ওজনে কম দেওয়ার স্বভাব ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান,

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

'যখন তাদের কঠিন ভূমিকম্প আক্রমণ করেছে।'[৯১]

২. হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে চল্লিশজন লোক তূর পাহাড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা ভাওতাবাজি আরম্ভ করল যে, আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব, আল্লাহর সাথে আমাদের কথা হয়েছে, নাকি হয়নি? এ-ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

'যখন তাদের কঠিন ভূমিকম্প আক্রমণ করেছে।'[৯২]

৩. অভিশপ্ত কারুন আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মানতে অস্বীকৃতি জানায়। তার ব্যাপারে মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ

'আমি তাকে তার ঘরবাড়িসহ জমিনে ধসিয়ে দিয়েছি।'[৯৩]

ভূমিকম্পের সময় কী করা উচিত?

এখানে অন্তরে একটি প্রশ্ন জাগে যে, ভূমিকম্পের সময় কী করা উচিত? আল্লামা ইবনে কাইয়েম (রহ.) 'আল-জাওয়াবুল কাফী' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) তাঁর কোনো এক গভর্নরের কাছে একটি পত্র লিখেন, যাতে লিখা ছিল, 'যখনই তোমরা জমিনে ভূমিকম্প অনুভব করবে, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্র সামনে নিজের গুনাহ্সমূহ থেকে তাওবা করবে। ময়দানে বের হয়ে আল্লাহ্র সামনে আহাজারি করবে, দু'আ করবে এবং নিজেদের কিছু অর্থসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করবে।'

---

৯১. সূরা আরাফ : আয়াত ৯১
৯২. সূরা আরাফ : আয়াত ৫৫
৯৩. সূরা কাসাস : আয়াত ৮১

ওলামায়ে কেরাম বলেন, ওই কঠিন পরিস্থিতির সময় সেসব দু'আ করা জরুরি, যেগুলো বিভিন্ন মসিবতের সময় আম্বিয়ায়ে কেরাম করতেন এবং সেসব দু'আর উসিলায় আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নবীগণকে মসিবত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজ সত্তার ওপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি রহম না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[৯৪]

এটি হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের দু'আ। এ-কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মসিবত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ভূমিকম্পও একটি কঠিন মসিবত। তাই তখনও এ দু'আ পড়ার অনেক উপকার রয়েছে।

৪. যখন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে তিনি আল্লাহ্র সামনে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করেছেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۞

উক্ত দু'আর বরকতে আল্লাহ্ তাঁকে মাছের পেট থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এভাবে যখনই কোনো মুসলিম কোনো-না-কোনো মসিবতে ফেঁসে যায়, তখন উক্ত দু'আ পাঠ করার দ্বারা আল্লাহ্ তাকে সেই মসিবত থেকে মুক্তি দান করেন।

'আদ-দুররুল মুখতার' নামক প্রসিদ্ধ ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, 'যদি কখনও ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় তাহলে, সকলে নিজ-নিজ ঘরে একা-একা নামায পড়তে থাকবে। নামায পড়া সম্ভব না হলে দু'আ করতে থাকবে। তবে নামায পড়াই উত্তম। কারণ, পবিত্র হাদীছ শরীফে উল্লেখ রয়েছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ

'নবী কারামী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কঠিন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন,তৎক্ষণাৎ তিনি নামায পড়া আরম্ভ করতেন।'

কিছুলোক ভূমিকম্পের সময় আযান দেওয়া আরম্ভ করে। এটা ভুল। এমনটা না করা উচিত।

---

৯৪. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৩

আরো একটি প্রশ্ন এখানে সৃষ্টি হয়। তাহলো, ভূমিকম্প আরম্ভ হওয়ার সময় অনেক লোককে দেখা যায়, তারা কামরা থেকে খোলা ময়দানে বের হয়ে পড়ে। তখন তাদের আর এই হুঁশ থাকে না যে, এখন কী করা উচিত। কেউ-কেউ একে ভালো মনে করলেও অনেকে আবার একে আল্লাহর ওপর ভরসার পরিপন্থী মনে করে। এ-ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

এ-ব্যাপারে 'আদ-দুররুল মুখতার' নামক ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ রয়েছে,

أخذته الزلزلة في بيته ففر إلى الفضاء لا يكره بل يستحب لفرار النبي صلى الله عليه وسلم من الحائط المائل

'ভূমিকম্প আসার সময় কেউ যদি তার ঘরে থাকে আর সেখান থেকে বের হয়ে খোলা ময়দানে চলে আসে, তাহলে এতে কোনো দোষ নেই। বরং এমনটি করা মুস্তাহাব। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেওয়ালের পাশ দিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে দ্রুততার সাথে চলে যান।'

যেভাবে হেলেপড়া দেওয়ালের পাশ দিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত অতিক্রম করেছিলেন, এভাবে ভূমিকম্পের সময় কামরা থেকে বাইরে চলে আসা মাকরুহ হবে না; বরং মুস্তাহাব হবে।

এটি সৃষ্টিগত সিদ্ধান্ত

আরো একটি বিষয় এখানে বোঝার আছে। তা হলো, যাদের ওপরই ভূমিকম্প আসুক-না কেন, তারা কখন ও আমাদের থেকে খারাপ নন। আর আমরাও তাদের তুলনায় ভালো নই। এটি শুধুই একটি আসমানি ফয়সালা ছিল যে, আল্লাহ্ জমিনের এ অংশে একটি ভূকম্পন সৃষ্টি করে আমাদের সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। এখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলে আমাদেরই উপকার হবে। অন্যথায় একদিন আমাদের ওপরও তো একই মসিবত আসতে পারে। সুতরাং এ-সকল ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবন পরিবর্তন করা উচিত।

একটি কঠিন ভূমিকম্প

পাকিস্তানের সেই ভূমিকম্পটি কতই-না ভয়ানক ছিল। সেটি যখন হলো, তখন অনেক লোক সেখানে গিয়ে অনেক আশ্চর্য-আশ্চর্য বিষয় প্রত্যক্ষ

করল। কিছু-কিছু ভূমিকম্প তো এমন রয়েছে, যেগুলো আসার পরও অনেক মজবুত-মজবুত ঘরবাড়ি রক্ষা পায়। আবার কিছু-কিছু ভূমিকম্প এমনও রয়েছে যে, তখন মজবুত থেকে মজবুত ঘর বাড়িরও কোনো পাত্তাই থাকে না। সাধারণত ভূমিকম্প কোনো একদিক থেকে এসে ডানে বামে জমিনের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে। তখন দেখা যায়, অনেক বিল্ডিং তখন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু পাকিস্তানের এবারের ভূমিকম্পটি খুবই ভয়ানক ছিল, যেখানে জমিন শুধু ওপরে নিচে কম্পমান ছিল।

জমিনের পেটে ধসে যাওয়া ব্যক্তির অলৌকিক জীবন

একব্যক্তি যবানবন্দি দিচ্ছে, যখন ভূমিকম্প আসছিল, তখন জমিনের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, মনে হয়ন তুলার মতো নরম। তাতে আমি আমার বুক সমান দেবে গেলাম। তারপর আরেকটি কম্পন সৃষ্টি হলো আর তাতে আমি পুনরায় বেরিয়ে এলাম। আর এভাবে আল্লাহ্ তাঁর অত্যন্ত দয়ায় আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

তিনতলা মসজিদ জমিনের ভেতর দেবে গেল

আমরা তিনতলা একটি মসজিদ দেখলাম, যার ছাদ জমিনবরাবর হয়ে আছে আর বাকি পুরা মসজিদটি এমনভাবে জমিনের ভেতরে দেবে আছে যেমন কেউ পেরেককে দেওয়ালের মধ্যে ঠুকে দেয়। এভাবে সম্পূর্ণ মসজিদ ভবনটিকে জমিনের ভেতরে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সম্পূর্ণ গ্রাম দুটি পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে যায়

আমাদের একজন খুবই ঘনিষ্ট আলেম আছেন। তিনি ভূমিকম্পের পর নিজের মাতাপিতার খোঁজখবর নিতে নিজ বাড়িতে গেলেন। পূর্ণ এক দিন খুঁজেও তিনি নিজের গ্রামটারই কোথাও খোঁজ পেলেন না। তিনি পেরেশান হয়ে বললেন, আমি এখানেই কালাতিপাত করেছি। আমর গ্রাম কই? তারপর তাঁর গ্রামের কেউ বলল, এই যে, দুটি পাহাড় দেখছেন; এগুলোকে দেখুন। এদুটি পাহাড়ের চূড়া আপনার কাছে পরিচিত মনে হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, ভূমিকম্পের মুহূর্তে এ দুটি পাহাড় কাছাকাছি চলে এসেছে আর উভয় পাহাড়ের মাঝখানে সম্পূর্ণ গ্রামই চাপা পড়ে আছে। আর মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনায় ওই আলেমের প্রায় তিনশত পচিশজন আত্মীয় নিহত হয়েছেন। কল্পনা করুন! মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভূকম্পন একজন ব্যক্তির তিনশত পঁচিশজন আত্মীয়র জীবনাবসান ঘটালো।

পরিবারের সবাই নিহত!

আমাদের মাদরাসার এক ছাত্রী, যার মাতাপিতা, ভাই-বোন এবং তাদের ঘরে যত ছোট্ট শিশু ছিল তারা সবাই ঘরসহ জমিনের পেটে দেবে গেছে। একমাত্র ওই মেয়েটি একা বেঁচে আছে। এসব শিক্ষণীয় ঘটনা শিহরিত হওয়ার মতো ঘটনা, যাতে এসব থেকে আমাদের হুঁশ ফিরে আসে। কারণ, এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাদেরও তো হতে পারে।

সম্পূর্ণ মহল্লা জমিনে ধসে গেল

আমাদের একজন খুব কাছের বন্ধু আছেন। তার এক পরিচিত ব্যক্তির সাথে আরো লোমহর্ষক ঘটনা ঘটল। যুবক মানুষ। জনৈক মেজরের স্ত্রী বলছে, আমার মাত্র চার বছরের কন্যাসন্তান আর দু-তিন মাসের একজন ছেলে সন্তান। ওই নারী তার স্বামী-সন্তানসহ একই খাটে ঘুমানো ছিল। হঠাৎ করে ছোট্ট বাচ্চাটি নড়ে উঠল এবং হালকা কাঁদল। মনে হলো, যেন তার ফিডারের প্রয়োজন হয়েছে। যদিও আমার অনেক ঘুম ধরেছে; কিন্তু আমি ঘুম থেকে জেগে বাচ্চাকে ফিডার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি পাশের দেওয়ালে পড়ল। আর আমি সেখানে একটি ফাটল দেখতে পাই। তৎক্ষণাৎ আমি আমার স্বামীকে জাগিতে বললাম, দেওয়ালে এসব কী হচ্ছে দেখুন! তিনি উঠে দেখলেন এবং বললেন, দেওয়ালে মনে হয় ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আমরা উভয়ে তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েকে তুলে কামরা থেকে বের হওয়ামাত্র ওই কামরার ছাদ ধসে পড়ল। আমাদের ঘরের বাইরের অংশে একটা বেলকুনি ছিল। আমরা তার মধ্যখানে আটকা পড়ি। আমার স্বামী বড় একটি ইট নিয়ে দরজার ওপর আঘাত করে একটু ভাঙলেন। তারপর তিনি বাইরে গিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি সন্তানদের তার কাছে দিতে বললেন। আমি খিড়কির ওপর দিয়ে ছেলেমেয়েকে তার কাছে দিলে সে তাদেরকে জমিনে শুইয়ে দিল। আমি দরজার খিড়কির ওপরে উঠে বের হতে পারছিলাম না। আমার স্বামী আমাকে আমার চুল ও হাত শক্ত করে ধরে টানল। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে আমিও বাইরে বেরিয়ে এলাম। যে বেলকুনিতে আমরা দাঁড়ানো ছিলাম, তার ছাদও ধসে পড়ল। তারপর আমরা ছেলেমেয়েকে জমিন থেকে কোলে নিলাম এবং সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই হাঁটতে পারছিলাম না। মনে হয় কেউ অনেক ভারী কিছু আমাদের পায়ের সাথে

বেঁধে দিয়েছে। পা উঠানোও খুব কষ্টকর ছিল। কারণ, এতক্ষণে জমিনের কম্পনও আরো তীব্র হচ্ছিল।

মহিলা বলছে, আমার স্বামী একজন মেজর ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আজতো দেখি পা উঠানো অনেক কঠিন লাগছে। আমরা সেখান থেকে কোনো রকমে পঞ্চাশ কদম পেছনে এসে যখন পেছনের দিকে তাকালাম, তো দেখলাম, আমাদের মহল্লার সব বাড়িঘর জমিনের পেটে ধসে গেছে। এখন আমরা একমাত্র জমিন ছাড়া সেখানে আর কোনো ঘর দেখতে পাচ্ছি না।

সর্বদা নিজের নিঃস্বতার খেয়াল রাখবে

আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে মাঝে-মাঝে বান্দাদের নিজের বিভিন্ন নিদর্শন প্রদর্শন করেন আর বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা বিভিন্ন দুনিয়াবি নেশায় মত্ত হয়ে আজ আমাকে, আমার হুকুমকে ভুলতে বসেছ। অথচ, আমি যদি নিদের্শ দেই, তাহলে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে তোমার যাবতীয় ভোগ-বিলাসিতা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তোমরা তো ওই প্রতাপশালী সৃষ্টিকর্তার আদেশ লঙ্ঘন করছ, এই পৃথিবীর ধ্বংসের চাবি যার হাতের মুঠোয় বিদ্যমান।

নিহত হওয়া সবাই কিন্তু পাপি ছিল না

স্মরণ রাখবেন, এ মহাপ্রলয়ে নিহত সবাই কিন্তু পাপী ছিল না। যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে।

১. আপনি শুনে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন যে, ঘটনার সাত দিন পর একটি ভবন ধসে পড়ে আর তার নিচ থেকে ১৬ থেকে ১৮ বছরের এক যুবককে উদ্ধার করা হয়। তাকে বের করা মাত্রই সে আল্লাহু আকবার! বলে চিৎকার করে। লোকেরা প্রশ্ন করল, তোমার কি কোনো ভয় নেই? সে বলতে লাগল, 'কেন? আমি তো আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি আর আমার জীবন-মরণ তো তাঁরই হাতে ন্যস্ত। আমি তো ধ্বংস্তূপের নিচে চাপা পড়ে ছিলাম। কিন্তু আমি মনে-মনে চিন্তা করলাম, যদি আমার মালিক আমার মৃত্যুর ইচ্ছা করে থাকেন, তাহলে আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আর যদি তিনি আমাকে জীবিত রাখতে চান, তাহলে যেকোনোভাবেই হোক তিনি আমাকে রক্ষা করবেন।'

দেখুন! এক যুবকের এমন পাক্কা বিশ্বাস ছিল। তাও আবার ধ্বংসস্তূপের ভেতরে থাকাবস্থায়।

২. এক বুযুর্গকে দশম দিন ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করা হয়, যার বয়স ছিল প্রায় পঁচাশি বছর। উদ্ধার করার মুহূর্তে তিনি খুবই ক্লান্ত ছিলেন। তবে বলছিলেন–

'এই দশ দিনে আমার কোনো নামায-রোযা কাজা হয়নি। আমার সাথে ঘড়ি ছিল। আমি সময় অনুযায়ী রোযার নিয়ত করেছি এবং ইফতারও করেছি এবং সময়মতো তায়াম্মুম করে আমি নামাযও আদায় করেছি।'

বলছিলাম, যাদেরকে জমিনের নিচে দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা যাদের ঘরবাড়ি জমিনের পেটে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তারা সবাই আমাদের থেকে বেশি খারাপ ছিল না। বরং আমাদের থেকে অনেক অনেক উত্তম ছিলেন। কতই-না আশেক লোক ছিলেন। কতই-না আল্লাহ্ওয়ালা নারী ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফয়সালা এসে গেছে। তাই তিনি জমিনের এ অংশকে ধসিয়ে দিয়েছেন। তাই সেখানে বদকারদের সাথে আশেকরাও ধ্বংস হয়েছেন।

এ-সকল ভয়ানক অবস্থা শ্রবণ করে আমরা কি নিজেদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করতে পারি না যে, আমরা আজই আল্লাহ্র দরবারের নিজেদের কৃত অপরাধের জন্যে তাওবা করব? যদি এমনসব ভয়াবহ অবস্থা অবলোকন ও তা শ্রবণ করার পরও শিক্ষা গ্রহণ না করি, তাহলে বুঝতে হবে, আমরা নিজেরাই আমাদের পরকালকে বিনষ্ট করার কাজে লিপ্ত রয়েছি।

বছরে দু-একবার পরীক্ষা

আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

'তারা কি দেখে না, তারা বছরে দু-একবার বিভিন্ন পরীক্ষায় লিপ্ত হচ্ছে? তথাপিও তারা তাওবা করছে না এবং উপদেশও গ্রহণ করছে না।'[৯৫]

আল্লাহ প্রতি বছর এক-দুবার আত্মপ্রকাশ করেন। কোথাও সুনামি আসে, কোথাও ভূকম্পন সৃষ্টি হয় আবার কোথাও ঝড়-তুফান দেখা দেয়। এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা যে, হে মানুষেরা! তোমরা হুঁশিয়ার হও।

---

৯৫. সূরা তাওবা : আয়াত ১২৬

তোমরা এখন গাফলতের ঘুমে বিভোর অথচ তোমাদেরকে আরো অনেক অগ্রসর হতে হবে।

আজ যদি আমরা নিজেদের অন্তর নিয়ে একটু ফিকির করি, তাহলে দেখতে পাব, সেখানে হিংস্রতা আর শত্রুতায় জায়গা করে আছে। আমরা আজ আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করার পরেও অন্তরে কোনো ধরনের অনীহা সৃষ্টি হয় না। আজ মানুষ মানুষকে ধ্বংস করতে প্রস্তুত। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ও মানুষদের সতর্ক করছেন।

চিন্তা করুন! উক্ত ভূমিকম্পে কতই-না জীবজন্তু মাটির নিচে চাপা পড়ে চিরদিনের জন্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কতই-না ক্ষেতখামার ছিল। সব জমিনের সাথে মিশে গেছে।

অসংখ্য আশেক লোক ছিলেন। তারাও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন এসব ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন।

শিক্ষা গ্রহণ করো, অন্যের শিক্ষা গ্রহণের কারণ হয়ো না

আমাদের পূর্বসূরীগণ বলতেন,

اَلسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ لِغَيْرِهٖ وَالشَّقِيُّ مَنْ وُعِظَ لِنَفْسِهٖ

'ভাগ্যবান তারা, যারা অন্যের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর বদকার হলো, যে নিজেই অন্যের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করার কারণ হয়।'

আজ আমাদের উত্তম কাজ এটাই হবে যে, আমরা এই মাহফিল থেকেই আল্লাহ্র দরবারে নিজেদের গুনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

সবাই এ দু'আ পড়ুন;

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا

'হে মাবূদ! আমরা যদি কোনো ভুলত্রুটি করি, তার কারণে আমাদের পাকড়াও করবেন না।'[৯৬]

নিঃসন্দেহে আমরা সবাই গুনাহগার। এজন্য তার সামনে আমাদের আরো বেশি নত হওয়া চাই। সুতরাং আজ এই মাহফিলকে নিজের জন্য তাওবা ও সংশোধনের মাহফিল হিসেবে গ্রহণ করুন।

---

৯৬. সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৩

আজ জীবনের গতি পরিবর্তন করুন

যে-সকল মহিলা পর্দা করতে ত্রুটি করে থাকেন, তারা আজ থেকে অন্তর থেকে তাওবা করুন যে, আমরা শরঈ পর্দা করব। যারা নামাযের ব্যাপারে অলসতা করেন, তারাও পাক্কা তাওবা করুন, আমরা আজ থেকে নামাযের ব্যাপারে পূর্ণ তৎপর হব। যারা সর্বদা নিজেদের স্বামীর সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত থাকেন এবং ঘরের শান্তি বিনষ্ট করেন, তারা আজ থেকে অঙ্গীকার করুন, আজকের পর থেকে আমরা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে হলেও স্বামীর ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব। যাদের অন্তরে অন্যের অস্তিত্ব ঘর বেঁধে আছে, তারা ওই প্রেতটাকে অন্তর থেকে তাড়িয়ে দিন।

একমাত্র আল্লাহ্‌র সাথে প্রেম-ভালোবাসার অঙ্গীকার করুন। তিনি আজ আমাদের এ রমজানুল মোবারক দান করেছেন। জানা নেই, আগামী রমজান আমরা কেউ পাব কিনা? এই রমজানেরও মাত্র কয়েক দিন বাকি আছে। কেউ পানিতে মাছ ধরার পর যেমন তা তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে ফসকে বের হয়ে যায়, রমযানের আগমনও এমনই। কয়েক দিন পূর্বে আমরা এর জন্যে অপেক্ষায় ছিলাম আর আজ দেখুন, মাত্র কটি দিন বাকি আছে। আমরা কি চিন্তা করেছি, আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা হলো কিনা? আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করার ফয়সালা নিয়েছেন কিনা? আমরা কি রোনাজারি করে আমাদের প্রভুকে বশে আনতে পেরেছি? যদি এতে কোনো ধরনের অলসতা করে থাকি, তাহলে যে কটা দিন বাকি আছে এর মধ্যে তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করি। আল্লাহর সাথে যে-ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, নিশ্চয়ই তিনি তার ঘাড় মটকে দেবেন এবং তাকে অন্যের জন্য শিক্ষা গ্রহণের কারণ বানাবেন। বান্দার জন্যে তো গোলামিই সাজে। তাই তাঁর সামনে নত হয়ে তাওবা করুন– হে মাবূদ! আমরা অনেক গুনাহ্ করেছি, অনেক অপরাধ করেছি, তথাপিও আপনি আমাদের সুযোগ দিয়েছেন। এখন আমাদের তাওবা কবুল করুন এবং ভবিষ্যতে আমাদেরকে শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে রক্ষা করুন।

এমন ভাবুন যে, আমরা আজ আবার নতুন করে প্রথম থেকে মুসলমান হচ্ছি এবং নতুনরূপে ঈমানি, ইসলামি ও কুরআনি জিন্দেগি যাপন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি।

একটু ভাবুন, আপনি আপনার এই জীবন থেকে মানুষের উপকারে কতটুকু ব্যবহার করেছেন।

আমি পিতার সাথে সাক্ষাতে যাচ্ছি।

আমি আম্মুর সাথে সাক্ষাতে যাচ্ছি।

আমি স্বামীর কাছে যাচ্ছি।

মানুষের কল্যাণে আপনি নিজেকে কতটুকু ব্যবহার করেছেন? আপনি কি কখনও নিজের এ-জীবনকে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের জন্যে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছেন? রব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি তো হলো নিজের কোনো অঙ্গ দ্বারা গুনাহ্ না করা এবং ওই পবিত্র শরীর নিয়েই প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়া। হে আল্লাহর বান্দিরা! আপনারা যদি প্রতিদিন হাজারবার মাখলূকের জন্যে নিজেদের চেহারাকে সাজাতে পারেন, তাহলে আজ থেকে নিজের এই চেহারাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেও সাজিয়ে রাখুন। কখনও গোসল করে, কখনও উজু করে মুসল্লার ওপর দণ্ডায়মান হয়ে প্রভুর মুখোমুখি হোন এবং বলুন, হে মাবূদ! আমি আপনার সাথে সন্ধি করার জন্যে এসেছি। আমার মাবূদ! আমি আজ সব ধরনের ভেদাভেদ নিঃশেষ করতে এসেছি। হে রব্বুল আলামীন! আমি আজ সেজদার মাধ্যমে তোমার সামনে নত হতে এসেছি। পারলে তাঁর সামনে এমন একটি সেজদা করুন, যা তাঁর পছন্দ হয়ে যায়।

نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا

کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمیں پر نشاں رہے

'আমরা ইখলাসের সাথে এমন একটি সেজদা করি, যা তাঁর কাছে পছন্দনীয় হয়ে যায় এবং এর দ্বারা তিনি আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।'

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে নিজেদের জীবন পরিবর্তন করে নেক জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

সৃষ্টিতত্ত্বে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ

'আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জমিনের প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তারা জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধি। এর উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষও দুনিয়ার জগতের বিভিন্ন বিষয়ের রহস্য জানার যোগ্যতা রাখে। এ-কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

'আর তিনি আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের যা কিছু আছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে।'

مسخر তথা আয়ত্তাধীন করা কাকে বলে? ইমাম রাগেব ইসফাহানী (রহ.) المفردات এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, مسخر করার উদ্দেশ্য হলো কোনো বস্তুতে লাগাম লাগিয়ে তাকে নিজের খুশিমতো ব্যবহার করা।'

সৃষ্টিতত্ত্বে (Genetic Engineering) বিজ্ঞানের উৎকর্ষ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ !

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

আমল কীভাবে ইবাদাত হয়?

মানুষ দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত, তাঁর প্রতিনিধি এবং তাঁর যাবতীয় গুণের জন্য পরিপূর্ণ প্রকাশস্থল, যাদেরকে তিনি তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

'আর আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।'[৯৭]

ইবাদাতের উদ্দেশ্য কী? অর্থাৎ– বান্দা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নির্দেশ ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো পন্থা অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করবে। এতে তার জীবনের সব কাজই ইবাদাতে গণ্য হবে। কেউ-কেউ নিজেদের ইবাদাতের সম্পর্ক একমাত্র নামাযের মুসল্লার সাথে করে নিয়েছে। এটা একেবারেই ভুল ধারণা। মুসল্লায় বসেও ইবাদাত হয়। আবার ইবাদাত তো সমস্ত জিন্দেগিকেই বেষ্টন করে আছে। যদি আমাদের লেনদেন, ওঠাবসা, চলাফেরা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নির্দেশ ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো পন্থা

---

৯৭. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৫৬

অনুযায়ী হয়, তাহলে দুনিয়ার জীবনের সবই ইবাদাত হবে। কেউ-কেউ শুধু তাসবীহ্ ঝপ করাকেই ইবাদাত মনে করে। অথচ তারা মাঝে-মাঝে মিথ্যা কথাও বলে বেড়ায়। যবান দ্বারা অন্যদের কষ্টও দিয়ে থাকে। তাদের লেনদেনও স্বচ্ছ হয় না। এভাবে তাদের সারাটা জীবন শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালিত হয় না। অথচ যদি কোনো বান্দা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পন্থা অনুসরণ করে থুতুও ফেলে কিংবা ইস্তিঞ্জা করে, তাহলে এটিও তার জন্যে ইবাদাতে পরিণত হয়ে যায়।

বস্তু ও হস্তলিখন বিদ্যা

আপনি যদি মানবেতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহলে দেখবেন, হযরত আদম আলাইহিস সালাম এ দুনিয়াতে 'বস্তুবিদ্যা' নিয়ে এসেছেন। এর উদ্দেশ্য কী ছিল? বিভিন্ন বস্তুর নাম সম্পর্কে জানা। বর্তমানে বিভিন্ন জিনিসের যে-নাম রয়েছে, প্রথমে কেউ না কেউ তো এগুলোর নাম ঠিক করেছেন। সর্বপ্রথম এ নামগুলো রেখেছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলে থাকি, এটা পানি, ওটা গাছ, এটা জমিন আর ওটা আসমান। এসব শব্দ বিভিন্ন বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করে। হযরত আদম আলাইহিস সালাম নামগুলো ঠিক করেছেন তৎকালীন যুগের ভাষা অনুযায়ী তখন যে ভাষাই থাকুক না কেন। এটা মানুষকে দান করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম বিদ্যা।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا

'আর তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিখিয়েছেন।'[৯৮]

তারপর হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আগমন করলেন। তিনি ইল্মে কলম তথা হস্তলিখন বিদ্যা নিয়ে এলেন। আর তিনি মানুষকে কলম দ্বারা লেখা শিক্ষা দিলেন। যদিও তখনকার লেখা বর্তমানকালের ন্যায় এত সুন্দর ছিল না, তথাপি তখনকার লেখায় এমন কোনো বিশেষ চিহ্ন অবলম্বন করা হতো, যার দ্বারা বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে কিছু না কিছু বোঝানো সম্ভব হতো। তখনকার মানুষ নিজ-নিজ শিক্ষাকে কলমের মাধ্যমে সংরক্ষণও করতে আরম্ভ করল। এভাবেই মানবজাতির নিকট লেখার বিদ্যার মতো মহা মূল্যবান নেয়ামতটি বিকশিত হলো।

---

৯৮. সূরা বাকারা : আয়াত ৩১

কৃষিবিদ্যার যুগ

মানুষ দুনিয়ায় সর্বপ্রথম শিল্পের যে-বিদ্যা শিক্ষা করেছে, তা হলো, ক্ষেতখামার আর কৃষি কর্মের বিদ্যা। কারণ, মানুষের সব ধরনের প্রয়োজনের সাথে জমিনের সম্পর্ক অনেক গভীর। শরীরের সব প্রয়োজন জমিন দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব। আমরা যে-রুটি আহার করি এর ফসলও তো জমিন থেকেই উৎপন্ন হয়। যে-পানি পান করি, তাও জমিন থেকেই নির্গত হয়। যে-ঘরে জীবন যাপন করি, তার সব আসবাবই জমিন থেকে সৃষ্টি হওয়া। যে-পোশাক পরিধান করি এর সব কাঁচামাল জমিন থেকে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বোঝা গেল, আমাদের জীবনের সব ধরনের প্রয়োজনাধি আল্লাহ্ তা'আলা জমিন থেকেই ব্যবস্থা করেন। এ-কারণেই জমিন সৃষ্টি করতে যদিও দুদিন সময় লেগেছে; কিন্তু এতে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ রাখতে চার দিন সময় লেগেছে।

জমিনের মধ্যে উর্বরতার যে-পন্থা তিনি ঠিক করে দিয়েছেন আর তাতে বিভিন্ন রকমের খনিজ পদার্থ রেখে দিয়েছেন, এ সবগুলোকে জমিনে রাখতে চার দিন সময় লেগেছে। যদি এ পদ্ধতি সুষ্ঠু না হতো এবং জমিন ফসল উৎপাদন না করত, তাহলে মানুষের জীবন কীভাবে পরিচালিত হতো? আর যদি শুধু ফসল উৎপন্ন হতো আর জমিন থেকে খনিজ পদার্থ পাওয়া না যেত, তাহলে মানবজীবনের অবস্থা কেমন হতো? এসব কিছুই মানুষের জন্যে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা জমিন থেকে বের করে দিয়েছেন। যেহেতু মাটিই মানুষের জীবনের মূল, তাই এ মাটিতেই তাদের সব প্রয়োজন রেখে দিয়েছেন।

প্রয়োজনগুলো কীভাবে পূর্ণ করবেন? এভাবে যে, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের প্রয়োজন যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, জমিনও তার উর্বরতা তত বেশি প্রদর্শন করছে। একটা সময় ছিল, যখন জমিনের ফসল ভোগকারীর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল। অথচ বর্তমান দুনিয়াতে মানুষের সংখ্যা এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্যে জমিন থেকে পানিও আসছে, সবজি, ফল এবং অন্যান্য নেয়ামতসমূহও জমিন থেকে সেভাবে উৎপন্ন হচ্ছে। আর জনসংখ্যা যদি এর চেয়ে কয়েক গুণ বৃদ্ধিও পায়, তথাপিও জমিন সবার জন্যে রিযিকের ব্যবস্থা করার যোগ্যতা রাখে।

মানুষ সর্বপ্রথম কৃষিকাজেই উৎকর্ষ সাধন করেছে। প্রথম-প্রথম মানুষ তাদের সরলতার যুগে বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি এবং ফল-ফলাদি উৎপাদন

করতে সক্ষম হয় এবং মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পুরা করতে আরম্ভ করে। এ-কারণেই সে যুগে যার কাছে একটু জমিন থাকত, সে তাতে ক্ষেতখামার করে অথবা কৃষি কাজ করে নিজের বিভিন্ন প্রয়োজন পুরা করত। পরবর্তীকালে কৃষিকাজ এমনভাবে বিস্তৃতি লাভ করল যে, কওমে সাবার যুগে কৃষিপ্রযুক্তি অনেক সম্প্রসারিত হলো। কুরআন যার সাক্ষ্য দিচ্ছে এভাবে,

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ

'কওমে সাবার জন্যে তাদের বস্তিতে রয়েছে নিদর্শন, যার ডানে-বামে ছিল দুটি বাগান।'[৯৯]

তাদের চলাচলের রাস্তাগুলোতে ডানে-বামে কয়েক মাইল পর্যন্ত বিভিন্ন ফল-ফলাদির বাগানে ভরপুর ছিল। মুফাসসিরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার মাথায় খালি টুকরি নিয়ে কওমে সাবার বাগান দিয়ে হেঁটে যেত, তবে বাগান এতো দীর্ঘ লম্বা হতো যে, বাগান থেকে বের হওয়ার পূর্বেই নিজে-নিজে ঝরেপড়া ফল-ফলাদি দ্বারা ওই ব্যক্তির টুকরি ভরে যেত। আমরা তাফসীরের কিতাবে যখন এ ঘটনা পড়েছি, বিশ্বাস করেছি বটে, কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি যে, এটা কী করে সম্ভব! হে মাবূদ! এটা কেমন বাগান ছিল, যেখানে ঝরেপড়া ফল দ্বারাই টুকরি পূর্ণ হয়ে যেত।

আল্লাহ্‌র মেহেরবানিতে আমার একবার দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি কলাবাগান দেখার সুযোগ হয়েছে, যেটি দেড়শত মাইল দীর্ঘ ও পঞ্চাশ মাইল প্রশস্ত ছিল। আমাদের গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলছিল। কিন্তু বাগান শেষ হচ্ছিল না। দেড়শ মাইল সফর করার পর বাগান শেষ হয়। সেদিন আমাদের একথা বিশ্বাস হয়েছে যে, কুরআনুল কারীমে যে কওমে সাবার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাদের বাগান এমন এমন ছিল। তাদের একেকটি শহরের মাঝখানে যে-পরিমাণ জায়গা থাকত, তাতে শুধু বাগান আর বাগানের সারি ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

'রবের দেওয়া রিযিক ভক্ষণ করো আর তাঁর শোকর আদায় করো। কতই-না পবিত্র শহর। আর তোমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল।'[১০০]

---

৯৯. সূরা সাবা: আয়াত ১৫

১০০. সূরা সাবা: আয়াত ১৫

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এটাই চান যে, বান্দা তাঁর খেয়ে তাঁরই শোকর আদায় করবে। তিনি তো তাঁর বান্দাদের ক্ষুধার্ত রেখে খুশি হন না। বরং তিনি চান, আমার বান্দা আমার নেয়ামতরাজি ভোগ করুক আর নিজের ঘাড়টা আমার সামনে নত করুক।

এর উদাহরণ এভাবে বুঝুন! যখন কোনো মেজবান তার মেহমানের সামনে কোনো খাবার রাখে, তখন মেজবানের খেয়াল কিন্তু এটা হয় না যে, মেহমান না খেয়ে থাকুন। বরং তখন মেহমান না খাওয়ায় মেজবানের আরো বেশি আফসোস হয়। আর যদি মেহমান আগ্রহের সাথে সে খাবার গ্রহণ করে, তবে মেজবান খুশি হয় আর উল্টো মেহমানের শুকরিয়া আদায় করে। এজন্যে যে, মেহমান তার দেওয়া খাবার আগ্রহের সাথে খেয়েছে।

এমনিভাবে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনও চান না যে, বান্দা না খেয়ে ক্ষুধার্তও পিপাসার্ত থাকুক। বরং তিনি চান, যাতে বান্দা তাঁর নেয়ামতরাজি ভোগ করে আর তার শোকরিয়া আদায় করে। কারণ, আমিই তো তার রিযিকের ব্যবস্থা করেছি।

ভাইয়েরা আমার! দুনিয়াতে কেউ আপনাদের পেপসি খাওয়ালেও কিন্তু আপনারা তার শোকর আদায় করেন। তাহলে যে-পালনকর্তা আপনাদের-আমাদের দস্তরখান বিভিন্ন রকমের নেয়ামত দ্বারা সাজিয়ে দেন, তিনি কি এই অধিকার রাখেন না যে, আমরা তার শোকর আদায় করব? তথাপিও মানুষ বলে,

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا

'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের সফরগুলোর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন।'[১০১]

তারা যেন তাদের প্রভুকে বলছে, হে মাবূদ! এক শহর থেকে অন্য শহরে যেতে কোনো তৃপ্তি হচ্ছে না। যদি মাঝখানে কিছু বিরান খালি জায়গা থাকত, তাহলে মনে হতো, আমরা সফরে রয়েছি। এজন্যেই বলা হয়, বান্দা যখন নিজেদের মর্জি মোতাবেক সব কিছুর ব্যবস্থাপনা পেয়ে যায়, তখন তার মধ্যে আমিত্ব আর গাদ্দারি চলে আসে। এসব বিপদের কারণ হলো পেটটা ভর্তি থাকা। কারণ, পেট যখন খালি থাকে, তখন তার আল্লাহর কথাও স্মরণ থাকে। আর পেট যখন ভরা থাকে, তো আল্লাহকেও ভুলতে থাকে। এমন অবস্থা কওমে সাবারও হয়েছিল।

---

১০১. সূরা সাবা: আয়াত ১৯

একদা হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) ক্ষুধার্ত থাকার ফযিলত বর্ণনা করছিলেন। কেউ একজন বলে উঠল, হ্যাঁ! ক্ষুধাও এমন একটি বিষয় হলো, এর ফযিলত বর্ণনা করতে হবে? তিনি বললেন, ফেরাউনেরও যদি দরিদ্রতা দেখা দিত, তবে সেও খোদায়িত্বের দাবি করত না। সে তো নিজের অবস্থা সম্পর্কে ভুলেই গেয়েছিল; তাই নিজেকে খোদা দাবি করেছে।

এভাবে বান্দা যখন নিজের পছন্দনীয় খাবার পেয়ে যায় এবং তার পেট ভরে যায়, তখন সে ভাবতে থাকে, এখন তো আমার আর কারো কাছে নত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সে তখন কারো পরোয়া করে না। সে তখন নিজের দয়াময়কেও ভুলে যায়।

যদি অধিক সময় ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে অথবা প্রয়োজনের তুলনায় কম ভক্ষণকারী হয়, তাহলে তার কথা মানুষের অন্তরে অধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর আপনি একথার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেখতে পারেন যে, যেব্যক্তি অধিক খাবারে আসক্ত হয়, তার কথায় মানুষের জীবনে খুব কমই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। সেগুলো অনেক মজাদার ও সুন্দর-সুন্দর বক্তব্য হতে পারে; কিন্তু মানুষ তা এক কান দিয়ে শ্রবণ করে অন্যটি দিয়ে বের করে দেয়। সুতরাং একথা মনে রাখবেন যে, যারা পেট ভরে আহার করে, তাদের ওপর কারো নসীহত কাজ করে না। আবার যারা নসীহত করে, তারা অধিক ভক্ষণকারী হলে তাদের কথায়ও কারো জীবনে পরিবর্তন আসে না। বোঝা গেল, ক্ষুধার্ত থাকতে পারা মহান আল্লাহ্‌র একটি বড় নেয়ামত। কারণ, ক্ষুধা মানুষকে তার প্রয়োজনীয় সময়গুলো স্মরণ করিয়ে দেয়।

এজন্যেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'আমি পছন্দ করি যে, একদিন আহার করব আর আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করব এবং অপর দিন রোযা রাখব আর ধৈর্যধারণ করব।'

তাই তো কওমে সাবা যখন আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হয়ে গেল, তখন তাঁর অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানির কারণে তাদের বাগানসমূহের নিচে পানির যে-নালা ছিল এবং বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন হচ্ছিল, আল্লাহ্ পানি শুকিয়ে দিলেন এবং এসব ফল-ফলাদির বাগানগুলো নিঃশেষ করে দিলেন।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগ

তারপর আরো একটি যুগ এল, যাতে মানুষ বিল্ডিং নির্মাণ করতে আরম্ভ করল। অর্থাৎ– কৃষি থেকে অগ্রসর হয়ে তাদের দৃষ্টি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর

দিকে এল। যদিও তখন এর সব ধরনের উপকরণ ছিল না যেমন বর্তমানে রয়েছে। কিন্তু তৎকালীন যুগ হিসেবে তারা এমন বিলাসবহুল বিল্ডিং তৈরি করেছে, যা দুনিয়ার আশ্চর্যতএ-বিষয় বলে বিবেচিত হতো।

প্রথমত মিশরে যে-পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছে, তা এখনো Wonders of the world বা দুনিয়ার আশ্চর্যতম জিনিসের মধ্যে অন্যতম বিবেচিত হয়। যার মধ্যে মিশরের রাজা-বাদশাহদের লাশ বিভিন্ন কেমিক্যাল ব্যবহার করে মমি করে রাখা হয়েছে। অথচ এ-পিরামিড দেখে বুঝে আসে না, এত সুবিশাল আকৃতির প্রস্তর খণ্ডগুলো কীভাবে কোত্থেকে সেখানে স্থাপন করা হয়েছে।

মানুষ সাধারণত ঘর নির্মাণ করার জন্য ইট ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু সেখানে কয়েক টন ওজনের এক-একটি পাথর রেখে দেওয়া হয়েছে। ওই পাথরগুলোও এমন শৈল্পিকভাবে কাটা হয়েছে, যেভাবে সেগুলো জোড়া দেওয়া হয়েছে, তাতে কেউ দেখে বুঝবে না, এখানে কয়েকটি পাথর আছে। ওই যুগে তো ক্রেন বা কোনো ধরনের মেশিন ইত্যাদি ছিল না। তাহলে কয়েক টন ওজনের এই পাথর খণ্ডগুলো শত-সহস্র ফিট ওপরে তোলা আবার সেখানে তা স্থাপন করা আশ্চর্যতএ-বিষয়ই বটে। তারা সেটিতে এমন নির্মাণশৈলী ব্যবহার করেছে যে, এত ওপরে গিয়ে এর তিনটি দেওয়াল একই স্থানে মিলিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন দেখুন যে, সুদীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত মানুষ এর প্রবেশ পথ আবিষ্কার করতে পারেনি। তারপর জাপানি বিজ্ঞানীরা সেখানে গবেষণা করে আল্ট্রাসাউন্ড (যেভাবে মানুষের আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হয়) পদ্ধতিতে তার ভেতরের অংশ অবলোকন করে দেখতে পায়, তার ভেতরের খালি জায়গাগুলোর কোনো-কোনো অংশে ফাঁকা মনে হয়। তখন তারা তৎকালীন মিশর সরকারের অনুমতিক্রমে ফাঁকা অংশের বাইর থেকে কাটতে আরম্ভ করে। তো বিশাল সিঁড়ি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। সেসব সিঁড়ি এমন সংকীর্ণ ছিল যে, কোনো মানুষ সেটা দিয়ে না শুয়ে, না বসে প্রবেশ করতে পারে। বরং মধ্যম পন্থায় আস্তে-আস্তে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়।

ভেতরে প্রবেশ করার পর তাদের কাছে তিনটি আশ্চর্য বিষয় পরিলক্ষিত হয়।

১. প্রথএ-বিষয়টি হলো, ওই পিরামিডের ভেতরে বড়-বড় কামরা বা হল তৈরী করা ছিল, যেখানে রাত-দিন অনুভব করা যেত। অথচ সেটি

সর্বদিক থেকেই বন্ধ। কিন্তু চতুর্দিকে এমন কিছু পাথর লাগানো ছিল, যেগুলো দিয়ে বাইরের একটু-একটু আলো ভেতরেও অনুভব হতো। যেমন ফাইভার গ্লাস দিয়ে ভেতরে আলো আসে। দিনে সেখানে একটু আলো থাকত আর রাতে একটু অন্ধকার থাকত।

২. দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক বিষয়টি হলো, পিরামিডের ভেতের যে হল রয়েছে, লক্ষণীয় বিষয় হলো, তাতে একটি সাইক্লোন বা বাতাসের প্রবাহ চলত। আর ভেতরে অবস্থান করা সবাই সেই বাতাস উপভোগ করত। অর্থাৎ– ওই জায়গাটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যদি কখনো এক জায়গায় বাতাস আসা বন্ধ হতো, তো অন্য দিক থেকে সেখানেও বাতাস চালু হয়ে যেত। সেখানে বাতাসের একটি অটোমেটিক যন্ত্র চলমান। এর জন্য কোনো ধরনের বিদ্যুত বা পাখার প্রয়োজন নেই। ওহে আমার মাওলা! ওই যুগে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এমন রাজত্ব ছিল যে, তারা তাদের রাজা-বাদশাহদের লাশ মমি করে রেখে দিয়েছে, যা এখনো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

৩. তৃতীয় আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, তারা সেই বিশাল হলরুমে শোওয়ার জন্য বিছানা সাজিয়ে রেখেছে। বরং তাতে একটি কামরা এমন রয়েছে, যেখানে তারা একটি মনোরম দরবার সাজিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ– ওই যুগে যেভাবে রাজা বাদশাহদের দরবার সাজাত, সেভাবে দরবার সাজিয়ে রেখেছে। সিংহাসনের মধ্যে স্বর্ণের কারুকার্য করা হয়েছে আর একজন বাদশাহ সেই সিংহাসনে টুপি পরিধান করে বসে আছেন এবং দরবারের দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন আর তাঁর হাত এমনভাবে রাখা আছে যে, এখনই কোনো নির্দেশ প্রদান করবেন। নতুন কোনো দর্শনার্থী যখন সেখানে প্রবেশ করবে, তখন সে বাদশাহর নির্দেশাবস্থা দেখে আজ উঠবে। একথা বুঝে আসে না যে, বাস্তবে তো সে মৃত; কিন্তু তারা একে সাজিয়ে এমনভাবে বসিয়ে রেখেছে যে, মনে হয় এভাবেই তার মৃত্যু হয়েছে। বর্তমান উন্নয়নশীল দুনিয়ার মানুষও যখন সেখানে যায়, তো এর অবস্থা অবলোকন করে সেও চরম আশ্চর্য বোধ করে।

তাহলে চিন্তা করুন, যে মানুষ কতই-না দৃষ্টিনন্দন ভবনসমূহ তৈরি করে রেখেছে। এগুলো তো বর্তমান যুগের কোনো শৈল্পিক কার্যক্রম নয়; বরং বহুকাল পূর্বেকার ঘটনা এটি। বর্তমানে তো বিল্ডিং-এর ভেতর লোহা-রড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এটিও নতুন কোনো ঘটনা নয়। এটি বহুকাল আগে থেকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও চৌদ্দশত বছর পূর্বে পাথরের যুগ ছিল। আর তখন তো তাদের এটা কল্পনাতেই ছিল না যে,

লোহা-রড ইত্যাদি বিল্ডিং-এর কাজে আসে। সর্বপ্রথম হযরত ওছমান (রাযি.) মসজিদে নববী নির্মাণে লোহা ব্যবহার করেছিলেন। ইতিপূর্বে মসজিদে নববীতেও লোহার কোনো ব্যবহার ছিল না। অথচ আপনি যদি এর বহু বছর আগের ইসকান্দার যুলকারনাইন আলাইহিস সালামের যুগ দেখেন, তো তাঁর ব্যাপারে পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে, তিনি একটি সুবিশাল প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন।

তিনি মানুষদের লক্ষ করে বললেন,

اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ

'তোমরা আমার জন্য লোহার টুকরা সংগ্রহ করো।'[১০২]

তারপর হযরত ইসকান্দার যুলক্বারনাইন আলাইহিস সালাম সেই প্রাচীর নির্মাণ করলেন। আর ওই প্রাচীরে তিনি পাথরের সাথে-সাথে লোহার ব্যবহারও করেছেন। বর্তমান যুগে এভাবে লোহা আর পাথর মিলিয়ে ব্যবহার করাকে কংক্রিট বলা হয়। তাই একথা বলা যায়, প্রকৌশলীগণ এ প্রযুক্তির নতুন ব্যবহার করছেন না; বরং আদিকাল থেকেই এর ব্যবহার স্বীকৃত।

ঠাঠায় ম্যাকলির কবরস্তান। তারই কাছে একটি শাহী মসজিদ রয়েছে। যদি আপনি ওই মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে কোনো শব্দ উচ্চারণ করেন, তাহলে কোনো স্পিকার ছাড়াই সেই আওয়াজ এত বিশাল মসজিদের সর্বশেষ দরজা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। মসজিদটি অসম্ভব উঁচু ছিল। আমি সেখানে সামান্য সময়ের জন্য সাধারণ মজলিসে বয়ান করি, তারপর দরজায় দাঁড়ানো এক বন্ধু তা হুবহু শুনিয়ে দেন। আমি আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এর রহস্য কী? তিনি জবাব দিলেন, এই যে মেহরাব আর গ্যালারিগুলো তৈরি করা হয়েছে। এটি এমন কৌশল অবলম্বন করে নির্মাণ করা হয়েছে যে, এই আওয়াজ নিজে-নিজেই সর্বশেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অথচ বর্তমান যুগের মানুষ স্পিকার আবিষ্কার করেছে। আর ওই যুগের মানুষ এর সমাধান এভাবেই করে নিয়েছিল।

মসজিদটি কল্পনাতীত উঁচু ছিল। আমরা দেখলাম, মসজিদের ওপরে দেওয়ালে কিছু একটা লিখিত আছে। কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার বিষয় ছিল যে, ওই লেখাগুলো নিচ থেকে ওপরের দিকে সমান দেখাচ্ছিল। আমাদের কাছে এটা নতুন কিছু মনে হলো। একজন অতি বৃদ্ধ লোককে আমরা দেখতে

---

১০২. সূরা কাহফ : আয়াত ১৯৬

পেলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, যদিও এটি শত বছর আগের তৈরী, কিন্তু এর নির্মাতাগণ গবেষণা করেছেন যে, কতদূর থেকে লেখাটি দেখা যাবে। সামনে থেকে দেখার পর একটু পেছনে সরলে মূল সাইজ থেকে একটু ছোট মনে হয়। তাই তারা কৌশল ঠিক করল, নিচ থেকে ওপরে প্রতিটি লাইনে কী পরিমাণ ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে। তারা সেই হিসাব করে নিচ থেকে ওপরের দিকে প্রত্যেক লাইনের সাইজ বৃদ্ধি করলেন। যেমন– নিচের লাইন একটু ছোট তার ওপরের লাইন সেই তুলনায় একটু বড়। তাই দর্শনার্থীগণ এখন এর প্রতিটি লাইন সমান সাইজে দেখতে পাচ্ছেন। অথচ এর লেখকগণ কিন্তু বিভিন্ন সাইজে সেটি তৈরি করেছিলেন। এর দ্বারা একটি কথা বুঝে আসে যে, তৎকালীন যুগের বিদ্বানগণও বিল্ডিং নির্মাণে কী পরিমাণ মেধা ব্যবহার করেছেন!

মেকানিক্যাল প্রযুক্তির যুগ

আল্লাহ্ মানুষের অন্তরে অনুসন্ধানের একটি যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন। এ-কারণে তারা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়ের অন্বেষণও করে থাকে। তাই তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সফলতা অর্জনের পর তারা লোহার ব্যাপক ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করলেন। এই লোহার ব্যবহার মনুষ্য ইতিহাসে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের যুগ থেকে বিদ্যমান। আল্লাহ্ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

আর আমি তাঁর (দাউদ-এর) জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছি।'[১০৩]

অর্থাৎ– যেভাবে আমরা প্লাষ্টিককে রাবারের ন্যায় নরম মনে করি, এভাবেই আল্লাহ্ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য লোহাকে নরম করে দিলেন। তাই তিনি লোহার বিভিন্ন টুকরাকে এমনভাবে জোড়া দিতেন যে, সেটা মানুষের নিরাপত্তার জন্য বর্ম (লৌহ পোশাক) হয়ে যেত। যেহেতু সে যুগে তরবারির যুদ্ধ হতো, তাই যখন কেউ লোহার পোশাক পরিধান করত, তখন যুদ্ধে তরবারির ধার তার কোনো ক্ষতি করতে পারত না। এ-বিষয়টিই আল্লাহ্ সর্বপ্রথম হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে শিখিয়েছেন।

এ-ব্যাপারে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

---

১০৩. সূরা সাবা : আয়াত ১০

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ

' আর আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ম তৈরির শিল্প শিক্ষা দিয়েছি।'[১০৪]

তারপর ক্রমান্বয়ে লোহার ব্যবহার বাড়তে থাকে। কখনো তরবারি ও ঢালের আকৃতিতে আর কখনো বর্মের আকৃতিতে। তার থেকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে একে বিল্ডিংয়ে ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। এভাবে এটি একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে, যাকে বর্তমান যুগে শিল্পপ্রযুক্তি বলা হয়। শিল্পপ্রযুক্তির এ যুগ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী সময়ে আরম্ভ হয়। ইতিপূর্বে লোহার ব্যাপক ব্যবহার ছিল না। কিন্তু যখন মানুষ গাড়ির বডি তৈরি করল, তৎপরবর্তী সময়ে শিল্পপ্রযুক্তিতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তারপর তারা যখন গাড়ির ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হয়, তখন তারা অনেক বেশি আনন্দিত হয়। এখন আমরা ভারী জিনিসপত্র সহজে অন্যত্র স্থানান্তর করতে পারব। তারপর রেলগাড়ি তৈরি করা হলো, যা বর্তমান যুগের একটি অকল্পনীয় শিল্প। দেখুন-না! রেলগাড়ি লোহার পাতের ওপর কত দ্রুত চলতে থাকে আর লক্ষ-লক্ষ মন ওজনের বিভিন্ন জিনিস বহন করে অন্যত্র নিয়ে যায়।

ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগ

তৎকালীন সময়ে মানুষ আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। আর তা হলো জেনারেটর, যা থেকে বিদ্যুত উৎপাদন করা যায়। এটা উদ্ভাবন করা থেকে মূলত ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভিত্তি তৈরি হয়। এ শিল্প আবিষ্কার হয়ে উন্নতির পথ আরো সুগম করে দিয়েছে। তাই তো আগের যুগের যে-সকল পরিবর্তন শত বছরে সাধিত হতো, সেটা ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগে অর্ধেক সময়ে নেমে আসে। মানুষ প্রথমে D.C জেনারেটর তৈরি করে। তারপর A.C জেনারেটর তৈরি করতে সক্ষম হয়। তারপর ঘরের বিভিন্ন রকমের আসবাবপত্র আবিষ্কার করা আরম্ভ করে। ঘরে বিদ্যুত আসতে আরম্ভ হয়। এ-যুগ বেশি দিন আগের কথা নয়। আমরা আমাদের পুরোটা ছাত্র যমানায় লাইটিং সিস্টেমে পড়ালেখা করেছি। যখন বাল্ব ইত্যাদি খুব কম ঘরেই দেখা যেত। যদি কারো ঘরে বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলতে দেখা যেত, তো মনে করা হতো, এটা কোনো ধনাঢ্য পরিবারের বাড়ি

---

১০৪. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮০

হবে। টিউব লাইট আর বৈদ্যুতিক পাখার তো কল্পনাই করা অসম্ভব ছিল। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে এ নেয়ামত ধনীদের ঘর হয়ে গরিবদের ঘরেও পৌঁছে গেছে।

সময়ের ব্যবধানে পানি উত্তোলনের জন্য মটর তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং আজ এ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর এতো ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে যে, বর্তমানে একটি নিরীহ পরিবারের ঘরেও টিউব লাইট জ্বলে। পাখার শীতল বাতাসে বসে আরামের জীবন যাপন করতে পারছে। এভাবে যখন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং নতুন-নতুন বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ও মেশিনারি জিনিস উপহার দিতে আরম্ভ করে, তখন এর প্রতি মানুষের আগ্রহ আরো প্রবল হতে থাকে। বিশেষ করে বস্তুবাদীরা, যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তারা মনে করে, এ দুনিয়ার জীবন কেবল বিলাসিতার জন্যেই। তারা আজ পাগলের ন্যায় এর ওপর গবেষণা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তারা আরো বলে, নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কার করো আর দুনিয়াটা উপভোগ করো। সুনাম আর প্রসিদ্ধি অর্জন করো। তারা যখন এর পেছনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তো প্রতি মুহূর্তে নতুন-নতুন জিনিস আবিষ্কার হচ্ছে।

এভাবে তারা আস্তে-আস্তে একে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করে। তারপর আধুনিক যুগের আশ্চর্যতম বস্তু টেলিফোন আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। এখন মানুষ এক শহর থেকে দূরের শহরের আরেক ব্যক্তির সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারছে, প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে নিতে পারছে। তারপর ওয়ার্লেস এল। তারপর এখন মোবাইল তো অতুলনীয় ব্যাপকতা লাভ করেছে। এই ধারা চলতে-চলতে এখন ইন্টারনেট ও ই-মেইলের মতো দ্রুতগতিসম্পন্ন সার্ভিসগুলোও আজ মানুষ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে।

ইউনানী চিকিৎসার যুগ

এরপর উন্নয়নশীল যুগে আরম্ভ হলো আরো একটি নতুন আবিষ্কারের। আর তা হলো, যখন মানুষের শরীরের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন ডাক্তারগণ সেটা নিয়েও গবেষণা আরম্ভ করেন এবং জঙ্গলে গিয়ে তারা বিভিন্ন ওষুধের অনুপান আবিষ্কার করেন। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মনে কিছু মেধা স্থাপন করে দিয়েছেন। আর এজন্যেই যত জড় বিদ্যা রয়েছে এগুলো কোনো-না-কোনোভাবে ইলহামি বিদ্যার সাথে মিলে যায়। আর রূহানি বিদ্যার সম্পর্ক কোনো-না-কোনোভাবে ওহীর সাথে মিলিত হয়।

মোটকথা, সেই ডাক্তারদের অন্তরে এটা জাগ্রত হয় যে, অমুক গাছ অমুক রোগের প্রতিষেধক। তাই তারা ওষুধের সেই অনুপান ব্যবহার করে চিকিৎসা করতে আরম্ভ করেন। অবশেষে এই চিকিৎসাবিজ্ঞানও পূর্ণতা অর্জন করে এবং দুনিয়াতে অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এমনও বহু ডাক্তার দুনিয়া থেকে অতিবাহিত হয়েছেন, যারা মানুষের চেহারা দেখেই বলতে পারতেন, তার সমস্যাটা কী।

অথচ বর্তমানে তো রোগীকে বলা হয়, রক্ত পরীক্ষা করুন, আল্ট্রাসনোগ্রাফী করুন, এম.আর.আই করুন। তারপরও নিশ্চিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে যে, রোগীর সমস্যাটা কী? কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ্ এমন বিচক্ষণতা দান করেছেন যে, যখন তারা কোনো ব্যক্তিকে অবলোকন করতেন, তো চেহারা দেখেই সাথে-সাথে বলে দিতে পারতেন, তার রোগের এখন এই অবস্থা। বাস্তবেও এমনই হতো। ডাক্তারদের এসব বিস্ময়কর ঘটনা দেখে মানুষ পেরেশান হয়ে যায় আর ভাবতে থাকে, ডাক্তারগণ কীভাবে এমন চিকিৎসা প্রদান করছেন! চিকিৎসা বিষয়ের একটি গ্রন্থ 'আল-কানূন' যা এখনো ইউরোপের বিভিন্ন কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ানো হয়। তাতে ডাক্তারগণ লিখেছেন, মৃত্যুর পূর্বে যদি কারো এমন-এমন রোগ দেখা দেয়, তাহলে সেগুলো চিকিৎসার অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগেও তাদের বর্ণিত পন্থাগুলো চিকিৎসার ক্ষেত্রে অতুলনীয় আদর্শ বিবেচিত হয়। যেহেতু এ চিকিৎসাপদ্ধতির সর্বপ্রথম গবেষণা ইউনানে (গ্রীক) আরম্ভ হয়, তাই একে 'ইউনানী চিকিৎসা' বলা হয়।

কম্পিউটারের যুগ

১৯৬০-এর দশকে মানুষ কম্পিউটার আবিষ্কার করতে আরম্ভ করে। এর আগেও কম্পিউটার ছিল। কিন্তু সেগুলো আকারে অনেক বড় ছিল। এখন তারা ছোট-ছোট কম্পিউটার আবিষ্কার করা আরম্ভ করে। আর এই ছোট কম্পিউটার দ্বারা কার্যক্রম এতো দ্রুত চলছে যে, যেসব কাজের সমাধা আগে বছরে হতো, তা এখন দিনে দিনেই শেষ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রতিদিন কোনো-না-কোনো নিত্যনতুন আইডিয়া মাথায় আসছে।

শিক্ষিত শ্রেণির ভাইদের জন্যে একটি ছোট্ট কথা বলছি। ১৯৭৫ সালে আমাদের একবন্ধু এম.এইচ.সি.তে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সম্পন্ন করে। সে এম.এইচ.সির যে-প্রজেক্ট পায়, তা ছিল PCAT প্রজেক্ট। সেখানে সাধারণত দুটি প্রজেক্টের ওপর পড়ালেখা হয়। একটি হলো PCXT প্রজেক্ট। আর

দ্বিতীয়টি ছিল PCAT প্রজেক্ট। তার রিসার্চের জন্য PCAT প্রজেক্ট ভাগে পড়ে। বর্তমানে যদি কেউ PCAT প্রজেক্ট-এর কথা বলে, তাহলে মনে হবে, সে কম্পিউটার জগতের ডাইনোসরের কথা বলছে। এটা কম্পিউটারের একেবারে পুরাতন ভার্সন ছিল। বর্তমানে তো Pentium, Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 5, -এর মতো সর্বাধুনিক ভার্সনগুলো চলছে।

তারপর ঘরে-ঘরে কম্পিউটার আসতে শুরু করেছে। অথচ এক সময় তো ক্যালকুলেটরেরও বেশি প্রচলন ছিল না। আমার স্মরণ আছে, একবার আমাদের ক্লাসে একজন শিক্ষক ক্যালকুলেটর নিয়ে এলে সবাই এমনভাবে তা পর্যবেক্ষণ করা আরম্ভ করে যে, মনে হয়, আশ্চর্য কোনো বস্তু হাজির করা হয়েছে। অথচ বর্তমানে বাচ্চাদের হাতেও অহরহ ক্যালকুলেটর দেখতে পাওয়া যায়।

কম্পিউটারের যুগে মানুষ আরো বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। মনুষ্যজীবনের জন্য প্রযোজ্য সব ধরনের মেশিনারি জিনিস উৎপাদন আরম্ভ হয়। আর মানুষও তার প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোর ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে। পোর্টগুলোতে গিয়ে দেখে আসুন; কী পরিমাণ মেশিনারি জিনিস আমদানি হচ্ছে। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ বিভিন্ন মেশিনারি বস্তু আসছে, যার দ্বারা কাপড়ের বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন ব্যবহার করে মানুষের জন্য অনেক উন্নত মানের কাপড় তৈরি করা হচ্ছে। এভাবে মানুষের জীবন ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর যুগ

তারপর কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নয়নের আরো একটি নতুন দরজা খোলা হয়েছে, যাকে Genetic Engineering (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং)-এর যুগ বলা হয়। একে মানুষের জীবনমানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ মনে করা হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিচয় কী

জন্মগ্রহণ করে এমন প্রতিটি বস্তুরই বীজ রয়েছে। সেই বীজের ওপর গবেষণা করে তা বোঝা এবং তাতে নিজের খেয়াল-খুশিমতো পরিবর্তন সাধন করাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়।

আল্লাহর প্রতিনিধির যোগ্যতা

লক্ষ্য করুন। যখন কোনো ডাইরেক্টর একটি ফ্যাক্টরী পরিচালনা করেন, তখন তিনি তার অধঃস্তন কর্মকর্তা যেমন– ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার, তার স্থলাভিষিক্ত ও তার প্রতিনিধি ওই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, যার ফ্যাক্টরী চালানোর মতো যোগ্যতা ও সক্ষমতা রয়েছে। তিনি কখনোই কোনো চাকরকে ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেন না। ঠিক তেমনি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনও মানুষের কল্যাণের জন্য যেসব খলীফাতুল মুসলিমীন প্রেরণ করেছেন, যারা জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধি হবেন; এ খলীফা হওয়ার উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য হলো, তিনিও দুনিয়ার মানুষের সব ধরনের প্রচলন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বোঝার যোগ্যতা রাখেন।

এজন্যেই আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

‘ আর আসমান ও জমিনের মধ্যখানে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুকে তিনি তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন।’[১০৫]

مسخر (মুসাখ্খার) করার মানে কী? ইমাম রাগেব ইসফাহানি (রহ.) বলেন, مسخر (মুসাখ্খার) করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো বস্তুতে লাগাম লাগিয়ে তাকে নিজের মনমতো ব্যবহার করা। এর দ্বারা একথা বুঝে আসে যে, মানুষকে এতো পরিমাণ যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। সে ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সূক্ষ্ম বিষয়গুলো অর্জন করে আপন বিবেক দ্বারা তাকে অকেজো করে দেওয়ারও যোগ্যতা রাখে।

ফসলের ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রভাব

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আবিষ্কার হওয়ার পর সর্বপ্রথম বীজ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়। তারপর বিভিন্ন ফসলের অদ্ভূত রকমের বীজ আসতে শুরু করে। এমন-এমন বীজ উৎপাদন হতে শুরু করে, ক্ষেতের মধ্যে এখন আগের তুলনায় অধিক ফসল উৎপাদন হতে আরম্ভ করে। আগে এক মন উৎপাদন হলে এখন দশ মন হচ্ছে। আগে যে-ফসলের আকৃতি অনুজ্জ্বল ছিল, এখন তা অনেক দর্শনীয় আকৃতি ধারণ করছে। আগে যে-ফসল সুস্বাদু ছিল না,

---

১০৫. সূরা বাকারা : আয়াত ৩৭৮

এখন তাতে স্বাদ আসছে। যেমন– এক সময় খিরা একেবারে তিক্ত হতো, মুখে নেওয়াই দুষ্কর ছিল। অথচ এখন এর ওপর গবেষণা করে এর এমন জাত আবিষ্কার করা হলো, যাতে বিন্দুমাত্রও তিক্ততা নেই। এখন এমনিতেই গাছ থেকে ছিড়ে খেলেও তিতা মনে হবে না।

ফলের ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রভাব

মানুষ এখন পানি-বাতাসের ন্যায় ফলফলাদি উৎপাদন করা শুরু করেছে। একটা সময় ছিল, যখন কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় ফল-ফলাদি উৎপাদন হতো। আর এখন প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় কোনো-না-কোনো ফল উৎপাদন হচ্ছে। মানুষ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর গবেষণা করে একে আজ পানি-বাতাসের ন্যায় সহজ করে নিয়েছে। মানুষ এ বিষয়ে এতো পরিমাণ গবেষণা আর পরিশ্রম করেছে যে, সুইডেনে একটি গাছ ছিল, যা মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে দেখানো হয়েছে। ওই গাছের প্রতিটি ঢালের মধ্যে ভিন্ন রকমের ফল ছিল। মনে হয়, বিজ্ঞানীরা এটা ভেবেছেন যে, এত গাছের কী দরকার, শুধু একটি গাছ উৎপাদন করো, যাতে একটি ফ্যামিলির জন্য যত ফল প্রয়োজন এর একেকটি ঢালে ওসব রকমের ফল ধরবে। ওই এক গাছে মিঠা ফল, টক ফলসহ সব ধরনের ফলই ছিল। মোটকথা, একটি পরিবারের জন্য যত ধরনের ফল প্রয়োজন সব তারা একটি গাছে ধরাতে আরম্ভ করে। এভাবে এই জেনেটিক পদ্ধতি মানুষকে হতভম্ব করতে আরম্ভ করে।

প্রাণীজগত নিয়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গবেষণা

এই গবেষণা শুধু ফসল আর ফল-ফলাদি নিয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এখান থেকে সেটা পশু-প্রাণী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। মানুষ যখন চিন্তা করল, এখন আমাদের জন্য অধিক দুধদাতা গাভির প্রয়োজন, তাই তারা এর ওপর গবেষণা আরম্ভ করল। সেই গবেষণার ফসল হিসেবে আজ একটা গাভি ২০ (বিশ) ঘণ্টায় ১২০ (একশত বিশ) লিটার দুধ দিচ্ছে। তার সাথে এমন ট্যাঙ্কি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, মাশাআল্লাহ্ বান্দা তো দুধ বের করেই হয়রান হয়ে যাচ্ছে। এখন এর থেকে দুধ বের করতে পাম্প লাগানো হয়েছে। হে মাবূদ! তোমার শান এটি!

প্রাণিবিদ্যায় জেনেটিক পদ্ধতি এমন উন্নতি লাভ করেছে যে, বড়-বড় ডাক্তারদের কাছে এর বীজ আসতে আরম্ভ করেছে। ডাক্তার মানুষকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনার কোন ধরনের, কোন জাতের গাভির বীজ প্রয়োজন? বংশ

আর রং বলে দিন এবং বলুন! আপনার গাভি প্রয়োজন নাকি ষাঁড়। মানুষ যা-ই বলবে, ডাক্তার সেই বীজই তাকে দেবেন এবং ওভাবেই পশু জন্ম নেবে। কিন্তু কেউ যাতে মনে না করেন, মানুষের দ্বারা তো এটা অসম্ভব। কখনো নয়। কারণ, দুনিয়ার শৃঙ্খলা আল্লাহপাকের হাতে। এর থেকে বের হয়ে বান্দা কিছুই করতে পারে না। তবে বান্দা আল্লাহর সেই শৃঙ্খলার ওপর গবেষণা করে নিজের রুচি অনুযায়ী তাকে কাজে লাগাতে পারে।

মনুষ্যবংশ বৃদ্ধি ও জেনেটিক পদ্ধতি

যখন বিভিন্ন প্রাণীর ওপর গবেষণা করে তারা সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়, তখন ধারণা করা হচ্ছিল, এটা বুঝি এখান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু তারা সামনে অগ্রসর হয়ে মানুষ পর্যন্ত অগ্রগামী হতে আরম্ভ করে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পূর্ণতা নতুন করে মানুষের মধ্য দিয়ে আসতে শুরু করে।

বর্তমানে মানুষের মধ্যে যাদের ছেলেসন্তান প্রয়োজন, তারা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন আর তাদের ছেলে সন্তানও হচ্ছে। এটা কীভাবে সম্ভব? এটা এভাবে যে, পুরুষের ভেতরে যে শুক্র রয়েছে, তার দুটি অংশ থাকে। একটি হলো x আর অপরটি হলো y। এভাবে নারীর ডিম্বের দুটি অংশ রয়েছে, যার একটি হলো x আর অপরটিও হলো x। অর্থাৎ– পুরুষের ভেতর x y আর নারীর ভেতর x x শুক্র আর ডিম্ব থাকে। নারী-পুরুষ যখন সহবাসে লিপ্ত হয়, তখন তাদের নিজ-নিজ শুক্রাণু আর ডিম্বাণু দুই-দুই করে চারভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পুরুষের x আর y আলাদা-আলাদা আবার নারীরও x আলাদা x আলাদা। এভাবে মোট চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এখন এ চারটি থেকে যে দুটি সর্বপ্রথম একসাথে মিলিত হতে পারে, সেভাবেই সন্তানের বীজ নির্ধারিত হয়। যদি পুরুষের y আর নারীর x একত্র হয়ে নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে, তাহলে সন্তান ছেলে হয়। আর যদি পুরুষের x নারীরও x শুক্র-ডিম্ব একত্রিত হয়ে জরায়ুতে প্রবেশ করে, তাহলে মেয়ে সন্তান জন্ম হয়।

এখন মানুষ যখন এই পদ্ধতি জেনে ফেলে, তখন তারা পুরুষের ভেতরে x এর পার্টটি লেজারের মাধ্যমে খতম করে দেয়। x শেষ হয়ে যাওয়ার পর পুরুষের আর মাত্র y বাকি থাকে। আর যেহেতু নারীর শুধু x ই রয়েছে, তাই এ দুটির মিলনে এখন কেবল ছেলেসন্তানই জন্ম নেবে। এটা বিস্ময়কর

কোনো কাজ নয়। আল্লাহ্ একটি নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন আর মানুষ তা জেনে নিজের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করছেমাত্র। কারণ, তিনি তো আগেই এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, আসমান আর জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়েছে।

কিছু মানুষ এই বিষয়গুলো শুনে আশ্চর্য বোধ করে। অথচ আশ্চর্য হওয়ার কথা তো তখন ছিল যদি মায়ের গর্ভে সন্তানের Temperature (টেম্পারেচার) উষ্ণতার পরিমাণ ২০ ডিগ্রি হয় আর মানুষ গবেষণা করে তা ২০ থেকে ১২০ ডিগ্রি বানাতে পারত। তখন না হয় বলা যেত, না; মানুষ কিছু একটা করতে পেরেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাতে (ডিগ্রি) বিন্দুমাত্রও কম-বেশী করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যে বিধান চালু করেছেন, মানুষকে তার অনুগতই থাকতে হয়। যদি মানুষ সে আনুগত্যের ভেতরে থেকে বলে, আমি যদি অমুক জিনিস শেষ করে দেই, তাহলে এটা হয়। তাহলে বাস্তবে তো এর দ্বারা আল্লাহর কুদরতি বিধানকেই অগ্রসর করা হলো। সে তো নিজের পক্ষ থেকে কিছুই সৃষ্টি করেনি। শুধু আল্লাহর দেওয়া বিধানকে বুঝে নিজ ক্ষমতায় সেটা ব্যবহার করছেমাত্র। কুরআনুল কারীমই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মানুষ এমন করতে পারে। কিছু মানুষ বর্তমানে ডাক্তারের কাছে ছেলে হওয়ার ঘোষণা শুনে বলে, এটা কীভাবে সম্ভব? ছেলে তো আল্লাহ দিয়ে থাকেন। আরে ভাই! কথা তো ঠিকই আছে। দেন তো আল্লাহ্ তা'আলাই; কিন্তু তিনি তো বান্দাকে জ্ঞান দিয়েছেন। বান্দা শুধু সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজের চাহিদা অনুযায়ী ফলাফল আবিষ্কার করছেমাত্র। সুতরাং এটা কোনো আশ্চর্য হওয়ার মতো বিষয় নয়। তবে যদি কেউ বলেন, আল্লাহ্ নিজেই কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন–

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

'তিনি যাকে চান মেয়ে দান করেন আর যাকে চান ছেলে দান করেন।'[১০৬]

আজ মানুষও তো তা-ই করছে। তাকে আমরা বলব, যখন নারী-পুরুষের মিলন হয়নি, তখন পারলে কোনো ডাক্তার একথা বলুক, তাদের ঘরে কী সন্তান জন্ম নেবে? যেহেতু কেউ বলতে পারবে না, তাহলে বলতে হবে, এটা একমাত্র আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছাতেই করে থাকেন। তিনি নিজে যে অংশ চান একত্রিত করে দেন। তবে বান্দা যেহেতু তা বুঝে আগেই একটি অংশকে

---

১০৬. সূরা শূরা : আয়াত ৪৯

খতম করে দিল, তাহলে এখন বাকিটির মধ্যে বান্দার ক্ষমতা আর রইল কোথায়? এখন তো যেকোনো একটি বাচ্চাই হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। তাহলে এখন বোঝা গেল, কুরআনুল কারীম যে বলেছে, সাধারণ অবস্থায় ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে এটা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তবে মানুষ এবিদ্যা শিক্ষা করে নিজের চাহিদামতো ব্যবহার করতে পারে। তাহলে এ-বিষয়টি তো কুরআনের বিপরীত হচ্ছে না। বরং কুরআনি শিক্ষার নিয়মেই হচ্ছে। মানুষের নিজস্ব যোগ্যতা কেবল তখনই হতে পারে, যখন তারা জন্মের এ মূলনীতি যে, 'বাচ্চা মায়ের গর্ভে হবে' এক দিকে রেখে বলবে যে, আমরা আমাদের Humanity (হিউম্যানিটি) বা মনুষ্যত্ব, Temperature (টেম্পারেচার) উষ্ণতার পরিমাণ ও Environment (ইনভাইরনমেন্ট) বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাচ্চাকে সৃষ্টি করতে পেরেছি, তখন না হয় আমরা বলব, না বিজ্ঞান কিছু একটা করে দেখাতে সক্ষম হয়েছে। যদি তারা সারা জীবনও জেনেটিক পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে, তাহলেও এমন করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না।

এই যে তারা টেস্টটিউব বেবি আবিষ্কার করেছে; তাদের এই টেস্টটিউব বেবি সম্পূর্ণ Environment (ইনভাইরনমেন্ট) বা ওই সব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মাধ্যমে হয়, যা আল্লাহ্ মাতৃগর্ভে দান করেছেন। ভাই! একটু আল্লাহর এ বিধানকে পরিবর্তন করে দেখাও, তাহলে আমরা বুঝব, তারা এ পদ্ধতি কখনো পরিবর্তন করতে পারবে না। বরং তারা তো বলে যে, আল্লাহর সৃষ্টি সেই Environment (ইন্ভাইরন্মেন্ট) বা ওই সব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই বাচ্চাকে রাখতে হবে। যেহেতু রাখার পদ্ধতিটি আল্লাহ্র বাতানো, সেখানে আমাদের কী প্রভাব? আমরা কি নতুন কিছু সৃষ্টি করছি ? আমরা কেবল ওই জিনিসটাকে নাড়াছাড়া করে দেখাচ্ছি। আর কোনো জিনিসকে একটি নাড়াছাড়া বা রদবদল করে দেখানোর নাম তো সৃষ্টি হতে পারে না।

DNA (ডি.এন.এ.) পরিচিতি

তারপর মানুষ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে DNA সম্পর্কে জানতে পারছে। DNA কী জিনিস? DNA হলো মানুষের শরীরে উপস্থিত এক প্রকার সূক্ষ্ম আদ্রতা, যাতে সব নির্দেশনা বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ– মানুষ মাতৃগর্ভে কীভাবে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ এসব নির্দেশনা একটি সূক্ষ্ম আদ্রতার

মাঝে রেখে দিয়েছেন। যেমন– ওয়ার্কসপে কোনো একটি বস্তু তৈরি হওয়ার পূর্বে কাগজে তার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা থাকে। মানুষ যখন এ-ব্যাপারে ধারনা লাভ করল যে, এ DNA -এর ভেতরে সব ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে, তখন তারা একে আরো বিশদভাবে বুঝতে চেষ্টা করে। DNA -এর মধ্যে শব্দগত কিছু নেই; বরং এর সুনির্দিষ্ট বারকোড রয়েছে। কোডের মধ্যে যেমন কিছু একটা লেখা থাকে, এখানেও তা-ই। মানুষ সেসব কোড বুঝতে আরম্ভ করে। সুতরাং এখন পর্যন্ত মানুষ DNA সম্পর্কে প্রায় তিন হাজার কোড বুঝতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ– সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে তার চক্ষু কালো হবে, নাকি নীল হবে। তার চুল কালো হবে, নাকি লাল বর্ণের হবে।

এ-ধরনের ইনফরমেশনগুলো DNA তে কোডের আকৃতিতে আসে। সেভাবেই তাদের জানা আছে, কোড এভাবে এলে বাচ্চার চুল কালো হবে। অথবা যদি কোড এভাবে আসে, তাহলে বাচ্চার চক্ষু নীল হবে ইত্যাদি। এখন এ-বিষয়গুলো মানুষ বুঝতে শুরু করেছে এবং এভাবে তারা এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের তিন হাজার গোপন রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণার এই ধারা এখনো চলছে। লক্ষ-লক্ষ ডাক্তার এর ওপর দৈনিক গবেষণা করেই চলছেন।

DNA টেস্টের মাধ্যমে জানা যায়, এ ব্যক্তির জীবনে কী-কী রোগের আগমন ঘটতে পারে। তাই এখন তারা বলতে শুরু করেছে, আমরা মানুষের শরীরের রোগগুলোর চিকিৎসা DNA তেই করে দিচ্ছি, যাতে রোগই খতম হয়ে যায়। তাই তারা নতুন করে এর ওপর গবেষণা আরম্ভ করে দেয়। ফলে এখন নতুন আরেকটি টেস্ট আবিষ্কার হয়েছে। আমাদের এক বন্ধু সেই টেস্ট করিয়েছেন এবং আমরা তা স্বচক্ষে অবলোকন করেছি। সেটা আগামী ২৫ বৎসরের একটি প্রোপাইল ছিল। তারা সেই প্রোপাইলে বলে দেয়, এ ব্যক্তি যদি কখনো এক্সিডেন্ট না করে বা অন্য কোনো বিশেষ ঘটনা না ঘটে আর নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করে, তাহলে,

এত বছর পর তার ডায়াবেটিস হবে।

এত বছর পর তার ব্লাডপ্রেসার হবে।

এত বছর পর তার টিবি রোগ হবে।

এত বছর তার নিউমুনিয়া রোগ হবে।

বাস্তবেই দেখা গেছে, কিছুলোক যখন টেস্ট করাল, তখন কিছু দিন নরমাল জীবন যাপন করার পর তাদের শরীরে সেসব রোগ দেখা দিতে

লাগল এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ওই প্রোপাইলে যে-সময়ের পর তার রোগ হবে বলা হয়েছে, ততদিন পরই তার রোগ ধরা পড়ে। সে শুধু নিশ্চিত হওয়ার জন্য সেই রোগের টেস্ট করাচ্ছে। যেমন– কোনো ইঞ্জিনিয়ার কোনো একটি মেশিন দেখেই বলে দিতে পারেন, এর অমুক পার্সটি এতো দিন পর অকেজো হয়ে যাবে, এতো দিন পর তার বেয়ারিং নষ্ট হয়ে যাবে, তেমনিভাবে বর্তমান যুগের ডাক্তারগণ ডি.এন.এ. প্রোপাইল দেখে বলে দিতে পারছেন, আগামী পঁচিশ বছর পর এ ব্যক্তির শরীরে এমন-এমন রোগ দেখা দিতে পারে।

মনে করুন! মানুষ এ ডি.এন.এ. পদ্ধতিতে কোনো ভুল করে বসল। যখন এ ডি.এন.এ. পদ্ধতিতে চিড় ধরবে, তখন শিক্ষার নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হবে। যাকে ডি.এন.এ. বুঝতে পারবে না, সেখানে এ পদ্ধতি ফেল করবে। যাকে Immune System (ইমিউন সিস্টেম) বা সংক্রমণযোগ্য নয় এমন সিস্টেম বলা হয়। মানুষ যখন এ পদ্ধতি Immune System (ইমিউন সিস্টেম)-এ ফেল করবে, তখন এমন মসিবতে পড়তে হবে যে, উক্ত বিষয়টিই আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। আর তখন বিজ্ঞান বলতে বাধ্য হবে যে, হে আল্লাহ্! আপনি যা সৃষ্টি করেছেন, সেটিই সর্বোত্তম।

কিন্তু যেহেতু এখনো নতুন-নতুন জিনিস আবিষ্কার হচ্ছে, তাই আজকাল মানুষ খুবই আনন্দিত যে, না জানি আমরা আরো নতুন-নতুন কী-কী জিনিস দেখতে আরম্ভ করি।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি প্রশংসামূলক কীর্তি

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং একটি পূর্ণতার কাজও করেছে। আর সেটা হলো তারা ডারউইনের থিউরিকে ভুল প্রমাণ করতে পেরেছে। শত বছর থেকে দুনিয়াতে যে থিউরি চলে আসছে এবং সাইন্সও সেটা মেনে চলছে। কিন্তু এখন জেনেটিক-এর যুগে ইউরোপের সাইন্সবিদগণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও ভুল হওয়ার কথা অকপটে স্বীকার করছেন। কী সেই থিউরি? তিনি বলেন, মিলিয়ন ও বিলিয়ন-এর মধ্যে প্রথমে অমুক বস্তুটি ছিল। তারপর সেটি এভাবে হয়েছে। তারপর সব বানর হয়েছে। তারপর তারা মানুষে পরিণত হয়েছে। তার বক্তব্য হলো, লাখো পুরুষ মহিলা একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু জেনেটিক পদ্ধতি বলে, দুনিয়াতে মানুষের যে বংশধারা বিকাশমান, এর শুরু একজন পুরুষ দ্বারা হয়েছে। বিষয়টি এখন বোঝাও অনেক সহজ

হয়ে গেছে। সুতরাং এটা একেবারেই অসম্ভব যে, প্রথমে একজন নারী সৃষ্টি হয়েছেন আর তার থেকেই পুরুষ জন্ম নিয়েছে। লক্ষ্য করুন, সাধারণত আমাদের ধারণা এটাই হবে যে, প্রথমে একজন মা দুনিয়াতে এসেছেন, তারপর তার থেকে সন্তান জন্ম লাভ করেছে। কিন্তু জেনেটিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, না, এমনটা সম্ভব নয়। সর্বপ্রথম পুরুষই সৃষ্টি হয়েছে। তারপর পুরুষ থেকে নারী হয়েছে। তারপর নারী আর পুরুষের সহবাসে ভবিষ্যত প্রজন্ম জন্ম নিয়েছে। কারণ, পুরুষের y x শুক্রাণু দ্বারা তো এটাও সম্ভব যে, তার থেকে কোনো মহিলা জন্ম নেবে। কিন্তু নারীর x x ডিম্বাণু থেকে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়াই অসম্ভব। কেমন যেন জেনেটিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে, ডারউইন থিউরি হলো ধারণাপ্রসূত একটি থিউরি, যার কোনো মৌলিক ভিত্তি নেই। সেই যুগ এখন আর রয়নি। এমন থিউরি জেনেটিকের যুগে অচল।

এবার লক্ষ্য করুন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে, দুনিয়াতে একজন পুরুষ দ্বারাই সর্বপ্রথম মানুষের বংশ বিস্তার লাভ করে। আর আমরাও এই একই কথা বলে আসছি যে, ওই প্রথম পুরুষটি হলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। আল্লাহ্ তাঁর বাম পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা আম্মাজান হযরত হাওয়া আলাইহাস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। আর আদম আলাইহিস সালাম ও হওয়া আলাইহাস সালাম থেকেই মানুষের বংশ বিস্তার লাভ করতে থাকে। তাই তো কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'হে লোক সকল! তোমরা ওই প্রভুকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক জীবন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তার থেকেই তার জোড়াকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দুজন থেকে অনেক নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন।[১০৭]

ওহে মাবূদ! ১৪০০ বছর পূর্বে মানুষ সাইন্স আর জেনেটিক পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানত না। তখনও কুরআনুল কারীম এটি বর্ণনা করে দিয়েছে যে, একটি প্রাণ থেকেই মানুষের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। আর তার থেকেই তার

---

১০৭. সূরা নিসা : আয়াত ১

জোড়া সৃষ্টি করা হয়। আর তাদের দুজন থেকেই সারা দুনিয়ায় নারী-পুরুষ ছড়িয়ে পড়ে।

জেনেটিক পদ্ধতি প্রশংসার কাজ যেটি করেছে, তাহলো, ইসলামের একথার সত্যায়ন তারা করেছে। এটিই চিরসত্য যে, যারা ইসলামের সমালোচনার উপাদান খুঁজতে ব্যস্ত, তাদের সামনেই ইসলামের পূর্ণতা আজ স্পষ্ট। আলহামদুলিল্লাহ্! এখন আমরা যখন বাইরে গিয়ে দুনিয়ার মানুষকে বলি, ওহে ডারউইনের পূজারিরা! তোমাদের সেসব থিউরি এখন কোথায় গেল? তখন তারা বলতে বাধ্য হয়, হ্যাঁ, ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বে সঠিক বক্তব্যই দিয়েছিল। তাই আমরা বলি, ইসলামের যেসব বক্তব্য এখনো তোমাদের বুঝে আসছে না, অচিরেই সেগুলোও তোমাদের বুঝে আসবে। ইনশাআল্লাহ্।

এ-কারণেই তারা বলে থাকে,

We are in search of truth

'আমরা তো সত্য অন্বেষণেই রয়েছি।'

আজ সেসব সত্য কথা তারা ইসলামের দরজায় এসে দেখতে পাচ্ছে। এ-কারণেই বহির্বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে-খবর আমরা জানি এবং কুরআনুল কারীমের অধিক বিক্রি হওয়া কি কোনো মুসলমানের মেহনতের ফসল? তারা নিজেরাই যেহেতু আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে বাস্তবতার সব কিছু লক্ষ করতে শুরু করেছে, তাই এখন নিজেরাই স্ব-উদ্যোগে মুসলমান হতে আরম্ভ করেছে। কুরআনের এই সত্য বক্তব্যই তাদের মুসলমান হতে উদ্বুদ্ধ করছে। সুবহানাল্লাহ্!

কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়া ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

এখন আমি আপনাদেরকে আরো একটি বিষয়ে অবগত করাতে চাই। আর তা হলো, কেয়ামত সংগঠিত হওয়ার যে বাহ্যিক নির্দশন দেখা যাচ্ছে, সেটা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংই মনে হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, একটু লক্ষ করুন! হাদীছ শরীফে কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার তিনটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–

১. একটি নিদর্শন এই বর্ণনা করা হয়েছে, কেয়ামতের পূর্বক্ষণে সবচেয়ে অসৎ লোকদের আবির্ভাব হবে। অর্থাৎ– দুনিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ লোকেরা তখন জন্ম নেবে আর তাদের ওপরই কেয়ামত কায়েম হবে।

ওই দুষ্ট লোকরা কেমন হবে? তারা এত পরিমাণ উদাসিন হবে যে, হাদীছে বর্ণিত আছে, লোকদের একটি সমাবেশ হবে আর তাদের পাশ দিয়ে একজন নারী হেঁটে যাবে। তাদের থেকে একজন পুরুষ ওই নারীর সাথে খারাপ কাজে লিপ্ত হবে। কিন্তু পুরা সমাবেশের মধ্যে এমন একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে তাদের লক্ষ করে বলবে, তোমরা দূরে কোথাও গিয়ে এসব করো। তারা এতটাই নির্লজ্জ হবে যে, তাদের মধ্যে কেউ বাধা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকবে না।

২. দ্বিতীয় নির্দশন যেটা বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলো, দীন থেকে দূরে সরে যাওয়া। হাদীছে উল্লেখ রয়েছে, মানুষ আল্লাহ্‌র নাম শুনে বলবে, হ্যাঁ, আমাদের মুরুব্বীগণ এ নাম উচ্চারণ করতেন। অর্থাৎ– এমন যুগ আসবে যখন আল্লাহ্‌র নাম চিনতে পারাও তাদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

৩. তৃতীয় নিদর্শন এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার মতো একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এবার এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় বোঝার চেষ্টা করুন, যেটি বোঝানোর জন্য আমি ভূমিকাটি বলেছি। তা এই যে, হাদীছ শরীফে এসেছে, একজন ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র নাম নেওয়ার মতো থাকবে না। এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? মেনে নিলাম, দুনিয়া থেকে মুসলমান খতম হয়ে যাবে। কিন্তু খ্রিস্টানরা তো থাকবে। যদি তারাও খতম হয়ে যায়, তাহলে ইহুদিরা তো থাকবে। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব যে, মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টান কেউই থাকবে না! আর যত দিন এই তিন জাতি থাকবে, ততদিন আল্লাহর আলোচনাও বিদ্যমান থাকবে। কারণ, ইহুদি-খ্রিস্টানরাও তো আল্লাহকে মানার দাবি করে থাকে। তাদের ডলারে এখনো লেখা আছে,

In God We believe.

তাহলে মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টান সবাই যখন আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে, তাহলে একথা বলা যে, দুনিয়াতে একজন ব্যক্তিও আল্লাহর নাম নেবে না, এর উদ্দেশ্য কী দাঁড়ায়? তাহলে তখন দুনিয়াতে কোনো মুসলমান তো দূরের কথা, ইহুদি-খ্রিস্টানও থাকবে না! অর্থাৎ– দীন-ধর্মে বিশ্বাসী কোনো লোক তখন পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এখানে একথাটি বোঝা কঠিন। এটা কী করে সম্ভব যে, তখন দুনিয়াতে কোনো ধর্মের অনুসারী থাকবে না?

তবে নির্মম সত্য হলো, বাস্তবতা এমনই হবে। এবার এটা কীভাবে হবে একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। এটা বুঝতে পারলে বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যাবে। সেটা এভাবে হবে যে, যেমনিভাবে মানুষ D.N.A নিয়ে গবেষণা করে তার Physical aspects (শারীরিক উপাদান) দেখল, সেভাবে তারা তাদের Behavioural aspects (আচরণগত উপাদানগুলো) নিয়ে স্টাডি করা আরম্ভ করে দেয়। যাকে তাদের ভাষায় Behavioural aspects of DNA বলা হয়। আপনি নিশ্চয় খেয়াল করেছেন যে,

কিছু শিশু অনেক সাহসী হয়।

আর কিছু বাচ্চা একেবারে ভীতু হয়।

কিছু বাচ্চা হয় নম্র-ভদ্র।

আর কিছু হয় একেবারে বেহায়া।

এ-সকল দোষ-গুণ বাচ্চাদের মধ্যে কীভাবে সৃষ্টি হয়? এর সম্পর্ক ও D.N.A -এর সাথে। এখন মানুষ এটা নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেছে। যদি তাদের বিষয়টি বুঝে চলে আসে, তাহলে তারা এর ওপর গবেষণা করে বিষয়গুলো জানতে পারবে–

এ জিনিস থাকলে বাচ্চা লজ্জাশীল হয়।

এ জিনিস থাকলে বাচ্চা নির্লজ্জ হয়।

এ জিনিস থাকলে বাচ্চা সাহসী হয়।

আর এটা থাকলে বাচ্চা হীনম্মন্য ও ভীতু হয়।

মানুষ যখন এর ভেদ বুঝতে আরম্ভ করবে, তখন তারা এতে হস্তক্ষেপ শুরু করবে। কীভাবে হস্তক্ষেপ করবে? তারা বলবে, আরে এ তো শুধু-শুধু লজ্জা পাচ্ছে– এটা তো একটি রোগ। তাই তো ইউরোপের কাফেররা এখনই বলতে শুরু করে দিয়েছে,

Shyness is a sickness

অর্থাৎ– 'লজ্জা-শরম একটা রোগ।'

অথচ ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে,

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ

'লজ্জা-শরম ঈমানের একটি অঙ্গ।'

اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

'লজ্জাশীলতা সবটুকুই মঙ্গল।'

যেহেতু বর্তমানের কুফরিশক্তিগুলো লজ্জাহীনতা শিক্ষা দিয়ে চলছে, তাই ইউরোপে একটি কথা বলা হয়, 'নারী-পুরুষ কারো মাঝেই লজ্জা থাকা উচিত নয়।' তাই আজ তারা লজ্জা-শরম বিদায় দেওয়ার চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেছে। তবে কথা হলো, এ লজ্জা-শরমকে কীভাবে বের করবে? তাদের সামনে এর একটি সহজ পদ্ধতি দৃষ্টিগোচর হবে যে, D.N.A তেই কিছু একটা করে দাও, যাতে তাদের মাঝে আর লজ্জা বাকি না থাকে।

বিষয়টি একটু স্পর্শকাতর। লক্ষ করুন, আমরা এখন এখানে বসে আছি। আমার পিপাসা দেখা দিল, তাই আমি আপনাদের সামনেই পানি পান করা আরম্ভ করে দিলাম। পানি পান করতে কি আমার কাছে কোনো লজ্জা লাগবে? না। কারণ, এটি আমার শরীরের একটি প্রয়োজন আর আমি একে লজ্জার কোনো বিষয়ই মনে করি না। কিন্তু ভয়ের বিষয় হলো, আজ ইউরোপ-আমেরিকার মানুষেরা বলতে শুরু করেছে, মৌলিকভাবে মানুষের তিনটি প্রয়োজন রয়েছে,

১. পানাহার।

২. ঘুম।

৩. জৈবিক চাহিদা পূরণ করা।

তাদের বক্তব্য হলো, এগুলো সবই যেহেতু প্রয়োজন, তাহলে এসব প্রয়োজন পূর্ণ করতে লজ্জা কীসের? ছাগলের পাল বা গরুর পালের দিকে লক্ষ্য করুন। যদি পালের ভেতরেই কোনো পুরুষ ছাগল নারী ছাগলের সাথে সহবাস করতে চায়, তখন কি সে লজ্জাবোধ করে? মোরগ যদি মুরগির সাথে সহবাস করতে চায়, তখন সে কি লজ্জাবোধ করে? তারা বলে, তোমরা পানাহারে কোনো লজ্জাবোধ করছ না। যেখানে ঘুম আসে, সেখানেই তোমরা শুয়ে পড়তে লজ্জাবোধ করছ না। তাহলে পরস্পরের সহবাস তো একটি প্রয়োজন; এখানে লজ্জা করবে কেন? এভাবে একটা সময় লজ্জা-শরমের বিন্দুমাত্রও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর মানুষ একেও পানাহারের মতো প্রয়োজন মনে করতে শুরু করবে। ফলে একটা নির্লজ্জ, অশ্লীল আর বেহায়া সমাজব্যবস্থা চালু হবে।

তারপর সাইন্সবিদগণ যখন দেখবেন, তাদের এই বেহায়াপনার ক্ষেত্রে কিছু দীনদার লোক বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন তারা বলবে, এদের তো দীনদার মনে হচ্ছে; তাই এদের অস্তিত্ব বিলীন করে দাও। সুতরাং তারা আবার D.N.A নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করে দেবে যে, কোন জায়গায় কি

সমস্যা থাকলে মানুষ ধর্মপরায়ণ হয়, আল্লাহ্‌মুখী হয়। কীভাবে একে ধ্বংস করা যায়, যাতে সব মানুষ খোদাবিমুখ হয়। এভাবে গবেষণা করে এক সময় তারা এমন একটি বংশ বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হবে, যারা জন্মগতভাবেই খোদাবিমুখ হবে এবং ওই বংশের লোকদের কাছে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বও অস্বস্তিকর মনে হবে।

তাহলে এর পদ্ধতি কী হবে? এর পদ্ধতি এটা হবে যে, ঘোষণা করা হবে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যদি সহবাস করতে চাও, তাহলে স্বাধীনভাবে করো। আর যদি সন্তানের প্রয়োজন মনে করো, তাহলে আমাদের এখানে ল্যাবরেটরিতে অনেক ধরনের বীজ সংরক্ষিত আছে, তাই তোমরা ব্যাপকভাবে সন্তান জন্ম না দিয়ে বরং আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী সন্তান জন্ম দাও।

নিউটনের মতো নেতা সন্তান জন্ম দাও।

সেক্সপিয়রের মতো বুদ্ধিজীবী সন্তান জন্ম দাও।

অমুককে রোলমডেল বানিয়ে তার মতো সন্তান জন্ম দাও, যাতে তোমার সন্তান এক সময় নোবেল প্রাইজের মতো কিছু আবিষ্কার করতে পারে। তোমার সন্তানের নামেও এমন কোনো আন্তর্জাতিক সম্মানিত পুরস্কার চালু হয়ে যায়।

যেহেতু সেসব দেশের নারীদের কাছে একে খুব একটা ভিন্ন ধরনের মনে হবে না। তাই তারা বলবে, আচ্ছা; ঠিক আছে। যেহেতু আমরা এটাই কামনা করি যে, যত দিন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক থাকবে, আমরা চাইব যাতে আমাদের সন্তান আইনস্টাইন আর নিউটনের মতো হবে। তাহলে আমার Marshal race (বিশ্বসেরা দৌড়প্রতিযোগী) সন্তান দরকার। তাই নারীরা নিজেদের স্বামীর পরিবর্তে জেনেটিক ব্যাংকে গিয়ে Pregnant (অন্তঃসত্তা) হবে। সেখান থেকে গর্ভবতী হলে রাষ্ট্র বলবে, যেহেতু সে Marshal race (বিশ্বসেরা দৌড়প্রতিযোগী) সন্তান জন্ম দেবে, তাহলে সে তো আমাদেরই সহযোগী হচ্ছে। তাই আমাদের পক্ষ থেকে তার কর মওকুফ করে দেওয়া হোক এবং অন্যান্য বিষয়ে বিশাল ছাড় দেওয়া শুরু করা হোক।

এভাবে তারা নারীদের এমনভাবে মার্শাল রেচ-এর চক্রে ফেলে দেবে যে, ভূমিষ্ঠ সন্তানের স্বাস্থ্যও অনেক ভালো হবে। তারা জ্ঞানী হবে, মেধাবীও হবে। চেহারাও অত্যন্ত সুশ্রী হবে। কিন্তু এসবের সাথে-সাথে সন্তানগুলো সৃষ্টিকর্তাবিমুখ হবে, দীন-ধর্মের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই থাকবে না।

আর তারা এতটাই নির্লজ্জ হবে যে, লজ্জাকে কোনো গ্রহণযোগ্য বস্তুই মনে করবে না।

তারপর যখন পৃথিবীতে এমন অসভ্য সন্তান জন্ম নেওয়া আরম্ভ করবে, তখন পুরো জাতির অবস্থাই এমন হবে যে, তাদের মধ্যে আর আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকারকারী কেউ বাকি থাকবে না। তারা সম্পূর্ণ জানোয়ারে পরিণত হবে। তাদেরকে বলতে হবে বিবেকবান জীব। মানুষ যখন এ-ধরনের বিবেকবান জীব আবিষ্কার করতে থাকবে, তখন এক সময় তাদের সংখ্যাধিক্য দেখা দেবে। তারপর তারা তাদের বংশ এমনভাবে বিস্তার ঘটাবে যে, দুনিয়াতে তখন কেবল তারা-ই থাকবে।

তারা এমন হবে যে, যদি তাদের সামনে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ করে, তখন তারা বলবে, ভাই! আমিও আমার দাদার কাছে এ নামটি শুনেছিলাম। এটা কী ধরনের নাম জানি না। তারপর এমন একটা সময় আসবে, সমস্ত দুনিয়ায় এমন লোক আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না, যারা আল্লাহকে চিনে-জানে। এমন বান্দা যখন একজনও আর বাকি থাকবে না, তখনই আল্লাহ্ তাদের ওপর কেয়ামত কায়েম করবেন এবং দুনিয়ার বিছানাকে ভাঁজ করে ফেলবেন।

তারপর মানুষের যে-সফর কৃষিবিজ্ঞান দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এসে ওই দীর্ঘ সফরের ইতি টানা হবে। আর মহান আল্লাহ দুনিয়ার এ-সকল তামাশা বন্ধ করে পুনরায় সকলকে নিজের সামনে উপস্থিত করবেন এবং নিজ-নিজ কৃতকর্মের হিসাব চাইবেন।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এমন ভয়ানক দিন আসার আগে-আগে আমাদের পরিপূর্ণভাবে দীনের ওপর অবিচল থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

খুতুবাতে যুলফিকার-১৮

আল্লাহর মর্যাদা

'তাসাওউফের নির্যাসও হলো, নিজের বড়ত্বের অনুভূতি বেরিয়ে যাক এবং আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব অন্তরে বসে যাক। যে এটি বুঝে নিল, সে তাসাওউফের পূর্ণ পরিচয় পেয়ে গেল। এরপর সে আর 'আমি'ওয়ালা কথা শুনতে পারবে না। সে আল্লাহর বিনয়ী বান্দা হয়ে থাকবে। এক কবি বলেন–

یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں
اس پر ہے مجھ کو ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں
کچھ ہونا میرا ذلت وخواری کا سبب ہے
یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

'এ হলো অন্তরের কথা যে, আমি কিছুই নই।
এ নিয়ে আমার গর্ব হয়, আমি কিছুই নই।

কিছু হওয়াই তো আমার অপমান ও অধঃপতনের মূল কারণ।

এটি আমার মর্যাদার রহস্য যে, আমি কিছুই নই।"

আল্লাহর মর্যাদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ـ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

আল্লাহর শান

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত এই পৃথিবীর খালিক ও মালিক। তাঁর মর্যাদা সুমহান। আমরা আমাদের কল্পনায় আল্লাহর যত মর্যাদা ও বড়ত্ব চিন্তা করতে পারি, তিনি তার চেয়ে আরো ঊর্ধ্বে; আরো উঁচুতে। আমাদের ইবাদাত, প্রশংসাবাণী, তাসবীহ-তাহলীল এসব তাঁর শানের পর্দার আড়ালেই থেকে যায়। তিনি তার চেয়ে আরো ঊর্ধ্বে; বরং বহু ঊর্ধ্বে।

আজ এই পরিবেশে ও সমাজে আল্লাহর বড়ত্বের অনুভূতি অন্তরে সৃষ্টি করা খুবই জরুরি। অধিকাংশ পাপাচারের মূল কারণ হলো, আল্লাহর বড়ত্বের, তাঁর আদেশ ও নিষেধের যতটুকু আযমত অন্তরে থাকা উচিত ছিল, তা আজ নেই। এ-কারণে মানুষ উদাসিনতা ও গাফলতের জীবন কাটায়। সে প্রকৃতভাবে যদি বুঝতে পারত, আল্লাহ কত মহান, কী তার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি, তাহলে তাঁর ভয় তাদের অন্তরে জমে যেত এবং গুনাহ ও পাপাচারের কল্পনাও তাদের মাথায় আসত না। পাপের চিন্তা মাথায় আসার সঙ্গে-সঙ্গে তার শরীরের লোম শিউরে উঠত, দাঁড়িয়ে যেত। আতঙ্কে তার হাত-পা নিথর হয়ে যেত। কুরআনে আল্লাহ বলছেন–

يَآأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

'হে লোকসকল! তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।'[১০৮]

إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ

'তিনি যদি চান, তাহলে তোমাদের শেষ করে দিয়ে নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন।'[১০৯]

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ

'এবং একাজ আল্লাহর জন্য মোটেও কঠিন কিছু নয়।'[১১০]

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের সুমহান মর্যাদার কিছুটা ঝলক পাওয়া যায়। অতএব, এ আয়াতের আলোকে আমরাও আমাদের ক্ষমতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে সতর্ক হই এবং আল্লাহর মর্যাদা ও শান বোঝার চেষ্টা করি। যখন আল্লাহর শান ও আযমত অন্তরে বসে যাবে, তখন মানুষ আল্লাহর হুকুমকেও মর্যাদাবান মনে করবে, সেই হুকুম অমান্য করতে তার অন্তর কেঁপে উঠবে, ভয়ে শরীর শিহরিত হয়ে উঠবে। চিন্তা করবে, হায়! আমি আল্লাহর কত নাফরমানি করছি। তারপর যে ইবাদাতই সে করবে, তাতে সীমাহীন স্বাদ অনুভব করবে।

এতেই আমি গর্বিত

হযরত আলী (রাযি.) বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমার জন্য এর চেয়ে আর বেশি সম্মান ও গৌরবের বিষয় কী হতে পারে যে, আপনি আমার পালনকর্তা এবং আমি আপনার গোলাম। কেন বলতেন এমন করে? কারণ, তাদের অন্তরে আল্লাহর মর্যাদা ও শান দৃঢ়ভাবে বসে গেছে। আর সে কারণেই তারা ইবাদাতে সীমাহীন স্বাদ পেতেন।

ইবাদাত কার অধিকার?

মনে রাখবেন, ইবাদাত হলো আল্লাহর হক। কোনো অবস্থাতেই গাইরুল্লাহর ইবাদাত জায়েয নেই। এই অধিকার একমাত্র তাঁরই। এই

---

১০৮. সূরা ফাতির : আয়াত ১৫
১০৯. সূরা ফাতির : আয়াত ১৬
১১১০. সূরা ফাতির : আয়াত ১৭

যোগ্যতা একমাত্র তাঁরই মধ্যে রয়েছে। সত্য কথা হলো, মানুষ যখন আল্লাহর বড়ত্ব স্বীকার করে, তাঁর সামনে নিজেকে অবনত করে, দেহের সবচেয়ে সম্মানিত স্থান কপাল যখন তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে, সম্মানের প্রতীক নাক যখন তার সামনে মাটিতে ঘষাঘষি করে এবং নিজেকে আল্লাহর সামনে মাটির সঙ্গে বিছিয়ে দেয়, তখন আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট হন এবং তাকে স্বীয় নৈকট্য দান করেন। কুরআনে কারীমে আল্লাহ বলেন–

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

'হে নবী! আপনি সেজদায় লুটিয়ে পড়ুন এবং আমার নৈকট্য লাভ করুন'।[১১১]

এই আয়াতে সেজদার পরেই নৈকট্যের আলোচনা করা হয়েছে কেন? কারণ, মানুষ সেজদার মধ্যে যখন নিজেকে নিজে এভাবে মিটিয়ে দেয়, তখন আল্লাহও তাকে স্বীয় নৈকট্য দান করে ধন্য করে দেন।

ফকীহগণ লিখেছেন, সেজদার স্থান যদি নরম হয়; যেমন– ঘাস ইত্যাতি হয়, তা হলে সেজদায় গিয়ে কপালটা নিচের দিকে চাঁপিয়ে সেজদা করবে, যেন নিচ থেকে মাটির কঠিনতা অনুভব করা যায়। যদি ঘাসের ওপর সেজদা করে, তাহলে সেজদা হবে না। এ ক্ষেত্রে কপাল চাঁপিয়ে সেজদা করা ওয়াজিব। এর মধ্যে হেকমত হলো, এই বান্দা নিজেকে এতটুকু ঝুঁকিয়েছে; যতটা তার পক্ষে সম্ভব ছিল, যতটা তিনি চান। এজন্যই বলা হয়–

اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

'নামায হলো মুমিনের মে'রাজ'।

আসুন. আমরা আল্লাহর রাব্বুল ইয্যতের সামনে ঝোঁকা শিখি এবং তাঁর আযমত ও বড়ত্ব অন্তরে সৃষ্টি করি।

ভালোবাসার মেরাজ

যখন আমরা কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ি, তখন আমরাও স্বীকারোক্তি দেই যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই'। আমরা আল্লাহর সম্মুখে কত বড় কথা বলে দেই এর উপলব্ধিই আমাদের নেই। বিষয়টি একটু বিস্তারিত শুনুন।

---

১১১. সূরা আলাক : আয়াত ১৯

* যখন কারো সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা হয়, তখন তার প্রাথমিক অবস্থাকে 'রগবত' তথা আগ্রহ বলে। যেমন– সাধারণত বলা হয়, 'মনে অমুক বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে'।

* এরপর যখন এই 'রগবত' ও আগ্রহ বেড়ে যায়, তখন একে 'তলব' তথা অনুসন্ধিৎসা বলে'। যেমন– বলা হয়- 'এই বান্দার অন্তরে অমুক বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়েছে'।

* এরপর যখন অনুসন্ধিৎসাও বেড়ে যায়, তখন তাকে 'মহব্বত' তথা ভালোবাসা বলে। যেমন– বলা হয়- 'তার মনে অমুক বস্তুর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে'।

* এরপর যখন এই 'মহব্বত'ও বৃদ্ধি পায় এবং একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন একে ইবাদাত বলে।

এই অধম কয়েকজন তরুণকে প্রশ্ন করেছি, বলো তো মানুষ তার প্রিয় মানুষকে সবচেয়ে প্রিয় কী বস্তু দিতে পারে? অর্থাৎ– সর্বোচ্চ ভালোবাসা কী দিয়ে প্রকাশ করা যায়?

একজন বলল, নিজের সমস্ত ধনসম্পদ তার তরে লুটিয়ে দিয়ে।

দ্বিতীয়জন বলল, নিজেকে সকল কাজকর্ম থেকে মুক্ত করে একমাত্র তার জন্য একাকার হওয়া।

তৃতীয়জন বলল, নিজের জীবনটা উৎসর্গ করে দেওয়ার মাধ্যমে।

তারা তারুণ্যের উচ্ছ্বাসভরা জবাব দিচ্ছিল। আমি বললাম- আরে ভাই! বার্ধক্যের দুর্বলতাভরা কোনো জবাব দাও না! আমি তো বৃদ্ধ!

তারা বলল, সেটা তো আপনিই ভালো বলতে পারবেন। এরপর আমি তাদের বোঝালাম–

'দেখো, ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর হলো, 'প্রিয়জনের ভালোবাসা অন্তরে এতটা দৃঢ় হবে যে, প্রেমিক ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে প্রিয়তমের পায়ে তার মাথা ঠেকাবে।'

অর্থাৎ– সে তার প্রিয়তমকে উপাস্য বানিয়ে নিবে। এটাই ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর, এটাই ভালোবাসার মেরাজ।

যখন আমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললাম, তখন আমরা যেন আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করলাম, হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর এবং সবচেয়ে নিখাঁদ যে-ভালোবাসা আছে তা যেন একমাত্র তোমার

জন্যই হয়। আমরা আমাদের ভালোবাসাকে কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছি। আমরা কালেমা পড়ার সময় এই অঙ্গীকারই করে থাকি।

কুরআনে ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, তারা এভাবে বলে–

إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

'আমরা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা রাখি।'[১১২]

মানে অন্তরে যদি ভালোবাসা থাকে, তা হলে তা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। এর পরের স্তর হলো 'তলব' বা অনুসন্ধিৎসা। সে-ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

'অনুসন্ধানকারী ও অনুসন্ধানকৃত উভয়ই দুর্বল'।[১১৩]

অর্থাৎ– অনুসন্ধান ও ব্যাকুলতা থাকলে কেবল কার জন্য হবে? আল্লাহর জন্য। যখন ভালোবাসার স্তরের প্রসঙ্গে এলো, তখন ইরশাদ করলেন–

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

'এবং ঈমানদাররা আল্লাহকে ভীষণ ভালোবাসে।'[১১৪]

এরপর 'ইবাদাত' প্রসঙ্গে বললেন–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।'

এখন চিন্তার বিষয় হলো, যেই আল্লাহ সম্পর্কের সর্বনিম্ন স্তর 'রগবত' তথা আগ্রহকে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকাকে পছন্দ করে না; বলুন তো, তিনি সম্পর্কের সর্বোচ্চ স্তর 'ইবাদাত' অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াকে কীভাবে পছন্দ করতে পারেন?

'ইলাহ' কাকে বলে?

'ইলাহ' হলো সেই সত্তার নাম, যাকে ছাড়া কারো কাজ চলে না এবং যার কাজ কারো সাহায্যের জন্য আটকে থাকে না। অর্থাৎ– যার প্রতি সকল

---

১১২. সূরা তাওবা : আয়াত ৪৯

১১৩. সূরা হজ : আয়াত ৭৩

১১৪. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

মাখলুক মুখাপেক্ষী; কিন্তু তিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। এই মহান শান কেবল আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। তার কোনো কাজ কারো অনুমতি বা সাহায্যের জন্য আটকে থাকে না; অথচ কোনো মাখলুকই তার সাহায্য ও তাওফীক ব্যতীত কিছু করতে পারে না। এমনকি গাছের একটা পাতাও তার অনুমতি ব্যতীত নড়তে পারে না। আম্বিয়া আলাইহিস সালামও উঁচু মর্যাদার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁরাও আল্লাহর অক্ষম বান্দার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

আল্লাহর ইচ্ছা-ই কার্যকর হয়

স্মরণ রাখবেন, ইচ্ছা ও পছন্দ সর্বদা আল্লাহরটি-ই কার্যকর হয়, বান্দারটা নয়। যেমন–

১. হযরত আদম (আ.) চেয়েছিলেন চিরদিন জান্নাতে থাকবেন; কিন্তু আল্লাহ চাইলেন তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণ করবেন। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছা-ই কার্যকর হলো; আদম (আ.) বিশেষ কারণে দুনিয়ায় প্রেরিত হলেন। তা হলে ইচ্ছা কারটি পূর্ণ হলো? আল্লাহরটি।

২. হযরত নূহ (আ.)-এর সামনে তাঁর সন্তান মহাপ্লাবনে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, সন্তান ধ্বংস থেকে বেঁচে যাক। এ উদ্দেশ্যের কথা তিনি বলেও ছিলেন–

يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا

'হে বৎস! আমাদের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ কর।'[১১৫]

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না, সে বেঁচে যাক; তাই সন্তান পিতার সামনেই সমুদ্রের অথৈ পানিতে ডুবে মারা গেল। তো ইচ্ছা কারটি পূর্ণ হলো? আল্লাহর রব্বুল ইয্যতেরটি।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের সন্তানকে মাটিতে শোওয়ালেন। চাচ্ছেন সন্তানকে জবাই করবেন। ছুরিও ধার দিয়ে নিলেন। পূর্ণ শক্তি দিয়ে চুরি চালিয়েও দিলেন। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন ইসমাঈল জবাই না হোক। তা-ই হলো। ইসমাঈল (আ.)-এর স্থলে জান্নাতি দুম্বা জবাই হলো। তো ইচ্ছা কারটি পূরণ হলো? আল্লাহরটি।

৪. আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইচ্ছা করলেন, আজকের পর আর মধু ব্যবহার করব না। কারণ, তাঁর একজন স্ত্রী

---

১১৫. সূরা হুদ : আয়াত ৪২

বলেছেন, এতে তাঁর মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা ছিল আর কখনো মধু পান করব না; কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরমান এল–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'হে নবী! কেন আপনি এমন জিনিসকে (নিজের জন্য) হারাম করবেন, যা আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে? আপনি কি স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।'[১১৬]

তো এখানেও আল্লাহর ইচ্ছার কারণে নবীজিকে পুনরায় মধু পান করতে হয়েছে। তো ইচ্ছা কারটি পূর্ণ হলো? আল্লাহরটি।

এই শান কেবল আল্লাহর সঙ্গে খাস যে, সর্বাবস্থায় ইচ্ছা একমাত্র তাঁরই পূরণ হয়। সম্মানিত উপস্থিতি! যখন সর্বাবস্থায় ইচ্ছা তাঁরটিই কার্যকর হয়, তা হলে আসুন, আমরাও নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ও পছন্দের মধ্যে সঁপে দিই এবং তাঁর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাই।

বন্দেগি এক গোলামের কাছে শিখেছি

এক বুযুর্গ বলেন, আমাকে বন্দেগি এক গোলাম শিক্ষা দিয়েছে। একজন প্রশ্ন করল, সেটা কীভাবে? তিনি বললেন, যখন আমি গোলামটা ক্রয় করে আনি, তখন তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম।

আমি বললাম, তোমার নাম কী?

গোলাম বলল, আপনি যে-নামে ডাকবেন সেটিই আমার নাম।

আমি বললাম, তুমি এখানে কী কাজ করতে পারবে?

সে বলল, আপনি আমাকে যে-কাজেই লাগাবেন, সেটাই আমার কাজ।

আমি বললাম, তুমি কেমন পোশাক পরিধান করবে?

সে বলল, আপনি আমাকে যা পরাবেন, তা-ই আমার পোশাক।

বুযুর্গ বলেন, সেই গোলাম আমাকে আল্লাহর প্রকৃত গোলামির অর্থ বুঝিয়ে দিল। আমার অন্তর বলে উঠল, এ আমার গোলাম এবং সর্বদা আমার ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট; তাহলে আমাকেও আমার পালনকর্তার ইচ্ছার ওপর রাজী-খুশী থাকা উচিত। সত্য কথা হলো, যে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেল, তার জীবন ধন্য হয়ে গেল।

---

১১৬. সূরা তাহরীম : আয়াত ১

একটি প্রশ্নের বিস্ময়কর জবাব

যুননূন মিসরি নামে একজন বুযুর্গ ছিলেন। একবার তিনি তার বন্ধুদের বললেন, সেই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কী, যার ইচ্ছায় দুনিয়ার সবকিছু পরিচালিত হয়? তার একথা শুনে বন্ধুরা খুব বিস্মিত হলো। ভাবল, এই বুযুর্গ তো অত্যন্ত সতর্ক মানুষ; তার মতো লোকের তো এমন গর্হিত মন্তব্য করার কথা নয়। নিশ্চিয়ই এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। তারা কৌতূহলী হয়ে বলল, হযরত! মনে হচ্ছে, আপনার এই কথার মধ্যে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে; অনুগ্রহ করে কথাটা আমাদের বুঝিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, দেখো! প্রকৃত অর্থে সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হয় আর আমি আমার ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে, সব কিছু আমার ইচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে।

আল্লাহর ইচ্ছা সবার ঊর্ধ্বে

লোকেরা বলে থাকে, আমার যা ইচ্ছা আমি তা-ই করব। আরে ভাই! যখন কালেমা পাঠ করেছি, তখন থেকে ইচ্ছার মূল্য শেষ। কালেমা পাঠ করার পূর্বে ইচ্ছার মূল্য ছিল। কিন্তু যখন কালেমা পড়েই ফেলেছি, এখন নিজের ইচ্ছার চেয়ে আল্লাহর ইচ্ছার গুরুত্ব বেড়ে গেছে।

مرضیٔ مولیٰ از ہمہ اولیٰ

'মাওলার মর্জি সবচেয়ে উত্তম ও বেশি বাস্তবায়ন যোগ্য'।

দেখার বিষয় হলো, আমরা আল্লাহকে কীভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি।

আল্লাহর ইবাদাতের আহ্বান

সকল নবী এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করেছেন এবং বলেছেন, 'হে লোকসকল! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করো।' যেমন– কুরআনে এ বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

'আমি কওমে আদের নিকট তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো।'[১১৭]

---

১১৭. সূরা হুদ : আয়াত ৫

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

'আমি কওমে ছামুদের নিকট তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো।'[১১৮]

আরো একস্থানে ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

'হে লোকসকল! তোমরা স্বীয় রবের ইবাদাত করো।'[১১৯]

আল্লাহর শাহী কালেমার কিছু ঝলক

১. একস্থানে আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

'তিনি সেই সত্তা, যিনি পানি থেকে মানব সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে বংশের সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন। আপনার রব সবকিছু করতে পারেন; তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।'[১২০]

আল্লাহু আকবার! কত শান ও প্রভাবশালী কালাম আল্লাহর! শুনলেই মনে হয় কোনো শাহেনশাহ কথা বলছেন।

২. আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্যে যিনি রাসূল হিসেবে আগমন করেছেন, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ মানসুখ তথা অকার্যকর করার ক্ষমতা নিয়ে এসেছেন। তাঁরা আল্লাহর খুব নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দা ছিলেন। আল্লাহ নিজেই তাদের এই গুরু দায়িত্বের জন্য নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

'আল্লাহ ভালো জানেন কাকে তিনি তার রেসালাত (নবুওয়াত) দান করবেন।'[১২১]

---

১১৮. সূরা হুদ : আয়াত ৬১
১১৯. সূরা বাকারা : আয়াত ২১
১২০. সূরা ফুরকান : আয়াত ৫৪
১২১. সূরা আন'আম : আয়াত ১২৪

তো তাদের আল্লাহই নির্বাচন করেছেন। কুরআনে আরো দৃঢ়ভাবে বলছেন–

وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'আমি তাদের নির্বাচন করেছি এবং সরল পথের সন্ধান দিয়েছি।'[১২২]

আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী শব্দ দিয়ে পয়গাম দিলেন, আমিই রাসূলদের নির্বাচন করেছি এবং যখন পাঠিয়েছি, রাসূল ও পথপ্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছি।

৩. আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন নাযিল করেছেন, সাথে-সাথে সেই কুরআন হেফাযতের দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়ে নিলেন। যে আয়াতে তিনি কুরআন হেফাযতের কথা আলোচনা করেছেন; সেটিও বড় বিস্ময়কর আয়াত। তিনি বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَحَافِظُونَ

'আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাযতকারী।'[১২৩]

এবার এটির অর্থের মধ্যে একটি চিন্তা করা যাক–

إِنَّا

আমি

نَحْنُ

আমি

نَزَّلْنَا

আমি

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমি

এটিই বড়ই বিস্ময়কর বিষয় যে, একি আয়াতে তিনি চারবার 'আমি-আমি' বলেছেন। সুবহানাল্লাহ! কী গভীরতাই না আছে এই বাক্যে!

---

১২২. সূরা আন'আম : আয়াত ৮৭

১২৩. সূরা হিজর : আয়াত ৯

প্রকৃত শাহানশাহের শাহী আন্দায লক্ষ করুন। কুরআন কারীমের হেফাযতের প্রসঙ্গ ছিল। এত মজবুত ও শক্তিশালী কথা বললেন! এর চেয়ে শক্তিশালী কথার কল্পনাও করা যায় না।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

ওলামায়ে মুফাস্‌সিরীন এখানে চারবার 'আমি' বলার কারণ এই লিখেছেন যে, বারবার 'আমি-আমি' বলে মূলতঃ কথার মধ্যে এক ধরনের আযমত ও বড়ত্ব সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য যে, এ কালামের মালিক কোনো সাধারণ সত্তা নন। একটু ব্যাখ্যার সাথে এর বঙ্গানুবাদ হবে। হ্যাঁ, আমি! হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিই এই কুরআন নাযিল করেছি; এবং আমিই এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছি।'

এবার দেখুন! কথার মাঝে কী পরিমাণ শক্তি এসে গেছে। এ আয়াতে আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের কী পরিমাণ ক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে। মূলত তিনি মানুষকে বোঝাচ্ছেন, হে বনী আদম! আমার বড়ত্ব, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শান দেখো! আর আমরা সেই মহান সত্তার বান্দা। তিনি দাতা; আমরা গ্রহীতা। তিনিই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক। আল্লাহু আকবার কাবীরা! মানুষ যখন আল্লাহর আযমত চিন্তা করে, তখন অন্তরে সীমাহীন প্রশান্তি অনুভব করে।

আম্বিয়া কেরামের অক্ষমতা

সকল নবী আল্লাহর অক্ষম ও দুর্বল বান্দা। সকলেই তার সামনে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন, কাকুতি-মিনতি করেছেন, হাঁটু গেড়ে বিলাপ করেছেন, সেজদায় লুটিয়ে পড়েছেন, চোখের পানি ফেলে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, তাঁর সামনে নিজের আঁচল বিছিয়ে করুণা ভিক্ষা চেয়েছেন।

কুরআনের আয়াতে অক্ষমতা প্রকাশের শিক্ষা

দোজাহানের বাদশাহ আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে আয়াত ও হাদীছ বর্ণিত আছে, সেগুলোতে চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত-এর আযমত ও বড়ত্বের বিস্ময়কর শিক্ষা পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করছি–

১. এক পয়গম্বর আলাইহিস সালাম বলছেন–

مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

'আমি জানি না, আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে এবং তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে। আমি তো কেবল তা-ই করি, যা আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার নিকট ওহী হিসেবে আসে।'[১২৪]

এই আয়াতের মধ্যে চিন্তা করে দেখুন, পয়গম্বরের কথা থেকে কতটা নিজের অক্ষমতা, অসহায়ত্ব ও আনুগত্য প্রকাশ পাচ্ছে এবং আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

'এবং তোমার প্রভু যা চান, তা-ই সৃষ্টি করেন। তারা (কাফেররা) নিজেদের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে না।' (আল্লাহর ইচ্ছা হলে হয়; অন্যথায় হয় না)।[১২৫]

২. অন্যত্র নবীজি আলাইহিস সালাম বলেন,

مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

'আমার এ অধিকার কোথায় যে, আমি একে আমার পক্ষ থেকে পরিবর্তন করব? আমি তো কেবল তা-ই অনুসরণ করি, যা আমার নিকট ওহীরূপে অবতীর্ণ হয়।'

৩. আল্লাহ তাঁর হাবীবকে একস্থানে বিস্ময়কর সম্বোধন করে বলেন–

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ

'আমাদের হযরত মুর্শিদে আলম (রহ.) এ আয়াতের অর্থ এভাবে বলতেন–

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

'হে প্রিয়! আপনাকে যা আদেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি তার ওপর একদম সোজা হয়ে জমে থাকুন।'[১২৬]

৪. অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

---

১২৪. সূরা আহকাফ : আয়াত ৯
১২৫. সূরা কাসাস : আয়াত ৬৮
১২৬. সূরা হুদ : আয়াত ১১২

'আমি চাইলে আপনার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, সব ফেরত নিয়ে নিতে পারি।'[১২৭]

এখানে আল্লাহ 'নূনে ছাকীলা' ব্যবহার করেছেন। কথাটা এতটা জোর দিয়ে বলেছেন, এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী কথা বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভবই নয়। কুরআনে কারীমের বর্ণনাশৈলী একটু লক্ষ করুন। কী অসম্ভব রকমের জালাল ও প্রতাপ ছিল এই বাক্যে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, যখন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কথা বলা হয়েছে, তা হলে এ আয়াত তেলাওয়াত করার পর কোনো ব্যক্তির জন্য নিজের ইল্‌ম নিয়ে আত্মতুষ্টিতে থাকার সুযোগ নেই। যেখানে স্বয়ং প্রিয় রাসূলকে এমন সম্বোধন করেছেন, তা হলে আমরা কোনো খেতের মুলা-গাজর! আমাদের তো পাত্তাই নেই।

৫. আমলের ব্যাপারেও একটি আয়াত আছে। আল্লাহ বলেন, হে আমার প্রিয়!

لَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

'যদি আমি আপনাকে অবিচল না রাখতাম, তা হলে আপনি তাদের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হতেন। আর তা হলে আমি আপনাকে দুনিয়ায়ও দ্বিগুণ শাস্তি দিতাম এবং মৃত্যুর পরও দ্বিগুণ শাস্তি দিতাম। তারপর আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।'[১২৮]

এই আয়াতের তরজমাটুকু আপনি বাড়িতে গিয়ে দেখুন। এই অধমের মধ্যে এর তরজমা ব্যাখ্যা শোনানোর মতো হিম্মত নেই।

যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলছেন যে, 'যদি আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখতাম', তো আমরা যারা ছোটখাট, টুকটাক-কিছু আমল করছি এটা আমাদের কোনো যোগ্যতা বলে নয়; বরং এ আল্লাহর অনুকম্পা যে, তিনি আমাদেরকে এর তাওফীক দিয়েছেন। অন্যথায় আমাদের কোনো যোগ্যতা বা শক্তি ছিল না।

---

১২৭. সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৬

১২৮. সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ৭৪

মাসনূন দু'আসমূহে বিনয়ের শিক্ষা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে-সকল দু'আ আল্লাহর নিকট করেছেন, সেগুলো যদি মুখস্থ করা হয় এবং অর্থের দিকে চিন্তা করে চাওয়া হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাদের সেই দু'আগুলো কবুল করে নেন। আজকাল লোকেরা দু'আ করে না; বরং দু'আ পড়ে। রব্বানা যলাম না ..., রব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা ... এসব শুধু পড়তে থাকে; কিন্তু প্রার্থনা করে না।

দেখুন! দু'আ পাঠ করা আর দু'আ করার মধ্যে পার্থক্য আছে। মুখের চাওয়া এক জিনিস আর অন্তরের চাওয়া আরেক জিনিস। লোকেরা বলে, আল্লাহ আমাদের কথা শোনেন না। আর আমি বলব, আল্লাহ সবার কথাই শোনেন। মানুষের অন্তরগুলো বোবা হয়ে গেছে; অন্তরগুলো কথা বলে না। আল্লাহ তো অন্তর থেকে বের হওয়া কথাই বেশি শোনেন; শুধু মুখ থেকে বের হওয়া কথার প্রতি তিনি গুরুত্ব দেন না। এখন মানুষ দু'আ করে মুখ দিয়ে, যেখানে হৃদয়ের উষ্ণতা থাকে না। তাই আল্লাহও সেই দু'আ কবুল করেন না। তিনি শোনেন না; একথাটা ঠিক নয়। তিনি সবার দু'আই শোনেন। তবে সেই দু'আই কবুল করেন, যা অন্তর থেকে বের হয়।

খুঁজে দেখুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অনেক দু'আ করেছেন; যেগুলোতে তাঁর চরম বিনয় প্রকাশ পেয়েছে।

বিদায় হজের সময় নবীজি একটি বিস্ময়কর দু'আ করেছিলেন–

أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُعِيْذُ وَالْوَجِلُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِيْ ـ اَسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ

'আমি বিপদগ্রস্ত, রিক্তহস্ত, সাহায্যের ভিখারী, আশ্রয় প্রার্থনাকারী, ভীতসন্ত্রস্ত, স্বীয় অন্যায়ের স্বীকারোক্তি প্রদানকারী। হে আল্লাহ! আমি মিসকিনদের মতো আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, হীন পাপীর মতো আপনার দরবারে অশ্রুস্বজল মিনতি করছি।'

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর এত প্রিয় রাসূল! কত সমুন্নত তাঁর মর্যাদা। দোজাহানের সরদার তিনি; অথচ দেখুন, দু'আর মধ্যে তিনি নিজেকে কতটা বিলীন করে দিচ্ছেন। একটু নিজের মনকে প্রশ্ন করুন। আমরা কি কখনো নিজেদের জন্য এমন শব্দমালা ব্যবহার করে দু'আ করেছি? না; কখনো এমন শব্দ দিয়ে দু'আ করিনি। তাহলে এ দু'আ কীভাবে কবুল হবে?

মহান প্রতিপালকের সামনে তো ঝুঁকতে হবে, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে হবে। এই ঝোঁকার মাঝেই তো আমাদের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। এতেই আমাদের মর্যাদা ও সম্মান। যে যত বড় হতে চায়, সে যেন তত বেশি ঝুঁকে যায়। আল্লাহ তাকে বড় বানিয়ে দেবেন। দেখুন, কত সহজ সমাধান।

বদরের যুদ্ধের দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছিলেন। কাঁদতে-কাঁদতে বুক ভাসিয়ে দু'আ করেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تُعْبَدْ اَبَدًا

'হে আল্লাহ! যদি আপনি এ ছোট জামাতটিকে (যারা মুসলমান হয়েছে) ধ্বংস করে দেন, তাহলে এরপর আপনার ইবাদাতকারী কোনো বান্দা দুনিয়াতে অবশিষ্ট থাকবে না।'

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, বদরের যুদ্ধের দিন ময়দানে আসা তিনশত তেরোজন সাহাবি যদি ধ্বংস হয়ে যেত, তবে আল্লাহর জন্য অন্য মুমিন সৃষ্টি করা কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তারপরও নবীজি একথা কেন বললেন যে, এরা মারা পড়লে কোনো বান্দা কখনো তোমার ইবাদাত করবে না?

মুহাদ্দিছীনে কেরাম এখানে উত্তর দিয়ে থাকেন যে, যখন নবীজি তাঁদের নাম উচ্চারণ করলেন, তখন নিজেকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। আর বাস্তবেও বিষয়টিও এমনই। কারণ, নবীজি হলেন শেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না। যদি তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হন এবং সেই জামাত ধ্বংস হয়ে যেত; তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদাতকারী আর কেউ অবশিষ্ট থাকত না।

তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয় দেখুন! নিজের দু'আর মাঝে নিজের খাদেমদের সঙ্গেই নিজেকে শামিল করে দু'আ করলেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.) যখন এ দু'আ শুনলেন, তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রিয় হাবীব! সেজদা থেকে মাথা উঠান। অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। অর্থাৎ– এতটা বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ করলেন যে, প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তরও তা দেখে নরম হয়ে গেল। আমাদের মুর্শিদে আলম (রহ.) প্রায়ই বলতেন, তোমরা আল্লাহর এত বেশি ইবাদাত করো, এত বেশি করো, যেন তোমার প্রতি স্রষ্টা ও সৃষ্টি সবাই দয়াদ্র হয়ে যায়।

নবীজি একবার দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَائُكَ ، اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِيْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اِسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনারই দাস। আপনার দাসের ছেলে। আপনার দাসির ছেলে। আমার কপাল আপনার হাতে। আপনার প্রত্যেকটি আদেশ আমার ওপর কার্যকর হয়। আমার ব্যাপারে আপনার প্রত্যেকটি ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ। আমি প্রার্থনা করছি আপনার সেই সকল নামের উসিলা দিয়ে, যা দিয়ে আপনি স্বীয় সত্তাকে নামকরণ করেছেন। অথবা যা আপনার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। অথবা আপনার মাখলুকের মধ্যে থেকে কাউকে শিখিয়েছেন অথবা যা আপনি ইল্‌মে গায়েবে নিজের কাছেই সংরক্ষিত রেখেছেন (আমি সেসব মুবারাক নামের উসিলা দিয়ে প্রার্থনা করছি।) আল্লাহু আকবার!

আসুন! আমরা আমাদের দু'আগুলোতে আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করি। বিনয় ও আকুতির সাথে যেমন দু'আ করা উচিত তেমন করে দু'আ করি।

যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন ফেরেশতা এসে তাঁকে আরজ করল, হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল! আপনি অনুমতি দিলে আমরা এই বস্তিবাসীকে ধ্বংস করে দেব। কিন্তু আল্লাহর রাসূল অনুমতি দেননি; বরং একটি বিস্ময়কর দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُرُ ضُعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّيْ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِيْ اِلٰى عَدُوٍّ يَتَهَجَّمُنِيْ اَمْ اِلٰى قَرِيْبٍ مَلَّكْتَهٗ اَمْرِيْ اِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِيْ . الخ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অনুযোগ করছি আমার দুর্বলতার আমার কৌশলের ত্রুটির, মানুষের মধ্যে আমার অযোগ্যতার। হে সকল দয়াময়ের শ্রেষ্ঠ দয়াময়! আপনি দুর্বলদের স্রষ্টা, আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে কাদের হাতে সোর্পদ করলেন। কোনো অপরিচিতের হাতে, যারা আমাকে কষ্ট দেয়? নাকি কোনো এমন শত্রুর হাতে, যে আমার ওপর কর্তৃত্ব করে, জুলুম করে? হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না

হন, তবে আমার কারো পরোয়া নেই; আপনার করুণা তার চেয়ে হাজার গুণ প্রশস্ত।'

কী বিস্ময়কর কথা! 'হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হন, তবে আমার কারো পরোয়া নেই।' কবি বলেন–

کیا غم ہے جو ہے ساری خدائی بھی مخالف
کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے
اللہ کے راستے کی جو موت آئے مسیحا!
اکسیر یہی ایک دوا میرے لئے ہے
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خَفَا میرے لئے ہے

সারা পৃথিবীর খোদারাও যদি আমার বিরুদ্ধে যায়, তাতে ভাবনার কী আছে? আমার জন্য এক খোদাই যথেষ্ট যদি তিনি আমার হন।

আল্লাহর পথে মৃত্যু যেন আসে হে মাসীহা! মুক্তির এই একটি ওষুধ আছে, যা শুধু আমার জন্য বরাদ্দ।

তাওহীদের মর্ম তো হলো এই যে, আল্লাহ হাশরের দিন বলবেন, আমার এই বান্দা উভয় জাহানের সব কিছুর বিরুদ্ধে গেছে শুধু আমার জন্য।

আল্লাহর রাসূল দু'আয় আরো বলছেন–

غَيْرَ اَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ اَوْسَعُ لِيْ. اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ

'কিন্তু আপনার নিরাপত্তা আমার জন্য আরো প্রশস্ত প্রশান্তিদায়ক। আমি আপনার চেহারার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা দিয়ে সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়। (দু'আর শব্দমালার প্রতি লক্ষ করুন। বলছেন কী তিনি? কি বিস্ময়কর বিষয়! নবীজির অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা কীভাবে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। আল্লাহর অনুপম সৌন্দর্যের অপূর্ব দৃশ্য তাঁর কল্পনায় ছিল, যা তাঁর মুখনিঃসৃত শব্দমালা থেকে উদ্ভাসিত হচ্ছে।)

আরো বলছেন–

وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ تُنْزِلَ فِيْ غَضَبَكَ اَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ . لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى

'(এবং যে নূর দ্বারা) দুনিয়া-আখেরাতের সকল কাজ গুছিয়ে যাবে। হে আল্লাহ! তোমার নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত মিনতি করব, যতক্ষণ-না তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।'

তো তিনি আল্লাহর নিকট নিজের দুর্বলতার অনুযোগ করেছেন। হযরত শাহ সাহেব বলেন, আজ আমরা বান্দাদের নিকট প্রার্থনা করি আর আল্লাহওয়ালারা আল্লাহর নিকট চান, সকল বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন।

নবীজি কোথাও এভাবে দু'আ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَنَوَاصِيْنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تُمَلِّكْنَا مِنْهَا شَيْئًا

'হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর, কপাল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব আপনার নিয়ন্ত্রণে। অন্য কাউকে আপনি এগুলোর মালিক বানাবেন না।'

সুবহানাল্লাহ! বিনয়ের কী অপূর্ব ভাষা! বাস্তবেই আমরা বড়ই নিঃস্ব ও দুর্বল। সকল ইচ্ছা তাঁরই হাতে। আমরা মাথা ঝোঁকাব, আল্লাহর ইবাদাত করব এবং সেই ইবাদাতকেও আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করব যে, তাঁরই অনুগ্রহে এই ইবাদাত সম্ভব হয়েছে। নিজের কৃতিত্ব মনে করব না। আমরা যে-নামায পড়ি, তাও আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহেই সম্ভব হচ্ছে।

আল্লাহর বিশেষ দয়া

দুনিয়ার নিয়ম হলো, কেউ কারুর ওপর অসন্তুষ্ট হলে বলে, আজকের পর তোকে যেন আর এই মহল্লায় না দেখা যায়। তুই আমার বাড়ির ধারেকাছেও আসবি না; অন্যথায় পরিণতি ভয়াবহ হবে। ঠিক এভাবেই আল্লাহ যখন কোনো বান্দার ওপর অসন্তুষ্ট হন, তখন তিনি সেই বান্দাকে তার ঘর, মসজিদে আসার তাওফীক থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে সে মসজিদে আসে না। আর যখন সে মসজিদে এসে যায়, তো এর অর্থ হলো- আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট। কারণ দুষ্ট লোকদের কেউ ঘরে ডাকে না। ঘরে তাকেই নিয়ে যাওয়া হয়, যার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক থাকে। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতও যার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে, তাকে স্বীয় ঘর মসজিদে আসার তাওফীক দান করেন।

একবার হযরত হাজী সাহেবের কাছে একজন প্রশ্ন করল, হযরত! আমরা কীভাবে বুঝব, আমাদের নামায কবুল হয়েছে? তখন হাজী সাহেব খুব চমৎকার উত্তর দিয়েছিলেন। তোমার এক নামায আদায়ের পর দ্বিতীয়

নামাযের জন্য মসজিদে এসে যাওয়াই প্রমাণ করে, তোমার প্রথম নামায কবুল হয়েছে। প্রথম নামায কবুল হওয়াতেই তো দ্বিতীয়বার আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার তাওফীক পেয়েছ।

এক হাদীছে এসেছে–

وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

'আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ না হতেন, তবে আমরা হেদায়াতও পেতাম না, সদকাও করতাম না এবং নামাযও পড়তাম না'।

অর্থাৎ– আমরা আজ যা কিছুই করতে পারছি, তা কেবল আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহেই করছি'।

নবজাতকের কানে আযান-ইকামত

হাদীছে এসেছে, যখন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাযি.)-এর কোল আলোকিত হলো এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক সন্তান ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করলেন, তখন নবীজি নিজেই তার এক কানে আযান বললেন এবং অপর কানে ইকামত বললেন।

আযান-ইকামতে আল্লাহর বড়ত্বের পয়গাম

আযান-ইকামতের শব্দমালা কোথা থেকে শুরু হয়? 'আল্লাহু আকবার' থেকে। তো বান্দার কানে শরীয়ত সর্বপ্রথম যে পায়গাম পৌঁছিয়েছে, তা কী? তা হলো 'আল্লাহু আকবার' – 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) আল্লাহর বড়ত্বের পয়গাম পৌঁছিয়েছে। তো এই দুনিয়ায় আগমনের পর নবজাতকের কানে সর্বপ্রথম যে-পয়গাম পৌঁছানো হয়, তা হলো আল্লাহর বড়ত্ব। বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আজ বিষয়টি আমরা একেবারে ভুলেই গেছি। এই পয়গামে এক-দুবার নয়: বরং চারবার আল্লাহু আকবার বলা হয়। চারবার কেন?

ওলামায়ে কেরাম এর উত্তর দিয়েছেন যে, এই নশ্বর পৃথিবী চারটি মৌলিক উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে। যথা– আগুন, পানি বাতাস ও মাটি। এই উপাদানগুলোর প্রত্যেকের মধ্যে কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

১. বাতাস : বাতাসের মধ্যে এক ধরনের শক্তি আছে। যখন এটি প্রবাহিত হয়, তখন শহরের পর শহর ধ্বংস করে ফেলে। কাওমে আদ-এর মতো শক্তিশালী জাতিকে মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। একটি দেশে

সাইক্লোন এল। একে ঘূর্ণিঝড়ও বলে। সাইক্লোনটি একটি ঘরকে শূন্যে ভাসিয়ে তিনশত মাইল দূরে নিয়ে নিক্ষেপ করল। মূলত ঘূর্ণিঝড়টির বেষ্টনীই ছিল তিনশত মাইলব্যাপী। এই তিনশত মাইল পর্যন্ত দূরত্বকে বেষ্টনী দিয়েই সাইক্লোনটি প্রবাহিত হচ্ছিল।

২. পানি : পানির মধ্যেও এক ধরনের শক্তি আছে। মানুষ যে-জলযানগুলো এমনভাবে তৈরি করে যে, তা কখনো ডুবে না যায়, সেগুলোও তুফানের সময় টুকরা-টুকরা হয়ে সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যায়।

৩. আগুন : আগুনের মধ্যেও এক ধরনের শক্তি আছে। কখনো-কখনো আগুন এত বেশি প্রজ্বলিত হয় যে, মানুষ তা নেভাতেই পারে না। একবার আমরা উড়োজাহাজে সফরে সমুদ্রের মধ্যে আগুন দেখেছি। সমুদ্রের মধ্যে আগুন! কী আশ্চর্যের কথা? হ্যাঁ, নিচে সমুদ্রের পানি, ওপরে আগুন জ্বলছে। মানুষ তা নেভাতে পারে না।

হে আল্লাহ! তুমি কত বিস্ময়কর বস্তুই-না সৃষ্টি করে রেখেছ! আমরা গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম, এই আগুনের কারণ কী? সে বলল, সমুদ্রের তলদেশ থেকে তেলের খনি থেকে তেল বেরুচ্ছে, সেই খনির ওপর এক ধরনের গ্যাস রয়েছে, যা আরো ক্ষীপ্র গতিতে বের হচ্ছে। কখনো হয়তো বৃষ্টির সময় মেঘের গর্জনে বা বিজলি চমকানোতে তাতে আগুন লেগে যায়। এখন যেহেতু নিচে থেকে গ্যাস অনাবরত বের হচ্ছে, তাই এই আগুন অবিরাম জ্বলে চলছে। এই বাতি আল্লাহই জ্বালিয়েছেন। একে নেভানোর বহু চেষ্টা করেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

৪. মাটি : মাটির মধ্যেও তার নিজস্ব শক্তি আছে। ভূমিকম্প দেখা দিলে মানুষের উঁচু-নিচু বিল্ডিংগুলো মাটিতে গুঁড়িয়ে পড়ে।

তো এই চার ধরনের মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। আযান ও ইকামতে এ আহ্বান করা হয়েছে যে, হে বান্দারা! তোমাদেরকে সেই মহান সত্তার দিকে আহ্বান করা হচ্ছে, যার ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা বাতাসের শক্তির চেয়েও বেশি।

পানির শক্তির চেয়েও বেশি।

আগুনের শক্তির চেয়েও বেশি।

মাটির শক্তির চেয়েও বেশি।

এ-সকল বস্তুর চেয়েও শক্তিশালী সত্তা, মহান আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আল্লাহু আকবার!

কোনো-কোনো ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, চারবার আল্লাহু আকবার বলানোর উদ্দেশ্য হলো, হে বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের চতুর্দিকে তাকাও; দেখবে, সবখানে শুধু আল্লাহরই বড়ত্ব ও আযমতের নিশান। সমস্ত সৃষ্টি কেবল তার মহিমা প্রকাশেই ব্যস্ত।

তাহনীক-এ কয়েকটি ইল্‌মি তত্ত্ব

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাযি.)-এর জন্মের পর নাম রাখলেন। তারপর দুকানে আযান ও ইকামাত দিলেন। তারপর তাঁর তাহনীক করলেন। তাহনীক হলো– খেজুর বা মধু নিজের মুখে রেখে লালা মেখে তারপর মুখ থেকে বের করা এবং তা নবজাতকের মুখে দেওয়া। এটি একটি সুন্নত আমল।

এখানে কয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয় বোঝার আছে।

১. প্রথম কথা হলো, শিশুর দৈহিক গঠন হয় তার মায়ের পেটে। কিন্তু জন্মের পর তার রিযিক ও খাদ্য থাকে তার মায়ের দুধে, যা কি-না ওপরের দিকে বুকে। লক্ষ করুন, তার সৃষ্টি নিচে, কিন্তু পয়গাম দিচ্ছেন, হে বান্দা! এই মুহূর্তে তুমি রিযিক কোন দিক থেকে পাচ্ছ? ওপরের দিকে বুকের মধ্যে। লক্ষ করুন, তার সৃষ্টি নিচে, কিন্তু খাবার ওপরে বুকের মধ্যে। এতে নবজাতককে আল্লাহ তা'আলা এই পয়গাম দিচ্ছেন যে, হে বান্দা আমার! এই মুহূর্তে তুমি রিযিক কোন দিক থেকে পাচ্ছ? ওপরের দিক থেকে। সুতরাং সারা জীবনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করে নাও, যখনই তুমি রিযিক পাবে; ওপর থেকে পাবে। বড় হলেও তোমার রিযিক ওপর থেকেই আসবে। আল্লাহ বলেন–

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ

'তোমাদের রিযিক আকাশে।'[১২৯]

তাই মনে রাখতে হবে, আমাদের রিযিক আসমান থেকে আসবে। সেখানেই রিযিকের সন্ধান করতে হবে।

২. শিশুর মুখ একটা। তবে তার পান করার জন্য স্তন দুটা। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা শিশুর জন্য পর্যাপ্ত রিযিকের ব্যবস্থা রেখেছেন। উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হলো, বান্দাকে এই সান্ত্বনা দেওয়া যে, বান্দা তোমার জন্য আমি ডাবল, (দ্বিগুণ) ব্যবস্থা করেছি। সুবহানাল্লাহ!

---

১২৯. সূরা যারিয়াত : আয়াত ২২

যখন কাউকে বলা হয়, জনাব, চারজনের জন্য আমরা আটজনের খাবার তৈরি করেছি, তখন মনে এক ধরনের প্রশান্তি এসে যায়। এ-ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায়, যাক অন্তত খাবারে কষ্ট হবে না।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলাও পান করার জন্য মুখ সৃষ্টি করেছেন একটি; খাবার রিজার্ভ রাখার জন্য ট্যাংকি বানিয়েছেন দুটি। বোঝাতে চাচ্ছেন, হে আমার বান্দা! তোমার রিযিকের দায়িত্ব তো আমি গ্রহণ করেছি। আমি সেই খোদা, যিনি তোমার প্রয়োজনের চেয়ে দ্বিগুণ রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছি। সুতরাং তোমার ভাবনা কীসের?

৩. এমনিভাবে আল্লাহা মানুষকে মুখ দিয়েছেন একটি, কিন্তু হাত দিয়েছেন দুটি। যেন বান্দা দুহাতে উপার্জন করে আর এক মুখে খেতে পারে। তাহলে বলুন তো, এখানে খাওয়া বেশি, না উপার্জন বেশি? উপার্জন বেশি। কারণ, খাদ্য উপার্জনের মাধ্যম দুটি; কিন্তু খাদ্য ধ্বংসের মাধ্যম মাত্র একটি। পরিবার পরিকল্পনার লোকজনের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, হায় কী উপায় হবে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে। তারা বলে, দুনিয়াতে আসতে প্রত্যেকেই একটা করে মুখ সাথে নিয়ে আসে। কিন্তু দুই-দুটা হাতও যে আসে, সেটা তাদের চোখে পড়ে না।

৪. নবজাতকের কানে প্রথমে আযান পড়া হলো। তারপর ইকামত। তারপর তার 'তাহনীক' করানো হলো। অর্থাৎ– কিছু খাওয়ানো হলো। তো এতেও এই হেকমত ছিল যে, হে আমার বান্দা! সত্যের আহ্বান প্রথমে শোনো; রিযিকের জন্য হাত-পা পরে ছোড়ো। আমরা আজ কী বলি? দোকান থেকে যখন অবসর হব, তখন নসীহত শুনতে এসে যাব। আমরা দোকানকে প্রথম স্থান দিচ্ছি আর সত্যের পয়গামে সাড়া দেওয়াকে দিচ্ছি দ্বিতীয় স্থান। অথচ এটা ফিতরাতের পরিপন্থি। সর্বপ্রথম তার কানে আল্লাহর বড়ত্বের কথা ঢালা হয়েছে; তারপর তাকে রিযিক দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হে আমার বান্দা! তুমি সর্বপ্রথম সত্যের পয়গাম শ্রবণ করো; রিযিকের জন্য হাত-পা পরে মারো।

৫. আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের এই পয়গাম এক কানে পৌঁছানো হলো, নাকি দুই কানে? দুই কানে। উদ্দেশ্য কী? হে বান্দা আমার! আমার পায়গাম এক কানে শুনে যেন অপর কান দিয়ে বের করে না দাও। আজকাল এমন হয় যে, নসীহত এক কানে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দেয়। আর কেউ-কেউ তো এমনও আছে; যারা শোনেই না।

আমাদের মুর্শিদে আলম (রহ.) ভরপুর মজলিসে বলতেন–

ওহে! শুনছ তোমরা? তারপর বলতেন, তোমরা কি শুনছ না?

বাস্তবেই কখনো দেখে মনে হবে শুনছে; কিন্তু আসলে সে শুনছে না। এজন্য উভয় কানে শোনার অভ্যাস গড়ো। মুমিন ও কাফেরের মধ্যে এই পার্থক্য তো হয়ে থাকে যে, মুমিন শুনে মানে আর কাফের মানে দেখে। তাদের তো মনে হয় বিবেকই নেই। কাফেররা আখেরাতে এটাই বলবে–

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

'হায়! যদি আমরা শুনতাম, বুঝতাম, তাহলে জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।'[১৩০]

বিসমিল্লাহ-এর ب ও তার তত্ত্ব

আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা শুরু করেছেন। বিসমিল্লাহকে কোন অক্ষর দিয়ে শুরু করেছেন? ب দ্বারা। আলিফ ا দ্বারা শুরু করলেন না কেন? ওলামায়ে কেরাম এতেও বিভিন্ন তত্ত্ব লিখেছেন। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ب কে কেন পছন্দ করলেন এবং ا-কে কেন একা ছেড়ে দিলেন; এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. একটি কারণ হলো, ا (আলিফ) দাঁড়ানো থাকে; অনেকটা অহংকারীর মতো। এটা দাঁড়িয়ে থাকা অহংকারের আলামত। পক্ষান্তরে ب শুয়ে থাকে; অনেকটা বিনয়ী বান্দার মতো। আল্লাহ তা'আলা আলিফের অহংকারকে অপছন্দ করেন আর ب এর বিনয়কে পছন্দ করেন। তাই নিজের পবিত্র কালামের সূচনা ب দ্বারা করেছেন।

২. আরেকটি কারণ হলো, 'আলিফ' হরফে ইল্লত তথা দুর্বল অক্ষরসমূহের মধ্য হতে একটি। আর আল্লাহ চান না, আমার মুমিন বান্দা দুর্বল হোক। এ-কারণেই কুরআন মাজিদ শুরু করার জন্য ওই অক্ষরটি নির্বাচন করেছেন, যা হরফে ইল্লাত তথা দুর্বল অক্ষরসমূহের মধ্যে শামিল নয়।

---

১৩০. সূরা মূলক : আয়াত ১০

৩. আল্লাহ তা'আলা নিজ কালাম শুরু করতে গিয়ে ب কে কার সঙ্গে মিলিয়েছেন? اسم-এর সঙ্গে। কোন اسم-এর সঙ্গে? الله নামক اسم-এর সঙ্গে। লক্ষ করুন, সাধারণত ب কে যখন অন্যান্য ইসমের সঙ্গে মিলানো হয়, তখন তাকে শুইয়ে লেখা হয়; কিন্তু যখন আল্লাহ শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে লেখা হয়, তখন দাঁড় করিয়ে লিখতে হয়। তো ب ছিল শুয়ে। আল্লাহ তার বিনয়কে পছন্দ করলেন। তাই নিজের নামের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দিলেন এবং সেই নামের বরকতে শুয়ে থাকা ب কে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হে মহান প্রতিপালক! ب তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সম্মানিত হলো। সুতরাং যে বান্দা নিজেকে তোমার জাতের সঙ্গে যুক্ত করে দিবে, তাকে তুমি কী পরিমাণ মার্যাদা দান করবে?

৪. এই ب -এর মধ্যে একটি পয়গাম রয়েছে। দেখুন, যেই অক্ষরগুলোতে নুকতা থাকে, সেগুলোর কোনোটি ওপরে, কোনোটি মাঝে এবং কোনোটি নিচে। যেমন– ث-এর নুকতা ওপরে, ج-এর নুকতা মধ্যখানে ও ب-এর নুকতা নিচে। এর মধ্যে আল্লাহর নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য নির্বাচিত হলো কে? ب । আল্লাহ ب -কে নিজের নামের জন্য নির্বাচন করে বোঝালেন, বান্দা! এই নুকতাগুলো হলো দুনিয়ার। ث তাকে নিজের মাথার ওপর বসিয়েছে। তাই তাকে বর্জন করেছি। ج তাকে পেটের মধ্যে বসিয়েছে, তাই তাকেও বর্জন করেছি। আর ب যেহেতু তাকে নিচে বসিয়েছে, তাই তাকে কবুল করে মনোনীত করেছি। অতএব, তোমরাও সারা জীবন দুনিয়াকে নিজের পদতলে রেখো; ب-এর মতো তোমাদেরও আমি সম্মানিত ও মর্যাদাশীল করে দেব। সুবহানাল্লাহ!

সম্মান ও অপমান কীসের ভিত্তিতে আসে?

যে বান্দা ঝুঁকবে, সো সম্মান পাবে আর যে মাথা উঁচিয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা করবে তার ভাগ্যে অপমান জুটবে। এর উদাহরণ এভাবে বুঝুন। মানুষের পা ও মাথার দিকে লক্ষ করুন। মাথা হলো ওপরে আর পা হলো নিচে। তো মানুষ যখন বিনয়ী হয়, অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চায় তখন কী করে? পা ধরে। ফলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে সম্মানিত হয়। পক্ষান্তরে যখন সে অহংকারী হয়, তখন স্বয়ং জুতা পা থেকে খুলে এসে তার মাথায় লাগে; ফলে সে অপমানিত হয়। এতে বুঝে আসে, যখন বান্দা বিনয়ী হবে, তখন সে সম্মানিত হবে; আর সে যখন অহংকারী হবে, তখন অপমানিত হবে।

তাই নিজেকে উঁচু না করা ভালো; বরং বিনয়ী করে রাখা ভালো। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বিনয়কে অত্যন্ত পছন্দ করেন।

গোঁফ ও পলকের মধ্যে বিস্ময়কর দৃশ্য

কেউ-কেউ নিজেদের গোঁফ অনেক লম্বা করে রাখে। দেখুন, যে গোঁফগুলো মুখের ওপর থাকে, সেগুলো একদম ছোট করে কেটে ফেলা উচিত। আর যেগুলো কিনারে থাকে সেগুলো একটু লম্বা রাখার সুযোগ আছে। এই গোঁফ উর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে। আর ভ্রূ নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে। একবার গোঁফ ও পলকের মধ্যে বিতর্ক হলো।

গোঁফ বলল, আমি উন্নত। অর্থাৎ– নিজেকে সে বড় বলে দাবি করে বসল। এভাবে গোঁফ গর্বিত মন্তব্য করতে লাগল আর পলক তার উত্তর দিতে থাকল। অবশেষে গোঁফ বলল, বাহাদুররা নিজের শান প্রকাশকালে আমাকে তাও দেয়। এতে আমার শান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়।

পলক বলল, জনাব! যখন আদব ও ইহতিরামের প্রসঙ্গ আসে, তখন সেখানে পলকের নাম উঠে আসে। বলুন তো, আদব ও ইহতিরামের সময় কেউ কি বলে, আমি গোঁফ ঝুঁকিয়ে দিয়েছি? সবাই তখন পলকের কথাই বলবে, আমি পলক ঝুঁকিয়েছি।

اے باد صبا! کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں

کلیاں نہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں

হে ভোরের হাওয়া! তুমি কিছু বলো; আমার যে অতিথি আসছে!

পুষ্পকলি বিছিয়ো না তার পথে; তার জন্য আমি পলক বিছিয়ে দেব।

গোঁফ বলল, জনাব! আমরা যৌবনের প্রতীক। আমাদের সঙ্গে টেক্কা মারছ!

পলক : তা অবশ্য ঠিক; তবে কেচিও তো আমাদের ওপরই পরিচালিত হয়।

গোঁফ : লোকেরা আমাদের খুব যত্ন করে, আমাদের পাকিয়ে রাখে।

পলক : মানুষের যখন শ্লেষ্মা বের হয়, তখন তোমাদের ওপর পতিত হয়। তো গোঁফের বড় সাজার কারণে এই শাস্তি হলো, তার ওপর ঘৃণিত শ্লেষ্মা পর্যন্ত পড়ে আর আশেকরা তো এটা কেটেই ফেলে। তাই তারা এ থেকে মুক্ত থাকে।

বকরির 'মেঁ-মেঁ-এর রহস্য

বকরি একটা প্রাণী। সে যখন ডাকে, মেঁ-মেঁ করে ডাকে। মেঁ-মেঁ (আমি-আমি) বলে। মূলত সে নিজেকে বড় বলে দাবি করে। আল্লাহ তা'আলা তার এই মেঁ-মেঁ (আমি-আমি) দম্ভোক্তি পছন্দ করেননি। তাকে তিনি মুমিন বান্দার জন্য হালাল করে দিলেন। এরপর মাশাআল্লাহ মুমিন বান্দা তার গলায় ছুরি চালিয়ে, তার শরীর থেকে চামড়া তুলে তাকে টুকরো-টুকরো করে। এরপর আগুনে পাকিয়ে তার গোশত বত্রিশ দাঁতে চাবায় আর খুব মজা করে খায়।

তারপর তার আঁত বেচে গেল। তা রোদে দিয়ে শুকানো হলো। শুকানো আঁতকে তুলাধুনার মেশিনে ব্যবহার করা হয়। মেশিনে বাঁধার পর যখন তাকে টান দেওয়া হয়, তখন সব 'তু-তু' (তুমি-তুমি) শব্দ তুলে চিৎকার করতে থাকে।

এক বুযুর্গ এখানে একটি তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন যে, বকরি মেঁ-মেঁ করত। তার এই মেঁ-মেঁ (আমি-আমি) আল্লাহর পছন্দ হলো না। তিনি তাকে এমন শাস্তি দিলেন যে, তাকে টুকরো-টুকুরো করে আগুনে পাকিয়ে বত্রিশ দাঁতে পিষিয়ে দিলেন। অর্থাৎ– এমন মুহজাহাদা করলেন যে, তার ভেতর থেকে এখন অনিচ্ছায়ই 'তু-তু' (তুমি-তুমি) শব্দ বের হয়ে আসতে লাগল।

হে বান্দা! তুমি নিজেই 'তু-তু' (তুমি-তুমি) করো। যদি তা না করে মেঁ-মেঁ কর, তবে তোমার অবস্থাও সেই বকরির মতো হবে, যে বেশি মেঁ-মেঁ করতে গিয়ে কুরবানির পশু হয়। এমন লোকদের আল্লাহও ভালো ঝাঁকুনি দেন। একপর্যায়ে তারা বলতে বাধ্য হয়, হায়! বাঁচার চেয়ে মরাই তো ভালো ছিল। এজন্য উত্তম হলো, আমরাও মেঁ-মেঁ না করে 'তু-তু' করব এবং স্বীকার করব, আয় আল্লাহ! বড়ত্ব ও অহংকার কেবল তোমাকেই মানায়।

'ময়না' প্রিয় হওয়ার কারণ

একটা পাখি আছে ময়না। তাকে মানুষ ঘরে রাখতে খুব পছন্দ করে। সকাল-সন্ধ্যা তার যত্ন-আত্তি করে। কেন এই যত্ন? কারণ, যখন সে ডাকে, তখন মেঁ-না, মেঁ-না (অর্থাৎ– আমি-না, আমি-না) বলেই ডাকে। আর এর থেকেই তার নাম পড়ে গেছে। 'ময়না'। অর্থাৎ– সে যখন নিজের অস্তিত্বকে নাকচ করে দিল, তখন আল্লাহ তার এই 'না-না'কে পছন্দ করে দামি ও প্রিয় বানিয়ে দিলেন। এর ওপর কোনো কবি ছন্দও বলে ফেললেন–

بکری کرے میں میں، گلے چڑھے پھر اوے

میناں کرے میں ناں-میں ناں، سب کے من کو بھاوے

'বকরি সারাক্ষণ ম্যাঁ-ম্যাঁ করে চিৎকার করতে থাকে

ময়না সর্বদা বলে ম্যাঁ-না, ম্যাঁ-না (আমি না, আমি না)

এভাবে সে সবার মন জয় করে নেয়।'

বলুন তো, আমরা কি যারা 'ম্যাঁ-ম্যাঁ' করে, তাদের দলভুক্ত হব, নাকি যারা 'ম্যাঁ-না, ম্যাঁ-না' করে, তাদের দলভুক্ত হব? ম্যাঁ-না, ম্যাঁ-না যারা করে, তাদের মধ্য থেকে হতে হবে। সুতরাং বান্দার জন্য বিনয় ও নম্রতাই শোভনীয়। বড়ত্ব ও বড়াই সে তো কেবল আল্লাহর জন্যই মানায়। আমরা তো তার সামনে অক্ষম ও মিসকিন বান্দামাত্র। আমরা নিজেদের যতটা ঝুঁকাব ততটাই মঙ্গল।

বিনয় দ্বারা যোগ্যতা তৈরি হয়

মনে রাখবেন, যখন বিনয় এসে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা যোগ্যতাও তৈরি করে দেন। এ-বিয়য়টি একটু ভেবে দেখুন। সায়্যিদুনা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর মধ্যে বিনয় ছিল। তার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সত্য গ্রহণের এমন যোগ্যতা দান করলেন যে, কাফের সরদার আবুজাহ্‌ল যখন মে'রাজের ঘটনা শোনাল, তিনি তাতেই ঈমান নিয়ে এলেন। পক্ষান্তরে আবুজাহ্‌লের মধ্যে ছিল অহংকার। অহংকারের কারণে সে মে'রাজের ঘটনা স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেও ঈমান আনতে পারেনি। কারণ, সত্য গ্রহণের যোগ্যতাই তার ছিল না; তাই তাওফীকও হয়নি। একজন জাহেলদের সরদারের মুখে শুনে মেনে নেয়, অপরজন নবীর মুখে শুনেও মানতে পারে না। কারণ, অহংকার যখন মানুষের মধ্যে এসে যায়, তখন সত্যগ্রহণের যোগ্যতা তার থেকে লোপ পায়।

নমরূদের অহংকার কীভাবে ভাঙল?

নমরূদ বড়ত্বের দাবি করেছিল। দেখছেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে কেমন শাস্তি দিলেন? একটা ক্ষুদ্র মশা, তাও আবার লেংড়া; নাকের মধ্যে চলে গেল। মশাটা যখন মাথার মধ্যে বসে কামড় দিত, তখন তার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হতো। এ-কারণে সে একজন চাকরকে বলল, একটু আমার মাথার

সেবা করো। অর্থাৎ– আমার মাথায় দু-চারটি থাপ্পড় মারো। যখন সে থাপ্পড় মারে, তখন কামড় বন্ধ হয়ে যায়। আবার থাপ্পড় যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন পুনরায় কামড় শুরু হয়ে যায়। সেই মশাটা ছিল দীনের মুজাহিদ। আল্লাহ তা'আলা দীনদারদের থেকে এভাবেই কাজ নিয়ে থাকেন। যখন থাপ্পড় মারনেওয়ালা ক্লান্ত হয়ে গেল, বলল, বাদশাহ নামদার! আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি; আর পারছি না। নমরূদ পেরেশান হয়ে উজিরকে বলল, এখন কী হবে? কেউ তো থাপ্পড়ও মারতে চায় না। উজির বলল, বাদশাহ নামদার! আমার মাথায় একটা সমাধান এসেছে। নমরূদ বলল, কী সেটা বলো। সে বলল, জনাব! আপনার কাছে মানুষ খুব বেশি আসা-যাওয়া করে। তাদের বলুন, তারা যেন আপনাকে সালাম দেওয়ার পরিবর্তে একটা করে থাপ্পড় মেরে চলে যায়। তারপর নমরূদ একেই শাহী কানুন বানিয়ে দিল। দরবারে যে-ই আসত, সালামের স্থলে তাকে একটা করে থাপ্পড় মারা হতো। দেখলেন তো? আল্লাহ তা'আলা কীভাবে তার 'মেঁ' বের করে দিলেন? অহংকারীর পরিণতি এমনই হয়ে থাকে।

তাসাওউফ-এর মৌলিক মাসআলা

তাসাওউফের সারনির্যাসও এটাই যে, নিজের বড়ত্বের অনুভূতি বেরিয়ে যাক এবং আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব অন্তরে বসে যাক। যে এটা বুঝে নিল, সে তাসাওউফের পূর্ণ পরিচয় পেয়ে গেল। এরপর তো সে 'মেঁ' (আমি)ওয়ালা কথা শুনতে পারবে না। সে আল্লাহর, বিনয়ী বান্দা হয়ে থাকবে। এক কবি বলেন–

یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں
اس پر ہے مجھ کو ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں
کچھ ہونا میرا ذلت وخواری کا سبب ہے
یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

'এ হলো অন্তরের কথা যে, আমি কিছুই নই।
এ নিয়ে আমার গর্ব হয়, আমি কিছুই নই।
কিছু হওয়াই তো আমার অপমান ও অধঃপতনের মূল কারণ।
এটা আমার মর্যাদার রহস্য যে, আমি কিছুই নই।'

এই উপদেশটি অন্তরে গেঁথে নিন যে, আমাদের মর্যাদা একথার মধ্যেই যে, আমি কিছুই নই। অন্যথায় আজকাল তো মানুষ স্বপ্ন দেখেই নিজের ব্যাপারে সুধারণায় থাকে। হ্যাঁ জনাব! আমি স্বপ্নে নিজেকে অমুক মর্যাদার আসনে দেখেছি। অথচ নিজের আমল-আখলাক চোখের সামনে থাকে না। এখন নিজেদের স্বপ্নের কারণেই নিজেদের কামেল মানুষ মনে করে বসে আছে।'

সাহাবায়ে কেরামের বিনয়

বিনয়ের এই শিক্ষা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সাহাবায়ে কেরামও গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যেও পূর্ণ বিনয় ছিল। যেমন–

১. হযরত ওমর (রাযি.) দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ صَغِيْرًا وَّ فِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

'হে আল্লাহ! আমাকে আমার দৃষ্টিতে ছোট বানিয়ে দিন আর মানুষের চোখে বড় বানিয়ে দিন।'

কারণ, বান্দা যদি মানুষের চোখেই ছোট হয়ে যায়, তা হলে তারা দ্বীনি কথাবার্তাগুলো মেনে নেবে না; তারা তো এর আহ্বানে সাড়া দেবে না। মানুষ তো তাকেই শ্রদ্ধা করে, তার কথা মানে, যাকে সে বড় মনে করে। যাহোক, একজন দাঈর জন্য এখানে শিক্ষা রয়েছে। যদি তারা একে মূল্যহীন মনে করে, তা হলে তার কথা কীভাবে মেনে নেবে। তাই হযরত ওমর (রাযি.) এভাবেই দু'আ করতেন।

২. হযরত আলী (রাযি.)কে কেউ প্রশ্ন করল, জনাব! আপনি কে?

তিনি উত্তর দিলেন, আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষ।

বলেননি–

আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাই।

আমি যুগের খলীফা।

আমি খায়বারবিজেতা আলী।

আমি হায়দার।

বরং যখন নিজের পরিচয় দিলেন, তখন বললেন, আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষ। এর নাম বিনয়।

আল্লাহওয়ালাদের বিনয়

স্মরণ রাখবেন, এটা কখনোই বিনয় নয় যে, কাজকর্ম অহংকারীর মতো আর মুখে নিজেকে ছোট বলে দাবি করে। একে বিনয় বলা হয় না। তবে যদি অন্তরে নিজেকে ছোট মনে করে এবং অন্যদেরকে নিজের চেয়ে বড় মনে করে, তখন সেটি হবে প্রকৃত বিনয়। আর এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতও পাওয়া যাবে।

زمیں کی طرح جس نے عاجزی وانکساری کی

خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسماں ہو کر

'মাটির মতো যে বিনম্র ও বিনয়ী হলো

আল্লাহর রহমত তাকে আসমান হয়ে ঢেকে নিবে।'

এক কবি বিনয়ের ওপর আজব ছন্দ বলেছেন–

جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں

صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ

'যারা আল্লাহওয়ালা হন, তারা সর্বদা ঝুঁকে (বিনয়ী হয়ে) থাকেন। (কারণ) কলসি তো মাথা নিচু করেই শূন্য পাত্রকে ভরে দেয়।'

কলসির মাথা যখন নিচের দিকে ঝোঁকে, তখনই নিচের শূন্য পাত্রে পানি পড়ে, না ঝুঁকলে তো পানি পড়বে না।

تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگو صراحی سے

کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی

'বিনয়ের পদ্ধতি শিখে নাও কলসি থেকে হে লোকসকল!

ফয়েজও জারি আছে, আবার গর্দানও ঝুঁকে আছে।'

একেই বলে বিনয়। একেই বলে নিজেকে ছোট মনে করা।

ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর বিনয়

ইমাম আযম (রহ.)-এর মধ্যে খুব বিনয় ছিল। তাঁর আম্মাজান সর্বদা হযরত আবুযুরআহ (রহ.) (যিনি একজন মুহাদ্দিছ ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন)-এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য যেতেন। প্রয়োজন হলেই তিনি

বলতেন, আমাকে আবুযুরআর কাছে নিয়ে চলো, আমি মাসআলা জিজ্ঞাসা করব। ইমাম সাহেব তাঁকে উটে বসিয়ে সেখানে নিয়ে যেতেন। ইমাম সাহেবের আম্মাজান বার্ধক্যের কারণে কানে একটু কম শুনতেন। তাই তাকে একটু উঁচু আওয়াজে মাসআলা শোনাতে হতো। ইমাম আবুহানীফা (রহ.) নিজেই আবুযুরআহ (রহ.)কে বলতেন, জনাব আমার আম্মাজান আপনার কাছে একটি মাস্আলা জানতে চান। আবু যুরআহ (রহ.) বলতেন– জনাব! মাসআলাটি আপনিই বলে দিন। ইমাম সাহেব সমাধান বলে দিলে তিনি একে উঁচু আওয়াজে তাঁর আম্মাজানকে শুনিয়ে দিতেন। ইমাম সাহেব জীবনভর এমনটি করে গেছেন। কখনো মাকে বুঝতে দেননি, মা! আপনার আস্থাভাজন মুফতী হযরত আবুযুরআহ তো আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেই উত্তর দেন। তাঁর ধারণা এমনই ছিল যে, আমার আম্মাজান তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করেই প্রশান্তি লাভ করেন। তার কণ্ঠের আওয়াজ শুনে তিনি তৃপ্তি পান। এজন্য তিনি এই বিষয়টি সারা জীবন গোপন রেখেছেন। আর তার এই বিনয়কে আল্লাহ তা'আলা এত পছন্দ করলেন যে, তাকে সারা দুনিয়ায় 'ইমামে আযম' নামে প্রসিদ্ধি দান করলেন।

দাসত্ব বর্জন ও লালন পদ্ধতি

একবার হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সঙ্গে খুব বিস্ময়কর একটি কথা বললেন–

قَالَ مُوْسٰى: اِلٰهِىْ اَتَرْزُقُ فِرْعَوْنَ وَهُوَ يَدَّعِىْ الرَّبُوْبِيَّةَ

'হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি ফেরাউনকে রিযিক দিচ্ছেন; অথচ সে রব হওয়ার (লালনকারী হওয়ার) দাবি করে।'

فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ

এরপর আল্লাহ তার কাছে ওহী পাঠালেন–

يَا ابْنَ عِمْرَانَ! لَوْ تَرَكَ فِرْعَوْنُ الْعُبُوْدِيَّةَ مَا اَتْرُكُ الرُّبُوْبِيَّةَ

'হে ইমরানের পুত্র! ফেরাউন আমার দাসত্ব পরিত্যাগ করলেও আমি কিন্তু তাকে লালন করা পরিত্যাগ করব না।' (আমি তাকে রিযিক দিতে থাকব)

চিন্তা করুন! যে-পালনকর্তা নিজের এমন অবাধ্য শত্রুকেও রিযিক দিচ্ছেন, তিনি কী করে নিজের অনুগত গোলামদের রিযিক না দিয়ে থাকতে পারেন?

বিনয়ের সাথে হাত পাতুন

আমাদের উচিত, আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব হৃদয়ে ধারণ করে তার সামনে ভিক্ষার হাত পেতে ধরি এবং খাঁটি মনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। তাঁর ভালো-ভালো নামগুলো উচ্চারণ করে, তাঁর বড়ত্ব প্রকাশ করে, তার গুণগান ও প্রশংসা করে খাঁটি মনে আমরা যাই চাইব, অবশ্যই আল্লাহ আমাদের ফরিয়াদ কবুল করবেন।

স্মরণ রাখবেন, পৃথিবীতে যার কাছে সম্পদ থাকে, তার ব্যাপারে যদি কেউ একথা বলে যে, আমি তার ঘরে ভিক্ষার জন্য গিয়েছিলাম; কিন্তু কিছুই পাইনি, তা হলে সে এটা কিছুতেই পছন্দ করবে না। দুনিয়ার কোনো ধনীই ফকিরের মুখে এমন অভিযোগ সহ্য করে না; বরং বলে, ভাই! যা মন চায় নিয়ে যাও। চিন্তা করুন। যদি দুনিয়ার ধনীরা এমন কথা সহ্য করতে না পারে, তা হলে সব ধনীর মহাধনী মহান আল্লাহ কীভাবে কোনো বান্দার এ অভিযোগ সহ্য করবেন যে, হে আল্লাহ! দুনিয়ায় আমি আপনার দরবারে প্রার্থনা করেই গেছি, ভিক্ষা চেয়েই গেছি; কিন্তু কখনো তা কবুল করা হয়নি? এ-কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সকল দু'আ কবুল করেন। হয়তো দুনিয়ায় তা পূরণ করে দেন, না হয় এর বদলে কোনো বিপদ দূর করে দেন অথবা কেয়ামতের দিন এর পরিবর্তে ছাওয়াব দান করবেন।

হাদীছে এসেছে, বান্দা যখন সেই ছাওয়াব দেখবে, তখন বলে উঠবে, হে আল্লাহ! যদি দুনিয়াতে আমার কোনো দু'আই কবুল না হতো, সকল দু'আ জমা করা হতো এবং আজ এই কেয়ামতের দিনে সেই দু'আগুলোর ছাওয়াব দেওয়া হতো, তা হলে কতই-না ভালো হতো। সুতরাং আল্লাহ যখন এতই করুণাময়, তা হলে আসুন, আমরা নিজেদেরকে তার সামনে ঝুঁকিয়ে দেই। যখনই কোনো বিপদ আসবে, পেরেশানি দেখা দিবে অথবা কোনো দুশ্চিন্তা দেখা দিবে, সঙ্গে-সঙ্গে দু-রাকাত নফল নামায পড়ে দু'আ করুন, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করুন।

আমরা যতটা বিনয় প্রকাশ করব, যতটা আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব বর্ণনা করব, আল্লাহ আমাদের প্রতি ততটা করুণা করবেন। আল্লাহ আমাদের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং আমাদের অন্তরে তাঁর আযমত বসিয়ে দিন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

মহব্বতের কারণসমূহ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু'।

উচিত ছিল এভাবে বলা যে, ঈমানদাররা ঈমান এনে আল্লাহর বন্ধু হয়ে গেছে। কিন্তু-না, আল্লাহ তা'আলা মহব্বতের নেসবত নিজের দিকে করে বলেছেন, 'আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু'।

এ থেকে অনুমান করুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কত ভালোবাসেন। এখন এই মহব্বতের প্রতিউত্তরে আমাদেরও ভালোবাসার প্রমাণ রাখতে হবে। আমাদের মধ্যেও আল্লাহর প্রেম থাকতে হবে। খোদাপ্রেমের উষ্ণতা ও প্রচণ্ডতা আমাদের অন্তরগুলোতেও অনুভূত হতে হবে।'

মহব্বতের কারণসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

আল্লাহর ব্যক্তিগত মহব্বত ও ব্যক্তিগত দুশমনি

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'এবং যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'[১৩১]

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত মানুষকে তাঁর পরিপূর্ণ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে দুটি শ্রেণি রয়েছে। তিনি বলেন–

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ

'(আল্লাহ তিনি) যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের আবার কেউ মুমিন।'[১৩২]

যে ঈমান আনে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন আর যারা কুফরি করল, তারা আল্লাহর ব্যক্তিগত শত্রু। একথাটা অন্তরে ভালোভাবে বসিয়ে নিন যে,

---

১৩১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

১৩২. সূরা তাগাবুন : আয়াত ২

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত ঈমানদারদের ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসেন এবং কুফর ও কাফেরদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দুশমনি রাখেন। এ-কারণেই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের আদেশ করেছেন, তোমরা কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না; অন্যথায় আমি তোমাদের হাশর-নশর তাদের সঙ্গে করে দেব। হাদীছে এসেছে–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে কোনো কওমের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হয়।'

কাফেরদের সাদৃশ্যের কারণে শাস্তি

ইন্ডিয়ায় এক বয়স্ক লোক ছিল। সে মারা গেল। কেউ একজন তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কী অবস্থা আপনার? সে বলল, আমি কঠিন শাস্তিতে নিপতিত আছি। সে প্রশ্ন করল, কী কারণে? বলল, একবার হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হুলির দিন ছিল। তারা উৎসবের দিন পরস্পরে রং ছড়াছড়ি করছিল। আমি আমার ঘর থেকে অন্য কোথাও যাচ্ছিলাম। মুখে পান ছিল। সামান্য থুতু ফেলার প্রয়োজন দেখা দিল। ঘটনাক্রমে সেখানে একটা গাধা সামনে পড়ল। আমার মনে তখন কিছুটা রসিকতা কাজ করছিল। আমি গাধাকে বললাম, আরে বেচারা গাধা! তোকে কেউ রং মারে না। আয়! আমি তোকে রাঙিয়ে দেই। এই বলে আমি আমার পানের লাল পিচকি তার গায়ে ফেললাম। আল্লাহ তা'আলা আমার এই কাজটা অপছন্দ করে আমাকে ধরে বসলেন। বললেন, 'তুই কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করেছিস; তোকে শাস্তি পেতে হবে। তারপর আমার কবরকে জাহান্নামের গর্ত বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

ঈমানদারদের সঙ্গে আল্লাহর ব্যক্তিগত মহব্বতের প্রমাণ

কেউ একজন হযরত বায়জিদ বোস্তামি (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করল, 'হযরত! আল্লাহ তা'আলা ঈমাদনদারদের ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসেন এর প্রমাণ কী? তিনি বললেন, ভালোবাসার নিদর্শন হলো, প্রেমিক তার প্রিয়তমকে যত কিছুই দিক, সে তাকে সামান্যই মনে করে। আর প্রিয়তম যখন তাকে সামান্য কিছুও দেয়, তখন সে তাকে অনেক বেশি মনে করে।'

একথা শুনে সে বলল, কথা তো যৌক্তিক; নিয়ম তো এটাই। তারপর পুনরায় হযরত বললেন, কুরআনে কারীমের দিকে দৃষ্টি দাও। আল্লাহ

তা'আলা মানুষকে কত নেয়ামত দান করেছেন। আমরা যদি সেগুলো গণনা করতে চাই, তা হলে কখনো গুনে শেষ করতে পারব না। এত কিছু দেওয়ার পর তিনি বলছেন–

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

'হে নবী! আপনি বলে দিন, দুনিয়ার নায-নেয়ামত অতি সামান্য।'[১৩৩]

যখন তার বিনিময়ে মুমিন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করল; অথচ মুমিন বান্দার জীবনও সীমিত, তার আমলও সীমিত; কিন্তু ভালোবাসা ছিল, তাই মুমিনের এই 'আল্লাহ স্মরণ'কে আল্লাহ এত বেশি পছন্দ করলেন যে, বললেন–

وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ

'এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ এবং অধিক স্মরণকারী নারী।'[১৩৪]

অর্থাৎ– আল্লাহ বান্দাদের সীমাহীন নেয়ামত দান করেও বলেছেন কমই দিয়েছি। আর প্রিয় বান্দার সামান্য যিকির ও স্মরণ করাকেও বলছেন, 'বান্দা আমাকে অনেক স্মরণ করেছে।' সুবহানাল্লাহ! এটি আল্লাহর ব্যক্তিগত মহব্বতের প্রমাণ। তিনি আরো বলেন–

اَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু'।[১৩৫]

উচিত ছিল এভাবে বলা যে, ঈমানদাররা ঈমান এনে আল্লাহর বন্ধু হয়ে গেছে। কিন্তু না, আল্লাহ তা'আলা মহব্বতের নেসবত নিজের দিকে করে বলেছেন- 'আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু'।

এ থেকে অনুমান করুন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কত ভালোবাসেন। এখন এই মহব্বতের প্রতিউত্তরে আমাদেরকেও ভালোবাসার প্রমাণ রাখতে হবে। আমাদের মধ্যেও আল্লাহর প্রেম থাকতে হবে। খোদা প্রেমের উষ্ণতা ও প্রচণ্ডতা আমাদের অন্তরগুলোতেও অনুভূত হতে হবে।

---

১৩৩. সূরা নিসা : আয়াত ৭৭
১৩৪. সূরা আহযাব : আয়াত ৩৫
১৩৫. সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৭

মহব্বতের কারণসমূহ

ওলামায়ে কেরাম বলেন, মহব্বত, ভালোবাসার কতক কারণ রয়েছে– এর নিদর্শন নিম্নে বর্ণিত হলো–

১. রূপ ও সৌন্দর্য : মানুষ সুন্দর কিছু দেখলেই তাকে ভালোবাসতে থাকে। চাই তা ব্যক্তির সৌন্দর্য হোক অথবা স্থাপত্যের সৌন্দর্য অথবা পোশাকের সৌন্দর্য হোক কিংবা কোনো দৃশ্যের সৌন্দর্য হোক। যে-বস্তুর মাঝেই সৌন্দর্য থাকবে, মানুষের অন্তর অটোমেটিক সেদিকে আকর্ষিত হবে। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের সৌন্দর্যের অনুমান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হাদীছে কুদসীতে আছে–

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

'আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।'

চিন্তার বিষয় হলো, যিনি সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি স্বয়ং কী পরিমাণ সৌন্দর্যের মালিক হবেন?

জান্নাতের আলোচনা করতে গিয়ে ওলামায়ে কেরাম একটি বিস্ময়কর তত্ত্ব লিখেছেন যে, জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করে যখন সেখানকার হুর-গেলমানদের দেখবে, তখন তাদের রূপ-সৌন্দর্য দেখে হতবাক হয়ে যাবে এবং সত্তর বছর যাবৎ অপলক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়েই থাকবে। এরপর সেখানকার যিন্দেগি শেষ হওয়ার পর একটা সময় আসবে, যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতিদের তাঁর দিদার নসিব করিয়ে ধন্য করবেন। হাদীছে এসেছে, সেই দিদার এমন হবে, যেমন চাঁদকে মানুষ দেখে। সবাই নিজের স্থান থেকে দেখবে, কারো কারণে কারো সমস্যা হবে না। সেই দিদার দিকহীন, অবস্থানহীন, সন্দেহমুক্ত ও উপমাহীন হবে।

কিন্তু যখন আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের দিদার হবে, তখন নূরের বারিধারা বর্ষাবে। সেই নূর বর্ষণে সিক্ত হয়ে জান্নাতিরা আপাদমস্তক নূরের আবরণে ঢেকে যাবে। মরুভূমিতে যখন ধূলিঝড় শুরু হয়, তখন ঘরের বাইরে দণ্ডায়মান ব্যক্তির গায়ের চাদরে যেমন বালির আবরণ পড়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে জান্নাতিরা যখন আল্লাহর দিদার লাভ করবে, তখন তাদের ওপর নূরের বর্ষণ হবে এবং নূরের আবরণে ঢাকা পড়ে তাদের রূপ ও সৌন্দর্য এত বেশি বেড়ে যাবে যে, তারা যখন নিজ-নিজ ঘরে ফিরবে, তখন তাদের সেবক হুর-গেলমানরা সত্তর বছর ধরে অপলক দৃষ্টিতে তাদের সৌন্দর্য দেখতে থাকবে। যতই দেখবে, ততই ভালো লাগবে– মন ভরবে না। সুবহানাল্লাহ!

এবার চিন্তা করুন! আল্লাহর দিদারপ্রাপ্ত জান্নাতিরা শুধু দিদারের কারণে যদি এত সৌন্দর্যের মালিক হয়ে যায়, তাহলে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের সৌন্দর্য কী পরিমাণ হবে অনুমান করতে পারবেন?

এ-কারণেই এই পৃথিবীতে

যে-পরিমাণ আল্লাহকে চাওয়া হয়েছে,

যে-পরিমাণ আল্লাহকে ভালোবাসা হয়েছে,

যে-পরিমাণ নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়েছে,

যে-পরিমাণ উদাসিন আল্লাহর জন্য হয়েছে,

যে-পরিমাণ কপাল ঘষা আল্লাহর সামনে হয়েছে,

যে-পরিমাণ তাঁর সামনে হাত পাতা হয়েছে,

যে-পরিমাণ অন্তরের কথা তাকে বলা হয়েছে,

যে-পরিমাণ জীবন তার নামে উৎসর্গ হয়েছে,

এমন অন্য কারো সাথে করা হয়নি। পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় কোনো সত্তা নেই, যার সঙ্গে এতটা সম্পর্ক মানুষ গড়েছে। এ কেবল আল্লাহরই শান, কেবল তাঁরই কৃতিত্ব।

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے

اسکے زلفوں کے سب اسیر ہوئے

'আমরা হয়েছি, তোমরা হয়েছ, মীরও হয়েছে

সবাই তার (মেঘ) কালো চুলের বন্দি হয়েছে।'

সবাই আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের প্রেমিক। যদি রূপ-সৌন্দর্যের বিচার করা হয়, তা হলে আল্লাহ তা'আলাই বান্দার ভালোবাসা পাওয়ার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত।

২. যোগ্যতা ও দক্ষতা : মহব্বত করার দ্বিতীয় কারণ হলো যোগ্যতা ও দক্ষতা। যদি কোনো ব্যক্তি বিশেষ কোনো অঙ্গনে দক্ষ ও যোগ্য হয়, তা হলে মানুষ তাকে ভালোবাসে। আপনারা হয়তো দেখেছেন, ক্রিকেট খেলে এমন ছোট-ছোট শিশুরা বড়-বড় খেলোয়াড়দের নাম নিয়ে ঘোরাফেরা করে। তারা তাদের দেখেনি; নাম শুনেছে। শুধু নাম শুনে তারা সেই খেলোয়াড়কে এত ভালোবাসে যে, তাদের ছবিআঁকা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে চলাফেরা করে। তারা এমন করে কেন? তাদের কৃতিত্ব ও যোগ্যতার কারণে। এমনিভাবে আমরা

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)কে দেখিনি।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)কে তো দেখিনি।

হযরত ওছমান (রাযি.)কে দেখিনি।

হযরত আলী (রাযি.)কে দেখিনি।

তবে আমরা তাদের যোগ্যতা ও খোদাভীরুতা সম্পর্কে শুনেছি। আমরা না দেখেও তাদের এত ভালোবাসি, যতটা-না মা-বাবাকে ভালোবাসি। সুতরাং বোঝা গেল, মানুষের মধ্যে যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণেও জনগণ তাকে ভালোবাসে।

আল্লাহর কামাল ও যোগ্যতা নিয়ে আর কী-ইবা বলা যেতে পারে। স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারব না। আপনার শান তেমন, যেমনটি আপনি নিজের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন।'

আবার আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা কীভাবে বর্ণনা করেছেন? কুরআন মাজীদের দিকে তাকান। ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا

'হে নবী! বলে দিন, যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের পানিগুলোকে কালি বানানো হয় এবং তা দিয়ে আপনার রবের প্রশংসা লেখা শুরু করা হয়, তাহলে কালি শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু আপনার প্রভুর প্রশংসা লেখা শেষ হবে না।'[১৩৬]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ

'হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি পৃথিবীর সমস্ত গাছ দিয়ে কলম তৈরি করা হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয় এবং এর দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা লেখা শুরু করে, তবে কলমও শেষ হয়ে যাবে,

---

১৩৬. সূরা কাহাফ : আয়াত ১০৯

কালিও ফুরিয়ে যাবে; কিন্তু আপনার রবের প্রশংসা লিখে শেষ করা যাবে না।'[১৩৭]

এমন মহান রবের প্রশংসা লিখে কে শেষ করতে পারবে? যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা হয়, তা হলে অন্তর নির্দ্বিধায় সাক্ষ্য দেবে, যদি মহব্বত করতে হয়, তা হলে একমাত্র আল্লাহর সঙ্গেই করা যায়। তিনিই একমাত্র এর প্রকৃত হকদার।

৩. সম্পদ ও প্রাচুর্যের কারণে মহব্বত হয় : ভালোবাসার তৃতীয় কারণ সম্পদ। আপনারা হয়তো দেখেছেন, কোনো ধনী লোক যখন কাউকে তার ভিজিটিং কার্ড প্রদান করে, তো সে একে তাবিজের মতো পকেটে পুরে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে আর মানুষকে দেখায়, দেখো, আমার অমুক আত্মীয় মন্ত্রী, অমুক আত্মীয় কোটিপতি। লোকেরা তার সম্পদ ও প্রাচুর্যের কারণে তার সাথে আত্মীয়তা নিয়ে গর্ব বোধ করে। তা হলে এবার আল্লাহ তা'আলার সম্পদ ও প্রাচুর্য নিয়ে ভাবুন। তিনি নিজেই ইরশাদ করছেন–

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمَاتِ وَالْاَرْضِ

'আসমান-জমিনের সকল সম্পদ একমাত্র আল্লাহর জন্য।'[১৩৮]

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

'(আল্লাহ বলেন), পৃথিবীর কোনো বস্তু এমন নেই, যার ভান্ডার আমার কাছে নয়, আমি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণমতো নাযিল করে থাকি।'[১৩৯]

তো আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের ধনভান্ডারও সীমাহীন। যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা হয়, তাহলেও অন্তর ফয়সালা করবে, যদি ভালোবাসতে হয়, তাহলে কেবল আল্লাহকে বাসতে হবে– অন্য কাউকে নয়।

৪. ইহসান তথা অনুগ্রহ : মহব্বত ও ভালোবাসার চতুর্থ কারণ হলো অনুগ্রহ বা করুণা। দেখা যায়, মানুষ তার উপকারী ও অনুগ্রহকারীকে স্বভাবগতভাবেই ভালোবাসে। মানুষ তো মানুষ; প্রাণীরাও তার অনুগ্রহকারীর প্রতি মহব্বত রাখে।

---

১৩৭. সূরা লুকমান : আয়াত ২৭

১৩৮. সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ৮

১৩৯. সূরা হিজ্‌র : আয়াত ২১

আরবি ভাষায় প্রবাদ আছে–

اَلْاِنْسَانُ عَبْدُ الْاِحْسَانِ

'মানুষ হলো অনুগ্রহের দাস।' (তাকে ভালোবাসে)

এবার ভেবে দেখুন, আমাদের ওপর আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের কত অনুগ্রহ! আমরা কখনো সেই অনুগ্রহ গণনা করে শেষ করতে পারব না। আমাদের নিকট যা কিছুই আছে, তা আমাদের নিজস্ব কিছু নয়; এসবই আমাদের সৃষ্টিকর্তার করুণা ও ইহসান।

সম্মানিত উপস্থিতি!

যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দৃষ্টিশক্তি না দিতেন, তা হলে আমরা অন্ধ থাকতাম,

বাকশক্তি না দিলে বোবা হতাম,

বুদ্ধি-বিবেক না দিলে পাগল হতাম,

সুস্থতা না দিলে অসুস্থ থাকতাম,

হাত-পা না দিলে লেংড়া-লুলা হতাম,

ইয্যত না দিলে বে-ইয্যত হতাম,

সন্তানাদি না দিলে নিঃসন্তান হতাম।

বোঝা গেল, আমরা যে ইয্যত-সম্মানের সাথে, স্বচ্ছলতা ও সুস্থতার সাথে জীবন যাপন করতে পারছি, এ কেবল আমাদের রবের অনুগ্রহের কারণেই হচ্ছে; অন্যথায় হতো না।

আল্লাহর অনুগ্রহের একটি উদাহরণ

আমরা তো আমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহে ডুবে আছি। সেগুলোর অনুমান করুন এভাবে যে, মানুষের মস্তিষ্ক হতে সারা শরীরে সংকেত পৌঁছানোর জন্য যে-ওয়ারিং করা হয়েছে, তা এত নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে, প্রতিটা তার অপর তার থেকে পৃথক। ইংরেজিতে একে Nerve (রগ) বলে। কারেন্টের তার দেখবেন; অনেকগুলো একটার সাথে আরেকটা লেগে থাকে; কিন্তু তারপরও সেগুলো পৃথক। এমনিভাবে শরীরের স্নায়ুতন্ত্র তথা রগগুলোও একটি অপরটি সাথে মিশে থেকেও পৃথক থেকেই শরীরের কাজ করে যাচ্ছে। এই ওয়ারিং এত লম্বা-লম্বা তার দিয়ে করা হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা বলেন, যদি একজন মানুষের সমস্ত রগ বের করে একটার সঙ্গে

আরেকটাকে গিট দিয়ে বাঁধা হয়, তা হলে এত লম্বা রশি হবে যে, সারা পৃথিবীকে দুবার প্যাঁছানো যাবে। এত দীর্ঘ ওয়ারিং একজন বান্দার দেহের মধ্যে করা হয়েছে। এই তারসমূহের কোনো একটিতে যদি গোলযোগ দেখা দেয়, তা হলে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করা ছেড়ে দেয়।

এ আল্লাহর কত বড় অনুগ্রহ যে, আমাদের প্রতিটি নার্ভ তথা স্নায়ুতন্ত্র যথাযথভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং সুস্থতার সাথে আমরা বেঁচে আছি। জীবনভরও যদি সেজদায় পড়ে থাকি, তবুও আল্লাহর এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে না। তো এই অনুগ্রহ ও করুণার দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি ভাবা হয়, তখন অন্তর সাক্ষ্য দেয়, 'হে বান্দা! খাঁটি মহব্বত তো একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। তুমি এখানে অন্য কাউকে স্থান দিয়ো না।

মহব্বতে ইলাহীর প্রচণ্ডতাই কাম্য

একথা আল্লাহও বলছেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'ঈমানদাররাই আল্লাহকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসে।'

এখানেই যে اَشَدُّ শব্দটি রয়েছে, তা আমাদেরকে কিছু বলছে। 'মহব্বত' আর 'প্রচণ্ড মহব্বত' এক জিনিস নয়। আল্লাহর প্রতি ঈমানদার লোকদের মহব্বত সাধারণ কাম্য নয়; বরং প্রচণ্ড মহব্বতই কাম্য। সাধারণ মহব্বত তো সবার সঙ্গেই হয়– সম্পদের সঙ্গে, সন্তানাদির সঙ্গে, স্ত্রীর সঙ্গে, বাবা-মা, পীর-ওস্তাদ সবার সঙ্গে। এটি তো একটি স্বভাবজাত বিষয়। আল্লাহ তা'আলা সেই মহব্বতকে নিষেধ করেননি। তবে এদের সঙ্গে মহব্বতের প্রচণ্ড মাত্রাটা নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, 'প্রচণ্ড মহব্বত' কেবল আল্লাহর সঙ্গেই হওয়া চাই এবং এমনটিই হতে হবে। অন্যথায় ঈমান কামেল হবে না। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ

'হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমাদের পিতা-মাতা, ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন, স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন এবং তোমাদের গচ্ছিত সম্পদ, তোমাদের ওই

ব্যবসা যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছ। ওই ঘরবাড়ি, যা নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট, যদি তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি পছন্দনীয় হয়, তা হলে অপেক্ষা করো; শীঘ্রই আল্লাহর হুকুম চলে আসবে।'[১৪০]

উল্লিখিত আয়াত থেকে বোঝা গেল, দুনিয়ার সব কিছু এমনকি পরিবার-পরিজন, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুর চেয়ে যদি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে বেশি ভালোবাসা না হয়, তা হলে আমাদের পাকড়াও করা হবে।

তাই আল্লাহর মহব্বত সব কিছুর চেয়ে বেশি হতে হবে। সবার সঙ্গে মহব্বত তো থাকবে; কিন্তু আল্লাহর দিকে ছুটে যাওয়ার যখন সময় হবে, তখন সব কিছুর মহব্বতকে পদদলিত করে সামনে এগিয়ে যাবে। যদি এসব বস্তুর মহব্বত আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে হে মুমিন! সেই মহব্বতগুলোকে লাথি মেরে এক পাশে ফেলে রাখো এবং তোমার প্রভুর দিকে ছুটে চলো; সেটাই তোমার গন্তব্য। কোনো বান্দা যখন আল্লাহকে প্রচণ্ডভাবে মহব্বত করে, 'আল্লাহও তখন তাকে অনেক মহব্বত করেন। সুবহানাল্লাহ! এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে এমন-এমন খোদাপ্রেমিক অতিক্রম করেছেন, যাদের ঘটনা পড়ে বড়ই আশ্চর্য হতে হয়।

প্রিয়তমের নামে জীবনের নিলাম তোলা

সায়্যিদুনা হযরত ইবরাহীম (আ.) একবার বকরি চরাতে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন, একব্যক্তি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এই বাক্যগুলো বলছিল–

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ

'আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সাম্রাজ্য ও ক্ষমতার অধিকারীর (অর্থাৎ– আল্লাহর জন্যে), আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি মর্যাদা, প্রতাপ ও মহান শক্তির অধিকারীর।'

যখন সে এই মায়াবী ঢঙে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করল, ইবরাহীম (আ.) থেমে গেলেন। তাঁর অন্তর আল্লাহর প্রেমে উথলে উঠল। তিনি আগন্তুককে বললেন, ভাই বাক্যগুলো পুনরায় একটু শোনাও তো! সে বলল,

---

১৪০. সূরা তাওবা : আয়াত ২৪

বিনিময়ে কী দেবেন? তিনি বললেন, পালের অর্ধেক বকরি আপনাকে দিলাম। এরপর সে বাক্যগুলো আরেকবার বলল, এবার শুনে অন্তরে খোদাপ্রেমের অগ্নি জ্বলে উঠল। মন চাইল, আবার শুনি। তাই পুনরায় বললেন, হে ভাই! একবার এই বাক্যগুলো আবার শুনিয়ে দাও। সে বলল, এবার কী দেবেন? তিনি বললেন, অবশিষ্ট বকরির পালটি তোমায় দিয়ে দেব। সে পুনরায় বাক্যগুলো উচ্চারণ করল। শুনে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অন্তর আরো বেশি উথলে উঠল। তিনি বললেন, ভাই! দয়া করে পুনরায় বাক্যগুলো আরেকবার উচ্চারণ করো। পথিক বলল, এখন তো আপনার কাছে দেওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই। তিনি বললেন, আমার মন চায়, আমার রবের প্রশংসাবাণী এভাবেই উচ্চারিত হতে থাকুক। সে বলল, ঠিক আছে, বাক্যগুলো না হয় আবার বললাম; কিন্তু এবার দেবেন কী? তিনি উত্তর দিলেন, দেখেন, আমার কাছে বকরি তো আর নেই; সব তো আপনাকে দিয়েই দিয়েছিল। কিন্তু বকরিগুলো চরানোর জন্য একজন রাখাল তোমার অবশ্যই লাগবে। বন্ধু আমার! আমি তোমার বকরিগুলো চরিয়ে দেব; তুমি আরেকবার বাক্যগুলো উচ্চারণ করো।

এবার পথিক আত্মপ্রকাশ করে বলল, হে আল্লাহর দোস্ত ইবরাহীম। আপনার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি একজন ফেরেশতা। আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন যে, যাও! আমার খলীলের নিকট গিয়ে আমার নাম বলে দেখো, সে আমার নামের নিলাম কত দামে তোলে। আমার পরীক্ষা হয়ে গেছে। বকরিগুলো আপনারই থাকুক। সালামুন আলাইক। বোঝা গেল, যাদের অন্তরে আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের ভালোবাসা রয়েছে, তারা আল্লাহর নামে এভাবেই নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। প্রয়োজনে নিজের জানকেও আল্লাহর নামে কুরবানি করে দেন।

সত্য হলো, হক আদায় হয়নি

দুজন তাবেঈ। একবার তাদের এক খ্রিষ্টান বাদশাহ বন্দি করল। সে তাদেরকে বলল, হয় আমাদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করো; অন্যথায় তোমাদের উভয়কে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করা হবে। তারা বলল, তোমার যা ইচ্ছে হয় করো; আমরা আমাদের ঈমান থেকে এক চুলও নড়ব না। সে তাদের একজনকে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করল। দ্বিতীয়জনের দিকে তাকিয়ে দেখল, সে কাঁদছে; তার চোখে পানি। বাদশাহ ভাবল, এবার মনে হয় ভয় পেয়েছে। তাই প্রস্তাব দিয়ে বলল, ঠিক আছে, যদি তুমি আমার কথা মেনে নাও, তা

হলে তোমাকে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করব না। তখন ওই তাবেঈ বললেন, আরে বেকুব কোথাকার! তুমি কি ভেবেছ, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি। বাদশাহ বলল, তা হলে কেন কাঁদছ? তিনি বললেন, আমার কান্না এজন্য এসেছে যে, আমার তো শুধু একটি জীবন আছে; একবার ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপের সাথে-সাথেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমার যদি শরীরের পশম পরিমাণও জীবন থাকত, তা হলে প্রতিটি জীবন আমার রবের নামে কুরবান করতে পারতাম। সুবাহাল্লাহ! এই হলো প্রকৃত মহব্বত। জীবন উৎসর্গ করে দিল রবের নামে; তারপরও বলছে–

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

'আল্লাহর জন্য জীবন দিলেন; এ তো তাঁরই দানকৃত ছিল,

সত্য কথা হলো, তার হক আদায় হলো না।'

জীবনটাও আল্লাহর নামে উৎসর্গ করল আবার তাঁরই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করল। হে প্রভু! এ তো আপনারই করুণা যে, আপনি আমার জীবনের কুরবানিকে কবুল করে নিয়েছেন।

এই হলো মহব্বতের অবস্থা!

আল্লাহপ্রেমের এক অপূর্ব ধরন

বান্দার অন্তরে যখন আল্লাহর ভালোবাসা থাকে, তখন সে আমলও খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে করে। মহান রবের দরবারে যখন তার আমল পৌঁছবে, তা যেন তাঁর পছন্দ হয় এবং তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) একবার বসে বসে কতগুলো দেরহাম-দিনার ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদৃশ্য দেখে বললেন, আরে আয়েশা! তুমি দিনার-দেরহাম ধুয়ে পরিষ্কার করছ কেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'হে আল্লাহর প্রিয় রাসূল! আমি আপনার মুখেই শুনেছি, কোনো বান্দা যখন কোনো ফকিরকে আল্লাহর জন্য দিনার-দেরহাম দান করে, তখন সেই দিনার ফকিরের হাতে পড়ার পূর্বে আল্লাহর কুদরতি হাতে পড়ে। একথা শোনার পর অবধি আমি সবসময় দিনার-দেরহাম ধুয়ে পরিষ্কার করে তার পর দান করি, যেন আমার মহান রবের হাতে পাক-ছাপ দিনার যায়।

আমলের গিফ্‌টপ্যাকিং কীভাবে হয়?

আপনারা হয়তো দেখেছেন, মানুষ যখন নিজের সন্তানের জন্য কোথাও বিবাহের কথাবার্তা চালায়, তখন সেখানে যদি ফলের টুকরাও পাঠায়, তো তাতে গিফটপ্যাকিং করে পাঠায়; অথচ এটা ফলের টুকরা; কাঁচামাল, অতি গরমের কারণে নষ্টও হয়ে যেতে পারে; কিন্তু তার পরও শুধু ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ তাকে প্যাকিং করে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে যে, প্যাকেটটি তাদের সেখানে পৌঁছলে যেন তারা খুশি হয়ে যায়। আজকাল সারা পৃথিবীতে এ নিয়ম চালু হয়েছে যে, নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য উপহারকে সুন্দর মোড়কে আবরিত করে পাঠায়। তো ঠিক এভাবেই মুমিন বান্দা তার আমলকে ভালোবাসা ও আবেগের মোড়কে পৌঁছিয়ে স্বীয় রবের দরবারে পাঠায় সেও তার নামাযকে গিফ্‌টপ্যাকিং করে যে, আমার এই নামায আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। তাই একে সুন্দর করতে হবে। আর এই উদ্দেশ্যে সেই আমলকে সাজিয়ে-গুছিয়ে আদায় করে তার পর মনে-মনে বলে–

میری قسمت سے الٰہی! پائیں یہ رنگ قبول
پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لئے۔

'হে প্রভু! ভাগ্যের জোরে এই কবুলিয়্যাতের রং পেয়েছি। অন্যথায় ফুল তো কিছু আমিও কুড়িয়েছিলাম তার আঁচলের জন্য।'

তারা নেক আমলসমূহকে সাজিয়ে-গুছিয়ে করে আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বদা আতঙ্কে থাকে পাছে কোনো ভুল হয়ে গেল না তো? আর আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের নিকট সেই আমলগুলোর কবুলিয়্যাতের প্রার্থনা করতে থাকে।

ইশ্‌কওয়ালাদের নামায

এরপর যখন মানুষ নামায পড়ে, তখন তার অবস্থা-ই ভিন্ন থাকে। এখানেই একজন সাধারণ মানুষ ও একজন আল্লাহওয়ালার নামাযে পার্থক্য। রাকাতের সংখ্যায় তো উভয়ের নামায একই রকম। রুকু-সেজদা, সূরা-কেরাতের হিসাবেও একই রকম; কিন্তু নামাযের কাইফিয়্যাত ও মানের মধ্যে পার্থক্য আছে। যখন আল্লাহওয়ালারা নামায পড়েন, তখন তারা দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তারা আল্লাহর ভালোবাসায় ডুবে নামায আদায় করেন। তাদের নামায কেমন ছিল?

১. হযরত মাওলানা ফজুলর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদি (রহ.) একবার মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.)কে বললেন, (তখন তিনি যুবকই ছিলেন, কেবল নতুন ফারেগ হয়ে এসেছিলেন) 'আশরাফ আলী! যখন আমি সেজদায় যাই, তখন আমার মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা আমার গালে চুমু দিয়েছেন।' সুবহানাল্লাহ!

২. হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া (রহ.) লম্বা-লম্বা সেজদা করতেন। একবার এক ছাত্র জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি এত লম্বা সেজদা করতেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি যখন সেজদায় যাই, তখন আমার মনে হয়, আমি আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের কদম মোবারকে কপাল রেখেছি। তারপর মাথা উঠাতে আর আমার মন চায় না। আল্লাহু আকবার!

হায়! এমন সেজদা যদি আমাদের ভাগ্যেও জুটত। তাদের নামায এমনই হতো। আর আমরাও নামায পড়ি আজর ও ছাওয়াবের নিয়তে। এজন্যই তো বলতে হয়, ইশরাক পড়ো; একটি হজ ও একটি ওমরাহ্র ছাওয়াব পাবে; কিন্তু আল্লাহওয়ালারা ছাওয়াবের নিয়তে পড়েন না। তারা তো স্বাদের কারণে পড়েন। তারা নামাযে স্বাদও পান; আবার ইবাদাতও হয়ে যায়। তাদের ব্যাপারই আলাদা।

بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے
ہم ثواب وعذاب کیا جانیں
کس میں کتنا ثواب ملتا ہے
عشق والے حساب کیا جانیں

'ইবাদাত দ্বারা তো তুমিই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা ছাওয়াব বুঝি না। কিসে কত ছাওয়াব পাওয়া যায়, ইশ্ক ও মহব্বতওয়ালারা এসবের হিসাব রাখেন না।'

আল্লাহর খাঁটি প্রেমিকরা হিসাব-কিতাবের দিকে তাকায় না। তারা আল্লাহর প্রেমে ডুব দিয়ে সাজদায় পড়ে থাকে। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রহ.) অত্যন্ত বিস্ময়কর একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কেয়ামতের দিন যদি আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমার ওপর রহমতের ফয়সালা করেন, তা হলে আমি আল্লাহর কাছে এভাবে মিনতি করব–

'হে আল্লাহ! রূপবতী হুরও চাই না; আলিশান বালাখানও চাই না। আমি তো কেবল আপনার আরশের নিচে মুছল্লা বিছানোর জায়গা চাই।'

সুবহানাল্লাহ! কী স্বাদই-না পেয়েছেন তারা নামাযে!

৩. শায়খ আব্দুল ওয়াহিদের এক মুরীদ কথায়-কথায় বলছিল, জান্নাতে নামায হবে না। একথা শুনে হযরতের চোখে পানি চলে এল। জিজ্ঞাসা করা হলো, হযরত! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, জান্নাতে কি নামায হবে না? সে বলল, না, হযরত! জান্নাতে তো নামায হবে না। তিনি বললেন, যদি জান্নাতে নামাযই না থাকে, তা হলে জান্নাতে যাওয়ার মজাইবা কী হবে? আল্লাহওয়ালাদের অবস্থা এমনই হয়। তাদের আমলও হয় এমন।

রাতজাগা লোকগুলো

এ-কারণেই রাতের শেষ প্রহরে তারা এই মহব্বত ও ভালোবাসার দাবি পূরণের জন্য স্বীয় প্রভুর সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বলেন। তারা যত ক্লান্তই হোন-না কেন, রাতের শেষ প্রহরে তাদের বিছানা তাদের ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয়। কুরআন বলছে–

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

'তাদের পাঁজরগুলো বিছানা থেকে পৃথক হয়ে গেল এমন অবস্থায় যে, তারা তাদের রবকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকতে থাকে এবং আমি তাদেরকে যে-রিযিক দিয়েছি, তা থেকে খরচ করে।'[১৪১]

তারা রাতের শেষ প্রহরে ঘুমাতে পারে না। তারা তখন আরশওয়ালার সঙ্গে মনের দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে। তার নিকট বুকভরা আশা আর দৃষ্টিভরা স্বপ্ন নিয়ে প্রার্থনা করতে থাকে।

এক কবি বলেন–

مجھکو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے
بیٹھا ہوں مست ہوکے تمہارے جمال میں
تاروں سے پوچھ لو میری رو داد زندگی
راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں

১৪১. সূরা হামীম সাজদা : আয়াত ১৬

'আমার তো নিজেরও খবর নেই; দুনিয়ারও খবর নেই ।
তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে বসে আছি আমি ।
তারাদের কাছে আমার জীবনের সাতকাহন জেনে নাও ।
রাতগুলো বিনিদ্র কাটাই তোমার কল্পনায় ।'

এই রাতজাগা লোকগুলোর ব্যাপারেই কথিত আছে।

رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ وَفُرْسَانٌ بِالنَّهَارِ

'তারা রাতের বেলা তাহাজ্জুদগুজার আর দিনের বেলা ঘোড়সাওয়ার ।'

ওলামায়ে কেরাম এর কারণ লিখেছেন, ইবাদাত নতুন সাধকদের জন্য ওষুধের মতো আর পুরাতন সাধকদের জন্য খাবারের মতো। শিশু ও মহিলাদের দেখুন। তাদের জন্য ওষুধ খাওয়া কত কঠিন। কাশির ওষুধ পান করাতে গেলে শিশুরা নাক চেপে ধরে বলে ও-ও! খেতে পারছি না। ট্যাবলেট খেতে বললে বলে, গিলতে পারছি না। কিন্তু যদি বলেন, এই নাও; আইসক্রিম খাও! তখন বলবে, আরো একটা দাও। অর্থাৎ– ওষুধ খাওয়া খুব কঠিন; কিন্তু খাদ্য খাওয়া খুবই সহজ।

একজন মাকে দেখুন। সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে গেছে। ঈশার নামায পড়ে বলছেন, এই কে কোথায় আছিস? আমি ঘুমাচ্ছি, খুব ক্লান্তি লাগছে, আমাকে কেউ জাগাবি না, ডিস্টার্ব করবি না। এভাবে তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। দশ মিনিটও ভালোভাবে কাটেনি; অমনি মায়ের এক প্রবাসী সন্তান ঘরে এল। তার কণ্ঠ শুনতেই মা উঠে বসে যান। এখন তিনি তাকে আদর ও করছেন, তার সঙ্গে বসে মিষ্টি-মিষ্টি গল্পও করছেন। খুব আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত বলে মনে হচ্ছে। এবার কন্যা বলছে, মা আপনি তো বললেন, আমি ক্লান্ত! আমাকে কেউ ডিস্টার্ব করবি না; আমি ঘুমালাম। তো এখন কোথায় গেল ঘুম? মা বললেন, বেটি! আমার কলিজার টুকরা সন্তান এসেছে। তার গলার আওয়াজ শুনতেই আমার ঘুম উড়ে গেছে।

তো যেভাবে সন্তানের সঙ্গে কথা বললে মায়ের ঘুম উড়ে যায়, এমনিভাবে আল্লাহর সঙ্গে শেষ রাতে কথা বলতে গেলে বান্দারও ঘুম উড়ে যায়। তাকে ঘুম আর কষ্ট দেয় না। বরং সে তো বলতেই পারে না, সময় কীভাবে চলে গেল? এ-কারণেই হযরত ফাতেমা (রাযি.) একবার তাহাজ্জুদের সময় দু-রাকাত নফলের নিয়ত বাঁধলেন। শীতের লম্বা রাত ছিল। যখন নামায শেষ করে দু'আর জন্য হাত তুললেন, তখন ফজরের ওয়াক্ত নিকটবর্তী হয়ে গেল।

তখন তার চোখে পানি চলে এল। দু'আয় তিনি বললেন, আয় আল্লাহ! আমি তো মাত্র দু রাকাত পড়তে না পড়তেই রাত শেষ হয়ে গেল।

তারা তো রাত ছোট হওয়ার অভিযোগ করতেন। কেন? কারণ, তারা আল্লাহকে অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসতেন, তাদের অন্তরে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ জাগ্রত থাকত। এ-কারণে ইমাম রাযি (রহ.) একটি বিস্ময়কর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! তোমার স্মরণ ব্যতীত দিন ভালো লাগে না। তোমার সঙ্গে কান্নাকাটি ব্যতীত রাত ভালো লাগে না।

সর্বদা সাক্ষাতের আনন্দ উপভোগ করি

হযরত খাজা মাজযুব হাসান (রহ.) একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। এক যুবকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। সে বলল, জনাব! কী অবস্থায় আছেন এখন? হযরত তখন চাকরি থেকে সদ্য অবসর গ্রহণ করেছেন। পেনশন চলছিল। তো তিনি কবিতার মাধ্যমে উত্তর দিলেন–

پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی

اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی

'পেনশন হয়ে গেছে। কী বলব নিজের কথা!

এখন তো দিনও আমার, রাতও আমার।'

اب اور ہی کچھ ہے مرے دن رات کا عالم

ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم

'এখন তো আমার দিন-রাতের অবস্থাই অন্য রকম,

সর্বদা সাক্ষাতের আনন্দ উপভোগ করি।'

এর নাম হলো তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ, ইনাবত ইলাল্লাহ, রুজু ইলাল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহমুখী হওয়া। তাঁকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা। শয়নে-স্বপনে তাঁর স্মরণে বিভোর থাকা। এর অপর নাম যিকরুল্লাহ তথা আল্লাহর স্মরণ। এই কাইফিয়্যাত ও অবস্থাই আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে, যেন সর্বদা চলাফেরা ওঠাবসায় আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের স্মরণ তাজা থাকে। এরপর দেখবেন ইবাদাতের স্বাদ অন্য রকম লাগছে, আমলের কাইফিয়্যাতও বদলে গেছে।

আল্লাহকে আল্লাহ থেকে চেয়ে নিন

এযুগে আল্লাহ থেকে

সম্পদ চাওয়ার লোক অনেক।

ব্যবসা চাওয়ার লোক অনেক।

বাড়ি-গাড়ি চাওয়ার লোক অনেক।

সুন্দরী স্ত্রী চাওয়ার লোক অনেক।

উঁচু পদ-পদবি চাওয়ার লোক অনেক।

কিন্তু আল্লাহ থেকে আল্লাহকে চাওয়ার লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। সুতরাং আমরা আমাদের দু'আগুলোতে আল্লাহকে চাইব। এমন দু'আ করার শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনাকেই চাই।'

আমি আপনার সন্তুষ্টি চাই, আপনার ভালোবাসা চাই, আপনার দিদার চাই। আল্লাহর এই ভালোবাসা অনেক বড় বিষয়।

دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو
عجیب چیز ہے لذت آشنائی

'অন্তরকে উভয় জগত হতে বেগানা করে দেয়,
আল্লাহপ্রেমের স্বাদ এক বিস্ময়কর জিনিস।'

এর অবস্থা ও কাইফিয়্যাতই ভিন্ন। বান্দার আমলের মধ্যে একধরনের মজা এসে যায়। জীবনে এক ধরনের আবেগ সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ ইবাদাত করতে গিয়ে ক্লান্ত হয় না। স্বীয় প্রভুর স্মরণ তাকে পরিশ্রান্ত করে না। বরং আল্লাহর স্মরণে সে প্রশান্তি অনুভব করে। তাই আমাদেরও উচিত আল্লাহর সঙ্গে গভীর মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা। এমন ভালোবাসা যে, আযান শোনার পর যেন নামায না পড়া পর্যন্ত শান্তি না আসে। এমন মহব্বত যেন এক নামায পড়ার পর দ্বিতীয় নামাযের জন্য অপেক্ষা শুরু হয়ে যায়।

সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নফলের বাহানা

বন্ধুরা আমার! আল্লাহওয়ালারা আল্লাহকে এত ভালোবাসেন যে,পাঁচ নামায দিয়ে তাদের মহব্বতের জাযবা ঠান্ডা হয় না। ফলে তারা আল্লাহর

সঙ্গে মুলাকাত করার উদ্দেশ্যে নফলকে বাহানা বানিয়ে নেন। এজন্য পাঁচ নামাযের বাইরে তারা ইশরাকের নামাযও পড়েন, চাশতের নামাযও পড়েন, আওউয়াবীনের নামাযও পড়েন। এরপর যখন তাহাজ্জুদের সময় হয়, তখন সেটি তাদের বিশেষ মুহূর্ত হয়। তখন তারা স্বীয় প্রভুর দরবারে নিজের নাক-কপাল ঘষে সাজদায় পড়ে থাকে। তারা তো নিজের সবটুকু সময় আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে প্রশান্তি লাভ করে।

আল্লাহর মহব্বত আল্লাহওয়ালাদের নিকট পাওয়া যায়

আল্লাহ তা'আলার এই ভালোবাসা ও মহব্বত কীভাবে সৃষ্টি হবে? মহব্বতওয়ালাদের কাছে বসলে সৃষ্টি হবে। যারা কম্পিউটারের ব্যবসা করেন, কেউ যদি তাদের কাছে কয়েক দিন সময় কাটায়, তখন তাদের অন্তরও কম্পিউটার-ব্যবসা করতে চাইবে। যদি কাপড়-ব্যবসায়ীর সাথে কিছু দিন থাকে তাহলে, কাপড়ের ব্যবসা করতে মনে চাইবে। এমনিভাবে যারা আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে বেশি ওঠাবসা করবে, তার অন্তর ও ধীরে-ধীরে আল্লাহকে ভালোবাসতে শুরু করবে।

আমাদের হযরত মুর্শিদে আলম প্রায়ই প্রশ্ন করতেন–

কাপড় কোথায় পাওয়া যায়? কাপড়ওয়ালার নিকট।

সবজি কোথায় পাওয়া যায়? সবজিওয়ালার নিকট।

বরফ কোথায় পাওয়া যায়? বরফওয়ালার নিকট।

দুধ কোথায় পাওয়া যায়? দুধওয়ালার নিকট।

এরপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করতেন–

আল্লাহ কোথায় পাওয়া যায়? আল্লাহওয়ালাদের নিকট। তাদের কাছে বসার দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যায়।

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ

ملنے والو سے راہ پیدا کر

'তার সঙ্গে সাক্ষাতের এই একটা পথই খোলা আছে,
নিয়মিত সাক্ষাৎকারীদের দ্বারা পথ তৈরি করে নাও।'

এসব কি খানকা, না ইশ্‌কের দোকান?

একবার হযরত শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী (রহ.) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আলী মোঙ্গেরী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, মাওলানা! আপনি কি কখনো ইশ্‌কের দোকান দেখেছেন? মাওলানা প্রথমে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, হযরত! আমি ইশ্‌কের দোকান দেখেছি। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়? মাওলানা বললেন, একজন হলেন শাহ আফাক (রহ.), যিনি সেলসেলায়ে নকশবন্দিয়ার একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন । অপরজন শাহ গোলাম আলী দেহলবী (রহ.) । তিনিও নকশবন্দি সেলসেলার বুযুর্গ ছিলেন।

এতে বোঝা যায়, আল্লাহওয়ালাদের আবাসস্থল ইশ্‌কে ইলাহীর দোকানে পরিণত হয়ে যায়। ব্যথিত ও আহত হৃদয়ের মানুষগুলো তাদের খেদমতে আসেন। আর ইশ্‌কে ইলাহীর বড়ি নিয়ে ফিরে যান এবং এতে তাদের অন্তরগুলো প্রশান্তি লাভ করে ।

পৃথিবীর সকল মজা অর্জনের ক্যাপসুল

এই ইশ্‌কের বড়িও খুব আজব জিনিস। আল্লাহ নামটিই সারা পৃথিবীর সকল মজা ও স্বাদের একমাত্র ক্যাপসুল। যেমন– বান্দা যখন ক্যাপসুল খায়, তখন আরোগ্য লাভ করে; অদ্রূপ আল্লাহর নাম উচ্চারণের দ্বারাও রূহানি শিফা লাভ হয়। ব্যস; যে-বান্দা এটি খাওয়া শিখে গেছে, সে দুনিয়ার সকল মজা ও স্বাদ অর্জন করে ফেলেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণে সীমাহীন স্বাদ অনুভব করে। কারণ, আল্লাহ নামের স্বাদই ভিন্ন।

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

عاشقوں کا مینا اور جام ہے

'আল্লাহ-আল্লাহ কত সুন্দর নাম,

আশেকদের ময়না ও শরাব এটি।'

اللہ اللہ ایں چہ شیریں ست نام

شیر و شکر کند جانم تمام

'আল্লাহ আল্লাহ কী মধুর নাম,

চিনি-দুধ আমার জীবনকে পূর্ণতা দিল।'

যখন আল্লাহ-আল্লাহ নাম উচ্চারণ করি, তখন আমার এই অন্তরে এমন মিষ্টি অনুভব হয়, যেমন দুধের মধে চিনি মিশে যাওয়ার কারণে মিষ্টিভাব এসে যায়।

মহব্বতে ইলাহী পাওয়ার একটি মাকবুল দু'আ

মহব্বতে ইলাহীর এই বিশাল নেয়ামত স্বয়ং আল্লাহর প্রিয় রাসূলও আল্লাহর নিকট চেয়েছেন। যেমন– হাদীছে এসেছে, নবীজি দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُبَلِّغُنَا اِلٰى حُبِّكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার ভালোবাসা চাই, আপনাকে যারা ভালোবাসে তাদের ভালোবাসা চাই, যে-আমল আমাদেরকে আপনার ভালোবাসার দিকে নিয়ে যাবে, সেই আমলের ভালোবাসা চাই।'

অর্থাৎ– তিনি আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহওয়ালাদের ভালোবাসা এবং আল্লাহর ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে এমন আমলের ভালোবাসা চেয়েছেন। আল্লাহ পাকের নিকট ফরিয়াদ ও মিনতি জানাই যে, তিনি যেন আমাদেরও তার খাঁটি আশেক বানিয়ে দিন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

হাফেযে কুরআন হওয়ার আগ্রহ

'এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম নারী হাফেযা ছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) তারপর হযরত হাফছা বিনতে খাত্তাব (হযরত ওমর (রাযি.)-এর বোন), যিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছিলেন। এভাবে ছোট্ট-ছোট্ট মেয়েদের মধ্যে হেফযুল কুরআনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। বহু নারী সাহাবি, নারী তাবিঈ, নারী তাবয়ে-তাবিঈ হাফেযে কুরআন ছিলেন। এভাবে প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক কালে হাজারো মেয়ে নিজেদের সীনায় কুরআন সংরক্ষণ করেছে এবং সেই ধারাবাহিকতা আজো চলছে। ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিছু বান্দার অন্তরে কুরআনে কারীমের মহব্বত ঢেলে দেন। তাদের অন্তরে আগ্রহ জাগিয়ে দেন, আমি কুরআন মাজীদ হেফয করব।'

হাফেযে কুরআন হওয়ার আগ্রহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ۔

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

কুরআনের মর্যাদা

কুরআন আযীমুশ্বান মর্যাদাসম্পন্ন কালাম ।

আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের বার্তা ও পয়গাম ।

নাযিল হয়েছে মানুষের জন্য ।

এটি হেদায়াতের কিতাব, যাকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য পাঠিয়েছেন। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, গোটা মানবকুলের জন্য অমৃত ।

কুরআন দেখাও ইবাদাত ।

অন্যকে শিক্ষা দেওয়াও ইবাদাত ।

নিজে পড়াও ইবাদাত ।

নিজে বোঝাও ইবাদাত ।

অন্যকে বোঝানোও ইবাদাত ।

আর কুরআন অনুযায়ী আমল করা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ইবাদাত । যখন কোনো বস্তুর নেসবত কোনো বড় বস্তুর দিকে হয়, তখন তার মর্যাদা বেড়ে

যায়। দুটা ইট একই ভাটা থেকে কিনে আনা হলো। একটাকে টয়লেটে লাগিয়ে দেওয়া হলো। দ্বিতীয়টাকে মসজিদে লাগানো হলো। যে-ইট টয়লেটে লাগানো হলো, তার ওপর মানুষ খালি পাও রাখতে পছন্দ করে না। অথচ যে-ইটখানি মসজিদে লাগালো হলো, তার ওপর মানুষ সেজদা করে, তাতে কপাল ঠেকায়। এই ইটটির মর্যাদা কেন বৃদ্ধি পেল? আল্লাহর ঘর মসজিদের সঙ্গে তার নেসবত হয়ে গেছে বলে। এমনিভাবে কিতাবের নেসবত হয়েছে আল্লাহর সঙ্গে যে, সে আল্লাহর কালাম। এজন্য এর এত মর্যাদা, এত সম্মান!

কুরআনের সুপারিশ

যে-অন্তরে কুরআন মাজীদের ভালোবাসা থাকবে, কেয়ামতের দিন এই কুরআন তার জন্য সুপারিশ করবে। হাদীছে এসেছে, কেয়ামতের দিন কুরআনকে খুব সুদর্শন এক যুবকের আকৃতিতে পেশ করা হবে। কুরআনকে ভালোবাসে এমন ব্যক্তি যখন হিসাবের জন্য দাঁড়াবে, তখন কুরআন আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের দরবারে নিবেদন করবে, হে দোজাহানের পালনকর্তা! এই বান্দা আমাকে ভালোবাসত। আপনি একে ক্ষমা করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার সুপারিশ কবুল করে নেবেন এবং সেই বান্দাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়ে দেবেন।

হাফেযে কুরআনের সুপারিশ

কেয়ামতের দিন একজন হাফেযে কুরআনকে এমন দশজনের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করা হবে, যাদের ওপর জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে। এখন এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, তারা কাদের জন্য সুপারিশ করবে? ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যখনই কোনো ছোট্ট ছেলে বা ছোট্ট মেয়ে কুরআন হেফয করার নিয়ত করে, তখন তার নিকটবর্তী লোকদের দুটি শ্রেণি হয়ে যায়।

এক শ্রেণির লোকেরা তাদের বাধা দেয়। তারা বোঝাতে চেষ্টা করে, হাফেয হয়ে কী করবে? মেয়েদের বোঝায়, তোরা হাফেযা হয়ে কি করবি? ভুলে যাবে; মুখস্থ রাখা কঠিন হয়ে যাবে। তোমরা বরং যদি স্কুলে পড়তে, তাহলে অনেক ভালো হতো। এই শ্রেণির লোকেরা আত্মীয়ও হয় আবার বন্ধুও হয়।

অপর শ্রেণির লোকেরা সেই ছোট্ট মেয়েটিকে উৎসাহ দেন, সাহস দেন। বলেন, বেটি! এটি অনেক উত্তম কাজ। তুমি কুরআনের হাফেযা হবে এতে তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। এর উসিলায় অনেক নেকি লাভ করা সম্ভব হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, কুরআনের হাফেযকে কেয়ামতের দিন যখন দশজনের জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে, তখন যারা দুনিয়াতে তাকে হিফযুল কুরআনের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করত, তারা সেদিন তার সুপারিশ হতে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে যারা তাকে উৎসাহ দিয়ে কুরআন হেফয করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করত, তাকে সমর্থন করত, তারা তার সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জিত হয় না

কুরআন কারীম হেফয করতে পারা অনেক আনন্দের বিষয়। এই সৌভাগ্য সবার নসিব হয় না। আল্লাহ যাকে চান তারই ভাগ্যে জোটে। ওইসব ছোট্ট মেয়েরা বড়ই ভাগ্যবান, যারা কুরআন মাজীদ হেফয করেছে। তাদের পিতা-মাতা মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। তাদের শিক্ষিকারাও মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। এরা নিজেরা পাওয়ার যোগ্য এবং এদের যেসব নিকত্মীয়া এখানে আছেন, তারাও পাওয়ার যোগ্য। এটি একমাত্র আল্লাহরই অনুগ্রহ।

ایں سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

'এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জিত হয় না।

এতো কেবল তখনই মিলে যখন আল্লাহ তা'আলা দান করবেন।'

এমন কত লোক রয়েছেন, যারা প্রখর মেধাবী; কিন্তু কুরআনে কারীমের হাফেয হতে পারে না। পক্ষান্তরে এমন লোকও আছে, যারা সেরকম মেধাবী তো নয়; কিন্তু মেহনত করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে কুরআনের হাফেয হয়ে যায়। এটি বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, মানুষের সময়গুলো আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কাটে।

মহিলাদের মধ্যে হিফযুল কুরআনের আগ্রহ

এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম নারী হাফেযা ছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)। তারপর হযরত হাফছা বিনতে খাত্তাব (হযরত ওমর (রাযি.)-এর বোন), যিনি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছিলেন। এভাবে ছোট্ট-ছোট্ট মেয়েদের মধ্যে হিফযুল কুরআনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। বহু নারী সাহাবি, নারী তাবিঈ, নারী তাবয়ে-তাবিঈ হাফেযে কুরআন ছিলেন। এভাবে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কালে হাজারো মেয়ে নিজেদের সীনায় কুরআন সংরক্ষণ করেছে এবং সেই ধারাবাহিকতা আজো চলছে। ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তার কিছু বান্দার অন্তরে কুরআনে কারীমের মহব্বত ঢেলে দেন। তাদের অন্তরে আগ্রহ জাগিয়ে দেন, আমি কুরআনে মাজীদ হেফয করব। ফলে যখন তারা মেহনত শুরু করে, তখন কুরআনের হাফেয হয়ে যায়।

পাঁচ বছর বয়সে কুরআনের হাফেয

বাদশাহ হারুনুর রশীদের দরবারে একটি শিশুকে আনা হলে তার পিতা তাকে বললেন, বেটা কুরআন পড়ে শোনাও। শিশুটি এত ছোট ছিল যে, সে তার পিতাকে বলল, আব্বু! প্রথমে ওয়াদা করুন আমাকে লাড্ডু কিনে দেবেন। আজকের ক্যান্ডি-চকলেট ইত্যাদি ছিল সেকালের লাড্ডু। যাহোক পিতা বললেন, হ্যাঁ দেব । তোমাকে লাড্ডু এনে দেওয়া হবে। এরপর শিশুটি কুরআন মাজীদ পড়তে শুরু করল। বাদশাহ হারুন তাকে ৪/৫ স্থান থেকে প্রশ্ন করলেন। সে সবগুলো স্থানেই সঠিক-সঠিক পড়েছে। যখন তার বয়স জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন জানা গেল তার বয়স মাত্র ৫ বছর। সুবহানাল্লাহ।

আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা দেখুন। তিনি কত দয়ালু ও মেহেরবান যে, মাত্র পাঁচ বছরের শিশুকে হাফেযে কুরআন বানিয়ে দিয়েছেন ।

নব্বই বছর বয়সে কুরআন হেফয

আমার এক মুরুব্বী বয়সের আত্মীয় আছেন। তিনি পুরা কুরআন হেফয শেষ করেন। দস্তারবন্দি অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি আমাকে আদেশ করলেন, অনুষ্ঠানে তুমিই আমাকে পাগড়ি প্রদান করবে। আমি এ উদ্দেশ্যে করাচি পৌঁছলাম। যখন তাকে পাগড়ি পরাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম, তার শরীরের একটি পশমও কালো নেই; সব সাদা হয়ে গেছে। খবর নিয়ে জানলাম, তার বয়স নব্বই বছর হয়েছে ।

এই উম্মতের পাঁচ বছরের শিশুও হাফেয হলো আবার নব্বই বছরের বৃদ্ধও কুরআন হেফয করল! এদের উভয়ের মাঝামাঝি বয়সের তো লক্ষ-লক্ষ মানুষ হাফেয হয়েছে। বাকি থাকছে সময়ের বিষয়। তো সাধারণত অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা দু-তিন বছরেই হেফযে কুরআন সম্পন্ন করে ফেলে। যদি উদ্যম নিয়ে পড়ে, তাহলে দু-বছর লাগে। আর যদি আরো একটু মেহনত-মুজাহাদা করে পড়ে, তাহলে দেড় বছরেও সম্ভব। কেউ-কেউ তো একবছরেও হেফয শেষ করেছে বলে জানা গেছে।

সাত মাসে কুরআন হেফয

কিছু দিন পূর্বের কথা। আমাদের জামেয়ার এক মেয়ে। সে মাত্র সাত মাসে কুরআন হেফয সম্পন্ন করেছে। এমনকি সাত মাসের কম সময়েরও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়।

এক মাসেই কুরআন হেফয

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি একবার হজের সফরে গেলেন। সেকালে সামুদ্রিক জাহাজে করে সফর হতো। পথেই কয়েক মাস লেগে যেত। এ-কারণে লোকেরা রমযানের পূর্বেই হজের সফরে বেরিয়ে পড়ত। যেন সময়ের পূর্বেই মক্কায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে। তিনিও এমনই করলেন।

যখন সফরের মাঝে রমযান এল, তখন তিনি জানতে পারলেন, আমার গ্রুপে একজনও হাফেযে কুরআন নেই! বড়-বড় আলেম ছিলেন। তারা নামায পড়াতে পারতেন। কিন্তু তাদের কেউ হাফেয ছিলেন না যে, তারাবীহর নামাযে পুরা কুরআন শোনাবেন। হযরত মাওলানা বললেন, আমার কাছে ভালো ঠেকছে না যে, ওলামায়ে কেরামের এত বড় একটি জামাত সূরা তারাবীহ পড়বে! এরপর তিনি প্রতিদিন এক পারা করে মুখস্থ করতেন আর তারাবীহ নামাযে তা শুনিয়ে দিতেন। একদিকে রমযানুল মোবারক শেষ হলো, অপর দিকে হযরতের কুরআন হেফয শেষ হলো। এটি এক মাসে কুরআন হেফযের উদাহরণ।

কুরআনের ইশ্‌কে সিক্ত এক মহিলা

কিছুলোক এমনও আছেন, কুরআন যাদের খুব ভালো মুখস্থ থাকে। তিন-চার বছর পূর্বের কথা। এক মহিলা আমাদের সঙ্গে হজের সফরে গেল। তার

গোটা কুরআন এমনভাবে মুখস্থ আছে, যেমন মানুষের সূরা ফাতেহা মুখস্থ থাকে। আপনি কুরআনের যেখান থেকেই পড়ুন তারপর থেকে সে পড়তে পারত অবলীলায়। কিছুক্ষণের জন্যেও তাকে থামতে বা চিন্তা করতে হতো না। সে এ বিষয়ে খুবই আশ্চর্য হতো যে, মানুষ কুরআন কারীম কীভাবে ভুলে যায় বা তাদের মুশাব্বাহ লেগে যায়! এত তাজা ছিল তার ইয়াদ!

কুরআন মাজীদের কম্পিউটার

আমরা একবার করাচির এক বিবাহ অনুষ্ঠানে গেলাম। বিবাহের পর এক আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমার এক বন্ধু তার পরিচয় এভাবে দিল যে, জনাব! ইনি কুরআন মাজীদের কম্পিউটার। শুনে তো প্রথমে বুঝতে পারিনি, কেন তার ব্যাপারে এই শব্দ বলা হলো? এতটুকু বলত সে ভালো কারী, ভালো হাফেয। ইতোমধ্যে দশ-বারোজন হাফেয সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন। এবার বুঝলাম, তাকে কেন কম্পিউটার বলা হয়। একজন তাকে প্রশ্ন করল, হযরত! বলুন তো فَتَكُوْنَ শব্দটি কুরআন মাজীদের কোথায়-কোথায় আছে? শব্দটি শুনতেই সে বলতে শুরু করল। এটি অমুক পারা, অমুক পারা এত নম্বর রুকু এত নম্বর আয়াতে একবার এবং অন্য স্থানে অমুক সূরা অমুক আয়াতে একবার, এমনিভাবে তৃতীয় জায়গায় কতবার এবং কোন সূরায় আছে তা বলে দিতে লাগল। তার এই কৃতিত্বে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমি নিজেও তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছি। সেই প্রশ্নগুলোর ঠিক-ঠিক উত্তর দিয়েছিল। এটি মূলত আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

'এটি আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল।'[১৪২]

কয়েক মাসের শিশুর সূরা মুল্‌ক মুখস্থ

আমার এক ছাত্রী ছিল। তার বিয়ে হলো। আল্লাহ তাকে একটি ছেলে দিলেন। তার স্বামী কারী সাহেব ছিলেন। একবার তিনি তার পুত্রকে নিয়ে এসে বললেন হযরত! এই আমাদের সন্তান। একে আপনি দু'আও করবেন এবং এর সবকও শুনবেন। ছেলেটিকে খুব দুর্বল ও শীর্ণকায় দেখাচ্ছিল।

---

১৪২. সূরা হাদীদ : আয়াত ২১

আমি ভাবলাম, ছেলেটি হয়তো কালেমা বা অন্য কোনো সূরা পাঠ করে শোনাবে। এটাই তার সবক হবে। কিন্তু যখন তাকে বললাম, পড়, তার বাবা বলল, তার মা বলেছে, সে হযরতকে দাঁড়িয়ে কুরআন শোনাবে। আমি বললাম, ঠিক আছে; তাকে দাঁড় করিয়ে দাও। কিন্তু ছেলে এত ছোট ছিল যে, সে নিজে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছিল না। ছেলেটির বয়স কত কম ছিল। আমি বললাম, সে তো দাঁড়াতে পারছে না; বসেই পড়ুক! তার বাবা বলল, তার মায়ের আদেশ সে দাঁড়িয়ে আপনাকে সবক শোনাবে। আমি এবার দুটি বালিশ আনালাম। বালিশদুটো দেওয়ালের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে তাকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললাম, এবার পড়ো। সে বালিশের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আমাকে সবক শোনাতে লাগল। এতটুকু শিশু যে ঠিকভাবে দাঁড়াতেও পারে না, সে গোটা সূরা মুলুক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ শুনিয়ে দিল। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আল্লাহ তা'আলা এই কচি শিশুকে সুরা মুল্‌ক মুখস্থ করিয়ে দিলেন।

হেফযে কুরআনের সম্পর্ক হলো ভালোবাসা ও আগ্রহের সাথে। কেউ-কেউ খুব মেহনত করে অল্প সময়ে হাফেয হয়ে যায়। আর যারা মেহনত করে না, তারা কয়েক বছরেও হাফেয হতে পারে না ।

স্পৃহার ডানায় ভর করে হাফেযে কুরআনের উড্ডয়ন

আমার ছোট ছেলে সাইফুল্লাহ যখন হাফেয হচ্ছিল, তখন তার মামুল এমন ছিল যে, প্রতিদিন সে এক পৃষ্ঠা সবক শোনাত এবং ১৮ থেকে বিশ দিনের মাথায় এক পারা মুখস্থ করে ফেলত। আমিও ভেবেছিলাম, এটাই স্বাভাবিক গতি। এভাবে চলতে দেওয়া উচিত। কিন্তু যখন শেষ পাঁচ পারা অবশিষ্ট ছিল, তখন আমার ওমরা যাওয়ারও এক ধরনের ব্যস্ততা ছিল । আমি তাকে বললাম, তুমি যতটুকু সম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করো। সে খুব মেহনত করল। তখন দৈনিক পাঁচ পৃষ্ঠা করে সবক শোনাতে শুরু করল। অর্থাৎ– আগের থেকে পাঁচ গুণ বেশি। এভাবে প্রতি চার দিনে এক পারা করে মুখস্থ শোনাতে লাগল।

যখন ওমরার সময় ঘনিয়ে এল, তখন তাকে কেউ একজন বলল শোনো! ওমরার সফরের এখনো তিন-চার দিন বাকি আছে, আর আপনার বাকি তিন পারা। যদি আপনি সেটুকু মুখস্থ করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা ওমরাহর সময় ইহরাম অবস্থায় মাকামে ইবরাহীমীতে বসে আপনার জন্য দু'আ করব। ছেলেটি কথাগুলো বুঝে ফেলল। এবার সে ওই তিন পারা

মুখস্থ করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। দুই পারা মুখস্থ যেদিন শেষ, সেদিন আমাদের ওমরার সফর ছিল। আমরা মক্কা মুকাররমায় পৌঁছে গেলাম। সেও আমাদের সঙ্গে ছিল। আর মাত্র একদিন বাকি ছিল। পরের দিনই আমরা ওমরার আমল শুরু করব। সে বলল, আব্বু! আমি আজকের দিনের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব। তারপর ফজর নামাযের পরে বসে সে একবার এক পারার এক চতুর্থাংশ মুখস্থ শোনাল। কিছুক্ষণ পর আবার এক চতুর্থাংশ। তারপর তৃতীয়বারও এক চতুর্থাংশ শোনাল এবং শেষ সবকটুকু সে শোনাল। আমরা মাকামে ইবরাহীমের নিকট বসে তার শেষ সবক শুনেছি এবং তার জন্য অনেক অনেক দু'আ করেছি।

তো এতে বোঝা গেল, শিশুরা যদি নিজ ইচ্ছায় আগ্রহভরে হেফয শুরু করে, তবে তারা একদিন এক পারা পর্যন্ত মুখস্থ করতে সক্ষম।

এ তো সেই শিশুটিই ছিল যে, চব্বিশ দিনে একপারা শোনাতো। আর এখন সেই চেষ্টার সঙ্গে যখন আগ্রহ সংযুক্ত হয়ে গেল তো মাত্র একদিনেই একপারা মুখস্থ করে শুনিয়ে দিল। সুবহানাল্লাহ!

এ-কারণে মেয়েদের বলছি, আপনাদের মধ্যে যে-পরিমাণ আগ্রহ, উৎসাহ ও একাগ্রতা থাকবে যে, হ্যাঁ আমি অবশ্যই কুরআন মাজীদের হাফেযা হব; জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচব। আমার কারণে কেয়ামতের দিন আমার বাবা-মাকে নূরের টুপি পরিধান করানো হবে, তো ইনশা আল্লাহ এতটুকুতে আল্লাহ আপনাদের জন্য কুরআন মজীদ হেফয করা সহজ করে দেবেন। আর যদি কুরআন মাজীদ হেফযের বিষয়ে আপনি অলসতা করেন, তবে মনে রাখবেন, সময়ও গড়াতে থাকবে, কাজও দেরিতে হবে।

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী চলুন

এ-ক্ষেত্রে বাবা-মার দু'আও নিতে হবে। বিশেষ করে একথা স্মরণ রাখবেন যে, শরীয়ত-পরিপন্থি কোনো কাজই করবেন না। মিথ্যা অন্যায় বা অন্য কোনো পাপ যেন কিছুতেই হয়ে না যায়। কারণ, মানুষের গুনাহ ও পাপ তার হেফযের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমি ওই মেয়েদের মুবারকবাদ জানাচ্ছি, যারা হেফয সম্পন্ন করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় মাকবুল বান্দীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন এবং জীবনভর এই নেসবতের মর্যাদা রক্ষা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

নিয়তের স্বচ্ছতা

'যখনই নিয়তের মধ্যে ইখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে, তখন আমলও কবুল হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার ফয়েজও জারি করে দেন। দেখুন! আজ মাদরাসা তো অনেক আছে; কিন্তু সব মাদরাসার ফয়েজ আগে বাড়ে না। বড়-বড় মহল অনেক দেখেছি; আবাদহীন উজাড় পড়ে আছে। একটি বিল্ডিং কেউ মাদরাসার নিয়তে বানিয়ে দিয়েছেন। আজ সেখানে ইংরেজি স্কুল চলছে। তো প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যে মাকবুলিয়্যাত জোটে না। কেন? নিয়তের স্বচ্ছতা ও ইখলাসের ত্রুটির কারণে পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়।'

নিয়তের স্বচ্ছতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصِ۔

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَر : مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ۔

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

মুমিনের নিয়তের মর্যাদা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

'সকল আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'

অন্য হাদীছে আছে–

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ

'মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়েও অধিক উত্তম।'

তালিবে ইল্‌মদের এ-বিষয়টি বুঝতে একটু সমস্যা হয়। কিন্তু বাস্তবতা এটাই যে, নিয়ত আমলের চেয়ে অনেক উত্তম। ওলামায়ে কেরাম এর কয়েকটি কারণ লিখেছেন–

১. প্রথম কথা হলো, নিয়তের বিনিময়ে মুমিন বান্দা ছাওয়াব পায়। তার আমলনামায় নেকি লেখা হয়। একথা ভিন্ন যে, পরবর্তী কালে তার আমলের

মধ্যে রিয়া আসুক বা না আসুক অথবা অন্য কোনো কারণে আমল কবুল হোক বা না হোক। কিন্তু নিয়ত করার দ্বারা তৎক্ষণা' তার আমলনামায় নেকি লেখা হয়।

২. দ্বিতীয় কারণ হলো, নিয়তের মধ্যে স্থায়িত্ব আছে। আমলের মধ্যে স্থায়িত্ব নেই। মানুষ যেকোনো আমলই করুক, তা সীমিত; কিন্তু নিয়তের কোনো সীমা নেই। যেমন একব্যক্তি এই নিয়ত করতে পারে, যতক্ষণ আমার হায়াত বাকি থাকবে, ততক্ষণ আমি তাহাজ্জুদ নামায পড়তে থাকব। যদি তার হায়াত একশত বছরের হয়, তাহলে তার নিয়তও একশত বছর পর্যন্তের জন্য হবে। যদি এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে নিয়তও তত বেশি সময়ের জন্য হবে। এই স্থায়িত্বের কারণেই নিয়ত আমল হতে অধিক উত্তম হয়ে যায়।

৩. এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বোঝার আছে। তা হলো, মানুষ যে-আমলই করুক, সেটি সীমিত হয়ে থাকে; কিন্তু এর বিনিময়ে জান্নাতে যা কিছু পাবে, সেটি চিরকাল থাকবে। এমনিভাবে মানুষ পাপ করে সীমিত পরিসরে, কিন্তু জাহান্নামে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে অনন্তকাল পর্যন্ত। অর্থাৎ– কাফের তো কুফরের পাপ করেছে সীমিত হায়াত পর্যন্ত; কিন্তু শাস্তি দেওয়া হবে অনাদিকাল পর্যন্ত। ওলামায়ে কেরাম এর কারণ লিখেছেন, মুমিন যদিও সীমিত আমল করে, কিন্তু তার নিয়ত থাকে স্থায়ী যে, আমি যতদিন বাঁচব, ততদিন আমার প্রতিপালকের ইবাদাত করতে থাকব। তাই সে চিরকাল জান্নাতে থাকবে। পক্ষান্তরে কাফেরের নিয়ত থাকে এমন যে, আমি আল্লাহকে স্বীকার করব না অথবা সে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, তাই তার নিয়তের কারণে তাকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে জলতে হবে।

৪. এর তৃতীয় কারণ হলো, নিয়ত অন্তরের আমল। এই অন্তর শরীরের সকল অঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে দামি অঙ্গ। কারণ, এই অন্তর দিয়েই আল্লাহর মারেফাত অর্জিত হয়। সুতরাং অন্তরের আমলও শরীরের অন্যান্য সকল অঙ্গের আমলের চেয়ে উত্তম হবে। এজন্য সর্বদা নিজেদের নিয়তগুলো যাচাই-বাছাই করতে থাকা উচিত। সর্বদা অন্তরের খবর রাখা উচিত যে, আমরা যে-আমলগুলো করি, সেগুলো বাস্তবেই কী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হচ্ছে, নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হচ্ছে সে ব্যাপারে একটু যত্নবান হই।

সৎকর্মের নিয়তের ভিত্তিতে ক্ষমার ফয়সালা

নিয়তের খারাবির কারণে কেয়ামতের দিন পাহাড়ের ন্যায় বড়-বড় আমল অকেজো করে দেওয়া হবে । আর ছোট-ছোট আমল যেগুলো মানুষ করে

ভুলে যায় শুধু নিয়তের স্বচ্ছতা ও ইখলাসের কারণে কেয়ামতের দিন মানুষের মাগফেরাতের কারণ হয়ে যাবে।

হাদীছে এসেছে, এক বান্দাকে কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে। তার থেকে স্বীয় হক উসূলকারী অনেক হবে। যখন পাওনাদারদের তাদের হকগুলো দিয়ে দেওয়া হবে, তার সকল আমল নিঃশেষ হয়ে যাবে। যারা দেখবে, তারা মনে করবে, এখনই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে বলবেন, তার আমলনামার সকল নেকি যদিও মানুষের মধ্যে বণ্টন হয়ে গেছে; কিন্তু তাতে এটাও লেখা ছিল যে, এই বান্দার অন্তরে সর্বদা সবার জন্যে কল্যাণের নিয়ত থাকত আর তার এই কল্যাণকামিতার নিয়ত আমার এত বেশি ভালো লেগেছে যে, সেই নিয়তের উসিলায় আমি আমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম।

বিস্ময়কর আমলনামা

এক বর্ণনায় এসেছে, কেয়ামতের দিন এক বান্দাকে উপস্থিত করা হবে। তার আমলনামায় হজ, ওমরা আরো কত বিনিদ্র রজনীর ইবাদাত লেখা থাকবে। সে বিস্মিত হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তো জীবনে হজও করিনি, ওমরাও করিনি অথবা বলবে আমি তো এত আমল করিনি যতটা এখানে লেখা আছে, অথবা বলবে আমার বয়স তো কম ছিল ইত্যাদি। উত্তরে তাকে বলা হবে, তুমি আমল তো কমই করেছিলে; কিন্তু তোমার অন্তরে প্রত্যেক বছর আল্লাহর ঘরে হাজির হয়ে লাব্বাইক বলার নিয়ত থাকত। প্রত্যেক রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নিয়ত থাকত। ওই যে তুমি বলতে 'হায়! যদি আমার সামর্থ্য থাকত, তাহলে প্রতি বছর হজ ও ওমরার জন্য বাতুল্লাহর দিকে ছুটে যেতাম। তোমার অন্তরে যেই নেক তামান্না ও সৎ ইচ্ছা জাগ্রত হতো, সেই নেক তামান্নার ইখলাসের দিকে তাকিয়েই তোমার আমলনামায় আমি এই নেকিগুলোর ছাওয়াব লিখে দিয়েছি ।

আকাঙ্ক্ষা, যা পছন্দ হয়ে গেল

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর এক প্রতিবেশী কামার ছিল । সে মারা গেল। তাকে কেউ স্বপ্নে দেখল। দেখে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সঙ্গে আল্লাহর আচরণ কেমন হলো? সে উত্তর দিল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর

সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। সে শুনে খুব বিস্মিত হলো! এরপরই তার চোখ খুলে গেল ।

স্বপ্নদ্রষ্টা নিজেও একজন আলেম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি মনে-মনে ভাবতে লাগলেন, লোকটির পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে দেখা যেতে পারে, তার এমন বিশেষ কী আমল আছে, যা আল্লাহ তা'আলা এত বেশি পছন্দ করেছেন? তিনি তার বাড়ি গিয়ে পরিবারের লোকজনের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, তার জীবন একজন সাধারণ মানুষের জীবনের মতোই ছিল। এরপর যখন বলল, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি , আমাকে তার সম্পর্কে আসল তথ্য দিতে হবে। অবশেষে ভেবেচিন্তে পরিবারের লোকজন বলল, তার মধ্যে দুটি ভালো গুণ ছিল। একটি হলো তার অন্তরে আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের আযমত ও বড়ত্ব খুব বেশি ছিল। এমনকি যখন তিনি লোহা পেটাতেন এবং হাতুড়ি মারার উদ্দেশ্যে মাথার ওপর তুলতেন, যদি ঠিক তখনই আযানের আওয়াজ আল্লাহু আকবার তার কানে পড়ত, তখন হাতুড়িটা সেখানেই ফেলে দিতেন। বলতেন, এবার আমাকে আমার রব ডেকেছেন। সুতরাং প্রথমে আল্লাহর কাজ; তারপর দুনিয়ার কাজ।

তার মধ্যে দ্বিতীয় যে-গুণটি ছিল, তা হলো, তিনি যখন ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরতেন এবং দেখতেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) নিজ ঘরের ছাদে ইবাদাত করছেন, তখন তিনি খুব আফসোস করে বলতেন, কী করব; আমার সন্তানাদি বেশি। যদি আমি আয়-উপার্জন না করি, তবে তাদের কী উপায় হবে। যদি আমার পিঠ হাল্কা হতো, আমার ওপর সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব না থাকত, তাহলে আমি সময় বের করে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতো ইবাদাত করে রাত কাটিয়ে দিতাম।

শুনে মুহাদ্দিছ বললেন, হ্যাঁ; তার এই কথাগুলো এমন ছিল যে, তার নিয়তের স্বচ্ছতা ও ইখলাস দেখে দয়াময় আল্লাহ তাকে জান্নাতে সেই মাকাম দান করলেন, যা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)কে দেওয়া হয়েছে।

এতে বোঝা গেল, বান্দা আমল করতে পারুক আর না পারুক; কিন্তু অন্তরে সেই আমলের নিয়ত তো করা যেতে পারে। আমরা পরিপূর্ণ আশেক হতে হয়তো পারছি না; কিন্তু আশেক হওয়ার তামান্না তো করতে পারি! মাথা হতে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গীনভাবে আমরা শরীয়তের অনুসরণকারী হয়তো হতে পারছি না; কিন্তু নিয়ত তো করতে পারি। যাহোক নিয়তের কারণে মানুষ সেই নেয়ামত অর্জন করে নেয়, যা সে আমলের মাধ্যমে অর্জন করতে সক্ষম হয় না ।

অন্তরে সততার আলামত

অন্তরে সততার লক্ষণ হলো, সাধ্য-সামর্থ্যের মধ্যে যা আছে তা-ই করে নেওয়া। এক বান্দা বলল, জনাব! আমি এটি করতে চাচ্ছি। তো কীভাবে বুঝব, সে একথাটি সত্য বলেছে? কারণ, নিয়ত তো দেখা যায় না। তো অন্তরে সততার লক্ষণ কিতাবে এটা লেখা হয়েছে যে, যতটুকু তার সাধ্যের মধ্যে আছে ততটুকু যদি সে করে ফেলে, তাহলে রব্বুল ইয্যত তাকে সাধ্যের বাইরের ছাওয়াবও দান করবেন। এ-কারণেই কেয়ামতের দিন বহু বড়-বড় আমীর ও বিত্তবানদের ফকিরদের মধ্যে গণ্য করা হবে আর যেব্যক্তি ঠিকমতো খেতেও পেত না, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরিত হয়ে জীবন যাপন করত এমন বহু লোককে কেয়ামতের দিন কারুনের সঙ্গে উঠানো হবে। তার সঙ্গেই তাদের হাশর হবে। কারণ, তাদের অন্তরে ওই নিয়তই ছিল, যা কারুনের অন্তরে ছিল। বিষয়টি পুরোপুরি নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। যদি আমরা অন্তরে এই নিয়ত করি যে, আমরা আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের মারেফাত অর্জন করতে চাই, তার ভালোবাসা দিয়ে অন্তরকে সিক্ত করতে চাই, তাহলে দৃঢ়ভাবে আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার খাঁটি প্রেমিকদের মধ্যে আমাদেরও নাম অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন।

খাঁটি বান্দার পরিচয়

ফকীহ আবুল লাইস সামার কান্দী (রহ.) কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত আমরা ইখলাস সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনি। অপনি আমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন প্রকৃত মুখলিস ব্যক্তিকে? হযরত তাকে একটি বিস্ময়কর উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝালেন। তিনি বললেন, তুমি কি কখনো ছাগলের পালনের রাখালকে দেখেছ? সে বলল, দেখেছি । তিনি বললেন এটাও দেখেছ যে রাখাল যখন নামায পড়ে তখন তার চার পাশে ছাগলগুলো ঘোরাফেরা করে! তাহলে আমাকে বল কখনো কি রাখালের মনে এই চিন্তা এসেছে যে, আমার নামায দেখে এই ছাগলগুলো আমার প্রশংসা করবে? সে বলল, না! তিনি বললেন এটাই হলো মুখলেছ বান্দার পরিচয় যে, মানুষের মধ্যে ইবাদাত করে অথচ তার অন্তরে এক মুহূর্তের জন্যও একথা আসে না যে আমার ইবাদাত দেখে লোকেরা আমার প্রশংসা করবে। রাখাল যেমন– ছাগলের পাল থেকে প্রশংসার আশা করে না তদ্রূপ এই বান্দাও মানুষের প্রশংসার আশা করে না। যার আমল দুনিয়ার স্বার্থহীন হবে তার বিনিময়ও হবে অন্য রকম। হীরা এবং মুতি দেখতে কতই না ছোট; কিন্তু মূল্যের

বিবেচনায় কতই না দামি। যেই আমলের মধ্যে ইখলাস হবে, সেটি হীরা-মুতির মতো মূল্যবান হবে।

মুখলিস বান্দার আমলের মর্যাদা

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন। ঘটনাটি তাঁর নিজের। একবার আমি কিছু লিখছিলাম। কুরআন-হাদীছ, ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদি কিছু। তো হঠাৎ কলমটা একটু সমস্যা করছিল। ঠিকমতো চলছিল না; খসখস করছিল। আমি সেটিকে আঙুলের নখের সঙ্গে ঘষে ঠিক করে নিলাম। এতে আমার নখে একটু কালি লেগেছিল। আমি লিখে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন দেখা দিল। আমি টয়লেটে গিয়ে প্রয়োজন পূরণের জন্য সবে বসেছি, হঠাৎ আমার আঙুলে লেগে থাকা কালিগুলোর ওপর দৃষ্টি পড়ল। ভাবলাম, আহ! যেই কালির দ্বারা আল্লাহর কালাম এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ লিখি, সেই কালিগুলো তো হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করার সময় ধুয়ে নাপাকির সঙ্গে মিশে যাবে। এটা তো বড়ই বেয়াদবি মনে হচ্ছে। তাই আমি পায়খানার বেগকে দমিয়ে উঠে বাইরে চলে এলাম। তারপর একটি পবিত্র স্থানে সেই কালিগুলো ধুয়ে ফেললাম। যেইমাত্র এ-কাজটি করছিলাম, অমনি আমার মনে ইলহাম হলো, 'হে আহমাদ সারহিন্দি! তোমার এই ক্ষুদ্র আমলের কারণে আমি জাহান্নামের আগুনকে তোমার জন্য হারাম করে দিলাম।' এবার দেখুন, আমলটি দেখতে কত ছোট; কিন্তু ইখলাসপূর্ণ হওয়ার কারণে সেটিই মাগফেরাতের কারণ হয়ে গেল।

তিনটি বিষয় আল্লাহর জন্য খাস

তিনটি বিষয় আল্লাহর জন্য খাস ।

১। এক নম্বর হলো, রুজু তথা আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। চেষ্টা করতে হবে, যেন সকল বিষয়ে আল্লাহর দিকেই রুজু হয়, সব সমস্যায় তারই শরণাপন্ন হই। একেই বলে ইনাবাত ইলাল্লাহ বা রুজু ইলাল্লাহ।

২। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ইহতিয়াজ তথা মুখাপেক্ষী হওয়া। অর্থাৎ- সকল প্রয়োজনে বান্দা যেন একমাত্র আল্লাহরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। ছোট-বড় সকল প্রয়োজন; এমনকি জুতার ফিতাও যদি ছিড়ে যায়, তাও যেন সে আল্লাহর নিকটই চায়।

৩। তৃতীয় বিষয়টি হলো, ই'তিমাদ তথা ভরসা। ভরসা সব সময় একমাত্র আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের ওপর রাখবেন। যেকোনো কাজ করুন, সেক্ষেত্রে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবেন।

যে-বান্দার এই তিন আমল ঠিক হয়ে যাবে, তার জীবন শরীয়ত ও সুন্নাত মোতাবেক হয়ে যাবে।

কথা ও কাজের বৈষম্য

আজকাল তিনটি বিষয়ে কথা ও কাজের মধ্যে বৈষম্য ব্যাপক হয়ে গেছে।

১। আমরা বলি, আমরা আল্লাহর বান্দা; কিন্তু কাজ করি স্বাধীন মানুষের মতো। বান্দা অর্থ দাস। দাস যে, সে স্বাধীনভাবে কী করে চলবে? আমরা চলি। জীবনটা এমনভাবে কাটাই, যেন এর মালিকও আমরা। এমনকি মুখেও বলে ফেলি, 'আমি তা-ই করব, যা আমার মন চাইবে'। আরে ভাই! যখন কালেমা পাঠ করেছ, তখন থেকেই তো তোমার সকল ইচ্ছা-মর্জি খতম হয়ে গেছে। এখন তো আমাদের ওপর আল্লাহর ইচ্ছা চলবে– আমাদের ইচ্ছা নয়। শরীয়তের হুকুম সবাইকে মানতে হবে।

দেখুন, এক হলো খাদেম, আরেক হলো গোলাম, আরেক হলো বান্দা। খাদেম তো স্বাধীনই হয়; তবে কিছুক্ষণের জন্য আদিষ্ট থাকে। দ্বিতীয়ত গোলাম; সে তার চেয়ে একটু কম মর্যাদার, কম স্বাধীন হয়। তাকে ক্রয় করে আনা হয়। আর তৃতীয়ত যাকে বান্দা বলা হয়, সে তো গোলাম থেকেও নিম্নমানের হয়। তার না মর্যাদা আছে, না স্বাধীনতা।

আমরা আল্লাহর বান্দা। তাঁর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। তিনি আমাদের মালিক। সুতরাং বান্দার ওপর আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ার ওই বান্দার চেয়ে বহু গুণ বেশি, যে তার অধীন এক গোলামের মালিক। বলুন, গোলামের কাছ থেকে কী চাওয়া হয়? এটাই তো যে, সে মালিকের সকল কথা মান্য করে চলবে। চিন্তা করে বলুন, আমরাও কি আমাদের আসল মালিকের কথা মান্য করে চলি? আমরা মুখে বলি, আমরা আল্লাহর বান্দা; কিন্তু কাজ করি স্বাধীন মানুষের মতো। আমরা আমাদের দোষ-ত্রুটি দেখি না; তবে অন্য সকলের দোষ-ত্রুটি ঠিকই দেখি। এ-কারণেই কোনো আল্লাহওয়ালা বলেছিলেন, হে বন্ধু! তুমি মানুষের দোষ-ত্রুটি এমনভাবে দেখো না, যেন তুমি তাদের প্রভু হয়ে গেছ; বরং দেখো এমনভাবে, যেন তুমি কারো গোলাম।

২। আমরা বলি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের রিযিকদাতা; কিন্তু অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশান্ত হয় না, যতক্ষণ-না সব কিছু হাতের নাগালে পেয়ে যাই। মুখে তো ঠিকই বলি, অল্লাহর ওয়াদা সত্য; কিন্তু রিযিকের ব্যাপারে যতক্ষণ চোখের সামনে সেটা দেখা না যায়, হাতে ধরা না যায়, ততক্ষণ বিশ্বাস হয় না। এ-কারণে যেব্যক্তি দীনের ওপর চলতে চায়, মাদরাসায় পড়ে আলেম হতে চায়, তাকে ঘরের লোকজন সর্বপ্রথম এ-প্রশ্নই করে, খাবে কোত্থেকে? তারা একথা বুঝতেই চায় না যে, রিযিক আল্লাহই পৌঁছিয়ে থাকেন।

দেশের বাইরে একব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে সে বলছিল, আমি তাকলীদ মানি না! অমুকের অনুসরণ করি না, অমুকের মাযহাব মানি না। এ-জাতীয় কিছু কথা বলার পর সে আমাকে বলল, আপনাদের আল্লাহ-আল্লাহ করা ছাড়া কি কোনো কাজ নেই? আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে একথাটার সাক্ষ্য দিয়ে দেবেন যে, দুনিয়াতে আল্লাহ-আল্লাহ করা ছাড়া এদের আর কোনো কাজ ছিল না। আমরা মুখে তো বলি, আল্লাহ আমাদের রিযিকদাতা; কিন্তু বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত পকেটে কিছু না ঢোকে।

৩। আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে একথাটি তো আমরা সকলেই মানি। কিন্তু জীবন যাপন এমনভাবে করছি যেন কোনো দিন মরাই লাগবে না। প্রত্যেকেই বলে, জনাব! মরণ তো সবারই আছে; কিন্তু যদি প্রশ্ন করি, মৃত্যুর পরের জন্য কে-কে প্রস্তুতি নিয়েছেন, তাহলে একজনও হাত তুলবে না। যেভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন, সেভাবে আমরা নিতে পারছি না। দুনিয়ার ধান্দা করতে-করতেই অস্থির অথচ দুনিয়া মানুষের দেহকে বুড়ো বানিয়ে দেয় এবং তার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে তরুণ বানিয়ে দেয়। জি! সত্য বলছি! জীবন পার হওয়ার সাথে-সাথে তার আকাঙ্ক্ষাগুলো যুবক হতে থাকে। আমরা আমাদের কাজগুলো গোছাতে পারিনি। ব্যাপারটা এমন হয়ে গেল যে, বর পক্ষ তো বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হয়ে গেল, অথচ কনেপক্ষ এখনো কন্যার কান ফোঁড়াতে ব্যস্ত। এমনিভাবে মানুষের চলে যাওয়ার সময় যখন আসবে, তখন সব কিছু ছেড়ে রিক্তহস্তে দুনিয়া ছাড়তে হবে।

আরো একটি উদাহরণ নিয়ে ভাবুন! আমাদের যখন কোনো জরুরি কাজ থাকে আর কেউ এসে বলে, চলো; অমুক স্থানে যাব, তখন বিষয়টি কেমন

খারাপ লাগে? আপনি তাকে বলবেন, ভাই আমার অনেক কাজ পড়ে আছে; তুমি যাও; আমার হাতে সময় নেই। এখানে তো আপনি কাজ করার জন্য কোথাও গেলেন না; এখানেই থেকে গেলেন। কিন্তু আজরাইল এসে যখন বলবে, ভাই চলো; দুনিয়ায় তোমার সময় শেষ, তখন আপনার অসম্পূর্ণ কাজের কী হবে? যা হবার তা হবেই। অতএব, মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমাদেরকে দুনিয়াতেই প্রস্তুতি নিতে হবে এবং এখনই। কারণ, এর জন্য পৃথক কোনো সময় আমাকে-আপনাকে দেওয়া হবে না।

ভালো সালেকের তিনটি নিদর্শন

ওলামায়ে কেরাম উত্তম সালেকের তিনটি নিদর্শন লিখেছেন–

১. অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ বিতাড়িত করো : প্রথম নিদর্শন হলো, সে নিজের অন্তর থেকে দুনিয়াকে বের করে দেয়। দৃষ্টি দুনিয়া হতে সরিয়ে আখেরাতের দিক নিবদ্ধ করে। কারণ, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল। একদিন একে ছেড়ে সবাইকে যেতে হবে। তার অন্তর এই ধোঁকার ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মন আখেরাতের দিকে ঝুঁকে যাবে। যখন মনের অবস্থা এমন হবে, তখন মানুষ আর দুনিয়ার পেছনে ছোটে না। দুনিয়া তার পেছনে ছোটে।

স্মরণ রাখবেন, দুনিয়া হলো আখেরাতের ছায়াজীবন। আমরা যদি ছায়ার পেছনে ছুটি, তাহলে কোনোদিন এই ছায়া হস্তগত হবে না। কিন্তু যদি আখেরাতকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেই, তাহলে দুনিয়া অবশ্যই পিছে-পিছে আসতে থাকবে। দুনিয়া চাওয়া ছাড়া পাওয়া যায়; কিন্তু আখেরাত চাওয়া ছাড়া কখনো পাওয়া যাবে না। এর জন্য মেহনত করতে হবে।

২. মৃত্যুকে ভালোবাসা : দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, মৃত্যুকে ভালোবাসা। আজ তো অবস্থা এমন যে, আপনি যদি ঘরে মৃত্যুর কথা মুখেও আনেন তাতে ঘরের নারীরা তা অপছন্দ করে। অথচ আমাদের আকাবিরদের অবস্থা ছিল, তারা নিয়মিত মৃত্যুকে স্মরণ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। যেমন– হযরত ওমর (রাযি.) একটি আংটি বানিয়েছিলেন। তার ওপর লেখা ছিল–

كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا يَا عُمَرُ

'হে ওমর! মৃত্যুর নসীহতই যথেষ্ট।'

বরং সায়্যিদুনা হযরত ওমর (রাযি.) একব্যক্তিকে শুধু একাজে নিয়োজিত করেছিলেন যে, তুমি আমার সঙ্গে থাকো। যখন আমি বিভিন্ন এলাকায় যাব, তখন বিভিন্ন প্রসঙ্গে ঘন-ঘন মৃত্যুর আলোচনা টেনে আনবে। সুবহানাল্লাহ!

বলুন তো! আমরাও কি নিজেদের মৃত্যুকে স্মরণ করার এমন আয়োজন করি? এ-কারণেই আমরা গাফলত ও উদাসিনতায় পড়ে যাই। এই ওমর (রাযি.)-ই সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে রোমান সেনাপতির কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন 'আমার সঙ্গে আছে এমন একটি জাতি, যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমন পছন্দ করে, যেমন শরাবকে তোমরা পছন্দ করে থাক।' আহ! তারা মৃত্যুর অপেক্ষা করতেন। মালাকুল মাউতকে দেখে বলে উঠতেন, বহু দিন থেকে তোমার অপেক্ষায় আছি।

৩. নেক লোকদের প্রিয় হওয়া : উত্তম সালেকের নিদর্শনের মধ্যে আরেকটি হলো তার আশেক লোকদের নিকট প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হওয়া। সমাজের আশেক লোকেরা তাকে ভালোবাসে। আপনারা এমন কিছুলোক অবশ্যই দেখেছেন, যারা সরাসরি ওলামায়ে কেরামের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করে। শুনে রাখুন! যারা ওলামায়ে কেরামের প্রতি সুধারণা রাখতে পারে না, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখে না এমন লোকদের জন্য তাসাওউফ ও সুলুকের পথে কোনো অংশ নেই। কিছু তো এমন আছে, যারা সরাসরি ইল্‌ম এর বিরোধিতা করে। যেমন– বলে, দোস্ত ইল্‌মের প্রসঙ্গ বাদ দাও; অনেক হয়েছে। আরে ভাই! ইল্‌ম তো যিকির ও সুলূকের পথে সহযোগী– প্রতিবন্ধক নয়। তাহলে কেন এর সঙ্গে এমন মনোভাব? হযরত হাসান বসরি (রহ.) বলেন, আমি ও আমার এক ভাই সুলুকের পথে এক সাথে চলা শুরু করি। আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য মনযিল সহজ করে দিয়েছেন। আমি এপথে তার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম। কারণ, আমি তার চেয়ে ইল্‌মের দিক দিয়ে এগিয়ে ছিলাম। এজন্য সালেকের উচিত সকল সুলাহা ও ওলামায়ে কেরামের প্রতি সুধারণা, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার মনোভাব রাখবে।

সালেককে সর্বপ্রথম 'মুরাদ' তথা উদ্দেশ্যে পরিণত হতে হবে। অর্থাৎ– এত প্রিয় হতে হবে যেন তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোই না লাগে। হযরত ওমর (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'মুরাদ' ছিলেন। আল্লাহর রাসূল হযরত ওমরকে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। নবীজির এতটা আস্থা তিনি অর্জন করেছিলেন।

* এমনিভাবে আমীর খসরু (রহ.) তাঁর শায়েখ খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর শায়েখ তাঁর প্রতি এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তিনি বলতেন, যদি শরীয়ত অনুমতি দিত যে, দুই বান্দাকে একই কবরে দাফন করা যাবে, তাহলে আমি মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যেতাম, আমীর খসরু আর আমাকে একই কবরে দাফন কোরো।

* হযরত মির্জা মাযহার জানেজানাঁ (রহ.) ও হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.)-এর সম্পর্কে এমনই উক্তি করেছিলেন। তিনি বলতেন, যদি কেয়ামতের দিন আল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করেন, তুমি আমার কাছে কী নিয়ে এসেছ? তাহলে আমি ছানাউল্লাহকে ধরে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করে দেব।

এজন্য সালেক সর্বপ্রথম 'উদ্দেশ্যে' পরিণত হতে হবে। যদি উদ্দেশ্যে পরিণত হতে না পারে, তাহলে কমপক্ষে অনুগত তো হবে। আজকালের মুরীদরা কেমন যেন! তারা চায় পীর সাহেবকে নিজের মতো করে চালাতে। এমন উদাসিনতার কারণে অনেক ফয়েজ ও বারাকাত হতে বঞ্চিত হতে হয়।

শায়েখের হাতে বায়'আতের একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন লোকও ছিল অনেক। বাদশাহ জানতে পেরে ভাবলেন, যেভাবে দিন-দিন তাঁর মুরীদের সংখ্যা বেড়ে চলছে। এভাবে চলতে থাকলে তো আমার রাজত্বই হুমকির মুখে পড়ে যাবে। তাই তিনি হযরতকে রাজদরবারে ডেকে পাঠালেন ।

বাদশাহ : হযরত! যেভাবে আপনার মুরীদের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমার তো ভয় হচ্ছে, আপনি আবার আমার বাদশাহি কেড়ে নেন কিনা?

শায়খ : বাদশাহ! আপনি চিন্তা করবেন না; এ একটি জনসাধারণের ভিড়; এখানে মুরীদ খুবই কম।

বাদশাহ : না জনাব! আমি তো জানি আপনার ভক্ত-মুরীদ লক্ষ-লক্ষ।

শায়খ : আপনার রিপোর্ট ভুল। বাস্তবতা এমন নয়।

বাদশাহ : আমি তো স্বচক্ষে দেখি, প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ মানুষ আপনার নিকট যায়।

শায়খ : বাস্তবতা এমন নয় মহারাজ! আমার তো প্রকৃত মুরীদ মাত্র দেড়জন।

বাদশাহ : (বিস্মিত কণ্ঠে) লক্ষ মানুষের জামাত! আর আপনি বলছেন মুরীদ দেড়জন?

শায়খ : জি; আমার মুরীদ মাত্র দেড়জন!

বাদশাহ : না, আমি এটা মেনে নিতে পারছি না।

শায়খ : আসুন, বাস্তবতা যাচাই করার জন্য আপনাকে একটি পদ্ধতি বলি।

বাদশাহ : হ্যাঁ অবশ্যই বলুন ।

শায়খ বাদশাহকে একটি পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। বাদশাহ পদ্ধতি অনুযায়ী ঘোষণা জারি করে দিলেন, অমুক শায়খের সকল মুরীদকে অমুক ময়দানে জমা হওয়ার জন্য আদেশ করা হলো। সময়মতো সেখানে লক্ষ মানুষের ভিড় তৈরি হলো। এবার বাদশাহ বিশাল জনসমক্ষে ঘোষণা দিলেন, এই শায়খ এমন এক অপরাধ করেছে, যার কারণে তাকে আজ হত্যা করা আবশ্যক হয়ে গেছে। তবে যদি কেউ তার স্থলে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে, তাহলে তাকে ক্ষমা করার বিষয়টি চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। একথা শুনে কেউ হাত তুলছে না। আস্তে-আস্তে ভিড় হাল্কা হতে শুরু করল । এরপর অল্প কজন ব্যতীত সবাই চলে গেল। বাদশাহ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আছে কেউ এমন, যে নিজেকে এই বুযুর্গের স্থলে হত্যার জন্য পেশ করবে? একথা শুনে একব্যক্তি সামনে এল। বলল, হ্যাঁ! আমি প্রস্তুত। আপনি আমাকে হত্যা করে আমার শায়খকে ছেড়ে দিন।

ইতিপূর্বে বাদশাহ একটি তাঁবু টাঙিয়ে তার ভেতর একটি বকরি রেখে দিয়েছিলেন। এবার যে-মুরীদ নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য এল, তাকে তাঁবুর মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ভেতরে সেই লোকটির পরিবর্তে বকরিটা জবাই করে দিল। রক্তের স্রোত তাঁবুর বাইরে এসে পড়ল। রক্ত দেখে সবাই মনে করল, সেই মুরীদকেই হত্যা করা হয়েছে। এতে সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। বাদশাহ পুনরায় ঘোষণা করলেন। আরো একজন ব্যক্তির জীবন চাই। আছে কেউ এমন, যে নিজের শাইখের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে?

এবার উপস্থিত লোকেরা তো রক্তও দেখে ফেলেছে, হত্যা যে বাস্তবেই করা হচ্ছে, তা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। এবার কে নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে? সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। বারবার যখন এভাবে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল, তখন মাজমা থেকে এক মহিলা বের হয়ে এসে বলল, জনাব! আমিও আমার শাইখের জন্য জীবন উৎসর্গ করছি। আমাকে হত্যা

করে আমার শায়খকে ছেড়ে দাও। সে ছাড়া আর কেউ এগিয়ে এল না। এবার শায়খ বাদশাহকে বললেন–

দেখেছেন তো! বলিনি আপনাকে, মজমা লক্ষ লোকের হলেও প্রকৃত মুরীদের সংখ্যা মাত্র দেড়জন।

বাদশাহ : হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। শরীয়তে পুরুষের সাক্ষ্য পূর্ণ আর মহিলার সাক্ষ্য অর্ধেক ধরা হয়। সেই হিসেবে পুরুষ এক এবং মহিলা আধা মিলে মোট দেড় হয়। সঠিকই হিসাব আপনার।

শায়খ : না, না আপনি উল্টা হিসাব করেছেন। পুরুষ এখানে অর্ধেক আর মহিলা হলো পূর্ণ। কারণ, মহিলা মৃত্যুর আলামত দেখার পরও নিজের জীবন পেশ করেছে। পুরুষ তো শুধু শুনেছে; দেখেনি।

বোঝা গেল, শাইখের সঙ্গে সম্পর্ক ভাসাভাসা বা মৌখিক নয়, আন্তরিকভাবে করতে হবে। অন্যথায় প্রকৃত মাকসাদ হাসিল হবে না।

তিনটি সত্য কথা

তিনটি কথা পাথরের খোদাইয়ের মতো অক্ষয়। এগুলোকে নিজের বুকের মধ্যে লিখে নিন। সর্বদা এগুলোর সত্যতা খুঁজে পাবেন।

১। যেব্যক্তি নিজের বাতেনকে পরিশুদ্ধ করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার যাহেরকেও পরিপাটি করে দেন। আজ তো লোকেরা এটাই বলে যে, জনাব! আমার এই বাধা! এই সমস্যা! এসব কেন হচ্ছে? কারণ, মনে সমস্যা। বান্দা যদি মনটাকে ঠিক করে নেয়, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে নেয়, তাহলে একটা সময় অবশ্যই আসবে, যখন আল্লাহ তার সকল বাধা ও সমস্যা দূর করে দেবেন। আল্লাহ অপ্রতিকূল অবস্থাকেও তার জন্য প্রতিকূল করে দেবেন।

২। যেব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে নিজের মোআমালা তথা হিসাব-নিকাশ ঠিক করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সঙ্গে তার হিসাব-নিকাশ ঠিক করে দেন। আজ যুবকরা মনে করে, হায় জনাব! আমি কী করব! মুখে দাড়ির সুন্নাত সাজালে মা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, বাবা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আরে! শরীয়তের বিষয়ে আল্লাহর পছন্দের সামনে কারো পছন্দকে পাত্তা দেওয়া যাবে না। হাদীছে এসেছে–

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'আল্লাহর নাফরমানি হয় এমন কোনো বিষয়ে কোনো মাখলুকের আনুগত্য করা যাবে না।'

স্বামী বলে দু'আ করুন, স্ত্রী দীনী বিষয়ে আমাকে সাহায্য করে না। স্ত্রী বলে, দু'আ করুন! স্বামী দীনী বিষয়ে আমাকে সাহায্য করে না। না এমনটা হবে কেন? এই স্বামী বা স্ত্রী এরা প্রত্যেকেই যদি আল্লাহর সঙ্গে নিজ-নিজ সম্পর্ককে সুসংহত করে নেয়, তাহলে তাদের সাথে মাখলুকের সম্পর্ককেও আল্লাহ তা'আলা সুসংহত করে দেবেন। চোর আমাদের ভেতরে থাকে আর আমরা তাকে অন্য কোথাও খোঁজায় ব্যস্ত। আমরা দেখি, সন্তানাদি ঠিক নেই, দুশ্চিন্তা করি। না ভাই? সন্তানাদি চোর নয়; চোর আমাদের অন্তরের মধ্যে। আমরা যদি নিজেদের শতভাগ শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালনা করি, তাহলে আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমাদের ও মাখলুকের মধ্যকার সম্পর্ককে ঠিক করে দেবেন । যদি আমরা বলি, আরে! আমরা তো যেমন আছি, তেমনই থাকি; কিন্তু আমাদের সন্তান যেন ঠিক হয়ে যায়। এমনটা হলে কোনো দিন সন্তান ঠিক হবে না। কারণ, আমরা যেমন নমুনা তাদের সামনে পেশ করব, তারা সেভাবেই নিজেদের ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করবে।

এক বুযুর্গ ছিলেন। তার কাছে একব্যক্তি তার ছেলেকে নিয়ে এল। বলল, হযরত! দু'আ করবেন, ছেলেটা যেন ঠিক হয়ে যায়। ছেলেটা নিষ্পাপ দুধের বাচ্চা ছিল। সেই লোকটির মুখ একেবারে পরিষ্কার ক্লীন (দাড়ি মুণ্ডিত) ছিল। তিনি তার চেহারায় হাত বুলিয়ে বললেন, আচ্ছা; আমি দু'আ করব, আল্লাহ প্রথমে বাবাকে আশেক হওয়ার তাওফীক দান করুন।

দুনিয়াপ্রেমের শাস্তির আলামত

দুনিয়ার মহব্বতের শাস্তি খুবই কঠিন। এর তিনটি আলামত রয়েছে।

প্রথম আলামত : আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মহব্বতের কারণে এমন দুশ্চিন্তা দিয়েছেন, যা থেকে সে মুক্তই হতে পারে না। এ-কারণে সর্বদা পেরেশানিতে পড়ে থাকে। এক পেরেশানি শেষ হতে না হতেই আরেক পেরেশানি এসে যায়। এটা হলো প্রথম শাস্তি।

দ্বিতীয় আলামত : তাকে এমন অস্থিরতায় ফেলা হয়, তা শেষই হয় না। বান্দা অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠায় এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, তা থেকে সে শত চেষ্টা করেও মুক্ত হতে পারে না। নিজের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার সঙ্গে প্রতিদিন যুদ্ধ করে; কিন্তু দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা কমার কোনো নাম নেই।

লোকেরা এসে বলে, হযরত! আমি আমার দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করি; কিন্তু তা দূরই হয় না। হযরত! দয়া করে একটু দু'আ

করুন। আরে ভাই! হযরত তো দু'আ করছেনই; কিন্তু আমাদেরও তো নিজেদের অন্তরগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে! আমরা চাই, আমরা নিজেরা না বদলে আপন অবস্থায়ই থাকি আর আল্লাহ আমাদের অবস্থা বদলে দিন। এটা কী করে হতে পারে?

তৃতীয় আলামত : এমন দরিদ্রতা যা কখনো দূর হয় না। বাহ্যিকভাবে লোকটি লাখপতি মনে হবে; কিন্তু তার ঋণও আছে লক্ষ-লক্ষ টাকা! বড়-বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা; দেখুন গিয়ে, তাদের এক-একজন বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে কত টাকা ঋণী!

বিস্ময়কর ব্যাপার!

যেলোক দুনিয়ায় থেকে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, রব্বে কারীম তার দুনিয়ার অবস্থাও ঠিক করে দেবেন। অবস্থা ঠিক করা দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এটা নয় যে, তাকে বাদশাহ বানিয়ে দেবেন। বরং উদ্দেশ্য হলো, তার অবস্থাকে দীনের অনুকূল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেবেন। অর্থাৎ– দীনী পদ্ধতিতে জীবন যাপনের মধ্যেই দুনিয়ার প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দেবেন।

কি আশ্চর্যের ব্যাপার! একজন ধনী লোক নিজের বসবাসের জন্য দুনিয়ার সব ধরনের বিলাসিতার আয়োজনে কত চেষ্টা করে, তার জন্য কি নিজের আখেরাতের বিলাসবহুল জীবনের চিন্তা করা উচিত নয়? এক বুযুর্গ বলেছিলেন, 'আমার বিস্ময় লাগে সেই ধনীর ওপর, যে আখেরাতের বিলাসিতার জন্য কোনো সম্পদ ব্যয় করে না।'

তিনি আরো বলেন– 'সেই ব্যক্তিকে দেখে বড়ই আশ্চর্য লাগে, যে নরম বিছানা বিছিয়ে ঘুম তো যায়; কিন্তু শেষ রাতে উঠে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে না।'

তিনি আরো বলেন– 'আমি আশ্চর্য হই সেই ব্যক্তিকে দেখে, যে একথা তো বিশ্বাস করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে; অথচ সে ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহও করে যাচ্ছে।'

গুনাহ সকল দুশ্চিন্তার মূল

গুনাহের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সকল দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি। আপনি এভাবে বুঝুন! গুনাহ হলো একটি পুটুলিসদৃশ আর সেই পুটুলিতে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি ভরা আছে। যখনই আমরা গুনাহ করি, সঙ্গে-সঙ্গে সেই পুটুলি হতে পেরেশানি বের হয়ে আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে।

যদি কাউকে বলা হয়, এই পুটুলিতে বিষাক্ত বিচ্ছু আছে; একটু খোলো তো! দেখবেন, সে এর ধারেকাছেও যাবে না– সর্বনাশ! আমি পারব না। ভাইয়েরা আমার! আমরা যদি বিচ্ছুর পুটুলি খুলতে রাজি না হই, তাহলে দুশ্চিন্তার পুটুলিটা কেন সারা দিন এতবার খোলাখুলি করি? গুনাহ করা, পাপে নিমজ্জিত হওয়া তো পেরেশানি ও দুশ্চিন্তার পুটুলি খুলে দেওয়া। এজন্য সকলের উচিত, ইচ্ছা ও বিচক্ষণতার সাথে গুনাহকে ছেড়ে দেবে।

স্মরণ রাখবেন, যেব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করবে, আল্লাহ তার আখেরাতের সাথে-সাথে দুনিয়াকেও ধ্বংস করে দেবেন। তাসাওউফ ও সুলুকের প্রথম ধাপও এটাই যে, মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করবে, যেন তার দ্বারা আল্লাহর কোনো নাফরমানি না হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, সে ফেরেশতা হয়ে যাবে; বরং মনে-মনে ইচ্ছা করবে, যদি কখনো নফসের তাড়নায় শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গুনাহ করেই ফেলে, তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে তাওবা করে পুনরায় গুনাহ না করার ইচ্ছা ও নিয়ত করে নেবে। অন্তরে সর্বদা এই ইচ্ছাই রাখবে যে, আমি কখনো আমার রবের নাফরমানি করব না।

রূহানিয়্যাতের পতন

গুনাহের কারণে আজ অন্তরের রূহানী অবস্থাগুলো একেবারেই ম্লান হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ–

* আমাদের সেলসেলায়ে আলিয়া নাকশবন্দিয়ার এক বুযুর্গ ছিলেন মির্জা মাযহার জানে জানাঁ। খুব আল্লাহওয়ালা ও সাহিবে কাশ্‌ফ্ বুযুর্গ ছিলেন। তার ব্যাপারে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.) তার কিতাবে লিখেন, এই সময় মির্জা সাহেবের মতো রূহানী শক্তিসম্বলিত ব্যক্তি আমার চোখে সারা দুনিয়ায় দ্বিতীয়জন নেই।

মির্জা সাহেব তার ঘরের পাশেই পাঞ্জেগানা নামাযের একটি মসজিদ বানিয়েছিলেন। দৈনিক জামাতের সাথে নামায সেখানেই আদায় করতেন। তবে জুমার দিন দিল্লীর জামে মসজিদে তাশরীফ আনতেন। যেহেতু তিনি ঘরবাড়ি থেকে বেশি একটা বের হতেন না; তাই মুরীদগণ তার সাক্ষাতের জন্য ছটফট করত। জুমার দিন যখন তিনি মসজিদ অভিমুখে রওনা হতেন, তখন যারা সাক্ষাৎ প্রার্থী হতো, তারা পথেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু তিনি করতেন কী? যেই মসজিদে প্রবেশের জন্য পা বাড়াতেন, সঙ্গে-সঙ্গে

লম্বা রুমাল দিয়ে নিজের চেহারাকে ঢেকে ফেলতেন। এতে সাক্ষৎ ও দর্শনার্থীরা আরো বেশি দুশ্চিন্তায় পড়ে যেত।

তার এক খাদেম একদিন তাকে প্রশ্ন করল, হযরত! লোকেরা আপনাকে সীমাহীন ভালোবাসেন, আপনার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হতে চায়; অথচ সপ্তাহে যা-ও একদিন বের হন; তা আবার নিজেকে রুমাল দিয়ে ঢেকে ফেলেন; এটা সবার জন্য কষ্টকর। তিনি খাদেমকে কাছে ডেকে নিয়ে সেই রুমালটিই তার মাথায় লাগিয়ে দিলেন। যেইমাত্র রুমাল দিয়ে তার মাথাটা ঢেকে দিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে সে একটা চিৎকার মেরে বেহুঁশ হয়ে গেল। যখন হুঁশ ফিরে এল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন কী দেখলে? খাদেম বলল, আপনি যেইমাত্র আমার মাথায় রুমাল রাখলেন, আমি মানুষের দিকে এক নজর তাকালাম, দেখলাম, গোটা মসজিদে কয়েকজন মানুষ ছাড়া বাকি সবাই কেউ কুকুর, কেউ বিড়াল, কেউ শূকর হয়ে বসে আছে। তাদের অন্তরের আসল অবস্থাগুলো তিনি দেখতে পেতেন। এরপর মির্জা সাহেব বললেন, দেখো! এই হলো আমার রূহানী শক্তির অবস্থা। তাই আমি রুমাল দিয়ে চেহারা ঢেকে নেই, যেন কারো ওপর আমার নজরও না পড়ে এবং কারো প্রতি আমার কুধারণাও সৃষ্টি না হয়।

এমন একটি ঘটনা হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (রহ.)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে। ঘটনাটি হযরত নিজমুখে কুরআনের ক্লাসে শোনাতেন। তিনি বলতেন– 'একবার আমি বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক মাজযুব আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। আমি তাকে চিনে ফেললাম। কাছে ভিড়ে বললাম, আসসালামু আলাইকুম। তিনি উত্তরে ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আহমদ আলী! মানুষেরা কোথায় থাকে? আমি তার প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হলাম। কারণ, আশেপাশে যারা ছিল তারা সবাই মানুষই ছিল। আমি বললাম, হযরত! এরা তো সবাই মানুষ। আমার কথা শুনে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তিনি আশপাশের মানুষগুলোর ওপর নজর বুলিয়ে বললেন, এরা কি সবাই মানুষ! তাঁর কথার প্রভাব এত বেশি ছিল যে, আমার মধ্যেও এমন একটি অবস্থা তৈরি হলো যে, আমিও বাজারের মধ্যে মানুষের সংখ্যা কম ও জীবজন্তুর সংখ্যা বেশি দেখতে লাগলাম। আমার এই হালত যখন চলে গেল, ফিরে দেখি, সেই আল্লাহওয়ালাও চলে গেছেন। মির্জা সাহেব তাঁর কুরআনের দরসে প্রায়ই বলতেন–

مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک
ہزاروں میں نہ ملیگا، لاکھوں میں تو دیکھ

'সবার মালিক তো একজনই। কিন্তু মালিকের জন্য একজনও সহস্রের মাঝে খুঁজে পাবে না, লক্ষের মধ্যে গিয়ে খোঁজো।'

তাসাওউস ও সুলুকের সারমর্মই হলো, আমরা আমাদের সারাটা জীবন শরীয়ত ও সুন্নাত মোতাবেক গঠন করব। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদা রবের আনুগত্যশীল জীবন যাপন করব। অন্তরে সর্বদা এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত রাখব। অন্যথায় গুনাহের পরিণতি দুনিয়ায়ই ভোগ করতে হতে পারে।

তিনটি গুনাহ সকল গুনাহের মূল উৎস

১। সর্বপ্রথম গুনাহ হলো তাকাব্বুর তথা অহংকার। এটা হলো গুনাহের মা। আর উজব তথা আত্মম্ভরিতা এই তাকাব্বুরে লুকিয়ে আছে। আরশে আযীমের ওপর আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের নাফরমানি এই তাকাব্বুরের কারণেই হয়েছিল। শয়তানই করেছিল সর্বপ্রথম এই পাপ।

২। দ্বিতীয় গুনাহ হলো হির্স তথা লোভ। এই লোভ খুবই নিকৃষ্ট স্বভাব। যুবকদের মধ্যে যে না-জায়েয খায়েশাত জাগে, তা এই লোভেরই সন্তান। লোভ থেকে এসব হারাম ইচ্ছা জাগে। চিন্তা করে দেখুন, একব্যক্তির বিবাহ হয়ে গেল। স্ত্রীও নিকটে আছে। স্ত্রী আশেক, পরহেযগার এবং খুব প্রেমময়ীও। এর সঙ্গে তো তার সুখ-শান্তিতে জীবন কাটানো উচিত। কিন্তু না, এখন যুবকের দৃষ্টি পড়েছে অন্য কারো ওপর? কেন? লোভের কারণে। লোভই তাকে পাপের দিকে টেনে নিয়েছে।

৩। তৃতীয় গুনাহ হিংসা। ঈমানদারদের ব্যাপারে অন্তরে যে বিদ্বেষ থাকে, তা একমাত্র হিংসার কারণেই হয়। এই তিন গুনাহ থেকে আমাদের সর্বদা বেঁচে থাকতে হবে। এগুলো খুবই মারাত্মক গুনাহ। কারণ, আরশের ওপর আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে যে-অবাধ্যতা হয়েছিল, তা কী কারণে হয়েছিল? অহংকারের কারণে। জান্নাতে হযরত আদম (আ.) হতে যে-ভুল প্রকাশ পেয়েছিল, তার মূল কারণ কী ছিল? লোভ! লোভই ছিল মূল কারণ। লোভ ভালোও হয়, মন্দও হয়। তিনি ভেবেছিলেন নিষিদ্ধ ফল খেলে আমি সর্বদা জান্নাতে থাকব; চিরকাল আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকতে পারব।

জমিনের মধ্যে সর্বপ্রথম যেই গুনাহ হয়েছিল, তা হিংসার কারণেই হয়েছিল। সেটা ঘটেছিল দুই ভাই হাবীল ও কাবীলের মধ্যে। এক ভাই অপর ভাইকে হিংসাবশত হত্যা করেছিল।

এই তিনটি গুনাহ মৌলিক। সুতরাং এগুলো থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। আশ্চর্য! জীবন বরফের মতো গলে যাচ্ছে; অথচ মানুষ গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে প্রতিনিয়ত গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে!

সাদা চুল দেখে লজ্জা!

হযরত ওমর (রাযি.) একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। দেখলেন, নবীজির চক্ষু হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। হযরত ওমর (রাযি.) পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কাঁদছেন কেন? নবীজি উত্তর দিলেন, এই তো কিছুক্ষণ পূর্বে আমার নিকট জিবরাঈল এসেছিল। সে বলল, যে বান্দা কালেমা পাঠ করে এবং কালেমা পড়তে-পড়তে তার চুল সাদা হয়ে যায়, সেই বৃদ্ধকে শাস্তি দিতে আল্লাহ তা'আলা লজ্জা পান। আমার কান্না এজন্য পাচ্ছে যে, বৃদ্ধকে শাস্তি দিতে তো আল্লাহর লজ্জা হয়; অথচ বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর নাফরমানি করতে বৃদ্ধের কেন লজ্জা হয় না?

এক বুযুর্গের নসীহত

এক বুযুর্গ তার সন্তানকে নসীহত করছেন, বেটা! গুনাহ করো না, আল্লাহকে লজ্জা করো, যদি আল্লাহকে লজ্জা করতে না পার; তবে কমপক্ষে মানুষকে লজ্জা করো। যদি মানুষ থেকেও লজ্জা করতে না পার, তবে নিজেকে চতুষ্পদ জন্তু মনে করো।

তিনটি অমূল্য বাণী

আজকের এই প্রথম মাহফিলে তিনটি কথা আপনারা অন্তরে গেঁথে নিন।

১। সূলুকের মেহনত তখনই সফল হয়, যখন সালেকের অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যেব্যক্তি একথা বলে যে, জনাব! আল্লাহকে আমি খুব ভয় করি; অথচ স্বেচ্ছায় সে বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত হয়, তা হলে বুঝে নিন, সে আত্মপ্রবঞ্চনায় পতিত হয়েছে। আল্লাহর ভয়ের নিদর্শন হলো, সে আল্লাহর নাফরমানি হতে বেঁচে থাকবে।

২। মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে মনে-মনে সুধারণা রাখবে। আর সুধারণার আলামত হলো, সে সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকবে। কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহর থেকে খুব ভালো প্রত্যাশা রাখি; অথচ সে নামাযই ঠিকমতো আদায় করে না, তাহলে বুঝে নিতে হবে, সে চরম ভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছে।

৩। বান্দা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে ডুবে থাকতে পারবে। মনে রাখবেন, সব বস্তুর একটি আলামত রয়েছে। মহব্বতের আলামত হলো প্রিয়তমের স্মরণ ও জল্পনা-কল্পনা। কল্পনাজুড়ে সর্বদা সে-ই ঘুরে বেড়ায়। আল্লাহকে মহব্বতকারীর ব্যাপারটিও এমনই। তারাও সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে। একেই বলে উকুফে কালবী। আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে প্রতিটি মুহূর্তে আমরা আমাদের অন্তরে আল্লাহর স্মরণকে তাজা রাখব।

ঈমান ধ্বংস হওয়ার কারণ

তিনটি বস্তু ঈমান ধ্বংস হওয়ার কারণ হয়ে থাকে ।

১। যেব্যক্তি ঈমানের নেয়ামত প্রাপ্তির ওপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না, তার ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার সম্ভবনা খুব বেশি থাকে। কারণ, যে-নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে না, আল্লাহ তা'আলা সেটি ছিনিয়ে নিতে পারেন। নেয়ামত তখনই বহাল থাকে, যখন মানুষ সেই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে। এ-কারণে দু'আ শেখানো হয়েছে।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا

'আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে মেনে নিলাম।'

সুতরাং আমরাও মনেপ্রাণে একথা বিশ্বাস করব যে, আমরা আমাদের রবের ওপর ঈমান রাখি যে, তিনি আমাদের পালনকর্তা; এতে আমরা সন্তুষ্ট। এমনিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আমরা নিবেদিত যে, তিনি আমাদের নবী ও নেতা। আর দীন হিসেবে ইসলামের ওপরই আমরা সন্তুষ্ট যে, এটি আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমাদের দান করে ধন্য করেছেন ।

২। ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সতর্ক না থাকা। কারণ, যেলোক ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন হবে, অনেক সময় সে ঈমান হতে

বঞ্চিত হয়ে যায়। এ-কারণেই কিতাবে লেখা আছে, কত মানুষ আছে এমন, যাদের নাম জীবনভর মুসলমানদের তালিকায় থাকে; কিন্তু মৃত্যুর সময় তার নাম মুসলমানদের তালিকা হতে বাদ দেওয়া হয়। হাদীছে এসেছে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময় মানুষ দেখতে পাবে, একজন সকাল বেলা ঘর হতে ঈমান নিয়ে বের হবে আর সন্ধ্যায় ঈমানহারা হয়ে ঘরে ফিরবে! এর কারণ কী হবে? তখন মানুষের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী কথামালা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। কখনো আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ, কখনো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সন্দেহ। কখনো দীনী কথাবার্তার মধ্যে সন্দেহ। এই সন্দেহ মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়।

৩। দীনদারদের প্রতি ঘৃণা। আপনি হয়তো দেখছেন, তারা বলে মোল্লা-মৌলভীদের আমি একদম সহ্য করতে পারি না। অথবা বলে, টুপি-দাড়িওয়ালাদের আমি একদম পছন্দ করি না। মনে রাখবেন, যে দীনদারদের ঘৃণা করে, তার ঈমান ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক নম্বরে ঈমানের নেয়ামতের ওপর আল্লাহর শোকর আদায় করবেন। দ্বিতীয়ত ঈমানের হেফাযতের জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট দু'আ করবেন এবং তৃতীয়ত দীনদারদের ভালোবাসবেন।

সবগুলো আসমানি গ্রন্থের সারাংশ

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, যদি সবগুলো আসমানি গ্রন্থের সারাংশ বের করেন, তবে তিনটি বিষয় বেরিয়ে আসবে।

প্রথম কথা : মানুষের অন্তরে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর ভয় হওয়া, যেন সে গুনাহ হতে মুক্ত থাকতে পারে।

দ্বিতীয় কথা : বান্দার অন্তরে ভয়ের চেয়েও বেশি রহমতের আশা থাকা। অর্থাৎ– যতটা আল্লাহর ভয় হবে, আল্লাহর কাছে রহমতের আশা তার চেয়ে বেশি হওয়া ।

তৃতীয় কথা : মানুষ তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করবে। বলুন তো আমরা কি পছন্দ করি, কেউ আমাদের গীবত করুক? না, তাহলে আমরা কেন অন্যের গীবত করি?

বলুন তো, কেউ আমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলুক এটা কী আমরা পছন্দ করব? না। তাহলে আমরা কীভাবে মিথ্যা বলি?

কেউ আমাদের সঙ্গে ওয়াদাখেলাফি করুক এটা কি আমরা পছন্দ করি? অবশ্যই না। তাহলে সেই ওয়াদাখেলাফির ঘৃণ্য কাজটা আমরা কী করে করি? কেউ আমাদের ইজ্জত-সম্মানের দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকাক এটা কি আমরা কেউ পছন্দ করি? না, তাহলে আমরা কীভাবে সেই কাজটা করতে পারি?

এসব বৈশিষ্ট্য মানুষ তখনই অর্জন করতে পারে, যখন তার মধ্যে ইখলাস থাকে। এজন্য আমাদের উচিত, আমরা আমাদের নিয়ত বিশুদ্ধ করে নেব। সবার ব্যাপারে আমরা কল্যাণের নিয়ত রাখব। কেউ যদি আমার ক্ষতিও করে আমি তার ক্ষতি করব না; বরং উপকার করব।

হযরত ঈসা (আ.)কে কেউ গালমন্দ করল। প্রতিউত্তরে তিনি তার সঙ্গে ভালো আচরণ করলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা খুব হয়রান হয়ে প্রশ্ন করল, হযরত! সে তো আপনার সঙ্গে এমন বেয়াদবি করল আর আপনি তার সঙ্গে এত ভালো আচরণ করছেন? তখন তিনি বললেন–

كُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ

'প্রত্যেক পাত্র হতে তাই বের হয়, যা তাতে থাকে।'

তার মধ্যে মন্দ ছিল। সেখান থেকে মন্দই বের হলো। যদি আমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ রেখে থাকেন, তাহলে আমরা কল্যাণের কথাই বলব।

অন্তরকে অন্ধকার করে দেওয়ার মতো গুনাহ

সর্বদা চেষ্টা করতে হবে, যেন আমাদের নিয়ত স্বচ্ছ ও ভালো হয়; কারো ব্যাপারেই যেন খারাপ নিয়ত না হয়। এই যে আমাদের মধ্যে অন্যের ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বেষ পাওয়া যায়, এসব জিনিস মানুষের অন্তরকে কালো করে দেয়। লোকেরা বলে, অমুক আমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করেছে, এখন তার ব্যাপারে অন্তরে হিংসা হবে না তো কী হবে? ভালো আচরণকারীর প্রতি কি বিদ্বেষ হয়? হয় না। বিদ্বেষ তো খারাপ লোকের প্রতিই হয়। মুমিন ব্যক্তির মহত্ত্ব তো এখানেই যে, তার সঙ্গে যে খারাপ আচরণ করে , তার প্রতিও সে বিদ্বেষ রাখে না। আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দেয়। লাইলাতুল কদরে সকল পাপীর পাপ ক্ষমা করা হয়; কিন্তু যাদের ক্ষমা করা হয় না, তাদের মধ্যে অন্যের ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যক্তি অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা কদরের রাতের মতো বরকতময় রাতেও তাকে ক্ষমা করেন না। সুতরাং

আমার সঙ্গে যত বড় অবিচার করা হোক, তাকে আমরা ক্ষমা করে দেব। তার ব্যাপারে অন্তরে কোনো ধরনের বিদ্বেষ রাখব না। এরপর দেখবেন তার বরকত কী?

ফয়েয কীভাবে জারি হয়?

যখনই নিয়তের মধ্যে ইখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে, তখন আমলও কবুল হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার ফয়েজও জারি করে দেন। দেখুন, আজ মাদরাসা তো অনেক আছে; কিন্তু সব মাদরাসার ফয়েজ আগে বাড়ে না। বড়-বড় মহল অনেক দেখেছি; উজাড় পড়ে আছে। একটি বিল্ডিং কেউ মাদরাসার নিয়তে বানিয়ে দিয়েছেন, আজ সেখানে ইংরেজি স্কুল চলছে। তো প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যে মাকবুলিয়্যাত জোটে না। কেন? নিয়তের স্বচ্ছতা ও ইখলাসের ত্রুটির কারণে সমস্যা তৈরি হয়ে যায়।

আমাদের আকাবির ওলামায়ে দেওবন্দ-এর জীবনের দিকে তাকান। একেকজনের জীবনে এমন ইখলাস দেখা যায় মানুষ হয়রান হয়ে যায়। সেই ইখলাসের কারণেই তাদের ফয়েজ আজো জারি আছে। গোটা পৃথিবীর যেখানেই যাবেন, সেখানেই তাদের রূহানী সন্তানদের দীনের খেদমতে মশগুল দেখতে পাবেন।

یہ علم و ہنر کا گہوارا تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے
ہر پھول یہاں یک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے
عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل
آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل

এটি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দোলনা, ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

এখানের প্রতিটি ফুলই একেকটি স্ফুলিঙ্গ। এখানে প্রতিটি বৃক্ষই একেকটি মিনার।

আবেদের একিন দ্বারা আলোকিত মনীষীদের সাচ্চা শুভ্র নেক আমল পৃথিবীর চোখগুলো হয়তো দেখেইনি। ইখলাসের এমন মনোরম তাজমহল।'

ইখলাসের বরকতেই এমন সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া যায়। আমাদের ওইসব বন্ধু, যারা দীনী মাদরাসাসমূহ পরিচালনা করেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে বলছি, আল্লাহর নিকট তাহাজ্জুদ পড়ে-পড়ে ইখলাস প্রার্থনা করুন। নামাযসমূহের পর প্রার্থনা করুন। অন্তরে দরদ থাকবে, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে কবুলিয়্যাতের ফয়সালা হয়ে যাবে। সুতরাং আজকের এই মাহফিলে প্রথমত আমরা অন্তরে এই প্রতিজ্ঞা করব যে, সকল বিষয়ে ও কাজে আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করব। দ্বিতীয়ত আমরা আমাদের অন্তরে কারো ব্যাপারে হিংসা-বিদ্বেষ রাখব না। তৃতীয়ত আমরা দেহ-মন দিয়ে সর্বদা একমাত্র আল্লাহর স্মরণে থেকে জীবন কাটাব একেবারে উকূফে কালবীর সঙ্গে।

সুতরাং আপনি যতটুকু সময়ই নিয়ে এসে থাকুন, তিন, চার অথবা পাঁচদিন সর্বদা উজুর সঙ্গে থাকুন এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণে থাকুন। পরস্পর কথা বলা বন্ধ রাখুন। এগুলো লক্ষ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। এখানে শুধু এটিই বেশি-বেশি করতে হবে যে, আমাকে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে সময় পার করতে হবে।

বড়দের তরবিয়তের পদ্ধতি

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) ও হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী (রহ.) যখন পড়ালেখা শেষ করলেন, তখন তারা হযরত থানুবি (রহ.)-এর খেদমতে কিছু দিন সময় কাটাতে থানাভবন গেলেন। ছাত্র ছিলেন টগবগে যুবক এবং ইল্‌মি যোগ্যতাও ছিল অসাধারণ।

খানকায় প্রথম দিনটা কাটালেন। যখন রাত হলো, তখন উভয়কে একই কামরায় রাত কাটাতে বলা হলো। সেখানে তারা পরস্পরে ইল্‌মি বিষয় নিয়ে কথোপকথন শুরু করে দিলেন। যখন তাদের কথোপকথনের শব্দ কিছুটা উঁচু হয়ে গেল, তখন বড় মিঞা যিনি খানকাহর দায়িত্বে ছিলেন, তাদের কাছে এসে বললেন, আপনারা কি শাহজাদা হয়ে গেছেন? খানকার নিয়মকানুন কী-কি কিছুই জানা নেই? এখানে সব বান্দাকেই নিজ-নিজ এবাদতে মশগুল থাকতে হয়! একজন অপরজনের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এখানে কথা বলা যায় না। আপনারা তো পুরোপুরি বাহাছ শুরু করে দিয়েছেন। আজ প্রথম দিন; তাই সর্তক করা হলো। ভবিষ্যতে পরস্পর কথা বলা নিষেধ। অন্যথায় আপনাদের কাঁথা-বালিশ খানকার বাইরে রেখে আসা হবে।

আমাদের বড়রা তো এমন সুলূক শিখিয়েছেন যে, খানকায় কথা বলা-ই নিষেধ করে দিয়েছেন! আপনারাও এ-বিষয়ে ভেবে দেখুন যে, পরস্পরে কথা

বলার জন্য কতটুকু অনুমোদিত হতে পারে? তাই বলছি, যতটুকু সময়ই নিয়ে আসেন, সর্বদা যেন এই চিন্তা থাকে যে, আল্লাহর স্মরণ যেন নসিব হয়ে যায়। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে প্রতিটি মুহূর্তে অন্তরে আল্লাহর স্মরণ যেন তাজা থাকে। কথা ততটুকুই বলা যতটুকু প্রয়োজন, অপ্রয়োজনে কথা না-ই বলা; বরং নীরবে-নির্জনে নিজের প্রভুর স্মরণে বিভোর থাকবেন। যখন এই কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে চলবেন, তখন আল্লাহও আপনার মনের বাসনা পূরণ করে দেবেন। হে আল্লাহ! আমাদের এই উপস্থিতিকে আপনি কবুল করে নিন। আমীন। ছুম্মা আমীন ।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব

'ইসলাম উত্তম চরিত্রকে অনেক বড় মর্যাদা দিয়েছে। মানবতা বলেই উত্তম চরিত্রকে। 'ইনসান' শব্দটি কোনো-কোনো আহলে ইল্‌মের নিকট 'উন্‌স' শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে, যার অর্থ হলো মহব্বত, ভালোবাসা। তো যে-ইনসানের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা থাকবে, সহমর্মিতা ও সমবেদনা থাকবে, অন্তর হিংসা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে পাক হবে, ঘৃণা নয়; বরং প্রেম-ভালোবাসার জীবন যাপন করবে, সে মানুষটির মধ্যে মানবতা বেশি। আর এ-কারণে অবশ্যই আল্লাহর নিকট তার মর্যাদাও বেশি হবে।

গাছের মূল্য যেভাবে তার ফল দিয়ে নির্ধারণ করা হয়, মানুষের মূল্যও তার আখলাক দিয়ে নির্ধারণ করা হয়।'

উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۔

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَر : وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۔

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

ফলেই গাছের পরিচয়

গাছকে তার ফল দিয়েই চেনা যায়। যে-গাছের ফল ভালো হয়, লোকেরা তা নিজের বাড়িতে লাগিয়ে আনন্দিত হয়। তার দেখভাল করে। সেই গাছটির কোনো প্রকার ক্ষতি হতে দেয় না। কোনো শিশু কিংবা প্রাণী যদি তা নষ্ট করে, তাহলে মন খারাপ করে, অসন্তুষ্ট হয়। পক্ষান্তরে যে-গাছের ফল তিতা, যার ফলে পোকা লেগে থাকে, যার মধ্যে শুধু কাঁটা-ই কাঁটা, লোকেরা তার কাছে যেতেও পছন্দ করে না; বরং কখনো-কখনো সেই গাছ কেটেই ফেলে।

মানুষকে তার চরিত্র দিয়ে চেনা যায়

মানুষকে তার স্বভাব-চরিত্র দিয়েই চেনা যায়। যে-মানুষটির চরিত্র ভালো, সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলে, আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে প্রশান্তিদায়ক হয়ে বসবাস করে, লোকেরাও তার সঙ্গে থেকে আরাম পায়। তাকে নিজেদের অন্তরে স্থান করে দেয়। সর্বদা তার সান্নিধ্যে থাকার আকাঙ্ক্ষা করে। সে মানুষের সঙ্গে আল্লাহর জীবন্ত রহমত হয়ে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে যার চরিত্র খারাপ, তার পাশেও কেউ বসতে চায় না।

এ-কারণেই ইসলাম উত্তম চরিত্রের প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করেছে। মানুষ তো সে, যার মধ্যে মানবতা থাকবে, যে আল্লাহর বান্দাদের জন্য রহমত হয়ে বসবাস করে, যে মানুষের উপকার করে, অন্যের বিপদে কাজে আসে, অন্যের দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখে এবং শুধু আল্লাহর জন্য তাঁর সৃষ্টির সাথে মহব্বত রাখে।

পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মানুষ

যে-মানুষ অন্যের মনে ব্যথা দেয়, অন্যের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে বসবাস করে, সে প্রকৃত অর্থে মানুষ নয়! বরং সে জীবন্ত মসিবত, পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

'তারা চতুষ্পদ জন্তু। বরং তার চেয়েও অধম। তারাই উদাসিন।'[১৪৩]

পশুর মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস

জন্তু তিন শ্রেণির।

১। উপকারী জন্তু, যারা কারো কোনো ক্ষতি করে না।

কিছু জন্তু এমনও আছে, যারা নিজেরা কষ্ট সহ্য করে নিলেও অন্য প্রাণীকে কষ্ট দেয় না। যেমন– গাভি, মহিষ, বকরি ইত্যাদি। বকরি যত ক্ষুর্ধাতই থাকুক অন্য জন্তুর ওপর আঘাত করে না। ক্ষুধায় মরে যাবে; কিন্তু অন্য প্রাণীকে কষ্ট দিবে না। এক গাভি আরেক গাভির ওপর কখনো হামলা করে না। ক্ষুধা থাকলে ক্ষুধা সয়ে যায়। এটা সবচেয়ে উত্তম জন্তু, যে নিজের আরামের জন্য অন্য জন্তুকে কষ্ট দেয় না। নিজে কষ্ট সয়ে যাবে; তারপরও অন্যকে কষ্ট দেবে না। এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য ।

২। হিংস্র জন্তু।

জন্তুদের আরেকটি প্রকার আছে, যারা ক্ষুধার সময় অন্য জন্তুদের ওপর হামলা করে ভক্ষণ করে। কিন্তু যখন তাদের পেট ভরা থাকে, তখন তাদের কোনো বিষয়ে পরোয়া থাকে না। যেমন– সিংহ ও বাঘ। প্রসিদ্ধ আছে, সিংহের যখন পেট ভরা থাকে, তখন ঈঁদুরও যদি তার গায়ে উঠে নাচানাচি করে, তাতে সে কিছুই বলে না। তো প্রয়োজনের সময় হিংস্র হয়ে ওঠে এবং

---

১৩৭. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৯

মানুষ ও জীবজন্তু হত্যা করে খায় আর পেট যখন ভরা থাকে, তখন কোনো পরোয়া থাকে না, কে এল আর কে গেল।

৩। ক্ষতিকর জন্তু।

আরেক প্রকারের জন্তু আছে, যেগুলো সর্বদা অন্যের ক্ষতি করার পেছনে লেগে থাকে; অথচ এতে তার নিজের কোনো লাভ হয় না। যেমন– সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি। বিচ্ছু যখন কাউকে দংশন করে, তখন তার এমন কী আনন্দ লাগে? এতে কি তার ঘুমটা ভালো হয়? নাকি তার ক্ষুধা মিটে যায়? কিছুই হয় না। বরং অন্যকে দংশন করা তার স্বভাব। বিচ্ছুর স্বভাব হলো, যে-বস্তু বা প্রাণির সঙ্গেই তার ধাক্কা লাগবে, তাকেই সে দংশন করে। এটা প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী।

পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট প্রাণী

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

'তারা জন্তুর মতো; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।'[১৪৪]

এর অর্থ হলো, মানুষ যখন পশু হয়ে যায়, তখন নিকৃষ্টতম জন্তুর মতো হয়ে যায়। সাপ-বিচ্ছুর মতো হয়ে যায়। নিজের কোনো লাভ নেই। তারপরও অন্যকে কষ্ট দিয়েই যাবে। আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দিচ্ছে। তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। নিজের চেয়ে নিম্ন শ্রেণির কিংবা উঁচু শ্রেণির ডানের হোক কিংবা বামের, সকলকে মুসিবতে ফেলছে।

এজন্য আপনারাও হয়তো কাউকে বলতে শুনবেন যে, তারা বলে, আমি তার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি। মহিলারা অনেক সময় পরস্পর বলাবলি করে আমি তাকে এমন কথা বলেছি যে, গায়ে আগুন ধরে গেছে। এই প্রকৃতির মানুষগুলো অন্যদের কষ্টেও ফেলে আবার তাতে আনন্দও করে। এ-কারণেই বলা হয়েছে, তারা জন্তুর মতো; বরং জন্তুর চেয়েও অধম।

দীনের মধ্যে উত্তম চরিত্রের দীক্ষা

আল্লাহ তা'আলা আমাদের মানুষ বানিয়েছেন, সম্মানিত করেছেন। এজন্য আমাদের উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে জীবন যাপন করা উচিত। নবী কারীম

---

১৪৪. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৯

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেও পয়গাম এসেছে যে, আমরা যেন উত্তম চরিত্র ধরে রেখেই জীবন কাটাই। মানুষের যতটা কল্যাণ কামনা আমরা করব, আল্লাহও আমাদের ব্যাপারে ততটা কল্যাণের ফয়সালা করবেন।

ইসলাম উত্তম ব্যবহারের আদেশ দেয়। নবীজির মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন–

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

'হে হাবীব! আপনি উত্তম চরিত্রের সর্বোচ্চ শিখরে আছেন।'

আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম চরিত্র দান করেছিলেন। কুরআনে কারীমের এই ফরমানটি ভালো করে বুঝে নিন। যেহেতু এখানে অনেক তালিবে ইল্‌ম রয়েছেন, যারা ভবিষ্যতে হাফেয হবেন, আলেম হবেন এজন্য শুরুতেই বিষয়টি তাদের মগজে বসিয়ে দিতে চাই, মানবতা কাকে বলে? ইল্‌ম কাকে বলে?

কিছু শব্দ মুখস্থ করা ও জানার নাম ইল্‌ম নয়; বরং মানুষের উত্তম চরিত্র ও চালচলনকেই ইল্‌ম বলে। যদি এই উত্তম আখলাক আমরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারি, তাহলে আমরাও উত্তম মানুষ হতে পারব। আর যদি এরকম হতে না পারি, তবে এই শব্দমালা আমাদের কোনো কাজে আসবে না। শিশুদেরকে এই বিষয়ে অবগত করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা উত্তম চরিত্রকে কত ভালোবাসেন।

আখলাকের তিনটি স্তর রয়েছে

১. আখলাকে হাসানাহ (উত্তম চরিত্র) অথবা আখলাকে আলিয়া (উন্নত চরিত্র)

২. আখলাকে কারীমা (উদার ও দরদী চরিত্র)

৩. আখলাকে আযীমা (মহান চরিত্র)

আখলাকে হাসানাহ বা আখলাকে আলিয়া

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)কে আদেশ দিয়েছেন–

يَا خَلِيْلُ! اَحْسِنْ خُلُقَكُمْ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ

'হে আমার বন্ধু! স্বীয় চরিত্রকে উত্তম করে নিন। যদিও তা কাফেরদের সাথে হোক।'

তো ভালো স্বভাব-চরিত্রকে আখলাকে হাসানাহ বলে। আখলাকের এই প্রথম স্তরকে আখলাকে আলিয়াও বলে। এমন আখলাকের আদেশ ইহুদি সম্প্রদায় তথা বনী ইসরাঈলদের দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে আখলাকে আলিয়া সৃষ্টি করো।

এই আখলাকে আলিয়া কী জিনিস? এর অর্থ হলো, কারো সঙ্গে বাড়াবাড়ি করো না। তবে কেউ যদি তোমার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে, তোমাকে কষ্ট দেয় এবং তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও, তাহলে তুমি প্রতিশোধ নিতে পার। তবে ততটুকু যতটুকু কষ্ট তোমাকে সে দিয়েছে। এর বেশি নিতে পারবে না। যদিএর চেয়ে বেশি কর, তাহলে সেটা জুলুম হবে। সারকথা, অন্যের সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ সমতা নিয়েই চলাফেরা করবে।

হযরত মুসা (আ.)-এর আখলাক

আখলাকে হাসানা হলো, মানুষ অন্যদের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে। যদি কেউ তার প্রতি অবিচার করে, তাহলে সে ততটুকু প্রতিশোধ নিতে পারবে যতটুকু তার সঙ্গে করা হয়েছে। যেমন– তাওরাতে এই হুকুমটিই দেওয়া হয়েছে–

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ.

'জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান ,নাকের বদলে নাক; দাঁতের বদলে দাঁত (ভেঙে দিতে পারবে)।'[১৪৫]

তো এই ছিল তাওরাতের মূল বিধান। ইহুদি জাতিকে আল্লাহ তা'আলা এই আখলাকই শিখিয়েছেন যে, তোমরা প্রতিশোধ কেবল ততটুকু নেবে, যতটুকু অবিচার তোমাদের সঙ্গে করা হয়েছে। এরচেয়ে বেশি নয়। আজকাল লোকেরা বলে, আমরা ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেব। এটা অন্যায়। এটা ঠিক নয় ।

'ইটের জবাব পাথর দিয়ে' এই লজিক বলছে, আজ আমাদের মধ্যে আখলাক নেই। উত্তম চরিত্র নেই। 'ইটের জবাব পাথর দিয়ে' এর চেয়ে বড় বদ-আখলাকি আর কী হতে পারে? প্রতিশোধপ্রবণতা আজ মানুষকে অন্ধ বানিয়ে ফেলেছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, কেউ কারো মঙ্গল দেখতেই পারে না। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

---

১৪৫. সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৫

২। আখলাকে কারীমানা

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলা এর চেয়েও উন্নত আখলাক দান করেছিলেন। তাকে 'আখলাকে কারীমানা' বলা হয়। 'আখলাকে কারীমানা' কী?

যদি কেউ আপনার সঙ্গে ভালো আচরণ করে, তবে আপনিও তার সঙ্গে ভালো আচরণ করুন। যদি সে আপনার সঙ্গে মন্দ আচরণ করে, তাহলে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। এ-কারণেই খ্রিষ্টানরা নিজেদের ধর্মীয় মাহফিলগুলোতে খুব মজা করে বলে থাকে, যদি কেউ তোমার গালে একটি চড় মারে, তাহলে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও এবং অপর গালটিও তার সামনে পেতে দাও। তো ক্ষমা করাকেই বলে আখলাকে কারীমানা। এটা কারীম তথা দয়ালু লোকদের কাজ। তারা শত্রু-মিত্র সবাইকেই ক্ষমা করে দেন। কেউ যদি মূর্খতার কথা বলে, তো জবাবে মূর্খতা প্রদর্শন করে না ।

সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আ.) দাঁড়িয়ে ছিলেন। একব্যক্তি এসে আজেবাজে কথা বলতে লাগল। হযরত তাকে দু'আ দিতে শুরু করলেন। সে হযরতকে গালি দিয়ে যাচ্ছিল আর তিনি তাকে দু'আ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একব্যক্তি প্রশ্ন করল, হযরত! বড় আশ্চর্যের ব্যাপার! সে আপনাকে গালি দিচ্ছে আর আপনি তাকে দু'আ দিয়ে যাচ্ছেন?

উত্তরে তিনি বললেন–

كُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ

'প্রত্যেক পাত্র হতে তা-ই বের হয়, যা তাতে থাকে।'

তার মধ্যে যা ছিল, তা-ই বের হচ্ছে, আমার মধ্যে যা আছে, তা-ই বের হচ্ছে। অর্থাৎ– যার মধ্যে মন্দ থাকবে, তার থেকে মন্দই বের হবে । আর যার মধ্যে কল্যাণ থাকবে, তার থেকে কল্যাণই বের হবে।

আমাদের করুণ দশা

আজ আমাদের অবস্থা কী? সামান্য একটু রাগ হলেই নিজের হাকীকত জাহির হয়ে যায়। আমরা একথাও ভুলে যাই যে, আমার মাথায় পাগড়ি আছে, টুপি আছে। চেহারায় সুন্নত ঝলমল করছে, বস! গালাগালি শুরু হয়ে যায়। বিবিকে গালি দেই, সন্তানাদির গালমন্দ করি। এই সব করেই আমরা দীনদার বনে আছি। মানুষকে দীনের দাওয়াত দিচ্ছি। যিকিরের মাহফিলে

বসে উচ্চৈঃস্বরে তাসবীহও পড়ছি। এই লোকদেখানো তাসবীহের কী মূল্য? ওপরে লা-ইলাহা ইল্লাহ আর ভেতরে কালোপনা। এতে কী লাভ? আসল বিষয় তো হলো, আমাদের মধ্যে আখলাক আছে কিনা? মানুষ যখন হয়েছি তো মানুষের মতো মানুষ হয়ে জীবন যাপন করি। এতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উভয় জাহানে সফলকাম করবেন।

শরীয়তের সৌন্দর্য

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত উভয় আখলাকের অনুমতি প্রদান করেছেন। উভয়টিই ইসলামে অনুমোদিত। ইহুদিরা আখলাকে আলিয়া আর খ্রিষ্টানরা আখলাকে কারীমানা কেন? কারণ, ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য মনোনীত ধর্ম। নরম তবিয়তের লোকেরা ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন। তাই তারা এই হুকুমের ওপর আমল করুক। অর্থাৎ– আখলাকে কারীমানা অনুযায়ী। আবার কিছুলোক আছেন, যাদের মধ্যে সাহস ও বাহাদুরি বেশি। তারা কারো বাড়াবাড়ি সহ্য করে না। তাদের বলা হলো, আচ্ছা ভাই! তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও তো নাও; তবে ততটুকু নেবে যতটুকু জুলুম তোমার ওপর করা হয়েছে।

শরীয়তের হুকুমের সৌন্দর্য দেখুন! যদি সাহসী ব্যক্তিকে বলা হয় 'তুমি ক্ষমা করে দাও, সে উত্তর দেয়, ইসলামকে সাত সালাম, এ তো আমাদের ভীরুতা শেখাচ্ছে। আর যদি নরম তবিয়তের ব্যক্তিকে বলা হয়, সে তোমার সঙ্গে জুলুম করেছে; যাও তাকে থাপ্পড় মেরে প্রতিশোধ নাও। সে বলে ইসলামকে সাত সালাম। এতো দেখছি আমাকে ঝগড়া শেখাচ্ছে। তো এখানেই শরীয়তের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করুন। এটি যেহেতু বিশ্বধর্ম; কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এজন্য মহা সৃষ্টিকর্তা উভয় পন্থাকেই বৈধ করে দিয়েছেন। যার যে-মানসিকতা, সে সেই পন্থা অবলম্বন করতে পারে।

৩. আখলাকে হাসানাহ

উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে আল্লহ তা'আলা এর চেয়েও উচ্চ মানের চরিত্র দান করেছেন, যাকে 'আখলাকে আযীমাহ' তথা 'মহান চরিত্র' বলা হয়। এটি আখলাকে আলিয়া ও আখলাকে কারীমাহ হতেও উন্নত ও উত্তম আখলাক। আখলাকে আযীমাহ-এর পরিচয় হলো–

যদি কেউ আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, তাহলে আপনি তার থেকে প্রতিশোধ তো নেবেনই না; বরং তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে সদ্ব্যবহার করবেন, নরম আচরণ করবেন। আল্লাহ বলেন–

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

'লোকেরা যদি তোমার সঙ্গে মন্দ আচরণ করে, তবে তুমি তাদের সঙ্গে ভালো আচরণ করো।'

মন্দ লোকদের সঙ্গেও উত্তম আখলাক প্রদর্শন করো। এরই নাম আখলাকে আযীমাহ।[১৪৬]

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নবীজির প্রশংসা করে বলছেন–

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

'হে প্রিয় হাবীব! আপনি আখলাকের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।'[১৪৭]

আখলাকে আযীমাহর উদাহরণ

উহুদের যুদ্ধে সাহাবাদের হতে একটি ইজতিহাদি ভুল হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন, পাহাড়ের ওপর আমাদের ডিউটি কাফেরদের পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। সুতরাং যখন কাফেররা পালিয়ে গেল, তখন মুসলমানগণ গনিমতের মাল জমা করছিলেন। তাঁরা সাহায্যের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে নেমে এলেন। খালেদ ইবনে ওলীদ (যিনি তখনো ঈমান আনেননি) পাহাড়ের পেছন দিক থেকে অতর্কিতে হামলা করে বসলেন।

এরপরই যুদ্ধের চিত্র বদলে গেল। নিশ্চিত জয় পরাজয়ে পরিণত হলো। মুসলিমদের মধ্যে প্রায় সত্তরজন সাহাবি শাহাদাত বরণ করলেন। এতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রাযি.)-এর জন্য তাঁর অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত ছিল। এই বেদনাহত অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে প্রিয় রাসূল!

فَاعْفُ عَنْهُمْ

আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন। তারা ইজতিহাদি ভুল করে ফেলেছে। বুঝতে পারেনি। তাঁদের নিয়ত খারাপ ছিল না। তাদের শুধু বুঝতে ভুল

---

১৪৬. সূরা হা মীম আস-সজদা : আয়াত ৩৪

১৪৭. সূরা কলাম : আয়াত ৪

হয়েছে। তারা ভেবেছিলেন, যখন দুশমন পিছপা হয়ে গেছে, তা হলে এখন কাজ শেষ। তো আপনি এখন কী করবেন? এসব সাহাবাদের ক্ষমা করে দিন। শুধু মাফই নয় বরং এক পা অগ্রসর হয়ে বললেন–

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

'আপনি নিজেও তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, যেন আল্লাহও তাঁদের ক্ষমা করে দেন।

শুধু এতটুকুই নয় বরং ক্ষমা করা ও ক্ষমার আবেদনের পাশাপাশি–

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

'হে নবী! তাদেরকে নিজের পরামর্শেও অন্তর্ভুক্ত করে নিন।'

লক্ষ করুন! আল্লাহ বান্দাদের প্রতি কত দয়ালু! আর একেই বলে আখলাকে আযীমাহ।

আখলাকে আযীমার শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা সাধারণ মুসলিমদের আখলাকে আযীমার শিক্ষা দিয়েছেন। যদি তিনি এর আদেশ জারি করে দিতেন, তা হলে এই আখলাক আমাদের ওপর ফরজ হয়ে যেত। তখন পছন্দ বলে কোনো কিছু থাকত না। এ-কারণেই আল্লাহ বললেন, আমি কাকে পছন্দ করি? এমন ঈমানদারদের, যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আছে–

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ

'ক্রোধ সংবরণকারীরা।'

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

'মানুষকে ক্ষমাকারীরা।'

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

'এবং আল্লাহ আশেকদের ভালোবাসেন।'[১৪৮]

অর্থাৎ– তোমাদের ক্রোধও সংবরণ করতে হবে, ক্ষমাও করতে হবে এবং তাদের প্রতি উত্তম আচরণও করতে হবে। তো তিন কদম এগুলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে।

---

১৪৮. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩৪

একেই বলে আখলাকে আযীমা

হযরত হুসাইন (রাযি.) একবার মেহমানের সঙ্গে বসা ছিলেন। দাসিকে আদেশ করলেন মেহমানের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসো। ঘরে শুধু তরকারির ঝোল ছিল। দাসি সেই ঝোল গরম করে পেয়ালা ভর্তি করে নিয়ে আসছিল। হঠাৎ বেখেয়ালে কিছুর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে গরম ঝোলের বাটি হাত ফসকে পড়ে গেল এবং গিয়ে একেবারে হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর গায়ে পড়ল। বলুন, ফুটন্ত সুপ যদি গায়ে পড়ে, তখন কেমন লাগে? কী পরিমাণ রাগ হয়। হযরত হুসাইন (রাযি.)-এর চেহারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। দাসিও তার ঘরের তরবিয়তপ্রাপ্তা ছিল। তাঁর আখলাকে আযীমা সম্পর্কে অবহিত ছিল। হযরতের চেহারায় গোস্বার ছাপ দেখে দাসি সঙ্গে-সঙ্গে কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে উঠল–

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ

'আর ক্রোধ সংবরণকারীরা।'

সায়্যিদুনা হযরত হুসাইন (রাযি.) সঙ্গে-সঙ্গে স্বীয় ক্রোধকে সংবরণ করে নিলেন। যখন দাসি দেখল, তিনি ক্রোধ সংবরণ করে নিয়েছেন, তখন সে পড়তে লাগল–

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

'মানুষকে ক্ষমা প্রদর্শনকারী।'

এতে তিনি মুচকি হেসে বললেন, যাও; তোমাকে মাফ করে দিলাম।'

এবার দাসি পড়ল–

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

'আল্লাহ উত্তম চরিত্রবানদের ভালোবাসেন।'

হযরত হুসাইন (রাযি.) বললেন, যাও; তোমাকে আজাদ করে দিলাম। এই ছিল আখলাকে আযীমা।

মন্দ লোকের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার

প্রতিশোধ তো দূরের কথা, শুধু ক্ষমা করাই নয় বরং মন্দ লোকের সঙ্গেও উত্তম আচরণ করতে হবে। আদেশ তো এটা হয়েছে যে, আমার সঙ্গে যতখানি খারাপ আচরণ করুক আমি তার সঙ্গে ততখানি ভালো আচরণ করব।

হাদীছে এসেছে।

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ

'যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে রাখো।'

وَاعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ

'যে তোমার ওপর জুলুম করবে, তাকে তুমি ক্ষমা করো।'

وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ

'আর যে তোমার সঙ্গে মন্দ আচরণ করে, তুমি তার সঙ্গে ভালো আচরণ করো।'

সম্মানিত উপস্থিতি!

ভালোদের সঙ্গে সারা পৃথিবী ভালো আচরণ করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো মন্দদের সঙ্গে ভালো আচরণ করার মধ্যে–

نشہ پلا کے گرانا تو سب کا آتا ہے
مزا تو تب ہے کہ گرتوں تھام لے ساقی

'নেশা পান করিয়ে কাবু করা তো সবাই পারে,
মজার ব্যাপার তো এখানে যে, পড়ন্ত মানুষগুলোকে ধরে রাখবে হে সাকী!।'

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করি

যদি আজ আমরা নিজেদের জীবনাচারের দিকে তাকাই যে, আমরা কেমন আখলাক নিয়ে জিন্দেগি কাটাচ্ছি, তাহলে দেখা যাবে, আখলাকের তিন স্তরের মধ্যে আমরা কোনোটিতেই নেই। সর্বোত্তম স্তর অর্জন তো দূরের কথা সর্বনিম্ন স্তরও আমাদের অর্জিত নেই। কারণ, আমরা তো সঙ্গে-সঙ্গে বলে ফেলি, আমরা ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেই। এমন কথা তো তিন স্তরের কোনো স্তরের মধ্যেই আসে না। আমরা তো ছোট-ছোট বিষয়েরও প্রতিশোধ নেওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মনের মধ্যে বিদ্বেষ জমিয়ে রাখি, বুকটা হিংসায় ভরা। তার পর ভেবে কূল পাই না ইবাদতে কেন স্বাদ লাগে না? তাহাজ্জুদ কেন নসিব হয় না? দু'আ কেন কবুল হয় না? অন্তরে কেন প্রশান্তি আসে না? আরে ভাই! অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ বাসা বাঁধলে প্রাশান্তি আসবে কীভাবে?

বিদ্বেষ চর্চার পরিণতি

বিদ্বেষ কাকে বলে? বিদ্বেষ বলে, কারো দ্বারা কোনো ধরনের কষ্ট পেলাম। এবার সেটা ভুলে না গিয়ে অন্তরে লুকিয়ে রাখলাম। ফলে তার অকল্যাণ কামনা করা, তার ক্ষতির চিন্তায় বিভোর থাকা; এটাই বিদ্বেষ। দেখুন, আজ প্রত্যেকটি অন্তরেই কারো না কারো ব্যাপারে অবশ্যই বিদ্বেষ খুঁজে পাবেন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া।

ভাইয়ের অন্তরে ভাইয়ের ব্যাপারে বিদ্বেষ, বোনের অন্তরেও বিদ্বেষ। একে অন্যের ঘরের রান্নাও খায় না; অথচ পরিচয় দেয়, আমরা সবাই মুসলমান।

স্মরণ রাখুন, আল্লাহ তা'আলা লাইলাতুল কদরে সকল পাপীদের ক্ষমা করে দেন, তবে কয়েকটি পাপও তাতে লিপ্তদের ক্ষমা সেই রাতেও করা হয় না। তার মধ্যে একজন হলো সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে বিদ্বেষ থাকবে। যার অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ থাকবে, লাইলাতুল কদরেও তাকে ক্ষমা করা হবে না। আমরা কি কখনো ভেবেছি, আমাদের অন্তরগুলোও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখা উচিত। এটি তো একটি মোবারক সুন্নতও।

বিদ্বেষমুক্ত অন্তরের পুরস্কার

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবিকে আসতে দেখে বললেন, এ জান্নাতি। জান্নাতের সুসংবাদ তো সবার জন্যই ছিল; কিন্তু নাম নিয়ে নির্দিষ্ট করে এভাবে বলা অনেক মর্যাদার ব্যাপার। অন্য এক সাহাবি মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি মনে-মনে ভাবলাম, এই সাহাবির সঙ্গে আমার সখ্য গড়ে তুলতে হবে। দেখতে হবে, ইনি এমন বিশেষ কী আমল করেন, যার কারণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন।

অবশেষে তিনি সেই সাহাবিকে বললেন, ভাই! আমি আপনার বাড়িতে তিন দিন মেহমান হয়ে থাকতে চাই। সাহাবি উত্তর দিলেন, খুব ভালো। তারপর তিনি তিন দিন তাঁর বাড়িতে মেহমান হয়ে রইলেন এবং তাঁর রাত-দিনের সকল আমল পর্যবেক্ষণ করলেন। তিন দিন পর বললেন, ভাই! আমি তো আপনার মাঝে বিশেষ এমন কোনো আমল দেখতে পাইনি, যা অন্য সাহাবিগণ করেন না! তাহলে কোন আমলের ভিত্তিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নাম নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ শোনালেন? সাহাবি উত্তর দিলেন, বিশেষ কোনো আমল তো আমার নেই; তবে একটি

গুণ আমার মধ্যে আছে। তিনি বললেন, সেটি কী? সাহাবি বললেন, সেটি হলো, প্রতিদিন রাতে শোওয়ার সময় যত মানুষ আমাকে যত রকমের কষ্ট দিয়েছে, তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেই। মনকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করে তার পর ঘুমাই। হতে পারে, আমার এই আমল আল্লাহ তা'আলার ভালো লেগে গেছে আর সেই আমলের বিনিময়ে দুনিয়াতেই আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন।

দুনিয়াবাসীর প্রতি রহম করো

আসুন, আমরাও আল্লাহর জন্য অন্যকে ক্ষমা করা শিখি। হযরত থানুবি (রহ.) বলেন, একব্যক্তির স্ত্রী বড় ধরনের একটা অপরাধ করে ফেলল। এখন সে চাইলে তাকে তালাকও দিতে পারে কিংবা মারধরও করতে পারে। এতে কোনো দোষ হবে না। লোকটি ভাবল, এখন যদি মহিলাকে তালাক দেই অথবা মারধর করি, তো বেচারী পেরেশান হবে। চলো এবারের জন্য ক্ষমা-ই করে দেই। আল্লাহর বান্দী ভুল করে ফেলেছে। তিনি বলেন, তার মৃত্যুর বহুদিন পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখল। তিনি জান্নাতে মনের ইচ্ছামতো ঘোরাফেরা করছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হলো? তিনি বললেন, আমাকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিলেন। সে প্রশ্ন করল, তোমার কোন আমল আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করলেন? তিনি উত্তর দিলেন, বিশেষ কোনো আমল তো নেই। তবে আমার স্ত্রীকে আমি একদিন আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। আল্লাহ আমাকে সেকথা স্মরণ করিয়ে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে আমার বান্দী মনে করে ক্ষমা করেছিলে। যাও; আজ আমিও তোমাকে আমার বান্দা মনে করে ক্ষমা করে দিলাম।

کرو مہربانی تم اہل زمین پر * خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر

তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ করো;
সুউচ্চ আরশের খোদা তোমাদের ওপর করুণা করবেন।

ভালো করো; ভালো হবে

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

যেব্যক্তি অন্যকে দ্রুত ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তা'আলাও কেয়ামতের দিন তাকে দ্রুত ক্ষমা করে দেবেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন, যেব্যক্তি

অন্যের ওজর দ্রুত কবুল করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার ওজর দ্রুত কবুল করবেন ।

খুবই সহজ কাজ। আসুন, আমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দেই। কেয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল ইয্যতও আমাদের প্রতি সদয় আচরণ করবেন ।

পাথেয়র চিন্তা

আমাদের বুযুর্গগণ কী করতেন? তাঁরা ছোট-বড় আমলগুলো খুব যত্নসহ করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। এক বুযুর্গ ছিলেন। পেশা হিসেবে দোকানদারি করতেন। তাঁর নিকট লোকেরা নষ্ট মুদ্রা আনত। সেকালে রূপার মুদ্রার প্রচলন ছিল। অতিমাত্রায় ব্যবহারের কারণে সেটা ক্ষয় হয়ে যেত। মুদ্রার গায়ের লেখাগুলো পড়া যেত না। এগুলোকে নষ্ট মুদ্রা বলা হতো। তো সেই বুযুর্গের নিকট তারা নষ্ট মুদ্রা দিলে তিনি সেগুলো রেখে সদাই দিয়ে দিতেন। জীবনভর তাঁর এটিই নিয়ম ছিল।

যখন তার সময় ঘনিয়ে এল, তিনি অনুভব করলেন, এটাই আমার শেষ সময়। তখন তিনি সেই নষ্ট মুদ্রাগুলোর থলেটি সামনে রেখে দু'আর জন্য হাত তুলে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি সারা জীবন আপনার বান্দাদের থেকে অচল মুদ্রা গ্রহণ করে তাদের ইচ্ছা পূরণ করেছি। আপনিও আমার অচল আমলগুলো কবুল করে আমার প্রতি রহম করুন।

বলুন তো আমরাও কি কেয়ামতের ভয়াবহ দিনের জন্য এভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি? আমরা যদি এভাবে মানুষকে ক্ষমা করতে শিখি, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও এর বিনিময়ে কেয়ামতের দিন আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। অন্তরকে প্রশস্ত করতে হবে। সামান্য বিষয় নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়া, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কথায় হানাহানি, মারামারি শুরু করে দেওয়া, একজনের সঙ্গে সামান্য কিছুতেই দুর্ব্যবহার শুরু করা এগুলো মুমিনের জন্য শোভা পায় না।

আমরা তো মানুষের একটা চুল পরিমাণ আপরাধও ক্ষমা করতে রাজী নই। অথচ আল্লাহর নিকট নিজের বড়-বড় অপরাধ ক্ষমা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন রাতের বেলায় শুতে যাবে, তখন অন্তর থেকে সকল হিংসা-বিদ্বেষকে মিটিয়ে দাও। এটি আমার সুন্নাত। আর যে আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে, সে

আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে। তাহলে বলুন, আমরা কি নবীজির সুন্নাতের ওপর আমল করি?

কখনো কি রাতের বেলা শোওয়ার সময় এমন নিয়ত করি যে, যাদের ব্যাপারে আজ আমি অন্তরে ব্যথা পেয়েছি, তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম। আর যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা ক্ষমা করতে থাকব, তখন বিনিময়ে আল্লাহও আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন।

কামেল মুমিন

আমাদেরও নিজেদের জীবনকে সাজানোর জন্য উত্তম আখলাক ধারণ করার চেষ্টা করতে হবে। যতক্ষণ আমাদের স্বভাব-চরিত্র ভালো না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে আমাদের কোনো মূল্যায়ন হবে না। যেমন– নবীজি ইরশাদ করেন ।

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে কামেল মুমিন সে, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম। অন্য এক হাদীছে এসেছে, ঈমান আনার পর মুমিন ব্যক্তি সবচেয়ে বড় যে-নেয়মত লাভ করে, তা হলো উত্তম চরিত্র ।

মানবতার মানদণ্ড

ইসলাম উত্তম চরিত্রকে অনেক বড় মর্যাদা দিয়েছে। মানবতা বলেই উত্তম চরিত্রকে। ইনসান শব্দটি কোনো-কোনো আহলে ইল্‌মের নিকট উন্‌স শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে, যার অর্থ মহব্বত, ভালোবাসা। তো যে-ইনসানের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা থাকবে, সহমর্মিতা ও সমবেদনা থাকবে, অন্তর হিংসা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে পবিত্র হবে, ঘৃণা নয়; বরং প্রেম-ভালোবাসার জীবন যাপন করবে, সেই মানুষটির মধ্যে মানবতা বেশি। আর এ-কারণে অবশ্যই আল্লাহর নিকট তার মর্যাদাও বেশি হবে।

গাছের মূল্য যেভাবে তার ফল দিয়ে নির্ধারণ করা হয়, মানুষের মূল্যও তার আখলাক দিয়ে নির্ধারণ করা হয়। মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান পুঁজি হলো তার ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব দেখতে যদিও খুব সাধারণ মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, এই ব্যক্তিত্ব দিয়েই মানুষ পৃথিবীর দামি থেকে দামি বস্তু ক্রয় করতে সক্ষম হয়। কারণ, কথিত আছে, পৃথিবী তরবারির মোকাবেলা করতে পারলেও ব্যক্তিত্বের মোকাবেলা করতে পারবে না।

আখলাকের তলোয়ার

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারাকে উত্তম আখলাক দ্বারা জয় করেছিলেন। একবার একলোক আমার সামনে বলছিল, জনাব! ইসলাম তো তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেটা কীভাবে? সে বলল, কিছু যুদ্ধবাজ ও সাহসী লোক পয়গম্বর (আ.)-এর আশেপাশে জমা হয়ে গিয়েছিল। তারা পেশীশক্তি দিয়ে গোটা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আমি বললাম, সেই যুদ্ধবাজ সাহসী লোকগুলোকে পয়গম্বর (আ.)-এর আশেপাশে কোন তরবারি একত্রিত করেছিল? কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে উত্তর দিল, এরা তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আখলাকে মুগ্ধ হয়ে কাছে ভিড়েছিল। গোটা পৃথিবীতে ইসলাম তরবারি নয়; বরং এই উত্তম আখলাকই প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন–

فُتِحَتِ الْمَدِيْنَةُ بِالْاَخْلَاقِ

'মদীনা আখলাক দিয়ে বিজিত হয়েছিল ।'

নবীজি আখলাকের তরবারি দিয়েই মদীনাকে বিজয় করেছিলেন।

নবীজির উত্তম চরিত্রের কিছু ঝলক

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক অভ্যাস ছিল, তিনি উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করে মানুষের অন্তর জয় করে নিতেন।

এক গ্রাম্যলোকের অন্তর জয়

এক গ্রাম্যলোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করল। মাহফিলে বসে দীর্ঘ সময় নসীহত শুনল। মজলিস ভাঙার পর তার পেশাবের প্রয়োজন দেখা দিল। সে ঝট করে সরে গিয়ে মসজিদের এক কোণে বসে পেশাব করতে লাগল। পাড়া গাঁয়ের লোকেরা সাধারণত ঘরের বাইরে খুব নিকটেই বসে এসব কাজ সেরে থাকে। সে-ও তেমনই করল। সাহাবায়ে কেরাম দেখেই তাকে বাধা দিতে চাইলেন। কিন্তু দয়ার নবী তাদের নিষেধ করে বললেন, তাকে এখনই কিছু বলো না। আগে পেশাব সেরে নিতে দাও। যখন সে পেশাব থেকে ফারেগ হলো, নবীজি তাকে ডেকে মহব্বতের সাথে কাছে বসালেন এবং বোঝালেন, দেখো, মসজিদ আল্লাহর ঘর, আল্লাহ অনেক বড়

ও সুমহান। তার ঘরের মর্যাদা রক্ষা করা ও তা পবিত্র রাখা আমাদের দায়িত্ব। এত মহব্বতের সাথে কথাগুলো বললেন যে, খুব সহজেই সে বিষয়টি বুঝে ফেলল। সেই গ্রাম্য সাহাবি ভীষণ আনন্দিত হলেন আবার বিস্মিতও হলেন। আরে! এত বড় অপরাধ করলাম; অথচ তিনি আমাকে একটু বকাঝকাও করলেন না। একটু বকুনিও দিলেন না। এমনকি একটু লজ্জিতও করলেন না। বরং অত্যন্ত আদর-সোহাগ করে কথা বুঝিয়ে দিলেন। সে যখন যাচ্ছিল, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু কাপড় হাদিয়া দিলেন এবং পায়ে হেঁটে যেতে দেখে একটি বাহনও হাদিয়া দিলেন। সে এসব পেয়ে সে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রইল। তারপর কাপড় পরিধান করে বাহনে আরোহণ করল। তারপর আস্তে-আস্তে সে নিজের গ্রাম অভিমুখে রওনা হলো। গ্রামের নিকট পৌঁছামাত্রই উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে ডেকে বলতে লাগল, ও চাচা! ও মামা! ও অমুক! তখন সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী হয়েছে? এমন চিৎকার করছ কেন? তখন সে বলল, আমি এমন এক শিক্ষক দেখে এসেছি, যাঁর মতো মহান মানুষ জীবনে কখনো দেখিনি। আমি এত বড় অপরাধ করা সত্ত্বেও তিনি আমার সঙ্গে কোমল আচরণ করেছেন। আমাকে ক্ষমা করেছেন, কাপড়ও দিয়েছেন, একটা বাহনও দিয়েছেন।

দেখুন, তার কত উন্নত আখলাক! গ্রামবাসীরা শুনে বলল, তবে এমন উত্তম চরিত্রের অধিকারী মহামানবের নিকট তোমার সঙ্গে আমরাও যাব। অবশেষে সেই গ্রাম থেকে প্রায় তিনশত নারী-পুরুষ নবীজির খেদমতে হাজির হয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। তো নবীজি এভাবেই মানুষের অন্তর জয় করেছেন এবং উত্তম আখলাকের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শত্রুর অন্তর জয়

নবীজি যখন হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওনা হচ্ছিলেন, তখন তার মন চাচ্ছিল, কাবাঘরে ঢুকে দু-রাকাত নামায পড়ি, আল্লাহর দরবারে একটু দু'আ করি, তার দরবারে সেজদায় পড়ে কিছুক্ষণ সময় কাটাই। তাই তিনি কাবাঘরের চাবিরক্ষক ওছমান যে কিনা বনু শাইবা গোত্রের লোক ছিল, তাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, ভাই! একটু বাইতুল্লাহর ঘর খুলে দাও; আমি দু-রাকাত নামায পড়ব। সে খুলতে অস্বীকার করল। তিনি অনেক কাকুতিমিনতি করেও ব্যর্থ হলেন। সে তখন মুসলমান হয়নি। অবশেষে নবীজি তাকে বললেন, ওছমান! এমন একটা দিন আসবে, আজ যেভাবে তুমি

চাবি হাতে দাঁড়িয়ে আছ, সেদিন আমার হাতে এভাবে চাবি থাকবে। এমনিভাবে আমি এখন যেভাবে তোমার নিকট চাবি চাচ্ছি, তুমিও খালি হাতে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। চিন্তা করে দেখো; তখন কী হবে? কথাগুলো শুনে সে ক্রুদ্ধ হয়ে নবীজিকে কিছু অপমানজনক কথা শুনিয়ে দিল; কিন্তু চাবি দিল না। নবীজি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শেষবারের মতো বাইতুল্লাহর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকালেন। বিড়বিড় করে বললেন, হে মক্কা! তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছে না বলে তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে ।

নবীজি নীরবে মক্কা হতে হিজরত করে মদীনার পথে পা বাড়ালেন । মক্কা অভিযানে যখন নবীজি বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন মক্কার লোকেরা চরম আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় ছিল। তাদের ধারণা ছিল, আজ মুসলমানরা গুনে-গুনে প্রতিটি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে। কারও ধারণা ছিল, আজ গোটা মক্কার কোনো নারীর ইজ্জত অক্ষুণ্ন থাকবে না। কারও ধনসম্পদ নিরাপদ থাকবে না। তাই তারা ঘরের দরজা বন্ধ করে আত্মগোপন করে ছিল। যখন অর্ধরাত পার হওয়ার পরও কোনো ঘর থেকে নির্যাতিত নারীর আর্তচিৎকার ভেসে এল না, পল্লির কারো ঘরে মুসলিম বাহিনীর কোনো সৈন্যকে দেখা গেল না, তখন মক্কার নারীরা ভীষণ অবাক হলো। তারা পুরুষদের বলল, একটু বাইরে গিয়ে দেখো তো মুসলমানরা কোথায়? এরা কোনো ষড়যন্ত্র করছে না তো আবার! পুরুষরা এসে যখন দেখল, মুসলমানরা সবাই হারাম শরীফে কেউ সেজদায় পড়ে আছে, কেউ বাইতুল্লাহর গেলাফ ধরে কাঁদছে, কেউ মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছে, সবাই আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন আছে। এতে তারা সীমাহীন বিস্মিত হলো ।

পরদিন নবীজি বাইতুল্লাহর চাবিররক্ষক ওছমানকে ডেকে পাঠালেন। সে চাবি নিয়ে এল। নবীজি চাবি নিয়ে কাবাঘরের দরজা খুললেন। মূর্তিগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দিলেন। শিরকের নাপাকি থেকে আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করলেন। সেখানে ঢুকে দু-রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর বাইতুল্লাহ হতে বেরিয়ে পুনরায় তালা লাগিয়ে দিলেন।

নবীজি যখন বাইতুল্লাহয় পুনরায় তালা লাগিয়ে দিলেন, তখন সেখানকার দৃশ্য ছিল বিস্ময়কর। মক্কাবাসীরা ভাবছিল, আহ সে কতই-না ভাগ্যবান হবে, যার হাতে নবীজি বাইতুল্লাহর চাবি প্রদান করবেন। এ উদ্দেশ্যে কুরাইশের লোকেরাও নিকটে চলে এল। যারা নবীজির খাদেম ছিল, তারা এগিয়ে এল। প্রত্যেক মুসলিম সাহাবির ইচ্ছা ছিল, নবীজি চাবিটা আমার হাতে তুলে দিন।

পৃথিবীর একটা নিয়ম হলো, যখন কোনো বিজয়ী সেনাপতি বিজিত এলাকায় প্রবেশ করে, তখন সর্বপ্রথম অবশিষ্ট শত্রুদের হত্যা বা বন্দি করে নেয়। সকল যুদ্ধের ক্ষেত্রে এটাই হয়। কিন্তু আমাদের নবীজি তো একজন অতুলনীয় বিজয়ী, যিনি সারা পৃথিবীকে উত্তম আখলাক শিক্ষা দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি যখন তালা লাগাচ্ছিলেন, তখন সেই ওছমানও সামনে ছিল। নবীজি তাকে সম্বোধন করে বললেন, ওছমান! ওই মুহূর্তটা স্মরণ করো, যখন আমি তোমার কাছে চাবি চেয়েছিলাম। তখন তুমি দিতে অস্বীকার করেছিলে। আমি বলেছিলাম, একদিন এই চাবি আমার হাতে আসবে আর তখন তুমি আমার সামনে অসহায় অসহায় দাঁড়িয়ে থাকবে। মনে আছে তোমার? সে বলল, আপনি সত্য কথাই বলছেন। তুমি সেদিন আমার সঙ্গে যা করেছিলে, আমি কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে তা করব না। এই নাও; আমি তোমাকে চাবি ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি যদিও কাফের তারপরও আমি চাবিটা তোমাকেই সোপর্দ করছি।

চাবি হাতে নিয়ে সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি চাবি তো দিলেন; এবার আমার অন্তরের তালাটাও খুলে দিন। সে কালেমা পড়ল। ঈমান আনল। নবীজি বললেন, যাও; এই চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশের লোকদের নিকটই থাকবে। সুবহানাল্লাহ!

আমাদের মতো কেউ হলে সেদিন অবশ্যই প্রতিশোধ নিতাম। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় রাসূলকে দেখুন, তার আখলাক কত উত্তম ছিল। একেই বলে আখলাকে আযীমা। আর এই আখলাকই আমাদের ধারণ করতে হবে।

বন্ধুদের অন্তর জয়

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক জীবন আমদের জন্য আলোর মশাল। একবার তিনি সফরে বের হলেন। সঙ্গে এক সাহাবিও ছিলেন। এক স্থানে থামলেন। হাদীছে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের ডাল দিয়ে দুটি মেসওয়াক বানালেন। একটি খুব সরল ও চমৎকার ছিল; অপরটি ছিল বাঁকা। নবীজি সুন্দর ও সরল মেসওয়াকটি সাহাবিকে দিয়ে নিজে বাঁকাটি রাখলেন। সাহাবি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মন চাচ্ছে, এই ভালো ও সুন্দর মেসওয়াকটি আপনার কাছে থাকুক আর আপনার হাতেরটি আমার কাছে থাকুক। নবীজি উত্তর দিলেন, আমারও মনে চাচ্ছে, সুন্দর মেসওয়াকটি তোমার হাতে থাকুক।

দেখেছেন! কত উদার ও উত্তম চরিত্রের তালীম দিলেন!

যদি ক্ষণিকের একজন সফরসঙ্গীর হক এভাবে আদায় করতে হয়, তা হলে যে একই পিতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করে, একই ঘরে বড় হয়, সেই ভাইদের একজনের ওপর অপরজনের হক কী পরিমাণ হবে?

ছোটদের অন্তর জয়

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট শিশুদেরও খুব স্নেহ-মমতার সাথে বোঝাতেন। অল্প বয়সি এক সাহাবি ছিলেন। তিনি বলেন, আমার অভ্যাস ছিল, যে-কারো গাছের খেজুর আমার পছন্দ হতো, আমি সেটা পেড়ে খেয়ে ফেলতাম– অনুমতি নিতাম না। একবার এক মালিক আমাকে হাতেনাতে ধরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেল। নবীজি আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে বকাঝকা করবেন, মারধর কিংবা অপমানিত করবেন। কিন্তু তিনি আমাকে সেসব কিছু না করে মমতার সাথে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অন্যের গাছের ফল তার অনুমতি ব্যতীত কেন খাও? আমি বললাম, আমার কাছে ভালো লাগে। যে-গাছেরই ফল ভালো লাগে, আমি তা পেড়ে খাই। নবীজি অত্যন্ত দরদমাখা কণ্ঠে আমাকে বললেন, দেখো, প্রত্যেক গাছের মালিক থাকে, তার অনুমতি ব্যতীত সেই গাছের ফল পাড়া অন্যায়। তবে তুমি গাছের নিচে পড়ে থাকা খেজুর কুড়িয়ে নিয়ে খেতে পার। অর্থাৎ– একটি কানুন বলে দিলেন, যা শরয়ীভাবে বৈধ ছিল। এরপর তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এর ক্ষুধা দূর করে দিন। তারপর অত্যন্ত মমতার সাথে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। শিশু সাহাবি বলেন, নবীজির কোমল আচরণ ও মমতার স্পর্শ পেয়ে তার কথাগুলো আমার অন্তরে এমনভাবে গেঁথে গেল যে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করলাম, আজকের পর আর কোনো দিন অনুমতি ব্যতীত অন্যের গাছের ফল স্পর্শও করব না ।

এবার একটু চক্ষু বন্ধ করে আমরা নিজেদের অবস্থার দিকে তাকাই। যদি এমন ঘটনা আমাদের সঙ্গে ঘটত, তখন আমরা কী করতাম? হয়তো মুখে কিছু বলে দিতাম কিংবা হাত দিয়ে কিছু করে দিতাম। পরিস্থিতি উল্টে যেত। শিশুটি ভালো হওয়ার পরিবর্তে বিগড়ে গিয়ে মন্দ কাজগুলো আরো বাড়িয়ে দিত। এটাই মৌলিক পার্থক্য। যদি কোমলভাবে মানুষ কথা বলে, তখন সেই কথা হৃদয় স্পর্শ করে। নবীজি আমাদেরকে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। যদি কেউ অন্যের কল্যাণ কামনা করে, তাহলে তাদের সঙ্গে তার

আচরণও কোমল হবে, চরিত্রও উত্তম হবে। আর এমন মানুষ আল্লাহর দৃষ্টিতে অনেক মর্যাদাবান হয়।

নবুওতের অনুপম দলিল

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি ব্যতীত যত আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমন ঘটেছে, তাদের নিকট যখন নবুওতের দলিল চাওয়া হলো, তখন কেউ বিস্ময়কর উটনি পেশ করলেন, কেউ লাঠিকে অজগর বানিয়ে দেখালেন, কেউ জন্মান্ধকে সুস্থ করে দেখালেন, কেউ কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে নবুওতের দলিল পেশ করলেন। কিন্তু যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, হে মুহাম্মাদ! আপনি যে নবী এর দলিল কী? তখন তিনি বললেন–

لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'আমি তো জীবনের একটি অংশ তোমাদেরই মাঝে কাটিয়েছি। তোমরা কি বুঝতে পারছ না?'[১৪৯] (এই জীবনটা-ই তো আমার নবুওতের দলিল)

তো নবীজি নিজের জীবনকে নবুওতের দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। নিজের জীবনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু সেই জীবন এত স্বচ্ছ, সরল ও পবিত্র ছিল যে, কাফেররা পর্যন্ত তার মর্যাদার কথা স্বীকার করত। কারো আঙুল উঠাবার সাহসটুকুও ছিল না। তারা শত্রুতার কারণে নবীজিকে পাগল, জাদুকর ইত্যাদি বলত বটে; কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা যে, কেউ তাকে আমানতে খেয়ানতকারী বলতে পারেনি। মিথ্যাবাদী বা ওয়াদা ভঙ্গকারী বলতে পারেনি। তার উন্নত চরিত্রের দিকে আঙুল উঠাতে পারেনি। তো এমন নিষ্কলঙ্ক জীবন ছিল তাঁর যে, নিজের জীবনকেই নবুওতের দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। একটু ভেবে দেখুন। কত কঠিন কাজ ছিল!

পর্দার আড়ালে থাকতে দাও...

আমরা যখন ঘরে থাকি, তখন স্বামী-স্ত্রী মিলে আমরা বলি, দেখো! আমরা ঘরে ঝগড়াঝাটি যা-ই করি; এগুলো যেন ঘরের বাইরে না যায়। ঘরের কথা ঘরেই থাকতে দাও! এটা তো আমাদের স্বভাব। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন দেখুন। তিনি স্ত্রীগণকে বলে

---

১৪৯. সূরা ইউনুস : আয়াত ১৬

গেছেন, যদি কোনো নারী আমার অভ্যন্তরীণ জিন্দেগি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তাদের সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে তোমরা বাধ্য থাকবে। আমার জীবনের গোপন বিষয়গুলো তাদের খুলে বলবে। আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!! জীবনের গোপন বিষয়গুলোও উম্মতের নারীদের খুলে বলতে তিনি আদেশ দিয়ে গেছেন। কত চমৎকার জীবন ছিল তাঁর? কেমন আদর্শবান ছিলেন তিনি!

আজ আমাদের অবস্থা হলো, মানুষ যতটা আমাদের নিকটে আসে, ততটাই ঘৃণা করতে থাকে। তাওবা-তাওবা করতে থাকে। বলে, আল্লাহ রক্ষা করুন!

অর্থাৎ– কেউই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায় না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা দেখুন, যে যতটা তার নিকটে ছিল, সে তাকে তত বেশি মহব্বত করত। যেমন– মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি ঈমান এনেছেন, তিনি নবীজির স্ত্রী হযরত খাদিজা (রাযি.)। আচ্ছা বলুন তো! স্ত্রীরা কি কাউকে মানে? বাইরে ওয়াজ-নসীহত করা সহজ; কিন্তু ঘরে ওয়াজ নসীহত করা খুবই কঠিন। স্ত্রীরা তো কথা মানেই না। কিন্তু আল্লাহর রাসুলের মর্যাদার কী শান ছিল যে, সর্বপ্রথম কালেমা পাঠকারী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। এরপর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হযরত আলী (রাযি.) সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিলেন। তিনি শিশু-কিশোরদের মধ্যে সর্বপ্রথম কালেমা পড়ে মুসলমান হলেন। এরপর বন্ধুদের মধ্যে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) সবচেয়ে বেশি নিকটের ছিলেন। তিনিও সর্বপ্রথম কালেমা পাঠকারী হয়ে গেলেন।

মোটকথা, যিনি যত কাছের ছিলেন, তিনি তত দ্রুত কালেমা পাঠকারী হয়ে গেলেন। এতে প্রমাণিত হয়, আমাদের প্রিয় নবীজির জীবন ছিল অপূর্ব প্রেমময় ও তুলনাহীন।

এই উত্তম চরিত্রই মানুষের অন্তর জয় করে নেয়। মানুষ মানুষের হৃদয়ে ছেয়ে যায়, তার অন্তরে জায়গা করে নেয়। উত্তম চরিত্র এমনই এক নেয়ামত। তো মানুষ যদি উত্তম চরিত্র অবলম্বন করে, জীবন যাপন করে, তাহলে সে নিজেও সুখী হবে, আল্লাহর বান্দাদেরও সুখে থাকতে দেবে।

উত্তম চরিত্র ইবাদাত

কোনো মানুষের সঙ্গে উত্তম চরিত্রের সাথে ওঠাবসা করা; আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এটিও ইবাদাত। হাস্যোজ্জ্বল ও আলোকিত মুখ নিয়ে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও ইবাদাত। যেমন– হাদীছে এসেছে, যেব্যক্তি

কোনো মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে মুচকি হাসি নিয়ে সাক্ষাৎ করবে, তার এই হাসিকে সদকা হিসেবে গণ্য করা হবে। এরপর যখন মুসাফাহা করার সময় তাদের হাত নড়ে ওঠে, তখন তাদের গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়তে থাকে, যেভাবে গ্রীষ্মের সময় গাছের শুকনো পাতাগুলো ঝরে পড়ে যায়।

আল্লাহ এটা খুব পছন্দ করেন যে, আমার বান্দারা পরস্পরে অন্তরঙ্গতা ও ভালোবাসা নিয়ে মিলিত হোক। তাই আসুন, এই উত্তম চরিত্রগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করি, যেন আমাদের কারণে কেউ কষ্ট না পায়। আমরা মানুষের শান্তির কারণ হয়ে যাই।

আজ তো আমাদের অবস্থা এই যে, আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য শরীয়ত যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে আমরা আত্মীয়তার বন্ধনকে ভেঙে চলছি। ছোট-ছোট বিষয়ে দু-ভাই পরস্পর কথা বলা বন্ধ করে দেয়। ভাইয়ের মর্যাদার কোনো অনুভূতিই আমাদের মধ্যে নেই। দুই ভাই এক সাথে যুবক হচ্ছে; ভাইয়ের সঙ্গে সত্যতা ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলে না– বন্ধুত্ব গড়ে অন্যদের সঙ্গে। আর এটি কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এমন পরিস্থিতি হবে যে, লোকেরা অনাত্মীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়বে আর যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা রক্ষার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে।

আজ ভাই ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না, করে অন্যদের সঙ্গে। আরে ভাই! নিজের ভাইকে বন্ধু বানাও; বাবা মায়ের অন্তর খুশি হবে। আল্লাহও খুশি হবেন। কারণ, এই সম্পর্ক রক্ষার আদেশ স্বয়ং আল্লাহই দিয়েছেন। সত্যি কথা হলো, বান্দার ওপর যখনই মসিবত আসে, তার দৃষ্টি তখন সহযোগিতার জন্য ভাইয়ের দিকেই পড়ে। কুরআনে এর উদাহরণ হলো, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)কে নুবুওয়াত দান করে সম্মানিত করলেন, তখন মূসা (আ.) অনুভব করলেন, আমি একা আর আমার সামনে ফেরাউনের একটি শক্তিশালী বাহিনী। তার সঙ্গে তার কওমও আছে। সুতরাং আমারও একজন সঙ্গী প্রয়োজন, সহযোগী প্রয়োজন। যখন তাঁর মাথায় নবুওতের বোঝা রাখা হলো, সেই বোঝা বহনে সহযোগিতার জন্য একজন নবীর দৃষ্টি সঙ্গে-সঙ্গে কার প্রতি গেল? কী দু'আ করলেন তিনি?

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي۔ يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي۔ هَارُونَ أَخِي۔

'হে আমার রব! আমার অন্তর খুলে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার মুখের জড়তা দূর করে দিন যে, লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারের একজনকে আমার সহযোগী বানিয়ে দিন– আমার ভাই হারুনকে।'[১৫০]

বোঝা গেল, মূসা (আ.) যখন দুনিয়াতে বিপদে পড়লেন, তখন কার দিকে দৃষ্টি গেল? ভাইয়ের দিকে। এমনিভাবে আখেরাতেও যখন বিপদ আসবে, তখন বান্দা সর্বপ্রথম কার কাছে ছুটে যাবে? পরিবারের লোকদের কাছে। একথা ভিন্ন যে, সেখানে কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না। দেখুন, কুরআন সেই কথাটি কীভাবে বলছে–

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

'সেদিন (কেয়ামতের দিন) প্রত্যেক লোক তার ভাই হতে পালাবে।'[১৫১]

এখানে 'আব্বু'-র নাম নেওয়া হয়নি, 'আম্মু'-র নাম নেওয়া হয়নি। সুবহানাল্লাহ! বান্দা সর্বপ্রথম ভাইয়ের দিক ফিরে যাবে। সুতরাং আমরা সর্বপ্রথম ভাইয়ের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করে দেখি। এরপর দেখবেন, আল্লাহ সেখানে কীভাবে রহমত বর্ষণ করেন। যখন এই সম্পর্ক বাবা-মায়ের দিক থেকেও হবে এবং দীনের দিক থেকেও হবে, তখন এটা সোনায় সোহাগা হয়ে যাবে।

শিকড়ের সাথে লেগে থাক

আজ আমাদের অবস্থা হলো, যুবক সন্তানকে যদি মা-বাবা তরবিয়তের উদ্দেশ্যে কিছু বকাঝকা করেন, তো ব্যস সে রাগে-ক্ষোভে উত্তজিত হয়ে পড়ে– আমি এখান থেকে চলে যাব। তারপর শয়তান তাকে প্ররোচনা দেয়, তুমি যদি এ স্থান ত্যাগ করতে পার, তাহলে তোমার সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

লক্ষ করুন। এই বাহুসহ হাত যদি চিন্তা করে, আমি অযথা এই দেহের সঙ্গে কেন ঝুলে থাকব? দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তো আমি প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে পারব; আচ্ছা যদি হাতটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন কী হবে? একে পোকামাকড়ে ধরবে, কুকুরে খাবে, এর হাড্ডিগুলো ভেঙে দেওয়া

---

১৫০. সূরা তোয়াহা : আয়াত

১৫১. সূরা আবাসা : আয়াত ৩৪

হবে, টেনেহ্যাঁচড়ে, ছিঁড়ে-ফেড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলা হবে। এক পর্যায়ে তা পচে-গলে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে। কেন হবে এমন? কারণ, সে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তদ্রূপ যে-যুবক তার পিতা-মাতার তরবিয়ত থেকে দূরে থাকার মধ্যেই স্বাধীনতা অনুভব করে এবং সে এমনটি করে, তা হলে অচিরেই তার অবস্থাও বিচ্ছিন্ন হাতের মতোই হবে। সে এমন বন্ধুদের সঙ্গ অবলম্বন করবে, যারা তার ঈমান ধ্বংস করবে, তাকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করবে। তারপর সে না দীনদার থাকতে পারবে, না দুনিয়াদার।

মা বাবার স্নেহের ছায়া

আজকাল যুবকরা বাবা-মায়ের উপদেশ উপেক্ষা করে চলে। তাদের মধ্যে উপদেশ গ্রহণের যোগ্যতা-ই নেই। আরে ভাই! তারা তো তোমাদের কল্যাণের জন্যই বলে। আচ্ছা, যদি তারা কিছু বলা-ই ছেড়ে দেয়, তাহলে ক্ষতিটা কার হবে? সন্তানেরই হবে। বাবা-মা তো নিজের জীবন যাপন করছেন। কিন্তু তোমার ক্ষতি তো তুমিই করছ? তোমার ওপর কোনো ছায়া থাকবে না।

বরকতের ভান্ডার

বর্ণিত আছে–

اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ

'বড়দের সঙ্গে থাকার মধ্যেই তোমাদের জন্য বরকত নিহিত আছে।'

আর শয়তান বলে, তোমরা পৃথক হয়ে যাও। যে-আত্মীয়তার বন্ধনগুলোকে আল্লাহ সুসংহত করার আদেশ দিয়েছেন, সেগুলোকে আমরা ছিন্ন করছি। একটা কথা মনে রাখবেন, শবে কদরের মতো মূল্যবান রজনীতেও কিছু বান্দাকে ক্ষমা করা হয় না। এর মধ্যে একজন হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। শবে কদরেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না। এ থেকে অনুমান করুন সম্পর্ক ছিন্ন করা আল্লাহর নিকট কত জঘন্য কাজ!

আচার-ব্যবহার খারাপ হওয়ার কারণ

ইসলাম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করি। সত্য কথা হলো, কেউ যদি সমঝোতার ইচ্ছা করে, তাহলে বড়-বড় সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসে। আর যদি সংঘাতের ইচ্ছা

করে, তাহলে তুচ্ছ বিষয়েও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। সংঘাতে যাওয়া তো কোনো কৃতিত্বের বিষয় নয়। আমাদের উচিত সর্বদা সমঝোতার পথে চলা এবং সংঘাতের পথ এড়িয়ে যাওয়া ।

আচার-ব্যবহার খারাপ হয় কীভাবে? ক্রোধ ও গোস্বার কারণে। তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ বিষয় নিয়েও হইচই ফেলে দেয়। এমন কথা বলে দিল যে, স্ত্রী সারা দিন কাঁদতে থাকে। এমন কথা বলে ফেলল যে, ভাইয়ের অন্তর ভেঙে দিল। মনে রাখবেন, সকল রোগের মহা রোগ অন্তরের রোগ। আর অন্তরের রোগসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট রোগ হলো বেদনার রোগ। কারো অন্তরে ব্যথা দেওয়াকে আজ আমরা কোনো গুনাহই মনে করি না। আর আমরা সবচেয়ে বেশি কাদের অন্তরে ব্যথা দেই?. আপনজনদের। কবি কত সুন্দর বলেছেন–

شنیدم کہ مردان راہِ خدا * دل دشمناں را ہم کردن نہ تنگ

ترا کہ میسر شودی مقام * کہ با دوستاں را ہم پے کار جنگ

'আমি শুনেছি, যারা খোদার পথের যোদ্ধা হয়,
তারা শত্রুর অন্তরেও আঘাত দেয় না।
তুমি এই অধিকার কোথায় পেলে যে,
আপনজনদের সঙ্গেই যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছ?'

আজ অতি সাধরণ বিষয় নিয়ে ভাই-বোনের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়!

ক্রোধ সংবরণের পুরস্কার

আল্লাহ এই ক্রোধকে ধ্বংস করুন। এটি আমাদের কোথাও শান্তিতে থাকতে দেয় না। যাকেই জিজ্ঞেস করবেন, একটাই রিপোর্ট– মাথা গরম। মাথা উৎরাচ্ছে , ভাপ বের হচ্ছে। এমন হওয়া উচিত নয়। মুমিন বান্দা এমন ক্রোধকে সংবরণ করে থাকে। হাদীছে এসেছে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে কোনো প্রকার অন্যায় করে এবং এই (নির্যাতিত) লোকটি তার প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু সে তাকে আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এই ক্ষমার কারণে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে স্বীয় চেহারার দিদার দানে পুরস্কৃত করবেন। আজ যে গোস্বার ঢোক পান করবে, কাল আল্লাহ তাকে দিদারের শরবত পান করাবেন। কী চমৎকার সওদা বলুন তো!

সুতরাং এই ক্রোধ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুন। এটি মানুষের জীবনকে উজাড় করে ফেলে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বান্দা এন্তেজামী বিষয়াদিতে ত্রুটি দেখেও চুপ থাকবে বরং সেখানে পরিমাণমতো ক্রোধই প্রশংসিত। তবে সীমাছাড়া ক্রোধ যাকে বলে একেবারে আগুনের গোলা, সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়। সামান্য বিষয়েই উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। একটু ধৈর্য ও সহনশীলতা নিয়েই বসবাস করা উচিত।

মন্দের প্রতিদান ভালো দিয়ে

আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন। সহনশীলতা কাকে বলে? সহনশীলতা হলো অন্যকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু বিলম্ব করে ভেবেচিন্তে কাজ করা। তো নবীজি অত্যন্ত সহনশীল মেজাজের ছিলেন। আমাদেরও নিজেদের মধ্যে সহনশীলতা সৃষ্টি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

'ভালো ও মন্দ কখনো সমকক্ষ হতে পারবে না।'

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

'তোমরা মন্দকে ভালোর দ্বারা প্রতিহত করো।'[১৫২]

যখন মন্দের উত্তর ভালোর দ্বারা দেবে, তখন তোমার ও তাদের মধ্যকার শত্রুতা শেষ হয়ে যাবে এবং তারা তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। এই ভালো ব্যবহার এমন এক জিনিস, যে শত্রুকেও মিত্রে পরিণত করে দেয়।

পরোপকারের পুরস্কার

এ-কারণেই আমাদের মাঝে উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। একে শিখে সে অনুযায়ী বাকি জীবন যাপন করা অবশ্যক। তারপর দেখবেন এর বরকত কী! আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকের বরকত, সুস্থতার বরকত, সম্মানের বরকত। প্রত্যেকটি বিষয়েই তার কারণে বরকত হবে। কেন? কারণ, আল্লাহর ওয়াদা আছে–

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

---

১৫২. সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ : আয়াত ৩৪

'যে অন্যের উপকারে কাজ করবে, আল্লাহ জমিনে তার পা জমিয়ে দেবেন।'[১৫৩]

আমরা যদি চাই, আল্লাহ তা'আলা জমিনে আমাদেরও কদম জমিয়ে দিন, প্রভাব প্রতিপত্তি দান করুন, তবে আমরাও অন্যের উপকার করব, সবার জন্য কল্যাণ চাইব, সবার জন্য কল্যাণের কথাই ভাবব। এই কদম জমিনে কীভাবে জমবে?

যখন বান্দার নিকট উত্তম রিযিক থাকবে, সে সুস্থ হবে , তার গাড়ি-বাড়ি হবে, সমাজে সম্মান ও মর্যাদা থাকবে, তখন লোকেরা বলে থাকে, 'মাশাআল্লাহ এই বান্দার কদম জমে গেছে।'

কল্যাণকামিতার মূল্যায়ন

এই পরোপকার ও কল্যাণকামিতা আল্লাহর নিকট এত বেশি প্রিয় যে, এমন পরোপকারী বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন। একবার হযরত সুলাইমান (আ.) সৈন্যবাহিনীসহ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে একটি পিপীলিকার ঢিপি ছিল। বিশাল পিপীলিকারাজ্য সেটি। একটা পিপীলিকা অনুভব করল, সেনাবাহিনী আসছে। সে ঢিপির আশেপাশে ব্যস্ত পিপীলিকাদের ডেকে বলল, হে পিপীলিকার দল! তোমরা দ্রুত তোমাদের গর্তে প্রবেশ করো। কুরআন সেই কথাটা এভাবে বলছে–

يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ

'হে পিপীলিকারা! তোমরা তোমাদের ঢিপিতে প্রবেশ করো।'[১৫৪]

কারণ, সুলাইমান (আ.)-এর সৈন্যবাহিনী আসছে আর তোমরা পথে ঘোরাফেরা করছ। এমন যেন না হয়, তারা অজান্তে তোমাদেরকে মাটির সঙ্গে পিষে ফেলে; তোমরা দ্রুত ঢিপিতে আশ্রয় নাও।

এবার বলুন, পিপীলিকা কত ছোট্ট প্রাণী! সে অন্যান্য পিপীলিকার প্রতি কল্যাণকামিতা প্রদর্শন করেছে। এই কল্যাণকামিতা আল্লাহ এত পছন্দ করেছেন যে, তা কুরআনের মতো চির শাশ্বত কিতাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন আর সেই সূরাটির নামই রেখে দিয়েছেন 'আন নামল' (পিপীলিকা)। চিন্তা করার বিষয় হলো, একটা পিপীলিকার কল্যাণকামিতায় আল্লাহ এত খুশি

---

১৫৩. সূরা রা'দ : আয়াত ১৭

১৫৪. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ১৮

হলেন যে, তার আলোচনা কুরআনে করলেন। তাহলে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ যদি কল্যাণকামী হয়, তাহলে তাতে আল্লাহ কত খুশি হবেন !

তাই আসুন, নিজেকে কষ্টে ফেলে হলেও অন্যের প্রতি কল্যাণকামিতা প্রদর্শন করি, তার ভালো চাই, তা হলে আল্লাহও আমাদের উত্তম বিনিময় দান করবেন।

দুটি শব্দে গোটা দীন

ইসলাম একটি বিস্ময়কর দীন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটিমাত্র শব্দে গোটা দীন বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন–

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

'দীন হলো কল্যাণকামিতা।'

এখানে তুলাবা ও ওলামায়ে কেরামের জন্য একটি সূক্ষ্ম বিষয় হলো, সাধারণত মুবতাদা-খবরের মধ্যে একটি মা'রেফাহ, অপরটি নাকেরাহ হয়। কিন্তু এখানে উভয়টিই মা'রেফাহ। اَلدِّيْنُ ও النَّصِيْحَةُ কেন উভয়টিকে মারেফাহ আনা হলো? ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যখন মুবতাদা ও খবরের মধ্যে উভয়টি মা'রেফা হয় তখন একটি অপরটির জন্য কয়েদ ও হছর হয়। অর্থাৎ– দীন সেটাই, যা কল্যাণকামিতা আর যেখানেই কল্যাণকামিতা পাওয়া যাবে, সেখানেই পুরোপুরি দীনও পাওয়া যাবে। এরা পরস্পর লাযেম মালযুম। যেখানেই আপনি দীনদারি দেখবেন, সেখানেই আপনি কল্যাণকামিতাও দেখতে পাবেন । দীন ও অকল্যাণ কামনা এ দুটি বিষয় কখনো একত্রিত হতে পারে না। এটা হতেই পারে না যে, কেউ দীনদার হবে আবার তার মধ্যে অন্যের অকল্যাণ কামনাও থাকবে। কখনো না। এজন্যই মুমিন বান্দা সর্বদা কল্যাণকামী হয়; নিজের জন্যও কল্যাণকামী অন্যের জন্যও কল্যাণকামী। সবার জন্য কল্যাণকামী।

যাহোক ভাই! আমাদেরকে কল্যাণকামিতা শিখতে হবে, তার চর্চা করতে হবে এবং একে জীবনের উদ্দেশ্য বানাতে হবে।

আখলাকের পাঠদান প্রয়োজন

যখন আপনি এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের প্রতি অকল্যাণকামী দেখবেন, তখন বুঝে নিনম দীনের অবকাঠামো ভেঙে গেছে, দীনের অস্তিত্ব ধ্বংস হতে চলেছে। এখন আর মাঝখানে দীন নেই। আজকাল তো

আমাদের মতো লোকেরা যারা দীনদারির বেশভূষা বানিয়ে রেখেছি, এরাই পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যাই। একের সঙ্গে অপরের দ্বন্ব-বিদ্বেষ লেগেই আছে। মিলেমিশে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। আপনি শিংবিশিষ্ট একাধিক প্রাণী একই কামরায় রেখে দেখুন; তারাও মিলেমিশে থাকতে পারবে। কিন্তু আমাদের মতো শিংহীন জীবগুলোকে রেখে দেখুন, মিলেমিশে থাকতে পারব না– সংঘাত বাঁধিয়ে দিবে।

এর কারণ কী? কারণ হলো, আমরা আখলাক তথা উত্তম চরিত্র শিখিনি, উত্তম আখলাকের পাঠ আমরা গ্রহণ করিনি, কেউ আমাদের শেখাননি আল্লাহর নিকট আখলাকের মূল্য কী! এটি বোঝার বিষয়। এ শিক্ষা শুনে-শুনে অন্তরে গেঁথে নিতে হয়। আমরা সঠিক অর্থে মুসলমান হয়ে জীবন যাপন করতে পারি এবং অন্যদের অধিকারের প্রতি নজর রাখি এবং অন্যদের কল্যাণে কাজ করি।

প্রতিবেশীর মূল্য

আমাকে একব্যক্তি অন্য এক লোকের ব্যাপারে বলছিল, হযরত! অমুক ব্যক্তির সঙ্গে তার সন্তানরা থাকতে পছন্দ করে না। সন্তানরা তার ব্যাপারে আতঙ্কে থাকে। সে সবার সঙ্গে ঝগড়া করে বেড়ায়। আমি তাকে বললাম, যখন আমরা সঠিক অর্থে মুসলমান ছিলাম, তখন আমাদের কারণে প্রতিবেশীর মূল্যও বৃদ্ধি পেয়ে যেত। এরপর তাকে একটি ঘটনা শোনালাম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.), যিনি হাদীছের জগতে আমীরুল মুমিনীন উপাধি লাভ করেছিলেন। মুহাদ্দিছীনে কেরামের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বরং আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর যে-পরিমাণ প্রশংসা করা হয়েছে, কোনো মুহাদ্দিছ তো ননই স্বয়ং ইমাম বোখারি (রহ.)-এরও এত সর্বসম্মত প্রশংসা করা হয়নি। এমন সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনীতে লেখা আছে, তার ঘরের পাশে এক ইহুদির ঘর ছিল। সে তার ঘরটি বিক্রি করতে চাইল। ক্রেতা এসে বলল, দাম কত? ইহুদি বলল, দুই হাজার দিনার। ক্রেতা বলল, আরে ভাই! এই অঞ্চলে এমন ঘরের মূল্য বড়জোর এক হাজার দিনার হবে। আপনি দু-হাজার দিনার চাচ্ছেন কেন? সে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন যে, ঘরের মূল্য এক হাজার দিনার; কিন্তু দ্বিতীয় হাজার দিনার হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের প্রতিবেশিত্বের মূল্য।

এমন কথা একজন ইহুদি বলছিল! তো একটি সময় ছিল, আমরা যেঘরে থাকতাম, তার প্রতিবেশীর ঘরের মূল্য বেড়ে যেত। কারণ, তখন আমাদের মধ্যে আখলাক ছিল। আমরা সর্বদা অন্যের কল্যাণ কামনা করতাম এবং তাদের সঙ্গে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতাম ।

প্রকৃত কল্যাণকামিতা এমনই

আমাদের বড়রা অন্যের ব্যাপারে কত ভালো চিন্তা করতেন! অন্তরের কান খুলে শুনুন। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালী একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন। তিনি কারো থেকে ঘোড়া ক্রয় করলেন। ধরে নিন, সাত হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করলেন। ঘোড়া ক্রয় করে বাড়ি এলেন। ঘোড়া কেনা হলে লোকেরা দেখতে আসে এটাই নিয়ম। পরের দিন লোকেরা দেখতে এল। দেখে বলল, মাশা আল্লাহ খুব ভালো দামে ক্রয় করেছেন। এমনিতে তো এর মূল্য কম পক্ষে আট হাজার দিনার ছিল, তবে আপনি ভালোই জিতেছেন। এরা এমন মন্তব্য করে চলে গেল।

হযরত আব্দুল্লাহ পরের দিন ঘোড়ার মালিককে এক হাজার বাড়তি দিনার দিয়ে বললেন, ভাই লোকেরা বলে, এই ঘোড়ার মূল্য কমপক্ষে আট হাজার দিনার ছিল। আমি তো আপনাকে এক হাজার কম দিয়েছিলাম। এই নিন বাকি এক হাজার। পরের দিন অন্য একজন এসে ঘোড়া দেখে খুব প্রশংসা করে বলল, আমার দৃষ্টিতে এমন ঘোড়া মূল্য নয় হাজার দিনার ছিল। তবে আট হাজার দিনারে ক্রয় করে তুমি জিতে গেছ। পরের দিন হযরত আব্দুল্লাহ আবার সেই মালিকের কাছে গিয়ে কোনো কথা না বলে আরো এক হাজার দিনার দিলেন। মালিক বলল, জনাব আপনি বারবার কেন আমাকে এভাবে দিনার দিচ্ছেন? আমি তো স্বেচ্ছায় সাত হাজার দিনারে ঘোড়া বিক্রি করেছি। হযরত আব্দুল্লাহ বললেন, কল্যাণকামিতা এবং খায়েরখাহির কারণেই আমি এমনটা করছি। আমরা আমাদের ওস্তাদগণের হাতে এই বলে বায়'আত গ্রহণ করেছি যে, আমরা সর্বদা মুমিনের কল্যাণ কামনা করব। তুমি তোমার ঘোড়ার সঠিক মূল্য জানতে না। আমি অভিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি, এই ঘোড়ার সঠিক মূল্য কম পক্ষে নয় হাজার দিনার হবে। আমি তোমার কল্যাণ চাচ্ছি; তাই এই দুই হাজার অতিরিক্ত দিনার তোমাকে দিলাম।

সুবহানাল্লাহ! এক সময় আমরা মুসলমানরা এমন উদার, পরোপকারী ও কল্যাণকামী ছিলাম।

কল্যাণকামিতার বিস্ময়কর উদাহরণ

ইসলামের প্রতাপ যখন পৃথিবীব্যাপী ছিল, তখন মুসলমানরা সারা দুনিয়া শাসন করত। তখন কাফেররা একব্যক্তিকে গুপ্তচর করে পাঠাল, দেখো তো মুসলমানদের মধ্যে এমন কী বিশেষ গুণটি রয়েছে, যার কারণে তারা যেদিকেই ছুটে যায় বিজয় ও সাফল্য তাদের পদচুম্বন করে। ভিন্ন জাতির লোকেরা তাদের দেখে প্রভাবিত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়।

তখন বাগদাদ ছিল মুসলমানদের কেন্দ্র। সেই গুপ্তচর বাগদাদে এল। সে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিল। দুপুর বেলা যখন তার ক্ষুধা পেল, পাশেই একটি হোটেলে খাওয়ার জন্য প্রবেশ করল। দেখল, একলোক বারবার তার দিকে তাকাচ্ছে। সে খাবার শেষ করে কাউন্টারে গেল। ম্যানাজারকে জিজ্ঞাসা করল, কত টাকা বিল হয়েছে? ম্যানেজার উত্তর দিল, জনাব! আপনার টাকা পরিশোধ হয়ে গেছে। সে বলল, সেটা কীভাবে? আমি তো টাকা দিইনি; খেয়ে এই মাত্র এলাম। ম্যানেজার উত্তর দিল, আপনার পাশে ওই যে লোকটি বসা ছিল, সে একজন স্থানীয় লোক। সে যখন নিজের বিল দিতে এল, তো বলল, ভাই অমুক লোকটিকে বিদেশী মনে হচ্ছে, সে তো মেহমান, তার বিলটাও দিয়ে দিই। আমার পক্ষ থেকে তার জন্য এটা দাওয়াতই মনে করুন। আর সে এ বিষয়ে আপনাকে কিছু বলেও যায়নি। কারণ, সে আপনার মুখ থেকে কৃতজ্ঞতার বাক্যও শুনতে রাজী নয়। বরং আল্লাহ থেকে এর প্রতিদান নিতে চেয়েছে। এরপর আপনার বিল পরিশোধ করে চলে গেল। গুপ্তচর হতবাক হয়ে চিন্তা করল, বড় আশ্চর্য মানুষ তো এরা! মেহমানদারিও করল আবার কাউকে বুঝতেও দিল না, কে মেহমানদারি করল? সে খুব মুগ্ধ হলো।

তারপর তার জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সে সামনে এগিয়ে গেল। গলির মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ তার কোনো বস্তু ক্রয় করার প্রয়োজন পড়ল। এক দোকানে ওই বস্তুটি দেখে দোকানে ঢুকে বলল, ভাই! আমি ওই বস্তুটি ক্রয় করতেই চাই। এর মূল্য কত? দোকানী বলল, এত টাকা। গুপ্তচর লোকটি বলল, ঠিক আছে; দিন। কিন্তু দোকানী তাকে বলল, ভাই! আপনি একটু কষ্ট করে ওই সামনের দোকান থেকে বস্তুটি কিনে নিন। দাম এটাই রাখবে। সে নির্দেশিত দোকান থেকে বস্তুটি ক্রয় তো করে নিল; কিন্তু মনে প্রশ্ন থেকে গেল, প্রথম দোকানী উক্ত বস্তুটি নিজের কাছে থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে বিক্রি কেন করল না?

কৌতূহল নিবারণ করতে সে পুনরায় প্রথম দোকানীর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, ভাই! বস্তুটি তো আপনার কাছেও ছিল। তারপরও আপনি সেই দোকানে কেন পাঠালেন? আমার কাছে বিক্রি করতে কি কোনো সমস্যা ছিল? দোকানী মুচকি হেসে বলল, না, ভাই! বস্তুটি তো আমার কাছে ছিল; কিন্তু আমি চাচ্ছি, আপনি তার কাছ থেকে ক্রয় করুন। এর কারণ হলো, আজ আমার কাছে এত ক্রেতা এসেছে যে, আমার আজকের খরচা-পাতির পয়সা উঠে এসেছে। কিন্তু আমার সেই প্রতিবেশী দোকানীর কাছে তেমন কোনো ক্রেতা আসেনি। আমার ইচ্ছা ছিল, আপনি বস্তুটি তার দোকান থেকে ক্রয় করলে তার একটু উপকার হবে, তার ছেলে সন্তানের রুজি-রুটির একটু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ ছাড়া অন্য কোনো সমস্যা ছিল না।

আমল দিয়ে জীবন গড়ে

একটা সময় ছিল, মুখোমুখী দোকানীদের একজন অপরজনের প্রতি এই পরিমাণ দরদী ও কল্যাণকামী ছিল। আল্লাহু আকবার! আর আজ আমরা আমাদের অবস্থা যাচাই করে দেখি, কী অবস্থা আমাদের আখলাকের। সুতরাং এসব উন্নত আখলাক আমরা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করব। মুখে-মুখে নয়; কাজেও তা বাস্তবায়িত করতে হবে। মানুষের কাজই তার প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে পারে। যদি আমরা উত্তম আখলাক নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারি, তা হলে আল্লাহর মাকবুল বান্দাদের মধ্যে গণ্য হতে পারব।

অপূর্ব মকদ্দমা, অনুপম ফয়সালা

সায়্যিদুনা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)-এর শাসনামল ছিল। একব্যক্তি জমিন বিক্রি করল। অন্যজন তা ক্রয় করল। ক্রেতা যখন জমিনে হাল চালাল, তখন মাটির নিচ থেকে কিছু গুপ্তধন বেরিয়ে এল। চাষী চিন্তা করল, আমি তো কেবল জমি ক্রয় করেছি। গুপ্তধন তো ক্রয় করিনি। সুতরাং এর প্রকৃত মালিক জমির সাবেক মালিক। অর্থাৎ– বিক্রেতা। সে তা নিয়ে বিক্রেতার কাছে গিয়ে বলল, এই নিন ভাই আপনার গুপ্তধন। বিক্রেতা বলল, আরে ভাই! যখন আমি জমি বিক্রি করে দিয়েছি। এখন এর থেকে উৎপাদিত সব কিছুরই মালিক তুমি। চাষী বলল, না, আমি তো শুধু জমি ক্রয় করেছি, গুপ্তধন নয়। সুতরাং এটা আপনার সম্পদ, আপনি এটা গ্রহণ করুন।

বিক্রেতা বলল, অসম্ভব! এখন এই জমির মালিক আপনি। অতএব, এর মধ্যে থাকা সবকিছুর মালিকও আপনি। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলতে

লাগল। অবশেষে পরামর্শক্রমে স্থির হলো, আমরা খলীফা ওমর (রাযি.)-এর আদালতে বিষয়টি উত্থাপন করব। তিনি যে ফয়সালা দেন, উভয়ে তা মেনে নেব।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর জামানায় দুই মুসলমান ভাইয়ের মধ্যে এটাই সর্বপ্রথম মকদ্দমা ছিল, যেটি তাঁর আদালতে পেশ করা হলো। আর মকদ্দমা এমন যে, এক পক্ষ বলছে এটা আমার হক নয়; আপনার। অপর পক্ষ বলছে, না এটা আমার হক নয়; আপনার। সুবহানাল্লাহ! আমাদের এই যুগে এমনটি কল্পনা করা যায়?

আজ আদালতে মকদ্দমা পেশ করা হয়, এক পক্ষ বলে এটা আমার হক, দ্বিতীয় পক্ষও বলে, না, এটা আমার হক। এক পক্ষ বলে, আমি আমার অধিকার রক্ষায় রক্তের শেষ বিন্দুও প্রবাহিত করে দেব। অপর পক্ষ বলে, আমিও রক্তের বন্যা বইয়ে দেব। আজ যখন লোকেরা এই নিয়তে আদালতে যায়, তখন সেখানে শত্রুতা সৃষ্টি হয়। যেখানেই আদলত, সেখানেই আদাওয়াত (দুশমনি)। উচিত হলো, মীমাংসার জন্য আদালতে যাবে এবং ফয়সালা পক্ষে যাক বা বিপক্ষে, তা মেনে নেবে।

যাহোক হযরত ওমর (রাযি.)-এর আদালতে এক বিস্ময়কর ও নজিরবিহীন মকদ্দমা পেশ হলো। একজন বলছে, এটা আমার ভাইয়ের হক। অপরজন বলছে, না, এটা আমার হক নয়; বরং আমার মুসলমান ভাইয়ের হক। এখন যিনি ফয়সালা করবেন, তিনিও পড়লেন বিপাকে। কী করবেন এখন? আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে দীনি প্রজ্ঞাও দান করেছিলেন। উভয় পক্ষের জবানবন্দি শোনার পর খলীফা হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, আচ্ছা! আপনাদের ঘরে সন্তানাদি আছে কী? উভয়েই বলল, আছে। জানা গেল, একজনের ঘরে উপযুক্ত ছেলে রয়েছে, অপরজনের ঘরে উপযুক্ত মেয়ে আছে। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, আমার ফয়সালা হলো, আপনারা উভয়ে নিজের ছেলেমেয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন করুন এবং উক্ত গুপ্তধন কনেকে উপঢৌকন হিসেবে দান করে দিন। আগের দিনে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়াগুলো এ-ধরনের হতো।

দীনদারি না হলে স্বজনও দুশমন হয়ে যায়

আজ মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া কী নিয়ে হয়? এক বিঘত জমির জন্য মানুষ খুন হচ্ছে। এক বিঘত জমির কথা বাদই দিলাম। দুই বন্ধু বিশ বছর যাবত এক সাথে চলাফেরা করছে। হাসি-ঠাট্টা করতে-করতে একপর্যায়ে

কথায় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, সেখান থেকে হাতাহাতি এবং সর্বশেষ সেখান থেকে হত্যার মতো জঘন্য কাজও হয়ে যাচ্ছে। এমনটি কেন হচ্ছে? কারণ, তাদের দীনের বুঝ নেই। তাকে দীন শিখতে হবে।

মুমিন হত্যায় আল্লাহর ক্রোধ

একজন মুসলমান ভাইকে হত্যা করা এত জঘন্য অপরাধ যে, এই গুনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে যান। অন্য গুনাহের বেলায় তিনি এত ক্রোধান্বিত হন না। মন ও কান দিয়ে শুনুন! কুরআনে কারীমে আল্লাহ ইরশাদ করছেন–

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُهُ جَهَنَّمُ

'যে জেনেবুঝে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হলো জাহান্নাম।'

এতটুকু বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, তাকে জাহান্নামে ঢালব। কিসসা খতম। কিন্তু না, আল্লাহ প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করে এরপরই বললেন–

خَالِدًا فِيْهَا

'সে সেখানে চিরকাল থাকবে।'

এখানে 'চিরকাল' অর্থ অনেক লম্বা সময়। কারণ, চিরকাল জাহান্নামে তো কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকরা থাকবে।

এরপর আল্লাহ চাইলে এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হতে পারতেন যে, সে দীর্ঘ সময় জাহান্নামে জ্বলবে। কিন্তু না, এতটুকুতে তাঁর ক্রোধ থামল না। তিনি আগ বেড়ে বলছেন–

وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

'তার ওপর আল্লাহর গজব পতিত হবে।'

'যদি এতটুকু বলতেন, তবুও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এটি এত জঘন্য অপরাধ যে, যেন তাঁর ক্রোধ ঠান্ডা হতেই চাচ্ছে না। তিনি আরো বললেন–

وَلَعَنَهُ

'তার ওপর আল্লাহর লা'নত হবে।'[১৫৫]

---

১৫৫. সূরা নিসা : আয়াত ৯৩

আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কোনো মুমিনকে হত্যা করা এত বড় অপরাধ যে, তার ওপর আল্লাহ ক্রোধের পর ক্রোধ বর্ষণ করেছেন। এবার পুরা আয়াত একত্রে পড়ে অনুমান করুন, আল্লাহ কী পরিমাণ ক্রোধান্বিত হন।

কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত

আর আজ সবচেয়ে সহজ কাজ এটাই মনে হয়। এটা কেয়ামতের আলামত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

'কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামতসমূহের মধ্য হতে একটি হলো, একজন মুমিনকে হত্যা করা হবে, অথচ সে জানবে না, তাকে কী কারণে হত্যা করা হয়েছে।'

এখন তো অবস্থা এই হয়েছে যে, একব্যক্তি নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে যাচ্ছে। আর সে বলতেও পারবে না, আদৌ সে ঘরে ফিরে আসতে পারবে কি, পারবে না। আবার নিজেকে ইসলামের সবচেয়ে বড় ঠিকাদার দাবি করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

একজন মুমিনের মর্যাদা

এজন্যই আমাদেরকে আখলাকের শিক্ষা লাভ করতে হবে। মুমিনের শান ও মর্যাদা বুঝতে হবে। আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীছ আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করলেন, 'হে বাইতুল্লাহ! আল্লাহর নিকট তোমার বড়ই মর্যাদা সন্দেহ নেই। কিন্তু

حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ اَرْجَحُ مِنْ حُرْمَةِ الْكَعْبَةِ

'আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের দৃষ্টিতে একজন মুমিনের ইয্যত বাইতুল্লাহ শরীফের ইয্যতের চেয়েও অনেক বেশি।'

এখন আমরা কী করি? বাইতুল্লাহকে ঝাঁপটে ধরি, গেলাফ ধরে-ধরে দু'আ করি, কত ভালোবাসি, সম্মান করি। অথচ মুমিনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করি, তাকে মিথ্যুক মনে করি। আরো কত কষ্ট দেই। অথচ মর্যাদা বেশি কার? মুমিনের। এর কারণ কী? কারণ, তারা আখলাকের শিক্ষা লাভ করেনি। তারা জানেই না, জীবন যাপন কীভাবে করতে হয়।

ভালো করো ভালো পাবে

এ-কারণেই আমাদের উচিত, আমরা আল্লাহর বান্দাদের জন্য রহমত হয়েই বসবাস করব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

'যে জমিনে আছে, তার প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমার প্রতি দয়া করবেন।'

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একে অপরের সঙ্গে উত্তম আখলাক নিয়ে জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন।

তোমাদের তো লজ্জা হয় না

* আমাদের থেকে চন্দন কাঠ অনেক ভালো। কারণ, চন্দন কাঠ সেই কুড়ালের মুখকেও সুবাসিত করে দেয়, যে তাকে আঘাত করে।

* আমাদের থেকে ফুলের পাঁপড়ি অনেক ভালো। মানুষ যখন সেগুলোকে হাতে নিয়ে পিষে দেয়, তারা তাদের হাতকে সুবাসিত করে দেয়।

* আমাদের থেকে গাছ অনেক ভালো। বরই গাছে মানুষ ঢিল ছোড়ে। আর সে তাদের দিকে বরই নিক্ষেপ করে। লোকেরা তাল গাছে পাথর মারল, আর সে তাদেরকে নিজের ফল দিল।

হায়! আমরাও যদি আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণকারীকে কোনো ভালো প্রতিদান দিতাম, তাহলে কতই-না ভালো হতো। কিন্তু আমরা ভালো কিছু দেব কীভাবে? আমাদের মধ্যে যে ভালো কিছু নেই! ভেতরে যদি দুর্গন্ধ থাকে, তা হলে তো দুর্গন্ধই বের হবে। খুব ভালো, দীনদার হাজী সাহেব মানুষ। সামান্য বিষয় নিয়ে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ শুরু করে দেয়। একটু রাগের সুযোগ এলেই ব্যস, আসল চেহারা খুলে যায়। সারা জীবনে তিনি এগুলোই শিখেছেন।

আমাদের উচিত, নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে নেই। মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকা শিখি এবং নিজের আখলাককে উন্নত করি।

তিনটি মূল্যবান কথা

তিনটি কথা মনে রাখবেন–

১. আমরা যদি কারো সঙ্গে ভালো আচরণ করতে নাও পারি, তা হলে কমপক্ষে খারাপ আচরণ থেকে তো বিরত থাকতে পারি?

২. যদি আমরা কাউকে সুখ দিতে না পারি, তাহলে অন্তত দুঃখ দেব না।

৩. যদি কারো প্রশংসা করতে না পারি, তা হলে অন্তত তার বদনাম করব না। প্রশংসা যদি করতেই না পার, তবে এই মুখটি খোলার দরকার কী? বন্ধ রাখ।

ব্যবহারে চরিত্রের পরিচয় মিলে

কার চরিত্র কেমন তা বোঝা যায় তার ব্যবহার দ্বারা। একব্যক্তি একজনের খুব প্রশংসা করল। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, তুমি কি কখনো তার সঙ্গে লেনদেন করেছ? সে বলল, না জনাব! হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, কখনো সফর করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, জনাব! আপনি তাকে মসজিদ হতে বের হতে দেখেই তার প্রশংসা করতে লাগলেন। লেনদেন বা সফর না করলে মানুষের স্বভাব বোঝা যায় না।

আজ কোনো ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণকামী হয়ে তাকে গরিব-দুঃখী মনে করে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়ে নেয়। পরে দেখা যায়, সেই তার জন্য বড় রকমের বিপদ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। একজনের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে না। টাকা নেই, অপরজন তার কল্যাণকামী হয়ে তাকে বাকিতে মালামাল দিল। এবার সে তার টাকা পরিশোধ করতে গড়িমসি শুরু করে দিল। যার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, সে-ই খারাপ প্রমাণিত হয়। এমনটা কেন?

কারণ হলো, আমাদের তরবিয়ত হয়নি। আমাদের কেউ আখলাক শেখায়নি, মানবতা কাকে বলে শেখা হয়নি। যখন এই মানবতা আসবে, তখন কল্যাণকামিতা এসে যাবে। অন্যের উপকার করার গুণও এসে যাবে। তারপর আমাদের দীন দেখে মানুষ ইসলাম কবুল করে নেবে। আমাদের মুআমালাত দেখে মানুষ ইসলাম কবুল করবে। আজ মুআমালা উল্টা। আমাদের মুখে যখন তারা মিথ্যা-প্রতারণার কথা শুনবে, তখন তার মনে আমাদের ব্যাপারে কেমন ধারণা তৈরি হয়?

আজকের মুসলমানদের 'ইনশাআল্লাহ'

দেশের বাইরে একব্যক্তি আমাকে বলল, যখন কোনো মুসলমান ইনশাআল্লাহ বলে দেবে, তা হলে বুঝে নিন, তার সেই কাজ করার ইচ্ছা নেই। আমি একথা শুনে খুব আশ্চর্য হয়েছি। সে বলল, আমি টিচিং করি। মুসলমানদের মধ্যে এ-বিষয়টি লক্ষ করেছি, কোনো কাজ যখন তারা করার ইচ্ছা থাকে, তখন দৃঢ়তার সাথে বলে, হ্যাঁ! আমি একাজ করব। কিন্তু যেখানে নিয়ত খারাপ হয়, সেখানে বলে, ইনশাআল্লাহ! মুসলমানদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বিধর্মীদের অভিজ্ঞতা হলো, তারা যে-কাজের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলবে, সেই কাজ করবে না। চিন্তা করুন, আমরা আল্লাহর নামের নেসবতকে কোথায় নিয়ে ঠেকিয়েছি। নাউযু বিল্লাহ!

আমরাই ইসলামের বদনামির কারণ হচ্ছি। আমরা নিজেরাই যেহেতু বিগড়ে গেছি, তাই আমাদের কাজগুলোও বিগড়ানো অবস্থায় প্রকাশ পাচ্ছে। দীনের পথে আমরাই বাঁধা সৃষ্টি করছি। তো আমরা নিজেদের আখলাক ও চরিত্রের দিকে নজর দিতে হবে এবং নিজেকে একজন ভালো মানুষ বানানোর চেষ্টা করতে হবে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেক দোষ গোপন করার গুণ

সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের আখলাক তৈরি করেছিলেন। এ-কারণেই তারা যেদিকেই যেতেন, সফলতা তাদের পদচুম্বন করত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা এত বেশি ছিল যে, শুনে হয়রান হতে হয়। তাঁরা একে অপরের দোষ-ত্রুটি কীভাবে গোপন করতেন। আল্লাহু আকবার! একটি ঘটনা শুনুন–

একবার সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসা ছিলেন। নামাযের সময় সন্নিকটে ছিল। হঠাৎ এক ধরনের দুর্গন্ধ সবার নাকে লাগল। বোঝা গেল, কারো উজু ভেঙে গেছে। কিন্তু বিষয়টি ছিল লজ্জার। সামনে নামাযের সময়। যে-ই এটা ছেড়েছে তাকে উজুর জন্য উঠতে হবে। আর তখনই সবাই জানতে পারবে, অমুক এই কাজটা করেছে। তো কেউ উঠে দাঁড়ানোর পূর্বেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি অনুমতি হয়, তাহলে আমরা সবাই পুনরায় উজু করে আসতে পারি। নবীজি বিষয়টি অনুভব করে বললেন, তাহলে তো খুব ভালো হয়। সঙ্গে-সঙ্গে সকল

সাহাবা উঠে গিয়ে উজু করে এলেন। ফলে বোঝা গেল না, কার উজু ভেঙেছে। চিন্তা করুন, একজন মুসলমানকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেমন তৎপরতা ছিল। তাঁরা ছিলেন উত্তম মানুষ। তাঁদের আখলাক ছিল উন্নত। তাঁরা কোনো মুসলমান ভাইকে সামান্য লজ্জা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আল্লাহু আকবার!

হত্যার সময়ও কল্যাণ কামনা

আমাদের বড়রা একে অপরের জন্য আত্মত্যাগ করতেন। আবুল হাসান নূরী (রহ.) নামে এক বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন। অন্যের কল্যাণকামিয়তায় তাঁর এক বিস্ময়কর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। সে যুগের বাদশাহ নিজের সুবিধার অনুকূলে কোনো ফতুয়া চেয়েছিল। হযরত সরাসরি অস্বীকার করে ফতুয়া দিলেন না; বরং শরীয়তসম্মতভাবেই ফতুয়া প্রকাশ করলেন। আমাদের বড়দের নীতি এমনই ছিল। বাদশাহ আরো দুজন থেকেও ফতুয়া চাইলেন। তারাও একই রকম ফতুয়া দিলেন।

এতে বাদশাহ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে আনার আদেশ দিল। বাদশাহরা যখন নিজেদের ইচ্ছামতো হুকুমত চালাতে পারে না, তখন এভাবেই অত্যাচার করে থাকে। তিনজনকে গ্রেফতার করা হলো। বলল, এদেরকে আমার সামনে হত্যা করো। জল্লাদকে ডাকো। বাদশাহ দেখল, আবুল হাসান নূরী (রহ.) সবার আগে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যরা তার পেছনে। বাদশাহর অন্তরে আবুল হাসান নূরী (রহ.)-এর ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল, তিনি একজন বুযুর্গ মানুষ। ভালো মানুষ। সে চাচ্ছিল, অন্য দুজনকে প্রথমে হত্যা করিয়ে পরে তাঁকে কোনো বাহানা করে ক্ষমা করে দিবে। হত্যা করবে না। কিন্তু তিনি সবার আগে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাদশাহ বলল, না, এভাবে নয়। ওদিকে নিয়ে যাও। উদ্দেশ্য তাদের মধ্যে আগ-পরের বিন্যাস পরিবর্তন করা। যখন অন্য দিকে দাঁড়ালেন, তখনও হযরত আবুল হাসান নূরী সামনে থাকলেন। পুনরায় বাদশাহ কোনো অজুহাত দেখিয়ে অন্য দিকে নিয়ে গেল, যেন বিন্যাস পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু সেখানেও আবুল হাসান নূরী (রহ.) সামনে থাকলেন। এবার বাদশাহ আবুল হাসান নূরীকে ডেকে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়ে বলল, আমি চাচ্ছি, তাদের দুজনকে আগে হত্যা করব এবং সবশেষে আপনাকে ক্ষমা করে দেব। কিন্তু আপনি বারবার কেন নিজেকে আগে-আগে রাখছেন? এর কারণ কী?

হযরত আবুল হাসান (রহ.) উত্তর দিলেন, প্রতিটি স্থানেই আমি এজন্য আগে-আগে ছিলাম যে, হত্যার আদেশ তো হয়েই গেছে। আমাদের তিনজনকেই হত্যা করা হবে। তবে আগে আমি হত্যা হলে, যতটুকু সময় আমার হত্যা কার্যকর করতে লাগবে, ততটুকু সময় তারা জীবিত থাকার সুযোগ পাবে। সুবহানাল্লাহ!

একটা সময় ছিল, যখন আমরা আমাদের ভাইয়ের কল্যাণ কামানায় এতটা তৎপর ছিলাম যে, মরতে-মরতেও তার উপকার করার চেষ্টা করতাম।

মৃত্যুর সময়ও কল্যাণ কামনা

ইয়ারমুকের যুদ্ধের ঘটনা তো সবারই জানা আছে। তিন সাহাবি জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো পার করছিলেন। মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে 'পিপাসা' 'পিপাসা' বলে ডাক দিলেন। একজন পানি নিয়ে এলেন। এমতাবস্থায় অন্য সাহাবিও পিপাসার তাড়নায় 'পানি-পানি' বলে চিৎকার করে উঠলেন। শুনে প্রথম সাহাবি তাঁর মুখ বন্ধ করে দ্বিতীয়জনের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আগে তাকে পান করাও। পানি নিয়ে সেখানে পৌঁছলে তৃতীয়জনের শব্দ শোনা গেল। তিনিও বলছেন, 'পানি-পানি'। তিনি নিজে পান না করে তৃতীয় ভাইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আগে তার কাছে যাও। ছুটে গিয়ে দেখা গেল, এর আগেই তিনি মারা গেলেছন। পানিবহনকারী সাহাবি ছুটে এলেন দ্বিতীয় সাহাবির নিকট। দেখলেন, তিনিও শাহাদাত বরণ করেছেন। তারপর দ্রুত ছুটে এলেন প্রথমজনের নিকট। দেখলেন, তিনিও শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে আল্লাহর নিকট চলে গেছেন।

এই ছিল কল্যাণ কামনা। তারা মুমূর্ষু অবস্থায়ও অন্য ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় তৎপর ছিলেন। অথচ আমাদের অবস্থা হলো, হুঁশ-জ্ঞান অবস্থাতেই আমরা অন্যকে প্রাধান্য দিতে পারি না। এমনকি খুব ক্ষুদ্র-থেকে-ক্ষুদ্রতর বিষয়েও।

মানবতার স্তর পরিমাপ করার থার্মোমিটার

আমাদের উচিত, আমরা নিজেদের অবস্থার পর্যবেক্ষণ করি। তাপমাত্রা মাপার জন্য যেমন থার্মোমিটার আছে, তদ্রূপ কারো ব্যাপারে যদি জানার ইচ্ছা হয়, সে আল্লাহ তা'আলার কতটা নৈকট্যপ্রাপ্ত, তাহলে তা উপলব্ধি করার থার্মোমিটার হলো উন্ন আখলাক বা উত্তম চরিত্র। যার আখলাক যত খারাপ, সে আল্লাহ হতে তত দূরে, এমনিভাবে যার আখলাক যত সুন্দর, সে

ততটাই আল্লাহর প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত। আর এই আখলাকের প্রকৃত পরিমাপ করার উপায় হলো এক সঙ্গে চলাফেরা করা। তাতে বোঝা যায় তার মধ্যে কতটা ধৈর্য আছে, কতটা সহনশীলতা ও সমবেদনা আছে এবং অন্যের কল্যাণ কামনা তার মাঝে কতখানি আছে।

মুসলমানিত্ব গর্ব করে তাঁকে নিয়ে

হযরত ইমাম আবুহানীফা (রহ.) যৌবনের শুরুতে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। একদিন যোহরের পরপরই দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরছিলেন। পথে কোনো বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। সে জিজ্ঞাসা করল, নোমান! এত তাড়াতাড়ি দোকানা বন্ধ করলে কেন? তিনি বললেন, আকাশে মেঘ। তাই তাড়াতাড়ি বন্ধ করলাম। সে বলল, আরে ভাই! বৃষ্টির সঙ্গে দোকানের কী সম্পর্ক? তিনি বললেন, যখন আকাশে মেঘ থাকে, তখন অন্ধকারের কারণে গ্রাহকরা মূল্যবান ও পাতলা কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। আমি চাচ্ছি, এখন কোনো গ্রাহক এসে পাতলা কাপড়কে মূল্যবান মনে করে কিনে ক্ষতিগ্রস্ত না হোক। এজন্য দোকানই বন্ধ করে চলে এসেছি।

চিন্তা করুন, আমরা মুসলমানরা এক সময় অন্যের প্রতি কতটা খায়েরখাহ ও কল্যাণকামী ছিলাম। এ-কারণেই কাফের দেশ থেকে লোকেরা মুসলমানদের কাছে এসে বলত, আপনারা আমাদের দেশে আসুন এবং আমাদেরও উন্নত জীবনপদ্ধতি শিখিয়ে দিন।

বহু দেশ এমন আছে, যেখানে মুসলমানদের সেনাবাহিনী পৌঁছার পূর্বে ইসলামের আদর্শ পৌঁছে যায়। আর শহরের পর শহর বিজিত হয়ে যায়। সেখান থেকে আগে আগে চিঠি আসে, আপনারা আমাদের দেশে আসুন এবং আমাদেরকে আলোকিত জীবন যাপনের দীক্ষা দিয়ে যান। আমরা অত্যাচারী জীবন যাপনে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। হ্যাঁ; ইসলামের প্রচার-প্রসার এই আখলাক দিয়েই হয়েছে। তো আমাদের জীবন যখন শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক হবে, তখন আমরা আপাদমস্তক কল্যাণে রূপান্তরিত হয়ে যাব। এ-কারণে বলা হয়েছে–

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

'দীন কল্যাণকামিতারই নাম।'

প্রাণীদের প্রতিও কল্যাণকামিতা

আমাদের বুযুর্গগণ তো প্রাণীদের প্রতিও কল্যাণকামিতার মনোভাব রাখতেন। হযরত খাজা বাকি বিল্লাহ (রহ.) একদিন গভীর রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করলেন। প্রচণ্ড শীত ছিল। শীতে কাঁপতে-কাঁপতে তিনি লেপের কাছে এলেন। এসে দেখলেন, লেপের নিচে একটা বিড়াল খুব মজা করে ঘুমাচ্ছে। তিনি বিড়ালটাকে জাগালেন না এবং এই কনকনে শীতের মধ্যে নামাযের মুসল্লায় বসেই রাত পার করে দিলেন। আল্লাহু আকবার! আমাদের বড়রা প্রাণীদের প্রতিও কল্যাণকামী ছিলেন। আর আমরা মাশাআল্লাহ নিজের সুবিধা আর স্বার্থটাই আগে দেখি– অন্যেরটা গোল্লায় যাক।

কল্যাণকামিতা জাহান্নামের জন্য প্রাচীর

অন্যের কল্যাণকামিতা আল্লাহ তা'আলা এত পছন্দ করেন যে, একটা পিপাসার্ত কুকুরের প্রতি দরদ ও কল্যাণকামিতার কারণে বনী ইসরাঈলের এক বেশ্যা নারীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তা হলে আমরা যদি কুকুরের চেয়েও বহু গুণ উত্তম মানুষ ও আল্লাহর বান্দাদের খাওয়াই, পান করাই, তাদের জন্য কল্যাণের চিন্তা করি, তাদের দীন শেখাই, তাহলে আল্লাহ কত খুশি হবেন? আমরা যদি আল্লাহ যেসব বান্দারা গুনাহের কারণে জাহান্নামমুখী হয়ে আছে, তাদেরকে দীনের কথা বলে জান্নাতমুখী করি, তা হলে ভেবে দেখুন তো, আল্লাহ কত খুশি হবেন? একেই বলে পরোপকার ও কল্যাণকামিতা। এটিই জীবনের মাকসাদ ও উদ্দেশ্য। আসুন, প্রতিজ্ঞা করি, আমরা যেখানেই থাকব, কল্যাণের আধার হয়ে থাকব। উত্তম চরিত্র ও সৃষ্টির প্রতি দরদকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাব ইনশাআল্লাহ! তখন আমাদের ঈমানও পরিপূর্ণ হবে, আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন।

একটি মূল্যবান নসীহত

একটি খুব শিক্ষণীয় বিষয় আলোচনা করে বক্তব্য শেষ করার চেষ্টা করব। সেটি হলো, ছেলে বেলার কথা। তখন ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম শ্রেণিতে পড়তাম। বয়স আর কত; বারো বা তেরো বছর ছিল। অবুঝ বয়স! আমাদের স্কুলে এক সহপাঠী ছিল। সে গ্রাম থেকে পড়তে আসত। আমরা কখনো শহর থেকে বের হইনি। আমরা এটাও জানতাম না যে, গম কাঠ গাছে ধরে, নাকি তৃণ লতায়। সেই গ্রাম্য ছেলেটি আমাদেরকে যা-ই বলত তা-ই আমাদের কাছে নতুন জ্ঞান মনে হতো।

একদিন সে প্রস্তাব দিল, ভাই! গরমের ছুটি আসছে। তোমরা আমাদের গ্রামে বেড়াতে আস, আমি তোমাদের ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে গ্রাম দেখাব। আমি বাড়ি এসে আম্মুকে বললাম। আম্মু বললেন, ঠিক আছে। তুমি তো খুব ভালো ছেলে, আমাদের কথা মান্য কর, আগ্রহের সাথে লেখাপড়াও কর। তোমার ইচ্ছা পূরণ করা হবে। আমি তোমার সঙ্গে তোমার বড় ভাইকেও পাঠাব। সে তোমাকে নিয়ে গ্রাম ভ্রমণ করিয়ে আসবে; একা যাওয়া ঠিক হবে না।

আমি খুব খুশি হলাম। আমার ভাই আমাকে সঙ্গে করে গ্রামে নিয়ে গেলেন। সেখানে মন ভরে গ্রামের অলিগলি, বনবাদাড়, ক্ষেতখামারে খুব ভ্রমণ করলাম এবং নতুন-নতুন বিষয় জানলাম। এটা ছিল আমার ব্যাকগ্রাউন্ড।

এবার মূল প্রসঙ্গে আছি। আমরা হেঁটে-হেঁটে ফসলের ক্ষেতগুলো দেখছিলাম। একখানে দেখলাম, গরুর গোবর খুব যত্ন করে স্তূপ করা আছে। এমন নাপাকির স্তূপ আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। এরপর দেখলাম, এক কৃষক সেই গোবরগুলো স্বহস্তে মাটির সঙ্গে মেশাচ্ছে। এটা দেখে আমি আরো আশ্চর্য হলাম। প্রশ্ন করলাম, চাচাজান! এই দুর্গন্ধময় নাপাকি কেন মাটিতে মেশাচ্ছেন? তিনি মুচকি হেসে বললেন, বাবা! তোমরা তো শহরের ছেলে, তাই জান না। এ গোবর যেই মাটিতে মিশানো হয়, তাতে ফসল ভালো উৎপন্ন হয়। এগুলো যদিও নাপাকি; কিন্তু এগুলোতে অনেক শক্তি আছে। এ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে বেশি ফসল উৎপন্নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

তখন তো আমাদের বিষয়টি ভালো করে বুঝে আসেনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি। যে নাপাকি থেকে আমরা দূরে থাকি, গায়ে বা জুতায় লাগলে ঘৃণা লাগে। সেই নাপাকি যখন ফসলের মাঠে ফেলা হয়, তখন এটি মাটির উপকার করে, ফসল ভালো হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হলো, তুমি মানুষ হয়েও, আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও তোমার সঙ্গে বসবাসকারী মানুষকে উপকৃত করতে পার না। মনে হচ্ছে, তুমি সেই গোবর থেকেও নিকৃষ্ট। কারণ গোবর তো মাটির সঙ্গে থেকে মাটির উপকার করে, কিন্তু তুমি তোমার সঙ্গীকে উপকার পৌঁছাতে পার না। তো তুমি গোবরের চেয়েও নিকৃষ্ট।

বাস্তবেই যদি আমরা আমাদের আশেপাশে বসবাসকারী মানুষগুলোকে কষ্ট দেই, তাদের মনে আঘাত দেই, তাদের অকল্যাণ কামনায় লেগে থাকি,

তা হলে বাস্তবেই আমরা গোবর থেকেও নিকৃষ্ট। গোবর তো উপকারী; কিন্তু আমরা আমাদের প্রতিবেশির জন্য উপকারী নই।

অশান্তি নয়; প্রশান্তির উৎস হয়ে বসবাস করুন

আসুন, আমরা নিজেদের মধ্যে উত্তম চরিত্র ও ভালো আখলাক সৃষ্টির চেষ্টা করি, যেন আল্লাহর বান্দাদের জন্য আমরা প্রশান্তির কারণ হতে পারি। এখন তো আছি অশান্তির কারণ হয়ে। তাই উত্তম আখলাকের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে মেহনত-মুজাহাদা করতে হবে। এরপর দেখবেন, আল্লাহর রহমত কীভাবে আপনার দিকে ধাবিত হয়।

নিজের জীবনের জন্য একে উসূল বানিয়ে নিন যে, মানুষ আমার সঙ্গে মন্দ করুক; কিন্তু আমি কারো সঙ্গে মন্দ করব না।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর নিকট একব্যক্তি এসে বলল, হযরত! অমুক ব্যক্তি আমার অকল্যাণ কামনা করে। আমাকে কষ্ট দেয়। আমার চলার পথে কাঁটা বিছায়। আমার ধৈর্যেরও বাঁধ ভেঙে গেছে। এখন আমার মনে চাচ্ছে, আমিও তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেই। আপনি শুধু আমাকে অনুমতি দিন। হযরত তাকে কাছে ডেকে আনলেন, আল্লাহওয়ালাদের কথা বড়ই মধুর হয়ে থাকে। তিনি অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে একটি কথা বোঝালেন। কথাটা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। আপনিও সেটি শুনে রাখুন। জীবনে কাজে আসবে। হযরত বললেন–

'হে বন্ধু! যদি কেউ তোমার পথে কাঁটা বিছায়, তা হলে তুমিও তার পথে কাঁটা বিছিয়ো না। অন্যথায় সারাটা পৃথিবী কাঁটায়-কাঁটায় ভরে যাবে।'

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন এবং আমরা যেন নিজেদের মধ্যে উত্তম আখলাক সৃষ্টি করে অন্যের জন্য কল্যাণের কারণ হতে পারি, সেই তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

ছাত্রদের উদ্দেশে মূল্যবান নসীহত

'যারাই আল্লাহ রব্বুল ইয্যতের বান্দা অর্থাৎ– কালেমা পাঠকারী, আল্লাহ তা'আলা তাদের পরীক্ষা করেন। আমরা যদি দশ টাকার তরমুজ ক্রয় করতে যাই, তখন তাকে বাজিয়ে দেখি যে, কাঁচা, না পাকা। এমনিভাবে একটি মাটির পাত্র ক্রয় করতে গেলে যার মূল্য নিতান্তই সামান্য দু-তিন টাকার হবে- সেটাকেও টোকা মেরে বাজিয়ে দেখি, পাকা, না কাঁচা। তো দু-চার টাকা মূল্যের বস্তুও যেমন ক্রয় করার পূর্বে আমরা যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন বোধ করি, তদ্রূপ মহান রব্বুল আলামীনও ঈমানওয়ালাদের একটু বাজিয়ে দেখেন, তারা কাঁচা, না পাকা। অর্থাৎ– তাদেরকে বিপদে ফেলে কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন। কখনো আনন্দ দিয়ে পরীক্ষা করেন, কখনো দুঃখ-বেদনা দিয়ে পরীক্ষা করেন।'

ছাত্রদের উদ্দেশে মূল্যবান নসীহত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ـ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

দুনিয়াটা পরীক্ষার হল

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। আর আখেরাত হলো চিরস্থায়ী ও অক্ষয়। দুনিয়া প্রতারণার ঘর। আখেরাত আনন্দের ঘর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلدُّنْيَا دَارُ الْمِحَنِ

'দুনিয়া হলো পরীক্ষার জায়গা।'

পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য ও অযোগ্যের পার্থক্য বোঝা যায়। ফেল-পাসের ব্যবধান বোঝা যায়। এমনিভাবে এখানেই হক-বাতিলের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কে হকের সঙ্গে সহযোগিতা করছে, কে বাতিলের সঙ্গে সহযোগিতায় আছে। কে 'ইবাদুর রহমান' (রহমানের গোলাম) আর কে 'ইবাদুশ শাইতান' (শয়তানের গোলাম' তাও ভালোভাবে বোঝা যায়। এ-কারণেই আল্লাহ বলেন–

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ

'হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের নিকট হতে এই প্রতিশ্রুতি নিইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করবে না? নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[১৫৬]

وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

'তোমরা আমার ইবাদাত করো; এটাই সরল পথ।'[১৫৭]

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথ দেখান।'[১৫৮]

এই একটি দু'আর জবাবেই গোটা কুরআন বলছে–

هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

'এটিই সরল পথ।'

না নফসের গোলামি করা যাবে, না শয়তানের; বরং আল্লাহর গোলামি করতে হবে। এই গোলামি এক ধরনের পরীক্ষা। এর দ্বারা কে অনুগত আর কে অবাধ্য তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ ঈমানওয়ালাদের অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখেন। তিনি বলেন–

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

'তারা কি ভেবে রেখেছে, তাদের পরীক্ষা করা ব্যতীত শুধু 'আমরা ঈমান এনেছি' বলে দিলেই মুক্তি দিয়ে দেওয়া হবে?'[১৫৯]

আহ! কি শাহী স্টাইল! বলার ভঙ্গি দেখুন, কেমন বড়ত্ব ফুটে উঠেছে?

তিনি আরো বললেন–

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

'আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা নিয়েছি।'

فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

'আমি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবই।'[১৬০]

---

১৫৬. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৬০
১৫৭. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৬১
১৫৮. সূরা ফাতেহা : আয়াত ৫
১৫৯. সূরা আনকাবুত : আয়াত ২
১৬০. সূরা আনকাবুত : আয়াত ৩

এখানে لَيُعَلِّمَنَّ তে ছাকীলার সিগা– তাকীদের সর্বশেষ স্তর।

দু-ধরনের মানুষ

এই দুনিয়া পরীক্ষার স্থল। এক দিকে আম্বিয়া (আ.) ও তাদের অনুসারীরা, অপরপক্ষে শয়তান ও তার অনুসারীরা। একদল ঈমানদার, বিশ্বাসী অপরদল বেঈমান, অবিশ্বাসী। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন–

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ

'সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাদের মধ্যে কিছু হলো কাফের, কিছু হলো মুমিন।'[১৬১]

কিছু মান্যকারী অনুগ্রহ, কিছু অমান্যকারী বিদ্রোহী।

* যারা مومن তারা أَصْحَابُ الْجَنَّةِ আর যারা কাফের, তারা أَصْحَابُ النَّارِ

* مومن বান্দারা اَصْحَابُ الْيَمِيْنَةِ আর কাফের বান্দারা اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ

* এরা أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ এবং তারা أَصْحَابُ الشِّمَالِ

আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করেন

আল্লাহর যেকোনো বান্দা, যারা কালেমা পাঠ করেছে, আল্লাহ তাদের পরীক্ষা নেন। আমরা যখন দশ টাকার তরমুজ ক্রয় করি, তখন তাকে টোকা মেরে, থাপ্পড় মেরে বাজিয়ে দেখি, এটা কাঁচা, না পাকা। এমনিভাবে মাটির পাত্র যখন ক্রয় করি, যার মূল্য নিতান্তই সামান্য দু-চার টাকা হবে। সেটাকেও আমরা বাজিয়ে দেখি, কাঁচা, না পাকা। তো যেভাবে দু-চার পয়সার বস্তু ক্রয় করার সময় আমরা যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, তদ্রূপ আল্লাহ রব্বুল ইয্যতও ঈমানওয়ালাদের কষ্ট দিয়ে বাজিয়ে দেখেন। বান্দার ঈমান কাঁচা, না পাকা তাদের পরীক্ষা করেন। কখনো সুখ-আনন্দ দিয়ে পরীক্ষা করেন, কখনো দুঃখ-বেদনা দিয়ে পরীক্ষা করেন। কখনো সুস্থতা দিয়ে পরীক্ষা করেন, কখনো রোগ-শোক দিয়ে পরীক্ষা করেন। কখনো পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল করে দেন, কখনো বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে পরীক্ষা করেন।

---

১৬১. সূরা তাগাবুন : আয়াত ২

অবস্থার পরিবর্তন

মহান আল্লাহ হলেন অবস্থার পরির্তনকারী। তিনি বলেন–

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

'এই দিনগুলো আমি মানুষের মাঝে অদল-বদল করে দিচ্ছি।'[১৬২]

অর্থাৎ– সর্বদা এক অবস্থা থাকে না।

আজ আনন্দ আছে তো কাল কষ্ট আসে।

আজ দুর্দশাগ্রস্ত তো কাল ভাগ্যবান।

কখনো হাত সংকীর্ণ, তো কখনো প্রশস্ত।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আমি তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, কিছু ক্ষুধা, জান-মাল ও ফল-ফসলাদির কিছু ক্ষতি দিয়ে। আর আপনি ধৈর্যধারণকীদের সুসংবাদ দিন।'[১৬৩]

সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শন একসাথে চলছে। তবে সুসংবাদ লাভের পূর্বে কিছু পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। সর্বাবস্থায় বান্দার পরীক্ষা নেওয়া হবেই।

দুটি পতাকা

এই ঈমানওয়ালারাই লজ্জা ও শরমের পতাকাবাহী। ইসলাম বলে–

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ

'লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।'

এ-কারণেই মুমিন লজ্জাশীল জীবন যাপন করে। পূত ও পবিত্র জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে কাফেররা লজ্জাশীলতাকে এক ধরনের মানসিক রোগ মনে করে। এ-কারণেই ইউরোপ-আমেরিকায় বলা হয়–

Sky ness is a seck ness

'লজ্জা-শরম এক ধরনের রোগ।'

---

১৬২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪

১৬৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৫

অর্থাৎ– সেখানে যদি কেউ লজ্জাবনত হয়ে চলে, তারা বলে, লোকটি অসুস্থ, মানসিক রোগী। যে যতটা লজ্জাহীন হবে, সে তাদের নিকট ততটাই মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন উন্নত চিন্তার অধিকারী হবে। এ হলো দুটি চিন্তাধারা। একটি ধারা লজ্জাশীলতার পতাকা বহন করে এগিয়ে চলছে। অপরটি নির্লজ্জতার পতাকা বহন করে এগিয়ে যাচ্ছে। উভয়টি পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে।

চূড়ান্ত ফলাফল

আজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সারা দুনিয়ায় মুসলিম জাতি এক দিকে আর সকল কাফেরর 'এক জোট' হয়ে বিপরীত দিকে অবস্থান নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলাও চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সময় যেহেতু কেয়ামতপূর্ব, তাই আল্লাহও সবকিছু গুছিয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন–

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ

'আল্লাহ ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে চাচ্ছেন।'[১৬৪]

এই তো কিছু দিন পূর্বে সারা দুনিয়ার মানুষকে একটা ঝাঁকুনি দেওয়া হলো। কাফেররা প্রকাশ্যে জিজ্ঞসা করল, তোমরা কি আমাদের সঙ্গে, না অন্যদের সঙ্গে?

স্পষ্ট কথা বল, মাঝখানের কোনো কথা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রকাশ্যে সঙ্গ দিতে হলো। কারো সহমর্মিতা ও দু'আসমূহ ঈমানদারদের সঙ্গে দিল। আর কারো সহমর্মিতা ছিল কাফেরদের সঙ্গে। আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়ার মানুষগুলোকে ঝাঁকুনি দিয়ে যাচাই করে নিলেন।

সত্যের কাফেলা

ঈমানদারদের একটি কাফেলা, যার মধ্যে সর্বপ্রথম আম্বিয়ায়ে কেরামের দল। সেই দলের পেছনে আছেন সাহাবায়ে কেরামের দল। সাহাবায়ে কেরামের পেছনে ওলামায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের দল। এরা সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রত্যাশী ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলার মর্জি মোতাবেক জীবন যাপনকারী লোকজন। এরা আল্লাহর সন্তুষ্টিওয়ালা গন্তব্যের দিকে ধাবমান। এদের উদ্দেশ্য কী?

---

১৬৪. সূরা আনফাল : আয়াত ৩৭

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ

'এরা বিশ্বাস করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় বিষয়।'[১৬৫]

তাদের ওঠাবসা, চলাফেরা, শয়ন-জাগরণ, খানা-পিনা সব কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানি আমার জীবন, আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের পালনকর্তার জন্য।'[১৬৬]

এরা এত পবিত্র জামাত যে, ছোট-বড় যেকোনো কাজই করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে; নিজের নফসের চাহিদা পূরনের জন্য নয়, রিয়া ও লোক দেখানোর জন্য নয়; বরং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

আনন্দ করে নাও, দুনিয়া দ্বিতীয়বার আসবে না

অপর একটা জামাত আছে, যারা কাফেরদের জামাত। তারা ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত।

بابر! بعیش کوش کہ عالم دو بارہ نیست

বাবর বলেছিল, ভাই! ফুর্তি করে নাও, দুনিয়া দ্বিতীয়বার আসবে না। মৌজ করে নাও যতটা পার।

তো কাফেররা এই দুনিয়াকে জান্নাত মনে করে সব কিছু করে এবং তারা মুসলমানদের সেই নির্লজ্জতার দিকে আহ্বান করে। কখনো টিভির মাধ্যমে, কখনো ইন্টারনেটের মাধ্যমে, কখনো ভিসিআরের মাধ্যমে। আরো কত কি মসিবত আছে কে জানে!

রবের সন্তুষ্টি অনুসন্ধানকারী

এই আমাদের ছাত্ররা আলহামদুলিল্লাহ আম্বিয়া কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণকারী জামাতের মধ্যে শামিল আছে। এরা এমন লোক, যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহর দীনের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। তারা অন্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে, আমরা আল্লাহর দীন শিখব, আমরা সেই জামাতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলব চাই তাতে সুখ আসুক বা দুঃখ।

---

১৬৫. সূরা তাওবা : আয়াত ৭২

১৬৬. সূরা আন'আম : আয়াত ১৬২

তারা রসম-রেওয়াজকে বর্জন করেছে।

তারা ইংরেজদের সভ্যতাকে লাথি মেরেছে।

তারা চেয়ার-টেবিলের পরিবর্তে চাটাইয়ের ওপর বসাকে পছন্দ করে নিয়েছে।

তারা সেখানকার বিরানি-পোলাও খাওয়ার পরিবর্তে সাধারণ রুটি-ডাল খাওয়াকে পছন্দ করেছে। এটাই কুরবানি! দীনের জন্য সাধারণ জীবন যাপনকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এটাও এক ধরনের কুরবানি। তারা কুরবানি ও ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছে। কিছুটা দিন এই ছাত্রদের শিক্ষার মধ্যে কেটে যায়। তারপর তালীম-তাদরীস অথবা ওয়াজ-নসীহত, ইমামত-খেতাবত, ইফতা ও দাওয়াতে তাদের সময় পার হয়। তো এরা হলো কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী জামাত।

শয়তানের প্রচণ্ড হামলা

পরীক্ষা সব ধরনের হয়। বিশেষ করে আরবি মাদরাসার ছাত্রদের পেছনে তো শয়তান কোমর বেঁধে লেগে যায়। সে জানে, এই তালিবে ইল্‌ম তো আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে। এভাবে সে যদি চলতে থাকে, তাহলে সে অবশ্যই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। সুতরাং তাকে ধোঁকায় ফেলে দীনি ইল্‌ম চর্চা থেকে ছিটকে ফেলার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করো। অন্যথায় সে একদিন আমাদের সীমাহীন কষ্টের কারণ হবে।

শয়তানের ঘাঁটি

বলা হয়, কেউ একজন একবার শয়তানকে অলস কর্মহীন বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আরে শয়তান! তুমি তো কখনো অসল সময় কাটাও না। সর্বদা কোনো-না-কোনো কাজে অবশ্যই ব্যস্ত থাক। না খাওয়ার খবর থাকে, না নাওয়ার; কিন্তু এখন যে বড় রিলাক্সে বসে আছ? কারণ কী? সে উত্তর দিল, আমার এখন চেলা-চামুন্ডা অনেক হয়ে গেছে। সে বলল, সেটা কীভাবে? শয়তান বলল, এই যে স্কুল-কলেজ দেখতে পাচ্ছ। এখানে আমার চেলা-চামুন্ডাতে ভরে আছে। এখন এত সাঙ্গপাঙ্গ হয়ে গেছে যে, আমাকে বেশি একটা পরিশ্রম করতে হয় না। এখন আমি গুরু সেজে বসে থাকি, অন্যরা নিষ্ঠার সাথে আমার কাজগুলো করে যাচ্ছে। এ-কারণেই আকবর এলাহাবাদী ফেরাউনের ব্যাপারে বলেছিলেন–

یوں قتل سے بچوں کے بد نام نہ ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

'এভাবে শিশুহত্যার দোষে কলঙ্কিত হত না,
আফসোস! ফেরাউনের মাথায় কলেজের কল্পনা আসেনি।'

অর্থাৎ– ফেরাউন যদি তৎকালে শিশু হত্যা না করে কলেজ নির্মাণ করে দিত, তবে বনী ইসরাঈলের নবজাতকদের আর হত্যার দরকার পড়ত না। কেন? কারণ, সেখানে ঈমানের গলা টিপে হত্যা করার সব চেষ্টা করা হয়। আজকাল অবস্থা এতটাই নাজুক হয়ে গেছে যে, কলেজ পা রাখতেই শিক্ষাগত ফেতনা-ফাসাদ শুরু হয়ে যায়। শরীয়তে ইসলামিয়্যাহর কথা শুনে তাতে ত্রুটি খোঁজা এখন তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরিণত হয়ে গেছে। এটা এমন কেন হলো? ওটা অমন কেন হলো? ওকিল-ব্যারিস্টাররা যেভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে, এরা সেভাবে শরঈ বিধিবিধান নিয়ে এমন আক্রমণাত্মক কথা বলে। আর যখন ইউনির্ভাসিটিতে যায়, তখন সেখানকার হিসাব তো আরো বেশি।

ঈমানের জন্য হুমকি

আজকাল কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে-পরিবেশ তাতে ঈমান রক্ষা খুব কঠিন হয়ে গেছে। কারণ, সেখানে কাফেরদের চিন্তা ও দর্শনের চর্চা বেশি হচ্ছে। যাকেই দেখ, সে দুনিয়াদারি ও বস্তুপূজার পেছনে পড়ে আছে। একদিকে তো সেই প্রতিষ্ঠানগুলো বস্তুবাদী জীবন যাপনের দাওয়াত দেয়। অপরদিকে এই দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে আখেরাত নির্মাণের চিন্তা করা হয়। যেখানে নবীজির বরকতময় সুন্নতের দীক্ষা দেওয়া হয়। নবীজির অনুসরণ ও আল্লাহর স্মরণওয়ালা জীবন গঠনের কথাবার্তা এগুলোই আমাদের আসল বুনিয়াদ।

কর্মমুখী শিক্ষা ও আখেরাতমুখী শিক্ষা

প্রকৃত শিক্ষা কী, তা নিয়ে আমরা বিভ্রান্তির শিকার। প্রকৃত শিক্ষা হলো সেগুলো, যা কুরআন-হাদীছে সন্নিবেশিত আছে। এই যে কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং শেখে, কেউ ডাক্তারি অথবা কম্পিউটার সায়েন্স ইত্যাদি শেখে। এসব তো কিছু শাস্ত্রমাত্র। প্রকৃত শিক্ষা তো ভিন্ন জিনিস। শাস্ত্র দ্বারা মানুষ দুনিয়ার জীবিকা উপার্জন করে। আর দ্বীনি শিক্ষা দ্বারা মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

আল্লাহর নির্বাচন

প্রিয় ছাত্রবৃন্দ! আপনারা ভাববেন না, আপনারা নিজেরাই এখানে এসেছেন। না; বরং আল্লাহই আপনাদের কবুল করেছেন এবং এখানে আসার তাওফীক দিয়েছেন। আপনারাই বলুন, যাকে আপনি অপছন্দ করেন, তাকে কি আপনার ঘরে প্রবেশ করতে দেবেন? ঘর তো দূরের কথা, বাড়ির সীমানাও মাড়াতে দেবেন না। তো আপনারা যদি (মাআযাল্লাহ) আল্লাহর অপ্রিয় হতেন, তাহলে কি তিনি নিজঘরে আপনাদের আনতেন? এই মসজিদ-মাদরাসা আল্লাহর ঘর।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুবি (রহ.) একটি হাদীছ বর্ণনা করে তার ব্যাখ্যায় বলেন, মসজিদসমূহ তো আল্লাহর ঘর আছেই, এমনকি যেস্থানে কুরআন পাঠ করা হয়, সেটিও 'আল্লাহর ঘরসমূহের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ– এমন স্থানও 'বাইতুল্লাহ' তথা আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে শামিল হয়ে যায়, যেখানে কুরআনে কারীমের দরস হয়। আল্লাহ সেই ঘরে কেবল নিজ বন্ধুদেরই ডাকেন।

শয়তানের ব্যাটলিয়ন

আল্লাহ আপনাদের নিজের ঘরে আসার তাওফীক দিয়েছেন এবং যখন আপনারা এসেই গেলেন, তখন শয়তানও বুঝে গেল, এরা তো আমার দল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেল। এখন তার প্রাণপণ চেষ্টা থাকে, যেকোনো বাহানায় সেই বান্দাকে ইল্‌ম থেকে বঞ্চিত করবে এবং তার পদ্ধতি হলো, ছাত্রদের মস্তিষ্কে কুমন্ত্রণা দেওয়া। সর্বদা একের-পর-এক কুমন্ত্রণা ও ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। যে জানে, আমার এই লড়াইয়ের ময়দানটি দুর্বল। এখানে আমাকে বেশি মেহনত করতে হবে। জেনারেল যখন দেখলেন, অমুক স্থানে শত্রুদের সংখ্যা বেশি, তখন সে সেখানে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য অতিরিক্ত সেনা প্রেরণ করেন। শয়তানও জানে, এরা মাদরাসায় গিয়ে আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে, আহলে ইল্‌ম হয়ে যাবে, তাই সেও এদের পেছনে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠায়। এ-কারণেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে শয়তান থাকে একটা আর ছাত্রদের পেছনে যে কত হাজার শয়তান আছে। হাদীছে এসেছে দাড়িহীন বালকের সঙ্গে (৭০) সত্তরটা শয়তান রয়েছে। শয়তান ও তার চেলা-চামুন্ডারা প্রাণপণ চেষ্টা চালায়, কীভাবে এই শিশুদের ইল্‌ম থেকে বিমুখ করা যায়।

শয়তানের ইঞ্জেকশন

এরপর কী হয়? এরপর তালিবে ইল্‌মের ইল্‌ম ছাড়া আর সব কিছু ভালো লাগে। পড়া কঠিন– বাকি সব কাজ সহজ। অথচ নিয়ত করে এসেছে, পরিবারের ইচ্ছায় এসেছে, ইল্‌ম শিক্ষার আগ্রহ নিয়ে এসেছে; কিন্তু শয়তান মস্তিষ্কের মধ্যে Objection (প্রশ্ন) ঢালতে থাকে, ওয়াসওয়াসা, কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। তাই তালিবে ইল্‌মের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা হলো শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা। সর্বদা বেচারা পেরেশান থাকে। শয়তান তাদের ওপর হামলা করে। একথার অর্থ এ নয় যে, যারা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে যায় তারা শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে না। তাদের তো কুমন্ত্রণার প্রয়োজন পড়ে না। তারা তো নিজেরাই স্বেচ্ছায় সেই কাজ করে যাচ্ছে, যা শয়তান পছন্দ করে। সে তাদের ব্যাপারে আনন্দিত হয়ে বসে থাকে এবং বলে Welldore ঠিকই করছ। খুব ভালো কাজ করছ। অপর দিকে তাকে নিজেই কাজে নামতে হচ্ছে। সে জানে এক-একটি তালিবে ইল্‌ম, যারা আমার হাত থেকে ফস্‌কে গেছে, এরা তো ঘরে ফিরে হাজারো মানুষের হেদায়েতের কারণ হবে। সে নিজের চেলা-চামুন্ডাদের বলে, আরে! এ দিকে মনোযোগ দাও, এদেরকে লেখাপড়া থেকে সরাও।

সুতরাং সফল তালিবে ইল্‌ম হলো সে, যে সকল দিক থেকে নিজের মনোযোগ সরিয়ে ইল্‌ম অর্জনের ওপর পূর্ণ মনোনিবেশ করে। দিন-রাত একমাত্র লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ইল্‌মের নূর হাসিল করতে সর্বদা অদম্য স্পৃহা বুকে ধারণ করে থাকে। যখন পড়তে বসে, তখন পূর্ণ একাগ্রতার সাথে পড়ে। এই কথাগুলো ভালোভাবে অন্তরে গেঁথে নাও।

গুনাহ্ ও স্মৃতিশক্তি

যৌবনের শুরুতে মানুষের স্মৃতিশক্তি খুব ভালো থাকে; কিন্তু গুনাহের কারণে পুনরায় তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। যুবক যদি পবিত্র ও পরহেযগারির জীবন অবলম্বন করে, তাহলে তার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো থাকে।

ফটোগ্রাফিক মেমোরী

মুহাদ্দিছীনে কেরামের জীবনী আপনারা হয়তো পড়ে থাকবেন। আল্লাহ তাঁদের কেমন স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন! একদম ফটোগ্রাফিক মেমোরী। তারা যেকথা একবার শুনতেন, তো তা বহু বছর তাঁদের স্মরণ থাকত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) ইল্‌মে নববীর ব্যাপারে

সবচেয়ে বেশি আগ্রহ রাখতেন। হযরত মুফতী শফী (রহ.) স্বীয় কিতাবে লিখেছেন, হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) অনেকটা মওলবী ধরনের সাহাবি ছিলেন। নবীজির কথা ও তাঁর ছোট-বড় সকল আমল আত্মস্থ করার ব্যাপারে তিনি খুবই তৎপর ছিলেন।

কিন্তু প্রথম-প্রথম তিনি ভুলে যেতেন– মনে রাখতে পারতেন না। খায়বারের যুদ্ধের পর মুসলমান হয়েছেন। সোহবতের যামানাও সামান্য পেয়েছেন। কিন্তু তিনি সবার চেয়ে এগিয়ে গেলেন। যখন ভুলে যেতেন, মনে রাখতে পারতেন না, তখন একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বয়সও অনেক হয়ে গেছে, সময়ও আমার হাতে কম; ভুলেও যাই, আমার জন্য দু'আ করুন। নবীজি বললেন, তোমার চাদরটা বিছাও! তিনি চাদর বিছালেন। নবীজি তাতে এমনভাবে কিছু ঢাললেন, যেন তিনি বড় গাড়িতে কিছু ঢালছেন। সাহাবি বলেন, তারপর আমি চাদর মুড়ে গাঠুরির মতো বানিয়ে তা কাঁধে তুলে নিলাম। তারপর থেকে নবীজির কোনো কথা আর আমি ভুলিনি।

বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি

তাবেঈদের মধ্যে একজন শাসক ছিলেন মারওয়ান। তাঁর মনে একবার প্রশ্ন জাগল, হযরত আবুহুরায়রা অনেক হাদীছ বর্ণনা করেন। এই বর্ণনাগুলো কি হুবহু রাসূলের মুখে উচ্চারিত শব্দে বর্ণিত, নাকি শুধু অর্থগত হাদীছ। শব্দ তার পক্ষ থেকে? অর্থাৎ– এক হলো, আমি আপনার কথা শুনলাম এবং সেই মর্মার্থগুলো নিজের শব্দে হুবহু বর্ণনা করে দিলাম। একে বলা হয় রেওয়ায়াত বিল মা'না। অর্থাৎ– মর্মার্থ সেটাই; তবে শব্দমালা নিজের পক্ষ থেকে। আর অপর সূরত হলো, যেকথা, যে শব্দ যেভাবে শুনেছে, হুবহু শুরু-শেষ সেই শব্দেই বর্ণনা করা। অর্থাৎ– শব্দও সেটি, অর্থও সেটি। একে বলা হয়, 'রেওয়ায়াত বিল মাতান'।

তো মারওয়ানের মনে প্রশ্ন জাগল। তিনি তো ভালো করেই তা জানতেন, সাহাবি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। তারপরও বিষয়টি যাচাই করার কৌতূহল তিনি দমন করতে পারলেন না। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন, চলো, বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাক। রাজা-বাদশাহদের কর্মের ধরন অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্ন হয়ে থাকে। তিনি হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.)-সহ আরো বহু সাহাবাকে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর মারওয়ান হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.)কে আরজ করলেন, হযরত! আপনি নবীজির বহু হাদীছ জানেন। আজ আমাদের কিছু হাদীছ শোনান। পাশাপাশি উক্ত মজলিস থেকে পর্দার আড়ালে দুজন ক্ষিপ্রগতির লেখকও বসিয়ে দিয়েছিলেন। মজলিসের কারো জানা ছিল না, পর্দার আড়ালে কেউ বসা আছে। হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) সহস্রাধিক হাদীছ বর্ণনা করলেন। অনেক বড় মজমা ছিল। তিনি যা কিছু বলতেন, পর্দার আড়ালের দুজন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা লিখে ফেলত। দুজন লেখক রাখার কারণ ছিল, একজন যদি ভুল করে, তা হলে অন্তত দ্বিতীয়জনের লেখা থেকে তা যেন শুদ্ধ করে নেওয়া যায়।

গোটা মাহফিলের সমস্ত হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হলো। আর এ-বিষয়ে কেউ কিছুই জানতে পারেনি।

এরপর এক বছর পার হয়ে গেল। এক বছর পর মারওয়ান পুনরায় হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.)কে দাওয়াত করল, খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি গত বছরের লেখক দুজনকে পর্দার আড়ালে বসিয়ে বললেন, শোনো, আমি হযরতকে গত বছরের মজলিসে বর্ণিত হাদীছগুলো আজ আবার শোনানোর জন্য আবেদন করব। যেই তিনি বলতে শুরু করবেন, সঙ্গে-সঙ্গে তোমরাও গত বছরের পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীছগুলো মিলাতে থাকবে এবং কোথায়-কোথায় ভিন্নতা দেখা যায়, তা চিহ্নিত করে রাখবে।

স্বাভাবিক কথা, গত বছরের বর্ণিত হাদীছ এক বছর পর কি মনে আছে, কোন-কোনটি বলেছিলেন, কোনটি বলেননি? এটা মূলত যাচাই করার একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। যাহোক, খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর তিনি হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.)কে আরজ করল, হযরত! গত বছর যে-হাদীছগুলো আমাদের শুনিয়েছিলেন, সেগুলো খুবই চমৎকার ছিল, খুব ভালো লেগেছিল। আমার মন চাচ্ছে, সেই মাহফিলটা পুনরায় তাজা হয়ে যাক। দয়া করে সেই হাদীছগুলো আমাদের আরেকবার শুনিয়ে দিন।

হযরত আবুহুরায়রা (রাযি.) হুবহু গত বছরে বর্ণিত হাদীছগুলো একের-পর-এক প্রায় সহস্রাধিক হাদীছ হবে একনাগাড়ে শুনিয়ে দিলেন। পর্দার আড়ালে পর্যবেক্ষণকারী লেখকদ্বয় সাক্ষ্য দিল, গত বছরের হাদীছগুলোর সঙ্গে আজকের হাদীছগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে এক বিন্দু পার্থক্যও পাওয়া যায়নি।

সুবহানাল্লাহ! তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন। এই নেয়ামত আল্লাহ তা'আলা তালিবে ইল্‌মদেরও দিয়ে দেন। ব্যস! এখানে একটি বিষয়ই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর তা হলো 'গুনাহ'। যে-তালিবে ইল্‌ম তাকওয়া ও পরহেযগারির জীবন যাপন করে, তার স্মৃতিশক্তি আল্লাহ তা'আলা বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেন। একেবারে ফটোগ্রাফিক মেমোরীর মতো। যা শোনে, তা-ই মস্তিষ্কে একেবারে গেঁথে যায়। এমন স্মৃতিশক্তি তাকে দান করা হয়। আর এই বিস্ময়কর নেয়ামতই মুহাদ্দিছীনে কেরামের মধ্যে ছিল।

মুহাদ্দিছ কাকে বলে?

মুহাদ্দিছীন কারা ছিলেন? তাঁরা সেসব লোক ছিলেন, যাদের অন্তরে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ভরপুর ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অন্যদের তুলনায় বিস্ময় স্মৃতিশক্তির নেয়ামত দান করেছিলেন। তাদের মধ্যে সর্বদা নবীজির কথা, কাজ ও আমলসমূহ সংরক্ষণ করার এক অদম্য স্পৃহা ছিল। সারাটা জীবন তাঁরা এর মধ্যেই লাগিয়েছিলেন।

স্মৃতিশক্তির অপূর্ব এক উদাহরণ

ইমাম বোখারি (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, প্রায় দশ লক্ষ হাদীছ তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি যখন বসরা তাশরীফ আনলেন, তখন বসরাবাসী তাকে অভিনন্দন ও স্বাগতম জানাতে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। অভিনন্দনের পর তাকে একটি মাহফিলে বসালেন। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তারা পরিকল্পনা আঁটল, বোখারি একজন হাফেযে হাদীছ। তিনি কেমন হাফেয আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখব। তারা দশজন লোক ঠিক করল। দশজনের প্রত্যেকেই দশটি করে হাদীছ মুখস্থ করে এল। কিন্তু প্রত্যেক হাদীছের মধ্যে কোথাও শব্দে আবার কোথাও সনদের মধ্যে কিছু বিকৃতি সাধন করে গুছিয়ে আনল।

আচ্ছা! যখন কারো ব্যাপারে এভাবে পরিচয় দেওয়া হয়, ইনি হাফেযে হাদীছ এবং তাঁকে বলা হয়, ভাই! কিছু হাদীছ শোনাও, তখন তো তারও মন চায়, আমাকে যা বলতে বলা হচ্ছে আমি যেন সব বলতে পারি। কিন্তু হাদীছের সনদ, মতন ও শব্দবিন্যাস বিকৃত করে যদি প্রশ্ন করা হয়, তখন কি কাজটা সহজ থাকে? থাকে না। ইমাম বোখারির সঙ্গে তা-ই করা হয়েছিল।

সর্বপ্রথম তারা একটি বিশাল মাহফিলে ইমাম বোখারি (রহ.)-এর পরিচয় এভাবে দিলেন যে, ইনি হাদীছের একজন ইমাম, হাফেযে হাদীছ, লক্ষ-লক্ষ হাদীছ তাঁর মুখস্থ আছে। এভাবে তার খুব প্রশংসা করল। তারপর একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, জনাব! আমার নিকট কিছু হাদীছ পৌঁছেছে, একটু শুনে বলুন তো, এগুলো কি আপনার কাছেও পৌঁছেছে? তারপর সে প্রথম হাদীছটি পড়ে শোনাল। এগুলো হলো সেই পরিকল্পিত বিকৃত হাদীছ। সেগুলোতে সনদ, মতন ও শব্দবিন্যাসে উলটপালট করা হয়েছিল। সে পড়া শেষ করে বলল, আপনার নিকট কি হাদীছটি পৌঁছেছে? ইমাম বোখারি (রহ.) উত্তর দিলেন, না।

এবার বুঝুন, একটি হাদীছের বেলায় হয়তো 'না' বলা যেতে পারে। কিন্তু বারবার কি 'না বলা মানায়? লোকটি দ্বিতীয় হাদীছ পড়ে জিজ্ঞাসা করল। উত্তল এল, 'না'। তৃতীয়টি পড়ল। উত্তর- 'না'। চতুর্থটি পড়ল। উত্তর- না। এখন সাধারণ লোকেরা তো বলবে, আরে ভাই! কেমন হাফেয তিনি? যা-ই জিজ্ঞাসা করে, বলে, জানি না। এ তো দেখি 'ভুয়া মুহাদ্দিছ'।

তারপর দ্বিতীয়জন দাঁড়িয়ে এমনই দশটি হাদীছ জিজ্ঞাসা করল। প্রত্যেকটির উত্তর এলো, না। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ করে দশজনই হাদীছ জিজ্ঞাসা করল। ইমাম বোখারি প্রত্যেকের জবাবে শুধু 'না' বলে গেলেন। চিন্তা করুন, এতে তাঁর ওপর কী রকম মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হলো। আল্লাহু আকবার!

যখন দশজনের দশটি করে একশতটি প্রশ্ন শেষ হলো, এবার ইমাম বোখারি (রহ.) বললেন, আপনারা যে-হাদীছগুলো আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, এবার এগুলো সম্পর্কে আমার বক্তব্য শুনুন।

ইমাম বোখারি সর্বপ্রথম হাদীছটি পড়লেন। সনদ, মতন বা শাব্দিক ভুলসহই হুবহু তা পড়ে শোনালেন এবং বললেন, এই আল্লাহর বান্দা এই হাদীছে এই ভুলটা করেছেন। তারপর বললেন, মূলত উক্ত হাদীছটি আমার নিকট এভাবে পৌঁছেছে এবং হাদীছটি সঠিকভাবে বললেন, কিতাবে লেখে, ইমাম বোখারি (রহ.) তাদের ভুল মতন, ভুল সনদ বিশিষ্ট একশতটি হাদীছের প্রত্যেকটিকে হুবহু ওই ভুলসহ ওই বিন্যাসেই হাদীছের সহীহ সনদ ও সহীহ মতন উল্লেখ করে শোনাতে থাকলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ভুল চিহ্নিত করে প্রত্যেকটি হাদীছের সহীহ সনদ ও সহীহ মতন উল্লেখ করে শোনাতে থাকলেন।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, একশ হাদীছ মুখস্থ করা শুনিয়ে দেওয়া তেমন কোনো কঠিন কাজ নায়। কিন্তু পরম বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, প্রশ্নকারীরা যে যেই ভুলসহ হাদীছ পড়েছিল, সেগুলো মাত্র কয়েকবার শুনে-শুনে হুবহু মনে রাখা এবং শব্দ বা বিন্যাসের কি কোনো পরিবর্তন ছাড়াই যেমন বলেছে তেমিন বর্ণনা করা। এটা কুদরতের কারিশমা না হয়ে পারে না। হাদীছকে আল্লাহ এভাইবে হেফাযত করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

পরহেযগারির পুরস্কার

এখান থেকে কী বোঝা গেল? এত প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল যে, যেন মস্তিষ্কে ফটোর মতো ছেপে যেত। আর এমনটি কখন হয়? যখন মানুষ তাকওয়া ও পরহেযগারির জীবন যাপন করে। এটি একটি পুরস্কারমাত্র, যা আল্লাহ তাঁকে দান করে থাকেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়ে যায়। যা শোনে বা পড়ে, তা-ই মস্তিষ্কে ছেপে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন শয়তানি চিন্তা-ফিকিরে নিমগ্ন হয়, তখন সমস্ত কথা সে ভুলে যায়। কোনোও কিছুই হুবহু মনে থাকে না।

স্মৃতিশক্তি ও এক মুহাদ্দিছের মর্যাদা

তাঁদের স্মৃতিশক্তি বিস্ময়কর পর্যায় পর্যন্ত প্রখর ছিল। ইমাম তিরমিযি (রহ.)-এর ঘটনা। তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। একবার হারামাইন শরীফাইন-এর সফরে যাচ্ছিলেন। উটের ওপর আরোহী ছিলেন। উট তো এমনিতেই উঁচু প্রাণী। তার ওপর যে সাওয়ার হবে, তাকে আরো বেশি উঁচা মনে হয়। যদি রাস্তার আশেপাশে কোনো গাছ থাকে, তা হলে ভয় থাকে যে, মাথা আবার গাছের ডালের সঙ্গে লেগে না যায়। ইমাম তিরমিযি (রহ.) উটের ওপর আরোহী ছিলেন। এক জায়গায় এসে হঠাৎ ইমাম সাহেব মাথাটা একেবারে নিচু করে নিলেন। একটু পরে আবার সোজা হয়ে বসে গেলেন। লোকেরা বিস্মিত হয়ে বলল, হযরত! আপনি মাথা নিচু করলেন কেন? তিনি বললেন, সেখানে যেই গাছটা আছে, তার ডাল থেকে বাঁচার জন্য মাথা নিচু করেছি। তারা বলল, কিন্তু এখানে তো কোনো গাছ দেখতে পাচ্ছি না। তিনি বললেন, একটা গাছও নেই? তারা বলল, না, জনাব! একটা গাছও নেই। এবার ইমাম সাহেব গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন, সবাই থামো এখানে। সবাই থেমে গেল। বললেন, আশেপাশের গ্রামে খোঁজ নিয়ে জানো, এখানে কি কোনো গাছই ছিল না?

একজন বলল, হযরত! আমি খবর নিয়ে আসছি। কিন্তু এটা তো এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তিনি বললেন, অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমার স্মৃতিশক্তি বলছে, এখানে গাছ ছিল। যদি আমার ভুল হয়ে যায়, তা হলে আজকের পর হাদীছ বর্ণনা বন্ধ করে দেব। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে, আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। আর তা যাচাই করার এটাই উপযুক্ত সময়। পরে গ্রামবাসী থেকে জানা গেল, এখানে একটা গাছ ছিল। সেটা মূল থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। এবার ইমাম তিরমিযি (রহ.) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি ভবিষ্যতেও হাদীছ বর্ণনা জারি রাখব। কারণ, আমার স্মৃতিশক্তি এখানো ম্লান হয়নি।

এ ছিল তাঁদের স্মৃতিশক্তি। এটা কীভাবে পাওয়া যাবে? তাকওয়া ও পরহেযগারির মাধ্যমে। আল্লাহ আমাদের তাকওয়া ও পরহেযগারি দান করুন। আমীন।

স্মৃতিশক্তির আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা

এ-ধরনের পরম বিস্ময়কর হাজারো ঘটনা কিতাবাদিতে লেখা আছে। ইমাম আবুযুরআহ-এর ঘটনা প্রচুর লেখা হয়েছে। তিনিও বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। বহু হাদীছ মুখস্থ ছিল তাঁর। তাঁর যমানায় এক যুবকের বিবাহ হলো। কিছুদিন পর একটা ঘটনা ঘটে গেল। যুবক একদিন ইমাম সাহেবের হাদীছের দরসে গিয়ে ঘরে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। স্ত্রী অপেক্ষায় ছিল। স্ত্রী বলল, আজ বড় দেরি করলেন কেন? সে বলল, দরসে বসেছিলাম; তাই দেরি হয়ে গেছে। স্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, তুমি প্রতিদিন দেরি করে ফের। ঘরের প্রতি কোনো নজর নেই ইত্যাদি।

কথা কাটাকাটি হতে-হতে ঝগড়ার আকার ধারণ করল। স্ত্রী এক পর্যায়ে বলল, তুমি ইল্‌ম শিক্ষা করার কথা বলছ। তোমার শিক্ষক কিছু জানেন কি? নইলে তুমি আমাকে এত কষ্ট দিতে না। যুবক নিজের ব্যাপারে কিছু বললে তো মেনে নিতে পারে; কিন্তু ওস্তাদের ব্যাপারে এমন কথা শুনে সহ্য করতে পারল না। রাগের মাথায় বলে ফেলল, যদি আমার ওস্তাদের এক লক্ষ হাদীছ মুখস্থ না থাকে, তা হলে তুমি তালাক।

সকালে যখন উভয়ের মাথা ঠান্ডা হলো, তখন স্ত্রী বলল, কাল তো শর্তযুক্ত তালাক দিয়েছেন। শর্ত পূরণ হলে তালাক হবে না, পূরণ না হলে তালাক হয়ে যাবে। যুবক বলল, আচ্ছা! প্রকৃত তথ্য তো আমার কাছে নেই। আমি গিয়ে জেনে আসি।

কিছুক্ষণ পর যুবক গিয়ে ইমাম আবুযুরআহ (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত হলো। নিজের বোকামির পুরো কাহিনী ওস্তাদকে শোনাল। বলল, এখন তো যা হবার হয়ে গেছে। আপনি বলুন, তালাক কি পড়েছে? একথা শুনে ইমাম আবুযুরআ (রহ.) মুচকি হেসে বললেন, যাও, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের সঙ্গে জীবন যাপন করো। তালাক হয়নি। কারণ, এক লক্ষ হাদীছ আমার এমনভাবে মুখস্থ আছে, যেভাবে সূরা ফাতেহা মানুষের মুখস্থ থাকে।

এই ছিল আমাদের বড়রা। তারা অগ্রগামী, আমরা তাদের অনুসারী।

একই গন্তব্যের পথিক

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! আমাদের যে নেসবত ওইসব মহান মুহাদ্দিছীনে কেরামের দিকে আছে, এটা অনেক বড় সম্মানের বিষয়। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনেক বড় পুরস্কার যে, আমরা তাদের পথেই চলছি। যদিও তাদের ও আমাদের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে; তথাপি গন্তব্য তাদের ও আমাদের একই। একটা উদাহরণ শুনুন–

একটা ট্রেন চলছিল। ফাস্ট ক্লাস ট্রেন। ভেতরে এয়ারকন্ডিশন, মনোরম বগি যেখানে লাগানো ছিল। তার পরই লাগানো ছিল পুরাতন ও ভাঙাচোরা, নোংরা আরেকটা বগি। ফাস্ট ক্লাস বগিটা পুরাতন বগিটাকে বলল, আমি তো একেবারে নতুন। এ.সি, কার্পেট, উন্নত ফার্নিচার! কী না আছে আমার মধ্যে। আমার মধ্যে যারা বসে, তারাও ভি.আই.পি লোক। তুমি একটা ভাঙাচোরা, অপরিষ্কার বগি আমার সঙ্গে লেগে আছ। চলতে গেলে চিঁ-চিঁ শব্দ বের হয়। তোমার মধ্যে বসেও নিম্ন শ্রেণির লোকেরা। যাও! আমার পিছু নিয়ো না, আমার থেকে দূরে সরে যাও। উত্তরে পুরাতন বগি বলল, আমি মানছি, তোমার মর্যাদা অনেক আর আমি নিম্নমানের। আমার চেয়ারও ভালো না, আমার অবস্থাও ভালো না; কিন্তু একটি বিষয়ে তোমার আমার মজবুত মিল রয়েছে। ফাস্ট ক্লাস বলল, সেটা কী? পুরাতন বগি বলল, দেখো, আমার শিকলটি তোমার গায়ের আংটার সঙ্গে বাঁধা আছে। এবার তুমি যেখানেই যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে পৌঁছে যাব। যদি তুমি করাচির স্টেশনে গিয়ে থাম। তবে আমিও সেখানেই গিয়ে থামব। অর্থাৎ– আমাদের গন্তব্য এক।

সুতরাং মনে রাখবেন, আপনি যখনই 'দারুল উলূমে' ভর্তি হয়েছেন, তখনই সে মোবারক কাফেলার ট্রেনের সঙ্গে নিজের কড়াটি বেঁধে দিয়েছেন।

এবার যদি আমরা অযোগ্যও হই, দুর্বল-অকর্মাও হই, তবুও এতটুকু কথা নিশ্চিত যে, আলহামদুলিল্লাহ' কড়া আটকে গেছে। যেপথে তারা চলছেন, আমরাও সেপথেই চলছি।

সূরতকে হাকীকত বানিয়ে নিন

এবার প্রয়োজন কীসের? প্রয়োজন হলো, যখন আমরা কড়া আটকে দিয়েছি, তা হলে এবার আমরা নিজেদের যাহির-বাতিনকে এক করে শুদ্ধ করে নেই, যেন তাদের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য মজবুত হয়।

تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں
حقیقت اسکو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں

'আমরা সবাই মাশাআল্লাহ সূরত তো বানিয়ে রেখেছি খুব সুন্দর। এবার একে হাকীকত বানানোর জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন।

مَنْ طَلَبَ فَقَدْ وَجَدَ

'যে অনুসন্ধান করে, সে পেয়ে যায়।'

এ কাজটি সহজ। এত বড় কদম যখন উঠিয়ে ফেললেন, তাহলে পরের কদম তো খুবই ছোট। নিজেকে আল্লাহর হাতে সঁপে দিন। অন্তরে এই প্রতিজ্ঞা করে নিন যে, আমি শরীয়তপরিপন্থী কোনো কাজ করব না। কারণ, এটা বড়দের সঙ্গে একটি মোবারক নেসবত। এই পথ আলোর পথ। আল্লাহ এই পথে ওই বান্দাকে চলতে দেন না, যার মধ্যে মুনাফেকি ও অন্ধকার আছে। তিনি খুব ঘষেমেজে তারপর ছাড়েন। যেমন– কেউ বিদেশে যেতে চাইলে এয়ারপোর্টে তার কাগজপত্র যাচাইকারী থাকে। যদি কারো কাগজপত্রে ত্রুটি থাকে, তাকে সরিয়ে দিয়ে বলে, যান, ওপাশে চলে যান, কাগজপত্র ঠিক করে আসুন। তো এমন যেন না হয়, আমাদের আমলনামা যখন ওপরে পৌঁছবে, তখন বলা হয়, ত্রুটিযুক্ত আমলনামাওয়ালারা ওপাশে সরে যাও এবং অন্যরা এদিকে এসো। তাই আসুন, আল্লাহ যখন আমাদের আলোকিত জীবন যাপনের তাওফীক দিয়েই দিলেন, তা হলে এবার তার সুরতকে হাকীকতে পরিণত করার চেষ্টা করি।

রাসূলপ্রেমিক ও বন্ধু

কিন্তু এটি অনেক বড় চুক্তি, যাদের পেছনে আমরা চলছি, তারা অনেক বড় ও অনেক মর্যাদার অধিকারী। একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করছিলেন- 'হে আল্লাহ! আমাকে আমার বন্ধুদের সঙ্গে জলদি মিলিত করে দিন। যে আমাকে ভালোবাসে, তাদের সঙ্গে জলদি মিলিত করে দিন।' নবীজির খাদেম হযরত ছাওবান (রাযি.) একথা শুনে আরজ করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! আমরা আপনার খাঁটি আশেক, খাঁটি প্রেমিক। তারা কারা, যাদের ব্যাপারে আপনি দু'আ করেছেন? নবীজি ইরশাদ করলেন- ছাওবান! তুমি খাঁটি প্রেমিক। এজন্য যে, তুমি আমাদের স্বচক্ষে দেখেছ, আমার মাহফিল পেয়েছ, কুরআন অবতীর্ণ হতে দেখেছ। কিন্তু ছাওবান! আমার পর কিছুলোক এমন আসবে, যারা আমাকে দেখবে না, তারা শুধু কিতাব-পত্রে আমার আলোচনা পড়বে, স্বীয় ওস্তাদের নিকট আমার কথা শুনবে, আমাকে স্বচক্ষে না দেখেও তাদের অন্তরে আমার জন্য এমন ভালোবাসা সৃষ্টি হবে যে, আমার একটি সুন্নতও তারা ছাড়বে না; আমার পূর্ণ আনুগত্য করবে। তাদের পক্ষে যদি সম্ভব হতো, তাহলে নিজের সন্তানকে বিক্রি করে হলেও আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসত। এমন মহব্বত হবে। হে ছাওবান! আমি আমার সেই আশেকদের জন্য দু'আ করছি। হে আল্লাহ! সেই আশেকীনের সঙ্গে আমাকে জলদি মিলিত করো। আল্লাহ আমাদেরও সেই জামাতে শামিল করুন।

কাঁটার বিছানা

এরা এক এমন কাফেলা, যারা হকপন্থীদের পেছনে চলছে। এটা আহলে হকের কাফেলা। এটা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। এখন এ পথে সংকট তো আসবেই। কখনো কষ্ট, তো কখনো দুঃখ। এসব দুঃখ-কষ্টে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। আল্লাহই প্রতিদান দেবেন। ইনশাআল্লাহ মনোবাসনা পূরণ হবে। কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জিত হয়ে যাবে।

চলছেন না? দেখছেন না? কেমন বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে এখানে এসে বসে আছে? স্থানীয় লোকেরা পিছে-পিছে ঘোরে, একটু দু'আ করুন, কোনো ওযীফা বা দু'আ শিখিয়ে দিন, যেন ভিসাটা লেগে যায়। অথচ সেখানে যারা জন্মগ্রহণ করেছে, সেখানকার আলো-বাতাসে বড় হয়েছে। মাশাআল্লাহ তারা কিন্তু দুনিয়ার নেশায় নেই। তাদেরকে আল্লাহ এই স্থানে নিয়ে এসেছেন, গালিচা ছেড়ে চাটাইর ওপর বসার জন্য এসেছে।

আহ! আজ এদের দেখে মনে হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর কথা আবার তাজা হয়ে উঠেছে।

নেসবতের হক

আপনারা আহলে হকের কাফেলা। খুব বুঝে নিন! এরা ওইসব লোক, যারা 'হুর'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিল। কারণ, এরা বাতিলকে ছেড়ে আহ্‌লে হকের সঙ্গে শামিল হয়ে গেছে। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানও বিশাল পাওয়া যায়। যাহোক ভাই! আমরা একই কাফেলার সদস্য। সুতরাং বন্ধুত্বের হক আমাদের আদায় করতে হবে। দীন পেতেও হবে এবং তার ওপর আমলও করতে হবে এবং একে আগেও নিয়ে যেতে হবে।

আমাদেরকে তিনটি কাজ করতে হবে–

* পড়তে হবে।

* এরপর কী? আমলও করতে হবে।

* এরপর কী? কাজ। একে আরো আগে পৌঁছাতেও হবে।

এই তিনটি কাজ আমাদেরই করতে হবে।

বলা হয়, খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, তখন একটা চড়ুই পাখি একটুখানি পানি ঠোঁটে করে এসে ওপর থেকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলছিল। কেউ একজন পাখিটাকে জিজ্ঞাসা করল, এত বড় অগ্নিকুণ্ডে তোমার এই এক ঠোঁট পানিতে কী-ই বা আর হবে? এতে কি আগুন নিভে যাবে? পাখি উত্তর দিল, এটা তো আমিও জানি যে, আগুন নিভবে না। কিন্তু খলীলুল্লাহর সঙ্গে আমার যে-বন্ধুত্ব আছে, তার হক আদায় করতে হবে না? আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করছি। তাই আসুন, অন্তত যতটুকু সম্ভব ততটুকু করতে শুরু করি।

নিজের সাম্রাজ্য

বর্তমানে আমাদের চতুর্দিকে যেভাবে ফেতনা-ফাসাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, এগুলো দূর করে সমাজকে সুশৃঙ্খল করা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে নিজের দেহের ওপর তো আমাদের কর্তৃত্ব রয়েছে। যতটুকু সম্ভব এই দেহের ওপরই আল্লাহর কানুনগুলো কার্যকর করুন। এই ছয় ফিট দেহের ওপর আল্লাহ আমাদের রাজত্ব দান করেছেন। আমরা এটিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী গড়ে ছাড়ব। এরপর দেখবেন, এর কী সুপরিণতি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এর পুরস্কার থাকবে সীমাহীন এবং গ্রহণযোগ্যতা হবে তুলনাহীন।

দুধ ও পানির চমৎকার সংলাপ

কিছুদিন আগে একব্যক্তি বিস্ময়কর কথা শোনাল। ভালো লেগেছে। আপনাদেরও শুনিয়ে দেই। তিনি বললেন, মিষ্টির দোকানী আগুনে দুধ গরম করে যখন মালাই তৈরি করে, তখন প্রথমে তাতে পানি ঢালে। মিষ্টির দোকানের লোকেরা যে-কড়াইতে দুধ ঢেলে গরম করে, তাতে কেবল দুধই থাকে তা নয়; বরং পানিও তাতে মেশানো হয়। কারণ, দুধগুলো ফুটে শুকিয়ে যায় এবং অবশেষে মালাই তৈরি হয়। সেই আলেম বলছিলেন, যখন মিষ্টির দোকানী দুধের মধ্যে পানি ঢালতে আরম্ভ করে, তখন পানি আর দুধের মধ্যে সংলাপ হয়।

দুধ : জনাব! আমার রং সাদা, আমার মূল্যও বেশি, আমার স্বাদও অসাধারণ। আমাদের মধ্যে খাদ্য হওয়ার গুণও রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। হে পানি! তোমার মধ্যে তো উল্লিখিত গুণাবলির কিছুই নেই। না তোমার চেহারা আছে, না মূল্য, না স্বাদ। তাহলে আমার মধ্যে কেন প্রবেশ করছ? আমার আর তোমার মধ্যে তো বিস্তর ফারাক। আমি উন্নত, তুমি সাধারণ। তোমার সাথে আমার সামঞ্জস্য কীভাবে হয়।

পানি : ভাই দুধ! আপনার কথা একদম সঠিক। আপনি উন্নত, আপনার মূল্যও উন্নত, আপনার গ্রাহকও বেশি। আর আমি মূল্যহীন, সাধারণ, যাতে কোনো স্বাদও নেই। খুব মামুলি আমি। কিন্তু আমাকে আপনার মধ্যে প্রবেশ করতে দিন। কারণ, আমি ওফাদার। আমি যদি আপনার মধ্যে শামিল হতে পারি, তা হলে আপনার কল্যাণ করব।

দুধ : আচ্ছা! আপনার মধ্যে খুব কৃতজ্ঞতা আছে বুঝি? আচ্ছা বলুন তো, আমার সঙ্গে কী কৃতজ্ঞতা দেখাবেন?

পানি : যখন আপনাকে আগুনের ওপর রেখে ফোটানো হবে, তো যতক্ষণ-না আমার সর্বশেষ ফোঁটাটাও বাষ্পে পরিণত হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার শরীরে আগুনের তাপ লাগতে দেব না। (কারণ, দুধ পানি মিশিয়ে গরম করলে প্রথম পানি উড়ে যায়, এরপর দুধের পালা আসে।)

দুধ : তা হলে এসো, আমার গলায় লেগে যাও। তুমি এত ভালো ও কৃতজ্ঞ! তবে একটি কথা আমিও তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি, তুমি যখন উপকার

করে আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিলে। মনে রেখো, আমি যে-মূল্যে বিক্রি হব, তোমার মূল্যও তাই হবে।

আকাবিরগণ ছিলেন দুধ আর আমরা হলাম পানি

ভাই! আজ বাস্তবতা এটাই। আমাদের আকাবিরগণ ছিলেন দুধ আর আমরা হলাম পানি। আমরা তাদেরকে বুকে জড়িয়ে নিতে চাই, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে চাই। কিন্তু তাদের কদমে পড়ে থেকে আমাদেরকে কুরবানি করতে হবে, নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। যদি আমাদের গুনাহের কারণে আগুনের যে-শাস্তি দেওয়া হবে, তার থেকে বাঁচার জন্য যদি প্রতিরক্ষাযুদ্ধে লিপ্ত হতে পারি, তাহলে আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে।

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

'মানুষ (কেয়ামতের দিন) তার সঙ্গেই থাকবে, যে যাকে ভালোবাসে।'[১৬৭]

ইনশাআল্লাহ! কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন সেসব ওলামায়ে কেরাম, ফুকাহায়ে ইযাম ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। তখন আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া ও করুণার বিষয়ে আমাদের মতো অক্ষম, মিসকিনদের সঙ্গেও তাদের মতোই আচরণ করবেন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزٍ

'আল্লাহর জন্য কোনো কিছুই কঠিন নয়।'

এই ফকিরের তামান্না

মনে তামান্না ও দু'আ এই যে, আপনাদের এখানে আগমন করা এবং এই ওস্তাদগণের নেগরানিতে লেখাপড়া করাকে আল্লাহ কবুল করুন। এই অক্ষম, অধমের দু'আ সর্বদা আপনাদের সঙ্গে থাকবে। খুব মনোযোগসহ লেখাপড়া করুন, যেন যে-উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, তা পূরণ হয়। আসাতিযায়ে কেরাম আলহামদুলিল্লাহ খুব মেহনতি এবং পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তার সন্তুষ্টি নসিব করুন। আমীন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

---

১৬৭. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ২০

ইশ্‌ক ও সূলূকের তাজাল্লি

'এ উভয় প্রকারের মানুষ পৃথক-পৃথক তাজাল্লিতে জীবন কাটায়। মানুষের জীবনে কখনো প্রথমে এক ধরনের তাজাল্লি পড়ে। আর কখনো দ্বিতীয় ধরনের তাজাল্লি পড়ে। যেমন– দুনিয়াতে কিছুলোক এমন আছে, যারা প্রথমে 'মাজযুব' হয়। এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য? মানে আল্লাহর রহমত স্বয়ং তাদেরকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। যখন আল্লাহর রহমত তাদেরকে নিজের দিকে টানে, তখন সে-ও সেদিকে যায়। একপর্যায়ে সে নিজেই নিজের আগ্রহে আগে বাড়তে থাকে। যেমন– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার মাহবুব ও প্রিয় ছিলেন। সাথে-সাথে তিনিও আল্লাহ তা'আলাকে অন্তর থেকে ভালোবাসতেন মহব্বত করতেন। আল্লাহর স্মরণে কাঁদতেন।'

ইশ্‌ক ও সূলূকের তাজাল্লি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ـ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

ইশ্‌কের পথের পথিক

ইশ্‌ক-মহব্বতের পথের পথিকরা দু-ধরনের হয়–

১. ওইসব লোক, যারা স্বীয় মেহনত ও সাধনা দিয়ে মাহবুবে হাকীকীর মিলন চায়। তারা কষ্ট সহ্য করে, কুরবানি দেয়, আত্মোৎসর্গ করে সকল দুঃখ-বেদনাকে বুকে টেনে নেয়। তাদের উদ্দেশ্য থাকে, যে করেই হোক আমাদের মিলন প্রিয়তমের সঙ্গে হয়ে যাক। এই মিলন অর্জন করার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয়। তারা না আরামের পরোয়া করে, না বিলাসিতার। বরং সর্বদা এ-চিন্তাই করে, আমাদের প্রিয়তম কীভাবে সন্তুষ্ট হবেন। আমি প্রিয়তমের দৃষ্টিতে কীভাবে আকর্ষিত হব। প্রিয়তমের সঙ্গে কীভাবে আমার মিলন হবে। এর জন্য সে দিন-রাত একাকার করে ফেলে। মন ভরে আল্লাহর ইবাদাত করে, খাহেশাতে নাফসানীকে ধ্বংস করে, স্বীয় নফসকে কষ্টের চাকায় নিষ্পেষিত করে। তারপর তাদের প্রতি আল্লাহর দয়ার দৃষ্টি পড়ে। এমন লোকদের আশেক বলে, মুরীদ বলে, সালেক বলে।

২. কিছু ভাগ্যবান লোক এমনও আছেন, যাদের সঙ্গে মিলন স্বয়ং প্রিয়তম নিজেই চান। প্রিয়তম নিজেই চান, আশেক আমার নিকটে আসুক, আমার নৈকট্য লাভ করুক। প্রিয়তম নিজেই তাকে ঘনিষ্ঠ করে নেন। এদের বলা

হয়, 'মুরাদ'। আর তাসাওউফের পরিভাষায় এদের বলা হয়, 'মাজযুব' (আকর্ষিত, কাঙ্ক্ষিত)।

মনে রাখবেন, মাজযুব দ্বারা কখনো ওইসব লোক উদ্দেশ্য নয়, যারা অলি-গলিতে অর্ধনগ্ন হয়ে ঘোরাফেরা করে। লোকেরা তো এদেরও 'মাজযুব' বলে। কিন্তু আসল 'মাজযুব'দের ব্যাপারই থাকে ভিন্ন। প্রকৃত মাজযুবের পরিচয় হলো, যার মধ্যে আকর্ষণ পাওয়া যায়, যাকে মাহবুব নিজেই চান, মাহবুব নিজের মিলন দিতে তাকে কাছে টেনে নেন। মিলনের সুযোগ নিজে সরবরাহ করেন। এ জাতীয় লোকদেরকে 'মুরাদ' ও 'মাজযুব' বলা হয়।

এ জাতীয় লোকের ওপর 'জযব' তথা আকর্ষণের তাজাল্লি ঠিকরে পড়ে। তাদের জন্য পথ খুলে যেতে থাকে। যেমন–

সবক আদায় করা সহজ হয়ে যায়।

কাইফিয়্যাত তথা কালবের হালত ভালো থাকে।

তাহাজ্জুদের পাবন্দি করতে কোনো সমস্যা হয় না।

দ্বীনি কোনো কাজেই বাঁধা অনুভব করে না।

পরিবেশও পায় মনমতো।

হিম্মতও থাকে আকাশচুম্বী।

খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এই পথে লেগে থাকে।

এমন অনুভব হয়, যেন তাকে কেউ এ পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে সামনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে করুন, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। অথবা মরুভূমির ধূলিঝড় যেমন দ্রুতবেগে ছুটে চলে, সেই ধূলিঝড়ের গতির দিকেই কেউ যখন ছুটে চলে, তখন দেখে মনে হয়, ধূলিঝড় তাকে পেছন দিক থেকে ঠেলে সামনে নিয়ে যাচ্ছে। মাজযুবের অবস্থাও এমন হয়। মাহবুব চান, আশিক-মাজযুব আমার নিকটে চলে আসুক, আমার দেওয়ানা হয়ে যাক, আমার আশেকদের মধ্যে শামিল হয়ে যাক।

আরো একটি উদাহরণ বুঝুন। বন্ধু দু-ধরনের হয়। এক বন্ধু হলো, যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে। আমি তাকে রাস্তা বলে দিলাম– ভাই! যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাও, তবে বাস বা ট্যাক্সিযোগে অমুক স্থানে এসে পড়ো। এটা হলো সালেকের উদাহরণ যে, মাহবুবের দিকে ছুটে আসতে হয়।

আরেক ধরনের বন্ধু হলো, যেমন– ছেলেবেলার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল বহু বছর পর। দেখে এত খুশি লাগল যে, সে বলল,

'চলো বন্ধু, আমার বাড়ি চলো; বহু দিন পর একসাথে বসে চা খাই। সে বন্ধুকে নিজহাতে ধরে নিজের বাড়ি নিয়ে যায়। তো এভাবে মাহবুব যে আশেককে এভাবে ধরে নিজের কাছে টেনে নেন, তাকে বলা হয় 'মাজযুব'। এটি দ্বিতীয় উদাহরণ।

কবি বলেন–

مجذوب کو تو لائے وہ ہمراہ بزم میں

اور سالکوں کو دور سے راستے بتا دئے

'মাজযুবকে তো সঙ্গে করে মাহফিলে নিয়ে এলেন,

আর সালেকদের দূর হতে পথ বাতলে দিলেন।'

একথাটি বোঝার জন্য হযরত মূসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদাহরণ সামনে রাখুন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর আশেক ছিলেন। তার অন্তরে প্রচণ্ড তামান্না ছিল যে, আল্লাহর দিদার করব, তার সান্নিধ্য পেয়ে যাব, অথচ আমাদের নবীজি আল্লাহ তা'আলার মাহবুব তথা প্রিয়তম ছিলেন। আশেক ছিলেন আল্লাহ। হযরত মূসা (আ.)-কে দিদারে ইলাহীর জন্য তুর পর্বতে যেতে হয়েছে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰى لِمِيْقَاتِنَا

'যখন মূসা আমার সাক্ষাতের জন্য এল ...।'[১৬৮]

কিন্তু যখন আমাদের নবীজির যাওয়ার প্রসঙ্গ এল, তখন তাঁকে নিজে যেতে হয়নি; বরং ফেরেশতা পাঠিয়ে সসম্মানে উর্ধ্বজগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন– মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

'পবিত্র সেই সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে গভীর রজনীতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে গেছেন।'[১৬৯]

তো নিজে যাওয়া এক বিষয় আর অন্যকে পাঠিয়ে নিয়ে যাওয়া ভিন্ন বিষয়। হযরত মূসা (আ.) নিজেই তুর পর্বতে গেলেন আর নবীজিকে নিয়ে

---

১৬৮. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৪৩

১৬৯. সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ১

যাওয়া হয়েছে। জিবরাঈল (আ.)কে পাঠিয়ে বললেন, যাও! আমার মাহবুবকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। এর জন্য বাহনের ব্যবস্থাও তিনি করে দিলেন। রাস্তাও বাতলে দিলেন। তাকে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠানো হচ্ছে। এবার উভয়টার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করুন। যখন মূসা (আ.)-এর প্রসঙ্গ এল, তখন তাঁকে দু'আ করতে হলে–

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ- وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ

'হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ-সাধ্য করে দিন।'[১৭০]

আর যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গ এল, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন–

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

'হে মাহবুব! আমি কি আপনার বুক প্রশস্ত করে দিইনি?'[১৭১]

এই উভয় রকমের লোকজন ভিন্ন-ভিন্ন তাজাল্লির ছায়ায় জীবন যাপন করেন। মানুষের জীবনে কখনো এক ধরনের তাজাল্লি প্রথম পড়ে। কখনো ভিন্ন ধরনের তাজাল্লি প্রথম পড়ে। যেমন– দুনিয়ায় এমন কিছু মানুষ ছিল, যারা প্রথমে 'মাজযুব' হয়েছিল। কী অর্থ? অর্থাৎ– আল্লাহ তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন। তখন তারাও নিজের মহব্বত ও ভালোবাসায় সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। যেমন– আমাদের নবীজি। তিনি যেমন আল্লাহর আশেক ছিলেন, তেমনি আল্লাহর মাশুকও ছিলেন। কারণ, নবীজি প্রায়ই আল্লাহর ভালোবাসায় কাঁদতেন।

দীদারে ইলাহীর ব্যাকুলতা

হযরত হাফসা (রাযি.) বলেন, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে শুয়েছিলেন। হঠাৎ– আমি আমার মুখের ওপর গরম পানির উষ্ণতা অনুভব করি। আমি ঝট করে উঠে বসে দেখতে গেলাম, আমার মুখে কীসের পানি পড়ছে? দেখলাম, নবীজি কাঁদছেন আর তাঁরই অশ্রুতে আমার মুখ ভিজে গেছে। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম–

---

১৭০. সূরা তোয়াহা : আয়াত ২৫, ২৬

১৭১. সূরা আলাম নাশরাহ : আয়াত ১

مَا يُبْكِيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন কেন?'

নবীজি উত্তর দিলেন, হাফসা! তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছ না? তিনি বললেন, আমি খেয়াল করে দেখলাম, আমার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বাইরে আঙিনায় তাহাজ্জুদ নামায পড়ছিল। নামাযে তেলাওয়াতের সময় এই আয়াতটি বারবার পড়ছিল–

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ

'কক্ষনো নয়! অবশ্যই তারা সেদিন তাদের রবের থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে।'[১৭২]

এ আয়াতটি কাফেরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কেয়ামতের দিন তারা আল্লাহর দিদার হতে বঞ্চিত হবে। তাদেরকে দিদার হতে পর্দার আড়ালে নিয়ে যাওয়া হবে। নবীজি যখন আয়াতটি শুনলেন, কেউ-কেউ সেদিন আল্লাহর দিদার হতে বঞ্চিত হবে, তখন দিদারের প্রসঙ্গ আসতেই তাঁর অন্তরে আল্লাহর মহব্বত এমনভাবে তরঙ্গায়িত হলো যে, আনন্দে তিনি চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। হযরত হাফসা (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শুনেছি, আমার ভাই বারবার এ-আয়াতটি তেলাওয়াত করছেন–

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ

নবীজি উত্তর দিলেন, হাফসা!

أَنَا مُشْتَاقٌ وَبِيْ اِشْتِيَاقٌ

'আমি আমার রবের দিকে দিদারের জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী। আয়াতটি শুনে আগ্রহের সেই সমুদ্রে মহাপ্লাবন শুরু হয়ে গেছে।'

সুবহানাল্লাহ!

স্বয়ং রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাস হয়ে বলতেন, আয় আল্লাহ! আমাকে জলদি তোমার সঙ্গে মিলিত করো। তিনি আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় বান্দা ও রাসূল ছিলেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা ফুটে উঠেছে। কুরআনে কোথাও আল্লাহ তাঁর চেহারার কসম খেয়েছেন, কোথাও

---

১৭২. সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ১৫

তাঁর চোখ মোবারকের আলোচনা করেছেন, কোথাও তাঁর বক্তব্যের আলোচনা, কোথাও তার শহরের, কোথাও তার অন্তরের আলোচনা করেছেন। আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নবীজির আলোচনা করে তাঁর প্রতি গভীর দয়া ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

রূপবান তার রূপ নিয়ে অভিমান করবেই

মানুষের ওপর কখনো-কখনো সুলুকের প্রাথমিক অবস্থা অতিবাহিত হয়। বান্দা নিজ আগ্রহে আগে বাড়ে। বাড়তে-বাড়তে এমন একটা সময় আসে যে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি খুশি হয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নেন। আবার কখনো এমনও হয়, আল্লাহ তাকে প্রথম-প্রথম ভালো অবস্থা ও হালত দান করেন, ভালো ভালো কাইফিয়্যাত দান করেন এবং সে সুলুকের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। এরপর একস্থানে গিয়ে কিছু সময়ের জন্য সেই কাইফিয়্যাত থামিয়ে দেন। বলেন, এবার একটু আগে বাড়ো। তিনি দেখতে চান, তার মধ্যে আমার তলব আছে কি-না?

দেখুন, যার মধ্যে সৌন্দর্য আছে, তো সে তার সৌন্দর্য নিয়ে একটু অভিমান তো করতেই পারে, করেও। আল্লাহ তা'আলাও একটু অভিমান দেখান, হ্যাঁ, আমি তো তোমাকে আমার তাজাল্লি দেখিয়ে দিয়েছি, মহব্বতের স্বাদ চাখিয়ে দিয়েছি। এবার বাকি রাস্তা একটু নিজেই অতিক্রম করে আসো। তো সালেককেও একই স্তর পার হয়ে আসতে হয়।

ইশ্‌কের তাজাল্লি যে পায়

বহু আউলিয়ায়ে কেরাম এমন অতিবাহিত হয়েছেন, যাঁদের ওপর প্রথম-প্রথম ইশ্‌কের তাজাল্লি পড়েছে এবং তারা খুব দ্রুত আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়েছে। এমন লোকের সংখ্যা তো কম নয়, তারপরও দু-একটা উদাহরণ আপনাদের খেদমতে আরজ করছি।

সায়্যিদুনা হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.)কে আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে টেনে নিয়েছিলেন। যখন তার বয়স ষোলো বছর ছিল, তিনি একবার স্বপ্নে দেখলেন, তাকে বলা হচ্ছে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল দুনিয়ায় আসবেন, আপনি তার উজির হবেন, তাঁর খলীফা হবেন। তিনি স্বপ্নটি এক রাহেবের কাছে বর্ণনা করে তাবীর জানতে চাইলেন। তো সেও খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিল,

তোমার সঙ্গে এমনটা হবে। হযরত সিদ্দীকে আকবার এরপর নীরব হয়ে গেলেন।

যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওতের দাবি করলেন, তখন সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) বুঝতে পারলেন, আল্লাহর প্রিয়-রাসূল তাঁর নবুওতের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। এবার তার ছেলেবেলার স্বপ্নও মনে পড়ল, রাহেবের তাবীরও মনে পড়ল।

تَكُوْنُ وَزِيْرَهُ فِيْ حَيَاتِهِ وَخَلِيْفَتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ

'তুমি জীবদ্দশায় তার প্রধান সহযোগী হবে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খলীফা নির্বাচিত হবে।' কিন্তু

فَاَسَرَّهَا اَبُوْ بَكْرٌ مِنَ الْكَائِنَاتِ كُلِّهَا

'আবুবকর, সবার কাছ থেকে স্বপ্নটি গোপন করে রেখেছিলেন।'

নবুওতের ঘোষণা দেওয়ার পর সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) প্রশ্ন করলেন–

يَا مُحَمَّدُ! مَا الدَّلِيْلُ عَلٰى مَا تَدَّعِيْ؟

'হে মুহাম্মদ! আপনি যে-জিনিসের দাবি করেছেন, তার প্রমাণ কী?'

নবীজি উত্তরে শুধু এতটুকু বললেন–

اَلرُّؤْيَا الَّتِيْ رَاَيْتَ بِالشَّامِ

'(এর প্রমাণ) ওই স্বপ্ন, যা তুমি শামে দেখেছিলে।'

একথা শুনে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রাযি.) কেঁপে উঠলেন–

فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ

'তিনি নবীজির সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং নবীজির কপালে চুমু এঁকে দিলেন। (তারপর নবীজির ওপর ঈমান নিয়ে এলেন।)

এবার লক্ষ করুন, আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনাকে পছন্দ করেছেন। এ-কারণে ষোলো বছর বয়সের পূর্বেই অন্তরে একথাটি ঢেলে দিলেন। পূর্ব থেকেই মানসিকতা গড়ে দিলেন, যেন তার সম্মুখে যখন নবুওতের ঘোষণা আসবে, তখন যেন তিনি আপনা-আপনি সেদিকে ধাবিত হন। এতে বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা নিজেই চাইতেন, আমার এই প্রিয় বান্দা আমার আরো কাছে এসে যাক।

সায়্যিদুনা হযরত ওমর (রাযি.)

হযরত ওমর (রাযি.)-এর সঙ্গেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। নবীজি তাঁর ব্যাপারে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব কিংবা ওমর ইবনে হিশামকে ঈমানের তাওফীক দাও এবং ইসলামকে শক্তিশালী করো। নবীজির দু'আ আল্লাহ কুবল করলেন এবং হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) ঈমান নিয়ে এলেন। যখন হযরত ওমর (রাযি.) ঈমান আনলেন। আনন্দের অতিশয্যে অন্যান্য ঈমানদাররাও আল্লাহু আকবার তাকবীরধ্বনি উচ্চারণ করলেন। সকল মুসলমান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। হাদীছে তো এতটুকুও এসেছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজির খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন। হে আল্লাহর মাহবুব–

اِسْتَبْشَرَ اَهْلُ السَّمَاءِ بِالْاِسْلَامِ عُمَرَ

'ওমরের ইসলাম গ্রহণে আসমানের ফেরেশতারাও আনন্দিত হয়েছে।'

দেখুন, একে বলে 'জাযব' তথা আকর্ষণ-এর তাজাল্লি। তারপর আল্লাহ তা'আলা ঈমান আনার পর এই আয়াত নাযিল করেছেন–

حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

'তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আর মুমিনদের যারা তোমার অনুসারী হয়েছে, তাদেরও।'[১৭৩]

হযরত বিশ্‌র খাফী (রহ.)

এই উম্মতের মধ্যে একজন বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন, যার নাম ছিল বিশ্‌র হাফী (রহ.)। 'হাফী' বলা হয় উলঙ্গ পায়ে চলাচলকারী ব্যক্তিকে। তিনি শুরু জীবনে অত্যন্ত গাফলতের জীবন যাপন করেছেন। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন, আধা হুঁশ, আধা বেহুঁশ। পথে এক টুকরা কাগজ পড়ে থাকতে দেখলেন, যার ওপর 'আল্লাহ তা'আলার নাম' লেখা ছিল। আল্লাহর নাম লিখিত কাগজের টুকরাটা এভাবে পড়ে থাকতে দেখে তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করলেন, হায় রে! আল্লাহর নাম লিখিত কাগজটি এভাবে জমিনে পড়ে আছে! সে থেমে গিয়ে কাগজটি তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে কোনো উঁচু স্থানে রেখে দিল। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এমনটা করা কিন্তু সাধারণ বিষয় নয়। যেই সে

---

১৭৩. সূরা আনফাল : আয়াত ৬৪

আল্লাহর নামখচিত কাগজের টুকরাটি সম্মানের সাথে উঁচু স্থানে রাখল। সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সেই যুগের একজন ওলীকে ইলহাম করলেন, 'যাও! বিশ্‌র হাফীকে গিয়ে বল, তুমি আমার নামকে জমিন থেকে উঠিয়ে মাথার ওপর রেখেছ, আমি তোমার নামকে জমিন থেকে উঠিয়ে আরশ পর্যন্ত সমুন্নত করে দিচ্ছি।

যেন বলা হলো, তুমি তো ততটুকু সমুন্নত করছ, যতটুকু তোমার সাধ্যে ছিল। আর আমি আল্লাহ তোমার নামকে ততটুকু সমুন্নত করব, যতটুকু আমি পারি। ব্যস! এরপরই তাঁর জীবন বদলে গেল। আল্লাহর এত বড় ওলী হলেন যে, যুগের শাইখে পরিণত হয়ে গেলেন। সর্বদা বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম তার দ্বারা উপকৃত হতেন।

একব্যক্তি ছিল বিশ্‌র হাফী রহ,-এর গ্রামের লোক। একদিন সে স্বীয় গাধার পিঠে সাওয়ার হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ গাধা রাস্তার মধ্যখানেই পায়খানা করে দিল। এটা দেখে গাধার মালিক কাঁদতে লাগল। কেউ জিজ্ঞাসা করল, কাঁদছেন কেন ভাই! সে বলল, আমার মনে হয়, বিশ্‌র হাফী মারা গেছেন। আর সেই দুঃখেই কাঁদছি। লোকটি গাধার মালিককে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কীভাবে জানলে, তিনি মারা গেছেন। গাধার মালিক বলল, আমি সব সময় লক্ষ করেছি, তিনি সর্বদা জমিনের ওপর খালি পায়ে হাঁটতেন। আমার গাধাও অতীতে পায়খানা-প্রশ্রাব করতে চাইলে দেখতাম, সে রাস্তার মাঝখানে এসব করত না। রাস্তার একপাশে গিয়ে পেশাব-পায়খানা করত, যেন আল্লাহর এই নেক বান্দার পায়ে নাপাকি না লাগে। আজ আমার গাধা রাস্তার মাঝখানেই পায়খানা করে দিয়েছে। এতে আমি বুঝে নিলাম, এখন আর সেই বান্দা দুনিয়াতে নেই, যার জন্য আমার গাধাও সতর্ক হয়ে চলত। এরপর খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, বাস্তবেই বিশ্‌র ইন্তেকাল করেছেন এবং এখন তাঁর দাফন-কাফনের কাজ চলছে। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ তা'আলার মূল্যায়ন দেখুন। তিনি তো আল্লাহর জমিনে খালি পায়ে চলার ইচ্ছা করলেন। আর এদিকে আল্লাহ প্রাণীদের অন্তরেও একথা ঢেলে দিলেন যে, পথে-ঘাটে, যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলো না, সাবধান! আমার নেক বান্দার পায়ে যেন নাপাকি না লাগে।

একব্যক্তি স্বয়ং হযরত বিশ্‌র হাফী (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'জনাব! আপনি সর্বদা খালি পায়ে কেন চলাফেলা করেন? এটা তো মানুষের ব্যক্তিগত একটি ব্যাপার। তো বিশ্‌র হাফী উত্তর দিলেন, যখন আমি খাঁটি তাওবা

করেছিলাম, তখন আমার পায়ে কিছুই ছিল না। আমি কুরআন পড়ে দেখি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا

'আল্লাহ জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন।'[১৭৪]

এখন প্রকৃত শাহেনশাহ যে-জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন, সেই বিছানার ওপর জুতা নিয়ে চলতে আমার বড়ই লজ্জা হয়। আমি আল্লাহর বানানো বিছানোর ওপর দিয়ে জুতা পরে কী করে হাঁটি? তার মহব্বতের অবস্থা ছিল এই! ইনি ছিলেন সেই মনীষী, যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে টেনে এনেছেন, যার জন্য মাহবুব নিজের দিকে ছুটে আসার সকল পথকে সুগম করে দিয়েছেন।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলখের বাদশাহ ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত বিলাসবহুল। কিন্তু কখনো-কখনো চাইতেন, আমি আল্লাহকে পেয়ে যাই। তার সঙ্গে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। একদিন ঘরে শুয়ে ছিলেন। তিনি অনুভব করলেন, যেন ঘরের ছাদে কেউ পায়চারি করছে। তিনি খুব ঘাবড়ে গেলেন যে, এই গভীর রাতে আমার মহলের ছাদে কে হাঁটছে? রুম থেকে বের হয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন, আরে এই! কে তুমি? ছাদ থেকে উত্তর এল, আমি তোমার বন্ধু। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তো এখানে কী করছেন? বললেন, আমি আমার উট তালাশ করছি। বাদশাহ খুব আশ্চর্য হয়ে বললেন, এত রাতে তুমি বাদশাহর ছাদে উট তালাশ করতে এসেছ। এটা কি সম্ভব? বড়ই আশ্চর্যের কথা বললে তো তুমি।

এবার উত্তর এল, এটা তেমন কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। এর চেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, তুমি এই বিলাসবহুল জীবন যাপন করে আল্লাহকে পেতে চাও। এটা শুনে তার অন্তরে আঘাত লাগল। অন্তর সাক্ষ্য দিল, হ্যাঁ ইবরাহীম! বাস্তবেই এর জন্য তোমাকে কিছু-না-কিছু কষ্ট অবশ্যই করতে হবে। কিছু দিন পর আরো একটি ঘটনা ঘটল। সে যুগে ফোমের বিছানা ছিল না, রুম স্প্রেও ছিল না। তাই বাদশাহদের জন্য যখন বিছানা তৈরা করা হতো, তখন খাটের দুই পাশে ফুলদানি রেখে দেওয়া হত। কাঁচা ফুলের

---

১৭৪. সূরা বাকারা : আয়াত ২২

সুবাসে রুম সুবাসিত হয়ে যেত। এদিকে পাশ ফিরলে এদিকের ফুলের সুবাস, ওদিকে পাশ ফিরলে সেদিকের ফুলের সুবাস নাকে আসত।

তার যে-খাদেমা বিছানা ঠিক করত, সে একদিন বিছানা ঠিক করছিল। ছিল ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। হঠাৎ তার মনে এলো, দেখি, এমন বিলাসবহুল বিছানায় শুতে কেমন লাগে? এই বলে তাতে শুতেই তার প্রচণ্ড ঘুম পেল। আস্তে-আস্তে নিজের অজান্তেই সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল।

কখনো-কখনো কাজের চাপ বেশি হলে ক্লান্তিতে মানুষের অবস্থা এমনটা হয়ে যায়। সে বলতেই পারে না, বালিশে মাথাটা আগে রেখেছে-না কি ঘুম আগে এসেছে? আমাদের ইজতিমায়েও প্রথম এক-দুদিন রাত জেগে-জেগে ইবাদাত করে। কিন্তু ৩য় দিন যখন আসে, তখন সবার অবস্থা এমনই হয়। মন চায়, আহ! আজ হযরত একটু সংক্ষিপ্ত তাকরীর করুক, যেন ঘুমানোর একটু সুযোগ পাওয়া যায়। কোনো-কোনো সালেক তো বলেই ফেলেন, হযরত! তবিয়ত ঠিক নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, একটু ঘুমিয়ে নিলে তাদের তবিয়ত ঠিক হয়ে যায়। এটা এমন মজার রোগ যে, ৪/৫ ঘন্টা ঘুমানোর সুযোগ পেলেই সব ঠিক হয়ে যায়, তবিয়ত ফ্রেশ হয়ে যায়।

যাহোক, এটা মানবিক চাহিদার অংশ। তো সেই খাদেমা সেখানেই বাদশাহর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ইবরাহীম ইবনে আদহাম কামরায় গেলেন এবং খাদেমাকে এভাবে তার বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেন, তখন তার খুব রাগ এল। এত সাহস! খাদেমা শুয়ে আছে বাদশাহর বিছানায়!! সঙ্গে-সঙ্গে তিনি খাদেমার চুল ধরে টেনে উঠিয়ে কষে কয়েকটা চড় মারলেন। মার খেয়ে খাদেমা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল এবং খুব দ্রুত কান্না থামিয়ে হেসে দিল। বাদশাহ ভাবলেন, আমি যে মার মেরেছি, এতে তার দীর্ঘ সময় কান্নার কথা ছিল; কিন্তু তা তো সে করলই না; বরং এখন দেখি হাসছে। জিজ্ঞাসা করার পর খাদেমা উত্তর দিল, আমি এজন্য কেঁদেছিলাম যে, আপনি আমাকে মেরেছেন এবং আমি ব্যথা পেয়েছিলাম। বাদশাহ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে অল্পক্ষণ পর হেসেছিলে কেন? খাদেমা বলল, হেসেছিলাম এই ভেবে যে, এই অল্প সময় এমন বিলাসবহুল বিছানায় শোওয়ার কারণে আমাকে এত শাস্তি দেওয়া হলো। যেব্যক্তি তার সারা জীবন এমন বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছেন, কেয়ামতের দিন তার যে কি অবস্থা হবে আল্লাহই ভালো জানেন। আমি অন্তত তার চেয়ে ভালো থাকব।

খাদেমা তো কথাগুলো বলে চলে গেল। কিন্তু ইবরাহীম ইবনে আদহামের হৃদয়ের তার ছিড়ে গেল। এখন এই নরম বিছানায় আর আগের মতো ঘুম

আসে না। নিজের আখেরাত ও শেষ পরিণতি নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে গেল।

এর পরের দিন আরো একটা ঘটনা ঘটে গেল। দেখুন, আল্লাহ একে-একে এই বিস্ময়কর ঘটনাগুলো ঘটিয়ে তাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই সর্বশেষ ঘটনাই তার জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তিনি দরবারে বসা ছিলেন। উপস্থিত সভাসদবৃন্দে দরবারহল ভরপুর ছিল। হঠাৎ এক রূপবান যুবক দরবারের কক্ষে প্রবেশ করল এবং হাঁটতে-হাঁটতে সোজা তার সিংহাসনের কাছে এসে দাঁড়াল। দরবারকক্ষে প্রবেশের কোনো রীতিনীতির তোয়াক্কা করল না। যুবকের দুঃসাহস দেখে বাদশাহ খুব ক্রোধান্বিত হলেন। হুংকার ছেড়ে বললেন, এই! কে এই যুবক, যে দরবারের নিয়ম ভঙ্গ করে সোজা আমার কাছে চলে এসেছে? এই যুবক! কে তুমি? তুমি জান না, বাদশাহর দরবারে কীভাবে প্রবেশ করতে হয়? যুবক বলল, আমি তো একটা সারাইখানায় প্রবেশ করেছি। এখানে আবার কীসের নিয়ম? বাদশাহ বললেন, আরে! বলে কী? এটা আমার শাহী মহল। আমি এখানকার বাদশাহ।

যুবক বলল, বাদশাহ সালামাত! আপনার পূর্বে এখানে কে ছিলেন?

বাদশাহ : আমার পিতা।

যুবক : তার পূর্বে কে ছিলেন?

বাদশাহ : তার পিতা।

যুবক : তার পূর্বে কে ছিলেন?

বাদশাহ : তার পিতা।

যুবক বলল, বাশা সালামত! একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। একেই তো সারাইখানা বলে। এই নিয়ম তো সারাইখানার। একজন আসে। কিছুক্ষণ অবস্থান করে আবার চলে যায়। এরপর দ্বিতীয়জন আসে। কিছু দিন থেকে সে-ও চলে যায়। তৃতীয়জনের বেলায়ও এটাই ঘটেছে। এখন আপনার পালা এসেছে। কিছু দিন পর আপনাকেও চলে যেতে হবে। এখানে আসবে আরেকজন।

কথাগুলো বলে যুবক দরবার থেকে বের হয়ে গেল। কিন্তু কথাগুলো ইবরাহীম ইবনে আদহামের অন্তরে এমনভাবে আঘাত করল যে, তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার আমাকে আমার আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মেহনত-মুজাহাদা করতে হবে। অবশেষে বিশাল বাদশাহি ছেড়ে একদিন তিনি এমন এক শহরে গেলেন, যেখানে বহু

ওলামায়ে কেরাম ছিলেন। সেখানে নিজের পরিচয় গোপন করে ইল্‌ম অর্জন করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। তো এবার লক্ষ করুন, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজের দিকে টেনে আনার জন্য বিভিন্ন আসবাব ও কারণসমূহ নিজেই সৃষ্টি করেছেন। যখন প্রিয়তম নিজেই কারো দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে, তখন সে তার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেয় এবং সারা জীবন প্রিয়তমের গোলাম হয়ে কাটিয়ে দেয়। এমনিভাবে কখনো আল্লাহ তা'আলা সালেকের মুখে নিজের মহব্বতের শরাব হতে কয়েক ফোঁটা টপকিয়ে দেন। তখন বান্দা খুব চমৎকার কাইফিয়্যাত অর্জন করে এবং মানুষ তখন আল্লাহর দিকে ছুটতে শুরু করে। কিন্তু সারা জীবন এমন কাইফিয়্যত থাকে না। কখনো-কখনো এমন হয়। কারণ, নবীজি এক সাহাবিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার কাছে থাকা অবস্থায় তোমাদের অন্তরের যে অবস্থা থাকে, তা যদি সারা জীবন থাকে, তা হলে তো তোমাদের চলার পথে ফেরেশতারা এসে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতে শুরু করবেন।

হযরত মুবারক (রহ.)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর পিতা মুবারক (রহ.) একটা বাগানের মালি ছিলেন। বাগানের পরিচর্যা করা তার দায়িত্ব ছিল। একদিন বাগানের মালিক এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাগান থেকে একটি আপেল নিয়ে এস। তিনি একটি গাছ থেকে আপেল ছিঁড়ে আনলেন। সেটা টক পড়ল। এরপর আবার আরেকটি গাছ থেকে আপেল ছিড়ে আনলেন। সেটাও টক পড়ল। এরপর তৃতীয় গাছ থেকে আনার পর আবারো টক হলো। বাগানের মালিক তাকে বকুনি দিয়ে বলল, আরে! তুমি এত বছর এই বাগান দেখাশোনা করছ, কিন্তু কোন গাছের ফল মিষ্টি, কোনটির টক এই পার্থক্যটুকুও এখনো করতে পারনি? মুবারক (রহ.) উত্তর দিলেন, জনাব! আপনি আমাকে বাগানের দেখাশোনার জন্য রেখেছেন– ফল খাওয়ার অনুমতি তো দেননি। এ কারণেই এত বছরে আমি একটি ফলও মুখে দিয়ে দেখিনি, কোনটির ফল মিষ্টি আর কোনটির ফল টক? একথা শুনে বাগানের মালিক হয়রান হয়ে গেলেন এবং তার তাকওয়া দেখে তাকে আজাদ করে দিলেন। এরপর নিজের আদরের কন্যাকে তার বিবাহবন্ধনে দিয়ে সেই বাগান তাকে দান করে দিলেন। অবশেষে সেই মালি মুবারকই বাগানের মালিক হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)

তারপর আল্লাহ তা'আলা সেই মুবারক দম্পতিকে একটি ছেলে দান করলেন। তারা তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ! আল্লাহর কী শান ছিল যে, ছেলেটি ছিল খুবই রূপবান হলো। এমন মনে করুন যে, ছেলেটা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এমন বিলাসবহুলভাবে লালিত-পালিত হলেন। যখন পূর্ণ যুবক হলেন, তখন তার জীবনও ছিল একটি উদাসীন জীবন। গান-বাজনা, মদপান ইত্যাদি নিয়েই মেতে থাকতেন সারাক্ষণ।

একবার তিনি স্বীয় বন্ধুদের দাওয়াত করলেন। বাগানের মধ্যে বসেই খাওয়াদাওয়া চলছিল। মদপানও চলছিল জোরেশোরে। হঠাৎ তার কানে কুরআনে কারীমের একটি আয়াত তেলাওয়াতের আওয়াজ প্রবেশ করল। আয়াতটি তার অন্তরে এমনভাবে আঘাত হানল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের জীবন বদলে ফেলার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর তাওবা করে লেখাপড়া শুরু করলেন। পড়তে-পড়তে অবশেষে যুগশ্রেষ্ঠ একজন মুহাদ্দিছ হয়ে গেলেন। এত বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন, একবার তার হাদীছের ক্লাসে ওইসব দোয়াত গণনা করা হয়েছিল, যেগুলো থেকে কালি নিয়ে ছাত্ররা হাদীছ লিখত। তো সেই দোয়াতগুলোর সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। তাহলে ছাত্র সংখ্যা কত ছিল। তিনি একটি হাদীছ শোনাতেন আর লোকেরা তার থেকে শুনে উঁচু আওয়াজে অন্যদের শোনাত। যখন এই মুকাব্বির লোকদের সংখ্যা গণনা করা হলো, তখন তার সংখ্যা ছিল ১২০০ (এক হাজার দুইশত)। এবার আপনিই বলুন! যেখানে ১২০০ (বারোশত) স্পিকার লাগানো হয়, সেখানে জনসংখ্যা কত হবে?

একবার তিনি জামে মসজিদে এলেন। পথে তিনি একটি হাঁচি দিয়েছিলেন। বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! তো যত ছাত্র তার সঙ্গে ছিল, সবাই উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলল। এতে এত পরিমাণ শব্দ হলো যে, বাদশাহ হারুনুর রশীদ মনে করেছিলেন, হয়তো কোনো বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ হয়ে গেছে। তার স্ত্রী যখন বিষয়টি খতিয়ে দেখল এবং জানল যে, এ ছিল একটি হাঁচির উত্তর, তখন তিনি নিজের স্বামীকে বললেন, আপনাকে তো দুনিয়ার মানুষ বাদশাহ বলে; কিন্তু আপনার হাঁচির জবাবে দু'আ দেওয়ার জন্য কি কখনো এত লোক একত্রিত হয়েছে? এরা হলেন মুকুটহীন বাদশাহ! তখন জনগণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর এতটা ভক্ত ছিল!

শুরুতে তো আল্লাহ তাঁকে নিজের দিকে খুব টেনেছেন আর পরে তাঁকে নিজেকেই সামনে এগিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি আল্লাহর ইবাদাত খুব বেশি পরিমাণে করতেন এবং আল্লাহকে খুব ভয় করতেন। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তিনি ছাত্রদের বললেন, আমাকে খাট থেকে নামিয়ে মাটিতে শুইয়ে দাও। ছাত্ররা ওস্তাদে মুহতারামের আদেশ পালনার্থে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিল। তারা হতবাক হয়ে দেখল, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.) মাটির সঙ্গে নিজের গাল ঘষছেন আর নিজের দাড়ি টেনে ধরে বলছেন, হে আল্লাহ! আব্দুল্লাহর বার্ধক্যের প্রতি রহম করুন। আর তার দুচোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। একথা বলেননি, আমি অনেক বড় মুহাদ্দিছ, অনেক বড় ওস্তাদ, রাত জাগরণকারী ইত্যাদি ইত্যাদি। না; তিনি নিজের কোনো আমলই আল্লাহর দরবারে পেশ করেননি। ব্যস! শুধু এতটুকু বলেছেন, হে আল্লাহ! আবদুল্লাহর বার্ধক্যের প্রতি অনুগ্রহ করো। তাকে মাফ করে দাও।

দ্বিগুণ উন্নতির সময়

এ হলো ইশ্‌ক-জযব-এর তাজাল্লি, যা বান্দাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এরপর আল্লাহ চান, আমার বান্দা মুজাহাদা করুক। এতে কী হয়? কিছুলোক বায়'আত হন। শুরুতে তাদের কাইফিয়্যাত খুব ভালো হয়। একেবারে গাড়ির গতির মতো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আল্লাহ এভাবে তাদের সামনে এগিয়ে নেন। এরপর এমন একটা স্তর আসে, যেখানে আল্লাহ চান, আমার বান্দা নিজে কিছু একটা মেহনত করে সামনে এগিয়ে যাক। তখন কিন্তু ওই প্রথমের কাইফিয়্যাত বা স্বাদ থাকে না। তো তারা একে কবজের অবস্থা মনে করে হতাশ হয়ে যান। অথচ সেটা হতাশ হওয়ার সময় নয়। সেটা তো দ্বিগুণ উন্নতি করার সময়। কারণ, পরীক্ষা করা আল্লাহর নিয়ম। তিনি তো একটু-আধটু পরীক্ষা নিতেই পারেন। তাই না?

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا

'অবশেষে রাসূলগণ যখন নিরাশ হলো এবং লোকেরা ভাবল, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছে।'[১৭৫]

---

১৭৫. সূরা ইউসুফ : আয়াত ১১০

এরপর এমন একটা পর্যায় আসে, যেখানে গিয়ে বান্দা অনুভব করে–

وَزُلْزِلُوا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

'তারা প্রকম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল, তারা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? হ্যাঁ; আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।'[১৭৬]

আমরা চাই, সুলুকের লাইনে আমাদের সামনে এ-ধরনের বাঁধা যেন কখনো সৃষ্টি না হয়। ভাই! এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। বান্দার ইচ্ছাধীন তো নয়। তবে আমাদের ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.), এতটুকু লিখেছেন যে, বাসত-এর সময় সালেকের উন্নতি যদি এক গুণ থাকে, তা হলে 'কব্জ'-এর সময় দ্বিগুণে উন্নীত হয়। যখনই এমন কোনো কাইফিয়্যাত হয়, সেটি দু'আ কবুল হওয়ার সময় হয়ে থাকে। এজন্য এ-রকম কাইফিয়্যাতের সময় আমরা বেশি-বেশি দু'আ করব। যখনই সালেক দেখবে, যা করা সম্ভব তা করার পরও আমার কাইফিয়্যাতের উন্নতি হচ্ছে না, তা হলে বুঝে নেবে, আল্লাহ তা'আলা কিছু সময়ের জন্য আমাকে এভাইে রাখতে চাচ্ছেন। এই দুশ্চিন্তা যদি না থাকত, তা হলে আনন্দ-খুশি মানুষকে ঘুমে নিমজ্জিত করে রাখত, গাফেল বানিয়ে দিত। এই দুশ্চিন্তা মানুষকে জাগ্রত ও সচেতন করে রাখে।

سکھ ڈکھاں توں دیواں یار * دکھاں آن ملایم یار

'আমি সুখকে দুঃখের ওপর কুরবান করব।
দুঃখ আমাকে আমার প্রিয়তমের সাথে মিলিয়ে দেবে।'

অন্তর ভাঙার পরই উন্নতি লাভ হয়

যখন মানুষের অন্তর ভেঙে যায় এবং অন্তরে আঘাত লাগে, তারপরই মানুষের আত্মিক উন্নতি দ্রুত হতে থাকে। কবি বলেন–

تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

অন্তরকে লুকিয়ে রেখো না। এটা তোমার আয়না।

---

১৭৬. সূরা বাকারা : আয়াত ২১৩

ভেঙে যখন যায়, তখন তা আয়না নির্মাতার (আল্লাহ্)
কাছে খুব প্রিয় হয়ে যায়।

এ-কারণেই আল্লাহ বলেন–

اَنَا عِنْدَ مُنْكَسِرَةِ الْقُلُوْبِ

'আমি ভগ্নহৃদয়ের কাছাকাছিই আছি।'

যে আমাকে পেতে চায়, সে যেন আহত হৃদয়ের মধ্যে আমাকে খুঁজে।

একটি চমৎকার ঘটনা

এক বুযুর্গের ঘটনা। তিনি নিজেও আশেক ছিলেন। তার স্ত্রীও আশেক ছিলেন। নেকি করতে করতেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়ে এখন বার্ধক্যে পা রেখেছেন। এক দিন স্ত্রী তাকে বললেন, আমি এত বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করি, কিন্তু তারপরও কখনো নবীজির দিদার নসিব হয়নি।

আমাকে এমন কোনো আমল বলে দিন, যেন স্বপ্নে নবীজির দিদার নসিব হয়ে যায়। স্বামী বললেন, একটা আমল আমি বলে দিচ্ছি, তবে সেই আমলটি আপনাকে করতে হবে। স্ত্রী আশেক, সরল-সহজ মানুষ ছিল। বলল, বলুন; অবশ্যই করব। স্বামী বললেন, আজ একেবারে নববধূর মতো সেজেগুজে বসো। নতুন বউয়ের মতো শাড়ি, অলঙ্কার, মেকআপ, মেহেদি ইত্যাদি সবকিছু লাগিয়ে একেবারে সেজেগুজে থাকো।

বেচারী মনে করল, হয়তো এটা কোনো বিশেষ আমল হবে; তাই সে এই বৃদ্ধ বয়সে নেয়েধুয়ে জরি-চুমকিওয়ালা রঙিন শাড়ি পরে খুব মেকআপ করে সেজেগুজে ঘরে বসে রইল। বুযুর্গ স্বামী চুপেচুপে স্ত্রীর ভাইয়ের বাসায় গিয়ে বললেন, যাও। আমার বাসায় গিয়ে তোমার বোনের অবস্থা দেখে এসো। এ বয়সে তার কি নিয়ত আমি জানি না। ভাই তৎক্ষণাৎ বোনের বাসায় এলেন যে, কি জানি কোনো ঝামেলা হলো না-কি আবার? ঘরে ঢুকে তো ভাই থ খেয়ে রইল। একেবারে এলাহী কাণ্ড! বৃদ্ধ বয়সে বোনের এই কাণ্ড দেখে সেও বিরক্ত হলো। বলল, এ কী কাণ্ড তোমার! ৭৫ বছর বয়সে এসব কী লাগিয়েছ গায়ে? একটু বকাঝকা করে ভাই চলে গেলেন। বেচারী স্ত্রী খুব লজ্জা পেলেন। না কিছু বলতে পারছেন, না লজ্জা সইতে পারছেন। অবশেষে কেঁদেকেটে বুক ভাসিয়ে একপর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আল্লাহর শান দেখুন, সেই ঘুমেই তিনি নবীজির সাক্ষাৎ লাভ করলেন।

নবীজির সাক্ষাতে তিনি খুশি তো খুব হলেন, কিন্তু মনে ব্যথা ছিল যে, ভাইকে বিষয়টি কে বলল, আর ভাইও এতগুলো কটু কথা বলে গেল। এরপর খবর নিয়ে জানলেন, এসব স্বামীর কাণ্ড! তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলুন তো, আপনার কথায় আমি এভাবে সাজলাম। আর আপনিই কি-না ভাইকে এসব বলে আমাকে লজ্জা দিলেন!

উত্তরে স্বামী বললেন, শোনো! আমি তোমাকে আমার ঘরে এত আনন্দে, এত সুখে রেখেছি যে, কখনো তোমার অন্তর ব্যথিত হতে দিইনি। যত খুশি ইবাদাত করেছ। কিন্তু কিছু নেয়ামত এমন আছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা ব্যথিত হৃদয়ের মানুষকে দান করেন। তোমার ভাগ্যে এমন দুঃখের কোনো রেকর্ড ছিল না। এজন্য আমি ইচ্ছা করে তোমার মন যেন ব্যথিত হয়, সেই ব্যবস্থা করলাম, যেন হৃদয় ভাঙার কারণে আল্লাহর সেই রহমত তোমার দিকে ধাবিত হয়। আমি চাচ্ছিলাম, তোমাকে নববধুর মতো সাজিয়ে তোমার ভাইকে দেখাব। তিনি দেখলে তোমাকে বকাঝকা করবেন। এতে তোমার মন ব্যথিত হবে। আলহামদুলিল্লাহ! তা হলো এবং আল্লাহর রহমতও নগদেই এসে পড়ল। নবীজির দিদার তোমার নসিব হলো। তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো। এসবই আল্লাহর ইচ্ছায় হলো।

শাইখের পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা

এ থেকে বোঝা যায়, যখনই মানুষের অন্তর ভাঙে অথবা কষ্টকর হালত আসে অথবা কোনো বালামুসিবত ঘাড়ে চাপে, তাহলে সেটা দুশ্চিন্তা বা ঘাবড়ে যাওয়ার সময় নয়; বরং সেই সময়টা হলো দু'আ করার সময়। ওই সময় বান্দার দু'আ কবুল হয়ে থাকে। কখনো সন্তানদের কারণে দুশ্চিন্তা, কখনো অসুস্থতার কারণে দুশ্চিন্তা, কখনো স্ত্রীর কারণে দুশ্চিন্তা কিংবা কখনো ব্যবসা-বাণিজ্য, আয়-উপার্জনের কারণে দুশ্চিন্তা চেপে বসে। সাধারণত শয়তান দেখে এবং জানে, অন্তর যখন ভাঙা থাকে, তখন বান্দার দু'আ কবুল হয়। এজন্য সে বান্দাকে নিরাশ করার চেষ্টা করে। ফলে বান্দা নিরাশ হয়ে আমল, দু'আ সব ছেড়ে বসে পড়ে আর বলে, না, ভাই! এখন আর কী হবে? হলে তো হতোই!

ঠিক এই জায়গাটাতে যাদের সঙ্গে শাইখের সম্পর্ক গভীর, তাদেরকে শায়খ দিকনির্দেশনা দেন যে, আরে ভাই! এটা তো ভেঙে পড়ার সময় নয়। এটা তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা। তিনি একটু কষ্টের মধ্যে ফেলে আপনাকে যাচাই করেছেন। এই চাক্কির মধ্যে এখন আপনাকে পেষা

হচ্ছে। সবসময় এই অবস্থা থাকবে না। যেই পিষ্ট হয়ে চাক্কি থেকে বের হবেন, দেখবেন, আল্লাহর পক্ষ হতে আপনার ওপর কী-কী নেয়ামত অবতীর্ণ হয়। কারণ, এটা আল্লাহর ওয়াদা।

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

'নিশ্চয়ই কষ্টের পর আনন্দ ও স্বচ্ছলতা আসে।'

تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

'এই অন্তরকে লুকিয়ে রেখো না, এটা তোমার আয়না।
যখন এটি ভেঙে যায়, তখনই আয়নার নির্মাতা (আল্লাহ)
একে খুব ভালোবাসেন।'

যখনই হৃদয় ভগ্ন হয়, অন্তর ব্যথিত হয়, তখন আল্লাহর দৃষ্টিতে এটি অত্যন্ত মূল্যবান, অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও প্রিয় হয়ে যায়। এরপরই বান্দার ওপর আল্লাহর খাস রহমতসমূহ অবতীর্ণ হতে থাকে। কিন্তু এই রহমত কেবল নেসবতওয়ালারাই বুঝে থাকেন। তারাই বলে থাকেন, আরে বিপদে ঘাবড়ে যেও না, পেরেশান হয়ো না, এখনই তো কান্নাকাটি করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উত্তম সময়। এখনকার দু'আই আল্লাহ বেশি কবুল করে থাকেন।

তলব তথা অনুসন্ধিৎসার মান যাচাই

সালেক যখন এপথে পা বাড়ায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু রহমতও এসে যায়। তো প্রথম-প্রথম তো তাকে একটু কাছে টেনে নেওয়া হয়। এরপর কিছু দিন তাকে একা-একা চলতে দেওয়া হয়, তোমাকে এতটুকু পথ তো আমিই দ্রুত অতিক্রম করিয়েছি, এবার নিজে কিছু করে দেখাও! আমি দেখব তোমার মধ্যেও তলব ও অনুসন্ধিৎসা আছে কি-না? কারণ, আমার সৌন্দর্য ও মহিমার ওপর আমার আত্মগৌরব রয়েছে। আমি বে-তলব ও আগ্রহহীনদের কিছুই দেই না। যারা আমার মহত্ত্ব ও মহিমা জেনেও বে-তলব হয়ে বসে আছে, আমি তাদের পরোয়া করি না। এরা অধিকাংশ প্রবঞ্চিত হয়। এখন তুমি একটু আগে বেড়ে দেখাও, তুমিও আমাকে চাচ্ছ। আমি তোমার জন্য এত পথ উন্মুক্ত করে দিলাম, রহস্যও বলে দিলাম, তোমার মধ্যে আগ্রহও সৃষ্টি করলাম, নিজের সৌন্দর্য, মহিমা ও তাজাল্লি দেখিয়ে দিলাম। এবার তুমিও কয়েক কদম আগে এসো দেখাও।

میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں
انہی ہمس پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آو

'আমার ঘরে আসার পথে দুর্গম কোনো পর্বতমালা নেই
আসতে পার তো এই পাথরগুলো মাড়িয়েই আস।'

যিকির ও সুলূকের পথে মানুষের ওপর বিভিন্ন হালাত এসে থাকে।

তা দেখে ভেঙে পড়া যাবে না। আল্লাহর রহমতের দিকে আরো বেশি ঝুঁকতে হবে।

দয়ার নবীর অস্থিরতা

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত কয়েকবার তাঁর প্রিয় রাসূলের ওপর অল্প সময়ের জন্য ওহী অবতরণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এ-বিষয়টি অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। বারবার তিনি আকাশের দিকে তাকাতেন। এমনকি একটা পর্যায় এমনও এসেছিল যে, তাঁর মন চাচ্ছিল, তিনি নিজেকে পাহাড় থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করে ধ্বংস হয়ে যাবেন। কারণ, কাফেরদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অপমান ও লাঞ্ছনা চরমে পৌঁছেছিল। তারা বলতে শুরু করেছিল- 'এবার তো তোমাকে তোমার রবও ছেড়ে দিয়েছেন।'

দুশ্চিন্তার অবসান

সাধারণত দেখা গেছে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু থাকেন। তাদের সামর্থ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপান না। এমন কোনো বিধান তাদের দেননি, যা তারা মানতে বা সহ্য করতে পারবে না।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরের কাজের জন্য আদিষ্ট করেন না।'[১৭৭]

এ-কারণে এপথে যদি এ-ধরনের কষ্টকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা হলে হতাশ হয়ে মুখ ফিরিয়ে সবকিছু ছেড়ে বসে থাকার প্রয়োজন নেই; বরং হিম্মত ও ধৈর্যের সাথে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া ও বেশি-বেশি দু'আ করার প্রতি যত্নবান হতে হবে। কারণ, সেই সময়টা হলো

---

১৭৭. সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৬

আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ নেয়ামত পাওয়ার সময়। ওই সময় যারা আল্লাহর দিকে ফিরে যায়, আল্লাহ তাদেরকে তাদের আশার চেয়ে অনেক বেশি দান করেন। আপনি কি দেখেননি, মা যখন রাগের মাথায় সন্তানকে থাপ্পড় মারে এবং সে কাঁদতেই থাকে, কিছুক্ষণ পর যখন সেই মা অন্যদের মধ্যে কোনো খাদ্যবস্তু বণ্টন করে, তখন যাকে থাপ্পড় মেরেছিল, তাকে অন্যদের তুলনায় একটু বেশিই দিয়ে দেয়। যদি মা তার কর্মের ক্ষতিপূরণ করতে পারে যে, চলো! তাকে মেরেছি যেহেতু এবার একটু খাবার দিয়ে তার মনটাও আনন্দিত করে দিই, তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলাও বান্দার প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহশীল। তিনি কিছুক্ষণের জন্য কোনো বান্দাকে যদি কষ্ট দিয়েও দেন, কোনো মুসিবতে ফেলেও দেন, তা হলে খুব শীঘ্রই তার অন্তরে আনন্দ দেওয়ার জন্য বড় রকমের নেয়ামতের ব্যবস্থা করেন।

তো মাজযুব হলো সেই ব্যক্তি, যার ব্যাপারে আল্লাহ চান, সে আমার দিকে আসুক এবং সেও আল্লাহর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন তো সর্বত্রই বসন্ত ফুটে ওঠে।

একজন কত সুন্দর বলেছেন–

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھکو ذوق عریانی
کوئی کھینچے لے جاتا ہے وہ گریبانی

'আসগর! আমি দেওয়ানাও নই, না নগ্নপনা আমার ভালো লাগে। (তারপরও সেদিকে ধেয়ে চলছি, কারণ) কেউ আমার কলার ধরে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে।'

এ-বিষয়টি অন্য এক আরিফ বিল্লাহর মুখে এভাবে ফুঠে উঠেছে–

سن لے اے دوست! جب ایام بھلے آتے ہیں
گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

'শোনো বন্ধু! যখন দিনকাল ভালো আসে,
তখন সে নিজেই তোমাকে সাক্ষাতের সময়-সুযোগ বলে দিবে।'

সে নিজেই তোমাকে সাক্ষাতের উপায় বলে দেবে যে, তুমি এভাবে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পার। সুবহানাল্লাহ!

যখন আল্লাহই চান, আমার বান্দা আমার দিকে ফিরে আসুক, তখন পথ কত সহজ হয়ে যায়।

দেখুন ভাই! আল্লাহ বর্তমানে তাঁর ঘরে যাওয়া খুব সহজ করে দিয়েছেন। ঘোড়া-উটের ওপর আরোহণ করে, আবার কেউ সামুদ্রিক জাহাজে বা গাড়িতে করে। আর এখন মাশাআল্লাহ উড়োজাহাজে করে এত হাজার-হাজার মাইল পথ মাত্র কয়েক ঘন্টায় অতিক্রম করে ফেলে। যে-আল্লাহ তার ঘরের পথ সহজ করে দিয়েছেন, তিনি কি তার দিকে ধাবিত হওয়ার রাস্তাকে সহজ করবেন না? যদি বাইতুল্লাহ তথা আল্লাহর ঘরের রাস্তা সহজ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে রব্বুল বাইত তথা ঘরের মালিকের দিকে যাওয়ার পথও সহজ হয়ে গেছে। এ-কারণে বর্তমানে যিকির ও সুলূকের মনযিলগুলো অতিক্রম করা খুব সহজ হয়ে গেছে।

ব্যস! শুধু কামনা-বাসনাগুলোকে ভাঙতে হয়, নিষিদ্ধ ইচ্ছাগুলোকে পরিহার করতে হয় এবং আল্লাহর দীনের ওপর হিম্মত ও সাহসিকতার সাথে আমল করতে হয়। এখানে এমন কোনো কাজ করা লাগে না, যা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। সুতরাং এর নাম কি সহজ হওয়া নয়? সামর্থ্যের মধ্যে যা হয়, তা অবশ্যই সহজও হয়। তারপরই আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে নিজের দিকে টেনে আনেন। কবি বলেন–

حسن کا انتظام ہوتا ہے

عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے

'সৌন্দর্যের ব্যবস্থাপনা থাকে,

লোকেরা তাকে ইশ্‌কের নামে চিনে।'

মূলত প্রিয়তমই তো সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেয়। যদিও বলা হয়, ইশ্‌ক তাকে সাক্ষাৎ পর্যন্ত নিয়ে গেছে।

আশেকের প্রেম ও মাশুকের প্রেমের মাঝে তুলনা

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) স্বীয় মাকতুবাতে ফার্সী ভাষায় দুটি ছন্দ লিখেছেন–

عشق معشوقاں پنہاں است وپنہا

عشق عاشق باد وصد طبل ونفیر

'মাশুকের প্রেম থাকে লুকায়িত

আর আশেকের প্রেম দুশত ঢোল ধামাকার সঙ্গে হয়ে থাকে।'

অর্থাৎ– প্রকাশ্য।

যখন বান্দার ওপর আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি পড়ে যায়, তখন তার মধ্যে বিস্ময়কর বসন্তের কাইফিয়্যাত তৈরি হয়।

অর্থাৎ– প্রিয়তম কখনো হইহুল্লোড়, শোরগোল করে না যে, আমার সাক্ষাতে আস, বরং চুপে-চুপে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। মনে-মনে চায়; কিন্তু প্রকাশ করে না। কিন্তু যে প্রেমিকের মহব্বতে পড়ে যায় সে তো পাগলপারা হয়ে যায়। সেসব জায়গায় শুধু তারই কথা বলে বেড়ায়। এতে তার মহব্বত ও ভালোবাসা লোকদের মাঝে দ্রুত প্রকাশ পেয়ে যায়।

عشق عاشق آں بدن لاغر کند

عشق معشوقاں بدن فربہ کند

'আশেকের ইশ্‌ক শরীরকে দুর্বল করে দেয়,
আর মাহবুবের ইশ্‌ক শরীরকে মোটাতাজা করে দেয়।'

বিস্ময়ের জগত

সুলূকের কিছু পথ মানুষ জযব-এর পদ্ধতিতে অতিক্রম করে এবং কিছু পথ অতিক্রম করে সুলূকের পদ্ধতিতে। বহু লোক এমন আছেন, যাদের আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে টানেন। কোনো একটা উপসর্গ তৈরি করে দিলেন আর সে আল্লাহর দিকে আকর্ষিত হতে থাকল। আমরাও আমাদের জীবনকে একটু পিছু ফিরে দেখি, তো বাস্তবেই অবাক লাগে যে, কীভাবে আকর্ষিত হয়ে আমরা এ পর্যন্ত পৌঁছেছি। যেমন– কেউ পাহাড়ি উঁচু নিচু পথে গাড়িতে চড়ে পথ অতিক্রম করছে। এর কিছুক্ষণ পর পেছনের দিকে তাকিয়ে সে নিজেই বলছে, হায় আল্লাহ! আমি এই জটিল পথ অতিক্রম করে কীভাবে এ পর্যন্ত এসেছি।

তদ্রূপ তাসাওউফ ও সুলূকের জীবনেও কখনো যদি অতীত চিন্তা করা হয়, তখন বড়ই আশ্চর্য লাগে, হায় আল্লাহ! অতীতের এই মনযিলগুলো অতিক্রম করে আমি এ পর্যন্ত কীভাবে এলাম? মূলত আল্লাহ তা'আলাই এসব পথ সহজ করে দেন। তিনি তার দুর্বল বান্দাদের প্রতি দয়া করেন।

সারকথা, কখনো সালেক হয়ে ধীরে-ধীরে পথ অতিক্রম করতে হয় আবার কখনো মাজযুব হয়ে বাতাসের কাঁধে সাওয়ার হয়ে পথ পার হতে হয়। কখনো এই তাজাল্লি পড়ে তো কখনো ওই তাজাল্লি। একথা শায়খই বোঝেন যে, এই সালেকের ওপর এই মুহূর্তে কোন তাজাল্লি পড়ে আছে।

শয়তানের ফাঁদ

কোনো-কোনো সালেককে দেখা যায়, যখন তাদের জযব-এর তাজাল্লি দ্বারা টানা হয়, তখন তারা মনে করে, আমি এখন কিছু হয়ে গেছি। আমি রাতে যেই স্বপ্ন দেখি, দিনের বেলা তা বাস্তবে পরিণত হয়। আমি যে-দু'আই করি, তা কবুল হয়ে যায়। তো এ অবস্থায় সে ভাবে, এখন তো আমার আর শাইখের প্রয়োজনই রইল না। নিজে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায়। এটা মূলত শয়তানের একটা সূক্ষ্ম ফাঁদ। সে তাকে বোঝায়, এখন তো তোমার কাইফিয়্যাত উন্নত হয়ে গেছে, তোমার দু'আ কবুল হয়ে যায়, কাশ্‌ফও খুব ঠিক হয়ে গেছে, লোকেরা তোমার দিকে মনোযোগী হয়েছে। এখন তো তোমার আর শাইখের প্রয়োজন নেই। তো এ-রকম অবস্থায় বহু লোক ধোঁকা খেয়ে পদস্খলিত হয় এবং সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়ে।

বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতিও একটি নেয়ামত

কিছুলোক এমনও আছেন, যাদেরকে প্রথম-প্রথম খুব ভালো কাইফিয়্যাতের দিকে টেনে নেওয়া হয়। এরপর মধ্যপথে আল্লাহ তাদের কাছ থেকে একটু পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তাদেরকে বিপদে ফেলেন। কখনো সংসারের পক্ষ থেকে পরীক্ষা, কখনো সন্তানাদির পক্ষ থেকে পরীক্ষা, কখনো সুস্থতার দিক থেকে পরীক্ষা, আবার কখনো দেখা যায় অন্তরের সেই নূরানী কাইফিয়্যাতই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই সুযোগে শয়তান তার অন্তরে হতাশা ঢেলে দেয়। আর সে বলতে থাকে, আরে ভাই! আমি এপথে বিশ বছর লাগালাম। কী পেলাম? আরে ভাই! আপনি কিছুই পাননি এই যে অনুভূতি, এটিও তো এক ধরনের প্রাপ্তি। এই উপলব্ধি আসা যে, আমি কিছুই পাইনি এটিও এক ধরনের নেয়ামত।

'হাল মিন মাযীদ'-এর অবস্থা

একটি কথা মনে রাখবেন। সারা জীবনে কখনো এমন সময় আসতে পারে না, যখন বান্দা একথা বলতে পারে, আমি যা চেয়েছি সব কিছু পেয়েছি। যে-ই বলবে, আমি সব পেয়েছি, সেই নিজের অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ করে দেবে। এমনটা তো কখনো হতেই পারে না। বরং হাল মিন মাযীদ (আরো বাড়তি কিছু আছে কি?)-এর ব্যাপারটা থাকবেই। মানুষ যত উন্নতিই করুক, হাহাকার তার মধ্যে থাকবেই থাকবে। তার মন চাইবে, আমি নৈকট্য

অর্জন করি, আরো নিকটে যাই, মাহবুবের আরো ঘনিষ্ঠ হই। তাঁর আরো সান্নিধ্য লাভ করি।

জযব ও সুলূক বোঝার উপায় কী?

জযব ও সুলূক-এর মধ্যে কখন কোন কাইফিয়্যাতটি বান্দার ওপর বিরাজমান থাকে, তা শায়খ উপলব্ধি করতে পারেন। তাই সর্বদা নিজের কাইফিয়্যাত সম্পর্কে শায়খকে অবগত করতে থাকবে। তখন তিনি তাকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন এবং বান্দার বড়-বড় সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে। এই যিকির ও সুলূকের পথে জযব বা সুলূকের কাইফিয়্যাত অনুধাবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে বান্দা অনুভব করতে পারে, আমি এখন জীবনের কোন ধাপটি অতিক্রম করছি। যে এটি অনুভব করতে পারবে, সে যেন নিশ্চিন্তে নিজের কাজে আত্মনিমগ্ন থাকে। কষ্টের মধ্যেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলতে থাকবে। আনন্দের সময়ও আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করবে না। এরপর তার পথে আর কোনো কিছু বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না; বরং উত্তরোত্তর উন্নতি হতেই থাকবে।

দু'আ কবুলের সময়

তবে একটি কথা মাথায় ঢুকিয়ে নিন যে, যদি কারো ওপর কষ্টের কাইফিয়্যাত বিরাজমান থাকে, ওই সময়টাকে সে যেন মূল্যবান মনে করে। কারণ, তখন তার সকল দু'আ কবুল করা হয়। এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয়; বুঝে নিন। যখন কারো ওপর কষ্টের কাইফিয়্যাত চালু থাকে এবং সে ওই কাইফিয়্যাতে ঘাবড়ে না গিয়ে কিংবা হতাশ না হয়ে আল্লাহর দিকে আরো বেশি-বেশি প্রত্যাবর্তন করে, তখন তার দু'আগুলো দ্রুত কবুল হয়।

দেখুন, বাচ্চা যখন বিরক্ত করে, তখন মা তাকে ধমক দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু বাচ্চাটা পিছু-পিছু এসে চিৎকার করতে থাকে। আমাকে কোলে নিন। যখন মা দেখেন, সন্তান আমার ধমক খেয়েও আমার পিছু ছাড়ছে না। তখন মায়ের মধ্যে মমতা জেগে ওঠে, মা তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রাখে। এমনিভাবে আল্লাহও দেখেন, আমি বান্দাকে কষ্ট দিয়েছি। তারপরও সে আমার স্মরণ ছাড়েনি। আমাকে পাওয়ার পথ থেকে ছিটকে পড়েনি। তখন প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়, সে কি আসলে কাইফিয়্যাতের প্রত্যাশী ছিল, নাকি আল্লাহর প্রত্যাশী। এমন পরিস্থিতিতে

বান্দা যখন দু'আ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দু'আগুলো কবুল করে নেন, তবে কখনো-কখনো এই পরীক্ষাটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপও ধারণ করে।

কষ্টের সময় আল্লাহর দান : একটি ঘটনা

হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশাবন্দি বোখারি (রহ.)-এর একটি ঘটনা। একবার তার ওপর কষ্টের কাইফিয়্যাত এত প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল যে, তিনি কোনো কিছু উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। এমন মনে হচ্ছিল যে, সকল ত্যাগ-সাধনা মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেছে। ফলে তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইস্তেগফারও করতে থাকলেন, দু'আও করতে থাকলেন। সাথে-সাথে মুজাহাদার পথে আগে বাড়তে চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু কিছুই অনুভূত হচ্ছে না। এমনকি একদিন মনে এল- ধ্যাৎ! এত ত্যাগ-সাধনা করেও যখন কিছু হচ্ছে না, তাহলে যাই; গিয়ে কোনো হালাল উপার্জনের ফিকির করি। সন্তানাদিও কষ্টে আছে। ওটা না হোক অন্তত এটা হয়ে যাক।

একথা ভেবে তিনি কোনো কাজের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথে নামাযের সময় হলো। এক মসজিদে প্রবেশ করলেন। সামনে দুটি ছন্দ লিখিত দেখতে পেলেন। ছন্দদুটি পড়েই তার ইচ্ছা বদলে গেল। তিনি পুনরায় অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আল্লাহর দিকে মনোযোগ দিলেন। এটা সেই সময়, যখন দীর্ঘ কষ্টের পর আল্লাহ তা'আলা তাকে নেসবতে নকশবন্দিয়া দান করলেন। এত বড় নেয়ামত তাঁর অর্জিত হলো।

সেই ছন্দ দুটি ছিল–

مفلسانیم آمدہ در کوئے تو

شیئًا للہ از جمال روئے تو

'হে আল্লাহ! আমি আপনার গলিতে ভিখারী হয়ে উপস্থিত হয়েছি।
আপনার চেহারার সৌন্দর্যের সদাকায় আমাকে কিছু দিয়ে দিন।'

دست بکشا جانب زنبیل ما

آفریں بر دست و بر تو

'ওই পেয়ালা যা আমি নেওয়ার জন্য ধরেছি,
সেটি দেওয়ার জন্য একটু আপনার হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিন।'

এই কবিতার ছন্দদুটি তাঁর কাছে এত ভালো লেগেছিল যে, তিনি ওসিয়ত করেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর যখন আমার জানাযার খাটিয়া মানুষের কাঁধে উঠবে, তখন যেন কেউ এই ছন্দগুলো পড়তে-পড়তে আগে-আগে চলে।

এই ছন্দদুটি আমি অধমকেও অনেক উপকৃত করেছে। যখনই বাইতুল্লাহর জিয়ারত নসিব হয়েছে, তখন গভীর রাতে বাইতুল্লাহর সামনে গিয়ে কল্পনা করতাম, আমি এই মুহূর্তে শাহেনশাহের দরবারে দাঁড়িয়ে আছি। সেখানে মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে স্বীয় রবের সঙ্গে প্রেম করে। আমি দেখেছি, এই ছন্দদুটি বাইতুল্লাহর সামনে পড়ার পর আমার মধ্যে এমন কাইফিয়্যাতের অবতরণ হয়েছে, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টার প্রতিদান

আমাদের মাশায়েখগণ লিখেছেন, যে বান্দা দুনিয়ায় আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ কখনো তাকে স্বীয় শত্রুদের কাতারে দাঁড় করাবেন না। এটা কি করে সম্ভব? এক বান্দা দুনিয়াতে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ছটফট করছে, দু'আ করছে, কখনো এদিকে ধাক্কা খাচ্ছে, তো কখনো ওদিকে। সারাটা দিন চাটাইয়ে বসে-বসে নিজের কোমড়ে দাগ ফেলে দিয়েছে। এমন আল্লাহপ্রেমী বান্দাকে কেয়ামতের দিন তিনি কীভাবে তার শত্রুদের কাতারে দাঁড় করাবেন? এমনটি কখনো হবে না; হতে পারে না। হে আল্লাহ! আমরাও আপনাকে চাই। আপনাকে পাওয়ার আশাতেই আমরা নিজের ঘর ছেড়ে আপনার ঘরে এসে বসে পড়েছি। হে আল্লাহ! আখেরাতে আমাদেরও আপনি অপমান করবেন না।

ভালো হওয়ার ইচ্ছা ও তার মূল্যায়ন

হযরত আকদাস থানুবি (রহ.) একটি বিস্ময়কর ঘটনা লিখেছিলেন। কেয়ামতের দিন এক বান্দাকে দাঁড় করানো হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এই আমার বান্দা! তুমি দুনিয়ায় ভালো হওনি কেন? সেই উত্তর দেবে, আল্লাহ! আমি দুনিয়ায় আপনার কাছে দু'আ করতাম, আল্লাহ! আমাকে ভালো করে দিন। আল্লাহ সবকিছু জানা সত্ত্বেও ফেরেশতাদের আদেশ করবেন, এই! দেখো তো এর আমলনামায় কোনো দু'আর বিষয় উল্লেখ আছে কি-না? ফেরেশতারা আমলনামা দেখে বলবে, হে আল্লাহ! এর আমলনামায় লেখা আছে, সে দুনিয়ায় বলত, হে আল্লাহ! আমাকে ভালো

করে দিন, আমাকে আপনার বানিয়ে নিন। তখন আল্লাহ বলবেন, ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, এই বান্দা দুনিয়াতে আমার বন্ধু হওয়ার দরখাস্ত করত। যাও! আমি তাকে আমার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। আল্লাহু আকবার!

এই মজলিসসমূহে উপস্থিত হওয়া এবং কিছু সময় বসা অনেক বরকতময় আমল। আমরা এর ছাওয়াব দেখব কেয়ামতের দিন ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত আমাদেরকে নিজেদের জীবনে এ-জাতীয় মজলিসের মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে পরীক্ষাসমূহ হতে নিরাপদ রাখনু। পদস্খলন হতে, সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা হতে হেফাযত করুন। নিজ দয়ার গুণে আমাদেরকে মনযিলে মাকসুদ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন। আমীন। আমীন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

দু'আর আদব

'সৃষ্টি থেকেও চাইতে দেখেছি, স্রষ্টা থেকে চাইতে দেখেছি। কিন্তু উভয়টার মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। কোনো মানুষের কাছে আপনি যখন কোনো কিছু বারবার চাইবেন, তা হলে সে বিরক্ত হয়ে যাবে। একবার চান; দেবে। দুবার চান দেবে; কিন্তু কেমন যেন একটা ভাব দেখাবে। ৩য়-চতুর্থবার বিরক্ত হবে, সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কিন্তু দয়ালু আল্লাহর ব্যাপারটি একেবারেই ভিন্ন। বান্দা একবার চায়; তিনি দান করেন। দ্বিতীয়বার চায়; তিনি দেন। তৃতীয়-চতুর্থবার চান; দেবেন। বারবার চান; তিনি বারবারই দেবেন। এমনকি যে-বান্দা সারা দিন চাইতে থাকে, তাকে তিনি নিজের বন্ধু বানিয়ে নেন। তিনি বলেন, এই বান্দা অন্যের কাছে কিছুই চায় না– শুধু আমার কাছেই চায়; তাই এ আমার বন্ধু।'

দু'আর আদব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَر : أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخر : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ـ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ـ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ الْعَزِيْزِ ـ

سُبْحَانَكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ـ

আল্লাহর অগণিত নেয়ামত

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অগণিত নেয়ামত দানে ধন্য করেছেন। আমরা যদি সেগুলো গণনা করতে চাই, তাহলে গুনে শেষ করা যাবে না। কেউ যদি দাবি করে, আমি আকাশের তারাগুলো গুনতে পারব, তা হলে মেনে নেব। কেউ যদি দাবি করে, আমি সারা পৃথিবীর সমস্ত গাছের পাতাগুলো গণনা করতে পারব, তাহলে মেনে নেব। সারা পৃথিবীর বালির কণাগুলো গণনা করতে পারব, তাও মেনে নেওয়া যাবে, কিন্তু কেউ যদি দাবি করে, আমি আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতগুলো গুনতে পারব, তাহলে একথা কখনো মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, সমগ্র পৃথিবীর যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি বলেছেন–

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

'যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে গণনা করতে চাও, তাহলে গণনা করে শেষ করতে পারবে না।'[১৭৮]

আল্লাহর অনুগ্রহ ও আমরা

চিন্তা করুন, আল্লাহ যদি আমাদের দৃষ্টিশক্তি না দিতেন, তা হলে আমরা অন্ধ হতাম। যদি তিনি আমাদের শ্রবণশক্তি না দিতেন, তাহলে আমরা বধির হতাম। তিনি যদি বলার ক্ষমতা না দিতেন, তা হলে আমরা বোবা হতাম। হাত-পা যদি না থাকত, তাহলে ল্যাংড়া হতাম। সুস্থতা যদি না দিতেন, তাহলে আমরা অসুস্থ থাকতাম। খেতে না দিলে ক্ষুধার্ত থাকতাম। পানি না দিলে পিপাসার্ত থাকতাম। ঘর না দিলে যাযাবর থাকতাম। সন্তান না দিলে নিঃসন্তান থাকতাম। সম্পদ না দিলে ফকির থাকতাম। মাথায় বুদ্ধি না দিলে পাগল থাকতাম। ইল্‌ম না দিলে জাহেল থাকতাম। ইয্‌যত না দিলে আমরা লাঞ্ছিত, অপমানিত থাকতাম। আমাদের এই সম্মানের জীবন একমাত্র তাঁরই দান, তাঁরই করুণা। আল্লাহু আকবার কাবীরা!

এক পেয়ালা পানির মূল্য

এবার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বাদশাহ হারুনুর রশীদ একবার পান করার জন্য পানি চাইলেন। তার সামনে ঠান্ডা পানি রাখা হলো। একজন বড় আলেম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, বাদশাহ সালামাত! পান করার পূর্বে আমার একটি কথা শুনুন। যদি আপনার খুব পিপাসা লাগে আর এই এক পেয়ালা পানি ছাড়া আর কোনো পানি না থাকে এবং এই পেয়ালাটি প্রদানকারী বলে, আমাকে এই পানির মূল্য দিতে হবে, তা হলে এই পানি কত মূল্য আপনি ক্রয় করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন? বাদশাহ বললেন, অর্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে পানি ক্রয় করে পান করব। কারণ, তখন জীবন ওষ্ঠাগত থাকবে। তিনি বললেন, ধরুন, পানি পান করার পর তা পেটে চলে গেল। তারপর পেশাব হয়ে বের না হয়ে যদি আটকে যায়, তা হলে এটাও এক ধরনের রোগ। যাদের এসব রোগ হয়, তারা মুরগির মতো ছটফট করতে থাকে। মনে হয়, তার জীবন বের হয়ে যাচ্ছে। আমি বহু বীর-বাহাদুরকে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে কাঁদতে দেখেছি। এটা এত কষ্টদায়ক রোগ। যদি এই পেশাবই পেটে আটকে যায় আর কোনো ডাক্তার বলে, এর ওষুধ আমার

---

১৭৮. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৪

কাছে আছে, তা হলে কত মূল্যে তা ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকবেন? বাদশাহ বললেন, অর্ধ রাজত্ব দিয়ে। তিনি বললেন, বাদশাহ সালামত! বোঝা গেল, আপনার গোটা রাজত্বের মূল্য এক পেয়ালা পানি শরীরে ঢুকবে আর পেশাব আকারে বের হবে। ব্যস! এতটুকুই গোটা রাজত্বের মূল্য। সেই হিসেবে তো আপনি হাজারো পেয়ালা পানি পান করেছেন। শুধু কি পানি? কত শরবত পান করেছেন! বলুন তো, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শুকরিয়া কীভাবে আদায় করবেন? আমরা প্রতিটি কদমে-কদমে আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে ডুবে আছি। আল্লাহ আমাদেরকে তার শোকরগুজার বান্দা বানিয়ে দিন। আমীন।

পঙ্গুত্ব থেকে বাঁচার কুদরতি ব্যবস্থা

ডাক্তাররা বলেন, প্রত্যেক মানবদেহে প্রবাহিত রক্তের মধ্যে কখনো-কখনো ক্লোট হয়ে যায়। যদি ব্লাডক্লোট মানুষের মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়, তা হলে যেই অংশকে সেটি ব্লক (Blook) করে দেয়, সেটি অবশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আবার সেই ক্লোটও ঘোরাফেরা করতেই থাকে। আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে একে সেখানে পৌঁছতে দেন না। আমরা বলতেও পারব না, আল্লাহ আমাদের প্রতি কত দয়ালু। এমন প্রাণনাশক রোগ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। যত পয়সাওয়ালাই হোক যদি তার ঠিকমতো ঘুম না হয়, ৩য়-৪র্থ দিন তার কী দশা হয়? আর আমরা আলহামদুলিল্লাহ প্রতিদিন কত শান্তির ঘুম ঘুমাই। আমার মাওলার কী পরিমাণ করুণা যে, আমরা তার নেয়ামতগুলো গণনা করে শেষ করতে পারব না। ব্যস! শুধু এটুকু বলব, আমাদের সেই নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। মানুষ কত খারাপ! নেয়ামত গ্রহণও করে, আবার তা ভুলেও যায়। আর আল্লাহ! দানও করেন, ক্ষমাও করেন। আল্লাহু আকবার!

বিশ্বস্রষ্টার পছন্দ

যাহোক, আল্লাহ রব্বুল ইয্যত এ-বিষয়টি পছন্দ করেন যে, আমার বান্দা আমার নিকট প্রার্থনা করুক আর আমি তাদের দান করি। আমার বান্দা আমার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ুক। এবার তার একটি দলিল শুনুন।

কুরআনে মাজীদে লোকেরা যে-প্রশ্নগুলো করেছে, সেগুলো উল্লেখ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা তার নবীর মুখে তার জবাবও দিয়েছেন। তার একটি পদ্ধতি বলে দিয়েছেন يَسْئَلُوْنَكَ শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করিয়েছেন এবং قُلْ শব্দ দ্বারা তার জবাব দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ

'মানুষ আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।'[১৭৯]

এটি হলো প্রশ্ন।

قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

'আপনি বলে দিন, তা মানুষ ও হজের জন্য সময়নির্দেশক।'[১৮০]

এটি হলো উত্তর। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলের মুখ দিয়ে দিয়েছেন।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى

'মানুষ আপনাকে এতিমদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে।'[১৮১]

এটি প্রশ্ন।

قُلْ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ

'আপনি বলুন, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা ভালো।'[১৮২]

এটি জবাব।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ

'মানুষ আপনাকে হায়েজ (মাসিক ঋতুস্রাব) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।'[১৮৩]

এটি প্রশ্ন।

قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ

'আপনি বলুন, এটা অসুচি। সুতরাং তোমরা হয়েজ অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম বর্জন করবে।'[১৮৪]

এটি জবাব।

অর্থাৎ– يَسْئَلُوْنَكَ দিয়ে প্রশ্ন এবং قُلْ দ্বারা তার জবাব। পুরো কুরআনের মধ্যে এ তারতীবই রাখা হয়েছে।

---

১৭৯. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৯
১৮০. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৯
১৮১. সূরা বাকারা : আয়াত ২২০
১৮২. সূরা বাকারা : আয়াত ২২০
১৮৩. সূরা বাকারা : আয়াত ২২২
১৮৪. সূরা বাকারা : আয়াত ২২২

একটা প্রশ্ন ছিল, প্রশ্নকারীরা যখন প্রশ্ন করল আর সেই প্রশ্ন আল্লাহর এত ভালো লাগল যে, তিনি তার উত্তর অন্য কারো মাধ্যমে দেওয়ানোর পরিবর্তে স্বয়ং নিজেই দিলেন। প্রশ্ন এত ভালো লাগল যে, নিয়মই বদলে দিলেন। বললেন, হে আমার প্রিয় রাসূল!

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

'যখন আপনাকে আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, (আল্লাহ কোথায়? তা হলে বলুন) আমি নিকটেই আছি।'[১৮৫]

এখানে আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন বর্ণনা করে নিজেই তার জবাব দিলেন। তো আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক এমন যে, আল্লাহ তা'আলা মাঝখানের মাধ্যমও বাদ দিয়ে উত্তর দিলেন। তিনি চাচ্ছেন, বান্দা যেন আমার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি হতে চাওয়ার মধ্যে ব্যবধান

সৃষ্টি থেকেও চাইতে দেখেছি, স্রষ্টা থেকেও চাইতে দেখেছি। কিন্তু উভয়টার মাঝে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। কোনো মানুষের কাছে আপনি যখন কোনো কিছু বারবার চাইবেন, তা হলে সে বিরক্ত হয়ে যাবে। একবার চান; দেবে। দুবার চান দেবে; কিন্তু কেমন যেন একটা ভাব দেখাবে। ৩য়-চতুর্থবার বিরক্ত হবে, সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কিন্তু দয়ালু আল্লাহর ব্যাপারটি একেবারেই ভিন্ন। বান্দা একবার চায়; তিনি দান করেন। দ্বিতীয়বার চায়; তিনি দেন। তৃতীয়-চতুর্থবার চান; দেবেন। বারবার চান; তিনি বারবারই দেবেন। এমনকি যে-বান্দা সারা দিন চাইতে থাকে, তাকে তিনি নিজের বন্ধু বানিয়ে নেন। তিনি বলেন, এই বান্দা অন্যের কাছে কিছুই চায় না– শুধু আমার কাছেই চায়; তাই এ আমার বন্ধু।

কোনো ধনী লোকের নিকট সামান্য চান, দেখবেন, তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। কোনো মিনিষ্টারের কাছে জনসম্মুখে গিয়ে বলুন, আমাকে একটি টাকা দিন। তিনি বলবেন, আরে! তুমি আমাকে ভেবেছ কী? এমনিভাবে কোনো ফকির-মিসকিনের নিকট গিয়ে এক বিলিয়ন টাকা চান দেখবেন। সে বলবে, কমবখত!

মোটকথা, গরিবের কাছে বেশি চাইলে সে রাগ করবে। আবার ধনীর নিকট কম চাইলে সে রাগ করবে। সুবহানাল্লাহ! আমার আল্লাহ সেই দানশীল সত্তা, যিনি বান্দা যা চায়, তা-ই দান করেন।

---

১৮৫. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৬

স্রষ্টা ও সৃষ্টির দানের মধ্যে পার্থক্য

হাদীছে এসেছে, কোনো বান্দা যখন আল্লাহর নিকট জুতার ছিঁড়ে যাওয়া ফিতাও চায়, আল্লাহ তাতে খুশি হয়ে তাকে সেটি দান করেন। কখনো-কখনো সৃষ্টিরাও দান করে; কিন্তু অসন্তুষ্ট চিত্তে। যেমন– আপনি ড্রাইভিং করে কোথাও যাচ্ছেন। আপনার মা-ও সঙ্গে আছেন। জ্যামে পড়ে কোথাও দাঁড়িয়ে পড়লেন। হঠাৎ এক ভিক্ষুক এল এবং গাড়ির গ্লাসে ঠকঠক শব্দ করল। আপনি তাকে ইশারা করছেন, ভাই মাফ করে দাও! সেই বেটাও নাছোড়বান্দা; চেয়েই যাচ্ছে। আপনি নিষেধ করা সত্ত্বেও সে সরছে না। তার ওপর আপনার খুব রাগ হলো। এরই মধ্যে আপনার মা বললেন, বেটা! কিছু দিয়ে দাও; গরিব মানুষ। এখন মা যখন বলেই ফেলেছেন, তো কথা তো মানতে হবে। আপনি পকেট থেকে টাকা বের করলেন। টাকাটা তাকে দিচ্ছেন, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তার দিকে ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেনও।

তো এ হলো দৃষ্টান্ত যে, সৃষ্টিরা দেয়ও আবার অসন্তুষ্টও হয়। তবে জীবন কুরবান হোক সেই সত্তার নামে, যিনি যখনই কোনো বান্দাকে দান করেন, কখনো অসন্তুষ্ট হন না, তিনি সর্বদা আনন্দিত চিত্তে এবং খুশি হয়ে দান করেন। এরপর এটাও দেখা যায় যে, মানুষ কখনো দেয়ও আবার ওজরখাহিও করে। যেমন– বলে, ভাই! কাজ-কারবার ভালো যাচ্ছে না। আজকাল আয়-ইনকাম খুব একটা ভালো না। অথবা বলে, এখন তো ভাই কিছুই দিতে পারব না, পরে দেব ইনশাআল্লাহ!

তো বোঝা গেল, আল্লাহ এমন সত্তা যে, তাঁর কাছে যে-ই চায়, যখনই চায়, যা কিছুই চায়, সবকিছু আল্লাহ তাকে দান করেন। আল্লাহর খাযানায় কমে যাওয়ার কোনো কল্পনাই করা যায় না।

দুনিয়ার মানুষ যদি দিনে দান করে, তাহলে রাতের বেলা দরজা বন্ধ করে দেয়। যেমন– ছুটির দিনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দরজা বন্ধ থাকে। অথচ আল্লাহর দরজা কখনোই বন্ধ হয় না। দিবা-রাত্রি, ছুটি সর্বাবস্থায় খোলা থাকে। যে যখন চাইবে, তাকে তিনি দিয়ে থাকেন। তিনি এমন পালনকর্তা যে–

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

'তার না তন্দ্রা আসে, না ঘুম।'[১৮৬]

---

১৮৬. সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৫

কেন? কারণ, এমন যেন না হয় যে, প্রার্থনাকারী কিছু চাচ্ছে আর প্রদানকারী বসে-বসে ঝিমুচ্ছেন। প্রদানকারীর তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া তার শানের পরিপন্থি। সুতরাং আল্লাহ এমন সত্তা, যিনি ঘুম বা ঝিমুনি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। যখনই তোমরা কিছু চাইবে, আমার আল্লাহ তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন।

মাখলুক প্রথমে নিজেকে দেয়। যদি কেউ ক্ষমতায় যেতে পারে, তখন সে নির্বাচনে যারা ভোট দিয়েছে এবং তার পক্ষে কাজ করেছে, প্রথমে তাদের দেয়। তো কিছু দিতে চাইলে প্রথমে আপনজনদের দেয়। কিন্তু আল্লাহর ব্যাপার ভিন্ন। তিনি যেমন আপনজনদের দেন, তেমনি পরকেও দেন। ঈমানদারকেও দেন; বে-ঈমানকেও দেন। ওফাদারকেও দেন, গাদ্দারকেও দেন। লোকেরা কেউ এলে দেখে কী এনেছে। অনেকে জিজ্ঞাসাও করে ফেলে কী এনেছ? কিন্তু আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি আগমনকারীকে কখনো জিজ্ঞাসা করেন না, কী নিয়ে এসেছ? বরং তাকে জিজ্ঞাসা করেন, বান্দা আমার, বলো কী লাগবে তোমার? কী নিতে এসেছ? কত দয়াময় তিনি! আল্লাহু আকবার কবীরা!

বাদশাহ যদি কাউকে দাওয়াত করেন আর সে নিজের ঘর থেকে খানা নিয়ে আসে, তা হলে কি বাদশাহ খুশি হবেন? না; বরং তিনি বলবেন, তা হলে আমার এই আয়োজন কীসের জন্য? এক আল্লাহওয়ালা বলেন–

بَلَغْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ * مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْكَرْبِ السَّرِيرِ

كَرِيمًا ذَاتَ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ * إِذَا كَانَ الْغَفُورُ عَلَى الْكَرِيمِ

'আমি এক দানশীলের বাড়ি গেলাম। আমার কাছে প্রয়োজনীয় সামানপত্র ছিল না। কিছু নিয়ে দানশীলের বাড়ি যাব তা-ও ভালো লাগছিল না। তিনি বড়ই দানশীল মালিক। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার কাছ থেকে নিতে আমার দুয়ারে এসে গেছে আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।'

আল্লাহর কাছে চাওয়ার আদব

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এক বিস্ময়কর ইবাদাত। দু'আ ইবাদাতের মগজ। নবীজি ইরশাদ করেন–

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

'দু'আ ইবাদাতের মগজ।'

দু'আ ও কিছু আদাব

মন খুলে দু'আ করা

দু'আর মাহফিলে সম্মিলিতভাবে যখন দু'আ করা হবে, তখন মন খুলে খুব চাইবে। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ অবস্থান হিসেবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। কিন্তু চাইতে হবে মন খুলে। অনেক-অনেক, বেশি-বেশি। কখনো-কখনো তো আমরা চাইতেই পারি না বলে পাইও না।

এক আল্লাহর বান্দা এসে আমাকে দু'আ দিয়ে বলল, 'আল্লাহ আমার হায়াতটুকু আপনাকে দিয়ে দিন। আমি বললাম, আরে ভাই! তাঁর ওখানে অভাব কীসের? তোমারটা আমাকে কেন দেবেন? দু'আ করা উচিত এভাবে যে, আল্লাহ আপনার হায়াতে বরকত দান করুন, রিযিকে বরকত দান করুন, কবুলিয়্যাত দিন। অর্থাৎ– এদিকে হায়াতের পরিমাণ একটু কম হয়ে গেছে, তাই ওদিক থেকে কিছু নিয়ে এদিক পুরা করে দাও। এটা তো দুনিয়াবি হিসাব। আমরা আল্লাহর কাছে চাইতে জানি না।

একবার এক মহিলা এল। তার কোনো সন্তান নেই। সে পর্দার আড়ালে বসে নিজের কথা বলছিল, এখন আল্লাহর কাছে আমি শুধু সন্তানই চাই। তিনি আমাকে একটি ছেলে দিয়ে দিন। আমি আর কিছু চাই না।

আমি তাকে বোঝালাম। বললাম, জান, কার কাছে চাচ্ছ? আল্লাহর কাছে কীভাবে চাইতে হয় জানা আছে? এটা চাওয়ার কোনো পদ্ধতি হলো? আমি শুধু একটি ছেলে চাই। আরে! আল্লাহ যদি তোমাকে স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করে দেন, তখন কী হবে? দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত করলে কী উপায় হবে? যে-মান-সম্মান নিয়ে আছ, তা যদি আল্লাহ ছিনিয়ে নিয়ে অপমান করেন, তাহলে কী হবে? আল্লাহর কাছে এভাবে চাইতে হয় না; বরং বলা উচিত ছিল, 'আমি আল্লাহর কাছে সুখ-শান্তিও চাই, সবই চাই। ফকির যখন ভিক্ষা করে, তখন কি তার শরম লাগে? কখনো কোনো ফকিরকে লজ্জিত হতে দেখেছেন? ভিক্ষা চাইতে তার কাছে শরম লাগে না; সবার সামনে হাত পেতে দেয়। সুতরাং আমরা আল্লাহর দরবারে চাইতে গিয়ে লজ্জা করব কেন?

অতএব, শর্তসাপেক্ষ সংকীর্ণ দু'আ আল্লাহর কাছে করা উচিত নয়। বরং তাঁর কাছে চাইতে হবে ব্যাপক শব্দে। তিনি দয়ালু, করুণাময়। তাঁর একটি দয়ার দৃষ্টিতে আমাদের সারা জীবনের সীমাহীন নেয়ামত নসিব হতে পারে। এভাবে সংকীর্ণ দু'আ করা আল্লাহর শানে বেয়াদবির মতো। তাই বলি, যখন আল্লাহর কাছে চাইবেন, তার দরদ দেখে তারপর চাইবেন।

বিশ্বাসের সাথে দু'আ করুন

আমরা দেখেছি, ফকির যখন কোনো ধনীর দরজায় আসে, তখন উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা চায়। সে জানে, বড় দরজা; খালি হাতে ফিরব না। তো একটা ফকির দুনিয়ার যখন সামান্য ধনীর দরজায় এমন উচ্চ আশা রাখে, তখন আমরা তো আল্লাহর দরবারে বসা, আমাদেরও বিশ্বাস দৃঢ় হতে হবে। যে দু'আই আমরা করব, তা অবশ্যই কবুল হবে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি দুনিয়া চান, তাহলে দেখবেন, দু'আকৃত বস্তুটি ভালো, নাকি মন্দ। তারপর ভালো হলে দেবেন– নগদে বা পরে। অন্যথায় আখেরাতে এর জন্য বিশাল পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।

.শান্তিময় রিযিক প্রার্থনা করুন

আমরা কখনো-কখনো এমন বস্তু চাই, যা আমাদের জন্য বিপদ ডেকে আনে। এক বান্দা আল্লাহর কাছে টাকা-পয়সা চায়। আল্লাহ তাকে দেন না। তিনি জানেন, এর হাতে টাকা-পয়সা এলে এর সন্তানরা নাফরমান হয়ে যাবে। এমন ধন দিয়ে কী হবে যদি পরিবারের লোকেরা নাফরমানি করে? এমন সম্পদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ হোক। দু'আ করবেন, তো প্রশান্তিময় অর্থ চাইবেন। আল্লাহ আমাদেরকে অকল্যাণবাহী ধনসম্পদ থেকে হেফাযত করুন। ধনসম্পদ সর্বদা হাতে আসা কোনো ভালো বস্তু নয়। তাই আল্লাহর কাছে প্রশান্তিময় রিযিক চাইবেন।

আল্লাহ কল্যাণ দেখেন

একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। হযরত মূসা (আ.) খিযির (আ.)-এর সঙ্গে সফর করলেন। তিনি একটি শিশুকে হত্যা করলেন। দৃশ্যত ব্যাপারটা অত্যন্ত জঘন্য ছিল। যে দেখবে, সেই মর্মাহত হবে। ছেলেটি পিতা-মাতার স্নেহ হতে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কল্যাণকামিতা দেখুন। পরবর্তী কালে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কেন তিনি

ছেলেটিকে হত্যা করলেন, তিনি বললেন, এই ছেলেটি বড় হয়ে তার বাবা-মায়ের নাক কেটে দিত। তাদের কষ্ট দিত। ওলামায়ে মুফাস্‌সিরীন বলেন, এই ছেলের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা সেই পিতা-মাতাকে একটি মেয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই মেয়ের বংশ থেকে তিনি বেশ কজন নবী-রাসূল সৃষ্টি করেছেন। বহু অলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তো আল্লাহ তা'আলা সর্বদা বান্দার কল্যাণই কামনা করেন।

হয়তো দু'আর কারণে কোনো বিপদ দূর করে দেন, অন্যথায় সেটি জমা করে রাখা হয়। কেয়ামতের দিন এর প্রতিদান দেওয়া হবে। হাদীছে এসেছে, কেয়ামতের দিন বান্দা যখন দেখবে, দুনিয়ায় কবুল হয়নি এমন চাওয়া দু'আগুলোর বিনিময় এত বেশি, তখন বলবে, হায়! যদি দুনিয়ায় আমার কোনো দু'আ কবুল না-ই হত, সবগুলো দু'আ জমা করে রাখা হত, তাহলে আজ আল্লাহ তা'আলা আপন শান মোতাবেক তার প্রতিদান দিতেন। তো মুমিনের তো শুধু মজা আর মজা। সকল ক্ষেত্রে আমাদের কল্যাণই কল্যাণ। সুতরাং মন খুলে চাও। আর এর জন্য চাওয়ার পদ্ধতি জানতে হবে।

এক জায়গায় কয়েকজন বন্ধু একসাথে বসে আছে। একজন বলল, হে আল্লাহ! আমাকে পঞ্চাশ কোটি ডলার দিন। আরেকজন বলল, এত ডলার? সে বলল, আরে ভাই! তোমার কাছে তো চাচ্ছি না। এত অস্থির হচ্ছ কেন? আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছি। যখন আল্লাহর কাছে চাইব, তখন কম চাইব কেন? ব্যস! আমরা তো চাইতেই জানি না, যার ফলে পাইও না। অন্যথায় দেওয়ার জন্য তো তিনি সদা প্রস্তুত।

خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھیں احوال
کہ آگ لینے جائے اور پیغمبری میل جائے

'খোদার দীনের মর্যাদা মূসা (আ.)কে জিজ্ঞাসা করো,
যিনি আগুন নিতে গিয়ে পয়গম্বরি পেয়ে গেলেন।'

আমরা করুণার দিকে ধাবমান

হাদীছে এসেছে, এক ফেরেশতা রাতের শেষ প্রহরে ঘোষণা দিতে থাকেন, 'আছে কি কোনো প্রার্থনাকারী; তাকে সব কিছু দেওয়া হবে?

ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں
دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں
ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے کوئی راہرو منزل نہیں
لفظ و شاعری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم
دینے ولا دے بھی کیسے لفظ دعا ملتا ہی نہیں

'আমরা অভিযোগ করি, আমাদের চাওয়া বিষয় আমরা পাই না।
দানকারীর অভিযোগ হলো, আমি কোনো প্রার্থনাকারী পাই না।
আমি তো দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু প্রার্থনাকারী নেই।
পথ দেখাব কাকে? গন্তব্যে পৌঁছার কোনো পথিকই যে নেই।
কবিতা-কাব্য দেখে দয়াময় প্রভু বান্দাকে বলছেন,
দানকারী কাকেইবা দেবে, দু'আর তেমন আওয়াজই তো শোনা যায় না।'

আল্লাহ বলেন, আমি দেব কাকে? হাত তো পাততে হবে। তাহাজ্জুদের সময় ঘুমিয়ে থাকি। আল্লাহ তো দিয়ে খুশি হন। এজন্য আল্লাহর কাছে যে-বান্দা যত বেশি আগ্রহ, অনুনয় ও কাকুতি নিয়ে দু'আ করবে, আল্লাহ তার দু'আ অবশ্যই কবুল করবেন।

আপাদমস্তক ভিখারী হয়ে দু'আ করা

এই অধম পূর্বে বলেছিল, দু'আ চাইলে কবুল হবে– শুধু দু'আ পাঠ করলে কবুল হবে না। যেমন– আমরা আজকাল দু'আ পাঠ করি। এটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الخ.

তারপর আবার বলেও থাকি- দু'আ তো কবুল হয় না।

দু'আ চাওয়ার উদ্দেশ্য হলো, মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত মানুষের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহর সামনে ফরিয়াদ করতে থাকবে। এভাবে দু'আ করতে হবে। এরপর দেখবেন ফলাফল।

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

'আছে কি কেউ, যে বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেয়, যখন সে ডাকে... ।'[১৮৭]

বহু ঈমানদারকে দেখা যায়, যখন তারা দু'আ করে, মনে হয়, তারা আল্লাহকে অর্ডার করছে, আদেশ দিচ্ছে, দায়িত্বে নিয়োজিত করছে। যেমন– ব্যবসায়ীরা বলে, এই! তুমি ওই কাজটা করে নিয়ো। ওই হিসাবটা দেখে নিয়ো। তো এরাও আল্লাহ তা'আলার কাছে এভাবেই আদেশের সুরে দু'আ করে, আল্লাহ! আমার ছেলের জন্য ভালো একটি মেয়ের সম্বন্ধ মিলিয়ে দিন। আমার মেয়ের জন্য একজন ভালো ছেলে মিলিয়ে দিন। স্বামীর ব্যবসাটা ভালো হয়ে যাক ইত্যাদি। তো এসবকে তো প্রকৃত অর্থে দু'আ বলা যায় না। প্রকৃত দু'আয় মানুষের মধ্যে বিনয় ও মুখাপেক্ষিতা থাকে।

একজন ফকিরের দিকে তাকান। এক টাকা চাওয়ার জন্য কাপড়টা পরে আসে ছেঁড়াফাটা, মলিন। হাতে থাকে ভিক্ষার বাটি। সামনে এসে চুপচাপ দাঁড়ায়। তার হাত কাঁপে, কণ্ঠের আওয়াজ কাঁপতে থাকে। বেছে-বেছে এমন শব্দমালা মুখে আনছে, যেগুলো মানুষের অন্তরকে নরম করে, বিগলিত করে, অন্তরে সমবেদনা জাগায়। এত কিছুর পর সে একটা টাকা ভিক্ষা চায়।

চিন্তা করুন! একটা টাকা চাওয়ার জন্য যদি এতটা বিনয় প্রকাশ করতে হয়, তা হলে যে আল্লাহর কাছে তাঁকে পাওয়ার জন্য দু'আ করবে, তার মধ্যে কী পরিমাণ বিনয় ও নম্রতা থাকা উচিত? তো দু'আ চান চাওয়ার মতো, নিয়ম ও আদবমতো। তারপর দেখবেন, কীভাবে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে। এটা তো আল্লাহর দয়া যে, তিনি আমাদের গুনাহ ও অপরাধ থাকা সত্ত্বেও এখনো রহমতের দুয়ার বন্ধ করে দেননি।

শাহি আদবের দাবি

শাহি আদবের দাবি হলো, যে-বান্দা আল্লাহর দরবার থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, আল্লাহও তার পিঠে একটা লাথি মারবেন এবং রহমতের দরজা তার ওপর বন্ধ করে দেবেন, যা; যেদিকে ইচ্ছে চলে যা; আমার দরজা তোর জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ এমনটা করেন না। গাফলতের মধ্যেই বান্দার বার্ধক্য এসে যায়। স্ত্রী-সন্তান থেকেও থাকল না। ভাই-বোন চলে গেল, মা-বাবা চলে গেলেন– পুরো খান্দানে সে একাই রয়ে

---

১৮৭. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৬২

গেল। থাকছে কারো করুণার ভিখারী হয়ে। তারা এসে বলছে, আপনি সারা রাত কাশতে থাকেন; আমাদের সন্তানরা এতে বিরক্ত হয়। আপনি অন্য কোথাও চলে যান। তারা শেষমেশ ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল।

এখন ওই বুড়া, যে কখনো মসজিদের দরজা দেখেনি, জুমার নামায পড়েনি, ঈদের নামায পড়েনি, সেই অবাধ্য বুড়া এখন ভাবে, আমি কোথায় যাব? চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছে। তখন উপায়ন্তর না দেখে বলে, চলো, আল্লাহর দরজায় যাই। এবার লাঠিতে ভর করে, ঠকঠক শব্দ তুলে, হাঁপাতে হাঁপাতে, কম্পিত পায়ে এগুতে থাকে। একটু পথ চলে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। উঠে আবার চলে। এভাবে আল্লাহর ঘরের দিকে যায়।

দয়াময় আল্লাহ এই গুরুতর অবাধ্য বৃদ্ধকেও জিজ্ঞাসা করেন না, এই বান্দা! আমার দেওয়া যৌবনটা কোথায় ক্ষয় করেছ? যখন সৌন্দর্য ছিল, শক্তি-সামর্থ্য, ধনদৌলত, সম্মান-প্রতিপত্তি এসব ছিল, তখন কোথায় ছিলে? এসব নেয়ামত নষ্ট করে এখন অবশেষে আমার ঘরের কথা মনে পড়ল? আল্লাহ এভাবে তাকে অভিযুক্ত করেন না। সারা জীবনের নাফরমানির জন্য বকাঝকা, হুমকি-ধমকিও দেন না; বরং তিনি বলেন, অবশেষে আমার বান্দা বিশ্বাস করেছে, আমার একজন প্রকৃত মালিক আছেন। শেষমেশ আমার দুয়ারে এসেই ধরনা দিয়েছে। এতে আল্লাহ খুবই খুশি হন। সে এক বিঘত এগুলে আল্লাহর রহমত দুই বিঘত তার দিকে এগিয়ে যায়। সে হেঁটে-হেঁটে এলে আল্লাহর রহমত তার দিকে দৌড়ে যায়। তিনি এত দয়ালু! এত ক্ষমাশীল! এত করুণাময়! আল্লাহু আকবার! তাঁর মতো দয়াময়ের কাছে না চাইলে মানুষ কার কাছে চাইবে?

আল্লাহর মহব্বতের ধরন

শিশু যখন মায়ের ওপর চটে যায়, তখন মা শিশুকে তোশামোদ করে বলে, বাছা আমার, মায়ের সঙ্গে রাগ করে না, বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলো। কেন মায়ের সঙ্গে মুখ ভার করে আছ? যেভাবে মা মমতাভরা কণ্ঠে শিশুকে বোঝায়, আল্লাহও অত্যন্ত মমতাভরা কণ্ঠে স্বীয় বান্দাকে বোঝান। বলেন–

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

'হে মানুষ! তোমার দয়াময় প্রভুর ব্যাপারে তোমাকে কোন বস্তু ধোঁকার মধ্যে ফেলেছে।'[১৮৮]

---

১৮৮. সূরা ইনফিতার : আয়াত ৬

এমন করুণাময় আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোথায় গিয়ে পড়ে আছ? ধাক্কা খাচ্ছ, কেঁদে-কেঁদে ফিরছ, জুতার তলা ক্ষয় করছ; কিন্তু তোমার আমল পরিশুদ্ধ হলো না। তোমার দয়াময় রবের দরজায় কেন ফিরে যাচ্ছ না? কেন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করছ না, যার একটিমাত্র রহমতের দৃষ্টি তোমার সকল সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে?

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

এত মমতামাখা ঢঙ্গে বোঝাচ্ছেন। বান্দার উচিত, আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে দু'আ করতে থাকা, যত বেশি সম্ভব চাওয়া। সর্বদা গ্রহণকারী নিজের ঝোলা ছোট হওয়ার অভিযোগ করে আর দানকারীর ঋণ সর্বদা বড়ই থাকে, ওপরেই থাকে। আল্লাহর ঋণ তো সবচেয়ে বড়। আল্লাহু আকবার!

মহব্বতমাখা দু'আ ও তার মূল্যায়ন

হযরত ওমর (রাযি.) দু'আ এভাবে করতেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ قَبْرِيْ فِيْ بَلَدِ حَبِيْبِكَ

'হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত দান করো এবং তোমার হাবীবের শহরে আমার কবরের ব্যবস্থা কোরো।'

প্রার্থনাকারী তো শুধু এতটুকু প্রার্থনা করল আর দানকারী সেই প্রার্থনার মূল্যায়ন কীভাবে করলেন? শাহাদাত তো পাহাড়ের চূড়ায় হতে পারত, পথে-ঘাটে হতে পারত, কোনো মরুভূমি কিংবা পাথুরে ভূমিতে হতে পারত। আল্লাহ তাঁকে শাহাদাত দিলেন তো কোথায় দিলেন? নবীর মসজিদে, নবীর মুছল্লায়, উজু অবস্থায়, নামাযের মধ্যে, আল্লাহর কালাম কুরআন তেলাওয়াত করা অবস্থায়। যে-প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল, সেই আঘাতই শাহাদাতের কারণ হয়েছিল। তিনি তো এটা চাননি যে, আমাকে নবীর মুসল্লায় শাহাদাত দিন; বরং দু'আ করেছিলেন, আমাকে প্রিয়নবীর শহরে সমাধিস্থ হওয়ার তাওফীক দিয়ো।' আল্লাহ সেই দু'আ কবুল করলেন। জান্নাতুল বাকী'তে দাফন হলেই দু'আ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু-না- দানকারী আরো বেশি দিতে চাচ্ছেন– প্রত্যাশার চেয়েও বেশি। কোথায় দাফন নসিব হলো? প্রিয়নবীর পাশে রওজায়ে আতহারে। কত বড় সৌভাগ্য! তাঁর কাছে চেয়ে দেখুন। তারপর বুঝতে পারবেন, তিনি দিতে থাকলে কী পরিমাণ দেন। তিনি সর্বদা

প্রত্যাশার চেয়েও বেশি দেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু! বড়ই মেহেরবান! আল্লাহু আকবার!

বিগড়ে যাওয়া বান্দার অপেক্ষা

মনে রাখবেন, কোনো মায়ের সন্তান যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, তখন তার কী অবস্থা হয়? বেচারী মা কাঁদে, খায় না, পান করে না, পেরেশান থাকে, বিছানায় ছটফট করে, বিনিদ্র রাত কাটায়, সামান্য তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হলে যদি বাতাসে দরজা নড়ে ওঠে, তখন তিনি উঠে বসে পড়েন। আমার সন্তান এল না তো? মা সন্তানের জন্য এতটাই আগ্রহভরে অপেক্ষা করেন। কিন্তু আমাদের মাশায়েখগণ লিখেছেন, ঘর ছাড়া সন্তানের জন্যও মা এতটা অপেক্ষা করেন না, যতটা বিগড়ে যাওয়া বান্দার জন্য আল্লাহ অপেক্ষা করেন। আল্লাহ অনেক বেশি অপেক্ষা করেন, আমার বিগড়ে যাওয়া বান্দা কখন আমার দরজায় ফিরে আসবে?

আল্লাহর দরজায় পড়ে থাকো

আরেকটি কথা মনে রাখবেন। আমরা যদি কিছু পাই, তা হলে তা কেবল আল্লাহর দরজায়ই পাব। অন্য কোথাও কিছুই পাব না। পৃথিবীতে দেখবেন, যে-কুকুরের গলায় মালা পরানো আছে, সে চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে; কিন্তু কেউ তাকে এক টুকরা রুটিও দেয় না। প্রত্যেকেই বলে, নিজের মালিকের দরজায় গেলে খেয়ে নেবে। তো যে-কুকুরের গলায় মালা পড়ে যায়, তাকে কেউ খাবার দেয় না। তদ্রূপ আমাদের গলায়ও কালেমায়ে তাওহীদের মালা পড়ে আছে। আমরাও দুনিয়া হতে কিছুই পাব না। শুধু একটি দরজা-ই আছে, যেখান থেকে আমরা কিছু পেতে পারি। অন্যের কম্বলে কেউ হাত লাগায় না। আমরা কালেমা পড়েছি। সারা জগত বলছে, তোমার দু'আর কী হলো? কবুল হচ্ছে না কেন?

কুফরি শক্তি আজ মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে। আমাদের অবস্থা হলো এমন যে, আমরা স্বীয় রব্বে কারীমের কাছে চাইতেই জানি না। স্বীয় প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন। মন খুলে প্রার্থনা করুন। তারপর দেখবেন, আল্লাহর রহমতের বারিধারা কীভাবে বর্ষিত হতে থাকে আর আমাদের প্রয়োজনগুলো পূরণ হতে থাকে। দুনিয়া-আখেরাতের সৌভাগ্য দান করেন। আপনি এই কাইফিয়্যাত নিয়েই দু'আ করুন। আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই দান করবেন।

হে আল্লাহ! এরা সবাই আপনার রহমতের ওপর নির্ভর করে বসে আছে। আপনার ঘরের চৌকাঠ ধরে বসে আছে। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত উঠব না, যতক্ষণ-না আজ আপনাকে রাজি করাতে পারব।

تنگ دستی کے جو عالم میں مَیں گھبراتا ہوں

ہر در غیر پر جاتے ہوئے کتراتا ہو

ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی

شرم آئی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔

'অভাব-অনটনের সময় আমি ঘাবড়ে যাই,

প্রত্যেক গাইরুল্লাহর দরজায় যাওয়া থেকে দূরে থাকি।

অভাবী মানুষের হাত পাতায় আবার আত্মমর্যাদা কীসের?

বড়ই লজ্জা হয়, এরপরও নিজেকে তোমার বান্দা বলে দাবি করি।

হে আল্লাহ! লোকেরা বলবে, বান্দা আপনার; অথচ তারা দু'আ করবে, চাইবে অন্যের কাছে এটা কী করে হয়! আমরা তো শুধু আপনার কাছেই প্রার্থনা করব।'

تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے

تمہارے در سے ہی لو لگی ہے

'আমি তোমারই কাছে চাইব; তুমি দিবে।

তোমার দরজার সাথেই অন্তর লেগে আছে।'

আসুন! আমাদের রবকে আমরা সন্তুষ্ট করি। আল্লাহকে আল্লাহর কাছেই চেয়ে নিই। আল্লাহ আমাদেরকে তার সান্নিধ্য, সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ নসিব করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

واٰخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین

– অষ্টাদশ খণ্ড সমাপ্ত –